ভগবদ্‌গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

কলিকাতা ১৪ পারসীবাগান লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

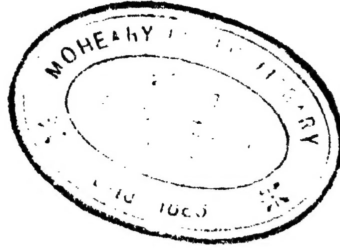
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য সাড়ে নয় টাকা

প্রথম সংস্করণ। আশ্বিন, ১৩৫৩

গীতা

বিষয়সূচী



মুখবন্ধ

সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার অল্প। সুতরাং প্রধানত অভিধান ও প্রচলিত টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়াই গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক স্থলে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক।

গীতার ব্যাখ্যার অন্ত নাই। গদ্যে পদ্যে গীতার অসংখ্য ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির ছাপ বর্তমান, অর্থাৎ গীতার টীকাকার যে মার্গের উপাসক, ব্যাখ্যায় তিনি সেই মার্গকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গের সাধক হইলে তিনি ভক্তিমার্গকে অথবা জ্ঞানমার্গের উপাসক হইলে জ্ঞানমার্গকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। যদিও সকলে নিজ নিজ সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে নিজেদের ব্যাখ্যাতে প্রতিপন্ন করেন নাই তথাপি তাঁহাদের লেখার মধ্যে অল্পাধিক সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতিতা থাকিয়া গিয়াছে। যুক্তিবাদীর পক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত ব্যাখ্যাই সত্যসন্ধিৎসুর আদর্শ। গীতাকার ঠিক কি বলিয়াছেন আমরা তাহাই জানিতে চাই।

এই ধরণের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্কিম চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন।

মনোবিদ্যার দিক হইতে আমি গীতার আলোচনায় নিযুক্ত হই। গীতায় এমন অনেক তথ্য আছে যাহা মনোবিদের দৃষ্টিতে মূল্যবান্। যুক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া গীতার বক্তব্য নির্ণয় আমার উদ্দেশ্য সুতরাং আমার এই ব্যাখ্যা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা দোষবর্জিত হইবার কথা। ধর্মভাবপ্রণোদিত হইয়া আমি এই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই নাই। তবে আমার ব্যাখ্যা যে অন্য দোষে দুষ্ট নহে এ কথা বলিতে পারি না। গীতার সর্বত্রই একটা সংগতির অবিচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যায়ের মধ্যেও এই সংগতি বিদ্যমান। এই সংগতিই যেন গীতার প্রাণ। যেখানে এই সংগতি উপলব্ধ হইয়াছে সেইখানেই বুঝিতে হইবে গীতার ব্যাখ্যা মোটামুটি নির্ভুল।

সত্যসন্ধিৎসা লইয়া গীতার ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিলে দেখা যায় এমন কতকগুলি শ্লোক আছে যাহার অর্থ বুঝা কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে এই সকল শ্লোক কবিকল্পনা বা অনর্থক কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। যেমন,

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮।২৪-২৫

অর্থাৎ, অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্ল ছয় মাস উত্তরায়ণ, তাহাতে মৃত ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন ॥ ধূম, রাত্রি এবং কৃষ্ণ ছয় মাস দক্ষিণায়ন, তাহাতে যোগী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্তন করেন ॥

উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে একরূপ গতি এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে অন্যরূপ গতি কেন হইবে, আর যে যে ভাবে হইবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাই না। তিলক মহোদয় তাঁহার 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা রহস্য' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে এই বিশ্বাস বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্লোক দুইটির নানারূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। যথা, (১) রূপক ব্যাখ্যা। "ধূমরূপ বাসনা-বিরহিত, নিশ্চল এবং জ্যোতিঃস্বরূপ যে মন, তাহাই 'অগ্নির্জ্যোতি' নামে অভিহিত। দিবস সদৃশ প্রকাশময় যে জ্ঞানে নিরন্তর জাগৃতি, তাহাই 'অহঃ' শব্দদ্বারা আখ্যাত, শুক্লপক্ষীয় রাত্রির নির্মল ও শান্ত চন্দ্রিকার ন্যায় মনের যে অবস্থা, তাহাই এ স্থলে 'শুক্লপক্ষ'। চিত্তের পূর্ণ জ্ঞানময় অবস্থা এ স্থলে 'ষণ্মাসা উত্তরায়ণ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা উদ্দিষ্ট" ইত্যাদি ॥ শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী কৃত ব্যাখ্যা ॥ এই রূপক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা বলা যায়। হঠাৎ গীতাকার কেন রূপকের আবরণে তাঁহার বক্তব্য ঢাকিলেন তাহা বুঝা যায় না। ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকে যত্র কালে ইত্যাদি বলা হইয়াছে। কালের অর্থ সময়, চিত্তের অবস্থা নহে। রূপক ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। (২) আক্ষরিক ব্যাখ্যা। এইরূপ ব্যাখ্যায়, গীতাকারের মতে উত্তরায়ণে মরিলে ব্রহ্মলাভ হয় মানিয়া লইতে হয়। যুক্তির দিক দিয়া এ কথা আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং মনে হয় ইহা কবিকল্পনা অথবা তৎকালীন সাধারণ বিশ্বাসের সমর্থনে কষ্টকল্পনা কিন্তু শ্লোক দুইটিকে কষ্টকল্পনা বা কবিকল্পনা মানিয়া লইতেও বাধা আছে। যিনি গীতায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন সেই গীতাকার যে হঠাৎ একটা গাঁজাখুরি কথা বলিবেন ইহা বিশ্বাস করা দুরূহ। অবশ্য একদিকে অলৌকিক জ্ঞান অপর দিকে ভ্রান্ত কুসংস্কারের একত্র সমাবেশ যে একেবারে অসম্ভব তাহাও নহে। (৩) অলৌকিক ব্যাখ্যা। এইরূপ মরিলে সত্যই ব্রহ্মলাভ হয়। তবে তুমি আমি এ কথা বুঝিতে পারিব না। যোগবলে এই সত্য পাওয়া গিয়াছে, এবং স্বয়ং ভগবান্ যখন গীতায় এ কথা বলিয়াছেন তখন তোমাকে এ কথা মানিতেই হইবে। যোগবল জন্মিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া যুক্তিবাদীর পক্ষে শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না বলাই সংগত। ব্যাখ্যা শুধু কথার মানে নহে। কেন কথাটি বলা হইল, পূর্ব বা পরের শ্লোকের সহিত ইহার সংগতিই বা কি, বিষয়টি যুক্তিসহ কি না, এই সমস্ত আলোচনাই ব্যাখ্যার বিষয়ীভূত। গীতার অলৌকিক অংশ বাদ দিলেও গীতাকারের উপদেশ

বুঝিতে কিছু অসুবিধা হয় না। আধুনিক যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতেও গীতার উপদেশ অতি মূল্যবান।

ব্যাখ্যাকালে আমি নিম্নলিখিত পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছি.

(ক) যেখানে কোন শ্লোকের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি কারণ আমার বিশ্বাস গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হওয়ায় বুঝিতে হইবে তাহা জনসাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছে, এবং গীতাকারের সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিবার যোগ্যতার অভাব ছিল না। অনধিকারীকে গীতার কোন কোন উপদেশ বলিতে নিষেধ আছে এ কথা সত্য কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে সাধারণে গীতা পড়িবেন না। অনধিকারীর নিকট গীতার কোন কোন বিশেষ কথা ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে ইহাই বলা উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে ১৮।৬৮ শ্লোকে অধিকারীর নিকট গীতা ব্যাখ্যা করার ফল বর্ণিত আছে এবং ১৮।৭০ শ্লোকে সাধারণকে গীতা পড়িতে প্ররোচিত করা হইয়াছে।

(খ) যেখানে কোন শ্লোকের কোন প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যান্য শ্লোকের বিরোধী মনে হইয়াছে, আমি তাহা ভ্রান্ত বলিয়া বর্জন করিয়াছি।

(গ) যে ব্যাখ্যাতে সংগতির অভাব লক্ষ্য করিয়াছি তাহা বর্জন করিয়াছি।

(ঘ) কোনও অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করি নাই।

গ্রন্থের শেষ অংশে শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত শ্লোক বাংলা অক্ষরে দিয়াছি। পাঠক যদি গীতার শ্লোকগুলি কিংবা তাহার যথাযথ অনুবাদ বার বার একটানা পাঠ করেন তবে তাঁহার নিকট শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ ও সংগতি আপনা হইতেই প্রতিভাত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই শ্লোক ও তাহার যথাযথ অনুবাদ পৃথক্ দেওয়া হইয়াছে। যথাযথ অনুবাদের দোষ এই যে তাহা অনেক সময় সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ এবং শ্রুতিকটু হয় কিন্তু এইরূপ অনুবাদেই গীতাকারের প্রকৃত বক্তব্য সুগম হইবে। যথাযথ অনুবাদ সকলপ্রকার পক্ষপাতদোষ হইতে মুক্ত হইবে আশা করা যায়।

গ্রন্থের আরম্ভে 'মুখবন্ধ,' 'অবতরণিকা,' 'যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার অবতারণা কেন' এবং 'মহাভারতে গীতা' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। পাঠককে এই কয়টি প্রবন্ধ অগ্রে পড়িতে অনুরোধ করি। এই প্রবন্ধগুলির পর মূলগীতার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাখ্যা যাহাতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পড়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। ব্যাখ্যার নীচে মূল শ্লোক দেওয়া আছে। ব্যাখ্যায় শ্লোকের যে অনুবাদ আছে তাহা যথাযথ অনুবাদের অনুগামী তবে বোধসৌকর্যার্থে তাহাতে স্থানে স্থানে শ্লোকাতিরিক্ত শব্দ যোগ করিয়াছি এবং শ্লোকোক্ত কোন কোন শব্দ, যথা, চ, হি, ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছি। শ্লোকের পৌর্বাপর্যও দুই এক স্থলে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে। ব্যাখ্যায় শ্লোকের যে অর্থ আছে তাহা কুত্রাপি যথাযথ অনুবাদকে অতিক্রম করে নাই। যে স্থলে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমার নিজমতের মিল

হয় নাই কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই শ্লোকের অন্বয় দিয়াছি। ব্যাখ্যায় সমস্ত পারিভাষিক ও দুরূহ শব্দের অর্থ যথাশক্তি নির্দেশ করিয়াছি।

পরিশিষ্টে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়, যেমন, 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ,' 'সৃষ্টিতত্ত্ব,' 'পুনর্জন্ম,' 'সত্ত্ব রজ তম' ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের কোনটি কখন পড়িলে গীতার বক্তব্য সুগম হইবে তাহা মূল শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাকালে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন ?, উদ্ধার চিহ্ন " " ইত্যাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির অনুমোদিত বানানপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি। বাংলা শব্দে অন্তস্থ বিসর্গ বর্জন করিয়াছি। গ্রন্থশেষে পারিভাষিক ও বিশিষ্ট শব্দের নির্ঘণ্ট আছে। কোথায় কোন্ শব্দের অর্থ বিচার করা হইয়াছে এই নির্ঘণ্টে তাহারও নির্দেশ আছে। গ্রন্থারম্ভে বিষয়সূচীতে পত্রসংখ্যা উল্লিখিত আছে কিন্তু নির্ঘণ্টে গীতার শ্লোকসংখ্যা এবং পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদসংখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যায় চতুর্দশ অধ্যায়, পঞ্চম শ্লোক ইত্যাদি নির্দেশ ১৪শ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক এই ভাবে না লিখিয়া ১৪ অধ্যায়, ৫ শ্লোক এই ভাবে লেখা হইয়াছে।

অবতরণিকায় গীতার শ্লোকের যে পদ্যানুবাদ আছে তাহার কতক আমার পূজ্যপাদ খুল্লতাত ৺শরদিন্দু মিত্র মহাশয়ের দুষ্প্রাপ্য 'চিদানন্দ গীতা' হইতে গৃহীত, কিছু আমার পিতৃদেব ৺চন্দ্রশেখর বসুর, কিছু কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের। গীতার ব্যাখ্যার আট অধ্যায় ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ সালে 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে তাহা বহুলাংশে পরিবর্তিত করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। মূলব্যাখ্যার মধ্যে যে কয়টি পদ্যানুবাদ আছে তাহা আমার নিজের। গ্রন্থপ্রণয়নে গীতামর্মজ্ঞ পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাচরণ সেন, পরলোকগত বন্ধু ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং আমার সুখদুঃখভাগী সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ীর নিকট প্রভূত উৎসাহ পাইয়াছি। ব্যাখ্যার যাথার্থ্য বিচারে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষাংশে মূল শ্লোকের যে যথাযথ গদ্যানুবাদ আছে তাহা প্রস্তুত করিতে আমার মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর লিখিত গীতার অনুবাদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। গ্রন্থ মুদ্রণব্যাপারে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৪ পারসীবাগান লেন, কলিকাতা। মহালয়া
১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৩। ২রা অক্টোবর, ১৯৪৬

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

অবতরণিকা

পুরাকালে মগধ দেশে শর্বিলক নামে এক মহাতেজস্বী ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শর্বিলক শালপ্রাংশু মহাভুজ ও অসীম শক্তিশালী। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। নানাদেশ হইতে বহু শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। যজন-যাজন ও শাস্ত্রচর্চায় তাঁহার গৃহ সর্বদা মুখরিত থাকিত। মগধে শর্বিলকের সম্মানের সীমা ছিল না।

শর্বিলকের পুণ্ডরীক নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। পুণ্ডরীক ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে একদিন প্রত্যূষে তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস, আজ অতি শুভদিন, আজ তোমাকে দীক্ষা দিব স্থির করিয়াছি। তুমি আজ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিবে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে অমাবস্যা পড়িলে তোমাকে আমাদের কৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করিব; তুমি সন্ধ্যা হইতে নিজ গৃহে নিজনে অবস্থান করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিও।'

পিতার উপদেশমত পুণ্ডরীক সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে নিজগৃহে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া পিতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রি; সমস্ত পুরী নির্জন নিস্তব্ধ। সহসা পুণ্ডরীকের গৃহদ্বার খুলিয়া গেল। ক্ষীণ দীপালোকে পুণ্ডরীক দেখিল কৌপীনধারী এক বিরাট পুরুষ গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান; সর্বাঙ্গ তাঁহার তৈললিপ্ত, উভয় স্কন্ধে শাণিত কুঠার। এই বীভৎস মূর্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, ভীত পুণ্ডরীক নিজ পিতাকে চিনিতে পারিয়া অতীব বিস্মিত হইল। গম্ভীর কণ্ঠে শর্বিলক বলিলেন, 'বৎস, নির্ভয় হও। তোমার দীক্ষাকাল উপস্থিত। কাষায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ কর; সর্বাঙ্গে তৈল লেপন করিয়া এই কুঠার হস্তে আমার অনুগমন কর, কোন প্রশ্ন করিও না।' এই বলিয়া শর্বিলক পুত্রের হাতে একখানি শাণিত কুঠার দিলেন, অপর কুঠার তাঁহার স্কন্ধে রহিল। পুণ্ডরীক মন্ত্রমুগ্ধের মত পিতার নির্দেশ প্রতিপালন করিল।

নানাপথ অতিক্রম করিয়া শর্বিলক পুত্রকে মগধ হইতে বারাণসী যাইবার রাজবর্ত্মের পার্শ্বে এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বলিলেন, 'তুমি এই অন্ধকারে সতর্ক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাক, কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়।' শর্বিলকও পুত্রের পার্শ্বে উদ্যত কুঠার হস্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে ও অন্ধকারে ভ্রমণজনিত পথশ্রমে পুণ্ডরীকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় মুহূর্তকে যুগ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কপালে স্বেদসঞ্চার হইল, শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল।

ধনবীর শ্রেষ্ঠী বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্যে রাজগৃহ হইতে বারাণসী যাইতেছিলেন। শীঘ্র পৌঁছিবার আদেশ থাকায় রাত্রেও তাঁহাকে পথ চলিতে হইতেছিল। সঙ্গে তাঁহার চর্মপেটিকায় বদ্ধ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া শকটের সম্মুখে চারিজন ও পশ্চাতে চারিজন সশস্ত্র প্রহরী চলিতেছে। শকট যেমনি সেই বৃহৎ বটবৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল অমনি বিকট হুঙ্কার করিয়া শবিলক অতর্কিতভাবে শকট আক্রমণ করিলেন। শকটের ম্লান আলোকে তাঁহাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। শকটচালক ও রক্ষিগণ প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। শাণিত কুঠার ঘুরাইয়া শর্বিলক ধনবীরের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইল। স্বর্ণমুদ্রার সুবৃহৎ গুরুভার পেটিকা অক্লেশে পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া শর্বিলক বটবৃক্ষমূলে ফিরিয়া আসিলেন। এই নৃশংস ব্যাপার দর্শনে পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে কুঠার স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, সে বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে। শর্বিলক কুঠার কুড়াইয়া লইলেন এবং পুত্রের হাত ধরিয়া যন্ত্রচালিতের মত তাহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে তাহার নিজ ঘরে বসাইয়া বহির্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ একাকী গৃহমধ্যে অবস্থান করিবার পর পুণ্ডরীক প্রকৃতিস্থ হইল। তখন ঘৃণায়, রোষে, ক্ষোভে তাহার মন মথিত হইতে লাগিল। মুহূর্তের জন্য আর সে এরূপ পিতার গৃহে অবস্থান করিবে না। দারুণ উদ্বেগে অবশিষ্ট রাত্রি কাটাইয়া প্রত্যূষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ঘুম ভাঙিলে দেখিল মুক্ত দ্বারপথ দিয়া প্রভাত সূর্যকিরণ গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং গৃহমধ্যে প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি তাহার পিতা চিরপরিচিত বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। রাত্রের সমস্ত ঘটনা দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইল

কিন্তু পরক্ষণে নিজের কৌপীন ও তৈলাক্ত শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সে ভুল ভাঙিয়া গেল। পিতা কহিলেন, 'বৎস, বৃথা উতলা হইও না। এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহা তোমার মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে।' পুণ্ডরীক বলিল, 'গতরাত্রে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আর মুহূর্তকালও এ গৃহে অবস্থান করিবার ইচ্ছা নাই। আমি এই দণ্ডে গৃহত্যাগ করিব, আপনি পথ ছাড়িয়া দিন।' পিতা বলিলেন, 'অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তোমার মন প্রকৃতিস্থ নাই; তুমি স্নানাহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, পরে তোমাকে আমাদের বংশগত কৌলিক দীক্ষার বিবরণ বলিব। সমস্ত শুনিয়া তখন যদি গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় করিও, আমি তাহাতে বাধা দিব না কিন্তু এখন তুমি কোথাও যাইতে পাইবে না।' পুণ্ডরীক বুঝিল পিতার অমতে তাহার গৃহ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। প্রয়োজন বুঝিলে তিনি বলপ্রয়োগেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুণ্ডরীককে স্নানাহার সারিয়া বিশ্রাম করিতে হইল।

দ্বিপ্রহরে শর্বিলক আসিলেন। বলিলেন, 'যাহা বলি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তোমার কিছু প্রশ্ন থাকিলে পরে করিও।' শর্বিলক বলিতে লাগিলেন, 'আমাদের বংশ অতি প্রাচীন। পাণ্ডবের রাজত্বকাল হইতে অদ্যাবধি আমাদের বংশে একই কৌলিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পুত্র ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে পিতা তাহাকে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়া কৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করিবেন। আমিও ষোড়শ বর্ষে আমার পিতার নিকট হইতে দীক্ষা পাইয়াছি এবং আশা করি তুমিও পুত্রলাভ করিয়া তাহাকে ষোড়শ বর্ষ বয়সে এই সনাতন কুলপ্রথায় দীক্ষিত করিয়া বংশের কৌলিক আচার অক্ষুণ্ণ রাখিবে। আমার যে এই অতুল ঐশ্বর্য দেখিতেছ, তাহার অধিকাংশই পরের নিকট হইতে বাহুবলে অর্জিত। আমি দিবাভাগে লোকধর্ম পালন করি, অনাথ আতুর দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকের প্রার্থনা পূর্ণ করি, এবং রাত্রে কৌলিক আচার পালন করিয়া অর্থোপার্জন করি। এই কৌলিক আচার পালনে আমাকে কোনও প্রকার অধর্ম স্পর্শ করে না। আমি বুঝিতেছি তোমার মনে কি চিন্তা উদিত হইতেছে। তুমি তোমার পিতাকে ভণ্ড, পরস্বাপহারক ও নরহন্তা বলিয়া মনে করিতেছ। ভাবিতেছ, এরূপ পিতার আশ্রয়ে বাস ও অন্নগ্রহণ মহাপাপ। ইহা অপেক্ষা ভিক্ষান্নভোজন অথবা মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়। তোমার মনে দুঃখ ক্ষোভ ও নানাবিধ ব্যামোহ আসিয়া চিত্তবিভ্রম ঘটাইতেছে। তোমার শরীর মন প্রকৃতিস্থ

নাই। তুমি তীক্ষ্ণধী। স্থিরভাবে সমস্ত কথা বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, বাস্তবিকপক্ষে তোমার মনঃক্ষোভের কোনই কারণ নাই। তুমি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ ও তাহার মর্ম উপলব্ধি করিয়াছ। অর্জুনেরও যুদ্ধকালে ঠিক এইরূপ চিত্তবিকার দেখা দিয়াছিল। আমি নিজকর্মের জন্য তোমাকে কোনরূপ মনগড়া কারণ দেখাইয়া দোষক্ষালনের চেষ্টা করিব না। সর্বলোকমান্য গীতাশাস্ত্রের উপদেশমাত্র তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিব; তুমি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছ, সহজেই গীতার উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি মোহবশে অর্জুনের মত কষ্ট পাইতেছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে কুরুসৈন্যের সম্মুখীন করিলেন, তখন অর্জুনের মনে মোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,

দেখিয়া স্বজন, কৃষ্ণ, সমবেত রণোন্মুখ,
অবসন্ন গাত্র মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ।
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত,
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত।
নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন,
হে কেশব, দুর্নিমিত্ত করিতেছি দরশন। ১।২৮-৩০

দেখ, তোমারই মত অর্জুনের শরীরে ও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। তুমিও অর্জুনেরই মত এ অবস্থায় ভিক্ষান্নভোজন শ্রেয় মনে করিতেছ,

না বধিয়া গুরু, মহান আশয়
ভিক্ষান্নভোজন মঙ্গল আমার
অর্থলুব্ধ মন গুরু করি হত,
ভুঞ্জিব কি ভোগ, শোণিত আধার। ২।৫

'আমি দিবাভাগে লোকধর্ম ও রাত্রে কুলধর্ম পালন করি। সাধারণকে আমার কুলাচারের কথা বলি না বলিয়া তুমি হয়ত আমাকে মিথ্যাচারী ও ভণ্ড মনে করিতেছ কিন্তু দেখ, সাধারণে দুর্বলচিত্ত। তাহারা আমার কুলাচারের মহিমা কেমন করিয়া বুঝিবে? আমার কুলধর্মের কথা জানিতে পারিলে তাহারা আমাকে উৎপীড়িত করিবে; সে উৎপীড়ন হয়ত আমার পক্ষে অসহ্য হইবে। এই দুর্বলতার ফলে আমাকে সত্য গোপন করিতে হয়। তুমি মনে করিও না আমি সত্যগোপনকে মিথ্যাচার বলিয়া মনে করি না। যে সত্য গোপন করে, সেই মিথ্যাচারী। অতএব

স্বীকার করিতেছি, আমি মিথ্যার আশ্রয়ে আছি। তুমি জানিবে মিথ্যার আশ্রয় ব্যতীত কাহারও সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না। সকলেই অল্পবিস্তর দুর্বল, এবং এই দৌর্বল্যজনিত অনিস্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে গেলে সকলকেই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধবধকালে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়াছিলেন। মহাভারতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিবার ব্যবস্থা আছে। আরও দেখ, শাস্ত্রের উপদেশ মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ কিন্তু অপ্রিয় সত্য গোপন মিথ্যারই প্রকারভেদমাত্র। সর্বত্র সর্বাবস্থায় সত্যকথা বলিতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না, এমন কি লৌকিক ভদ্রতাও রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। গীতায় আছে,

কর্মেন্দ্রিয় ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাকে
ধ্যান যার ইন্দ্রিয় বিষয়।
মূঢ় আত্মা মিথ্যাচারী তাহাকেই কয়। ৩।৬

আমরা সকলেই মনে একরূপ ভাবি, আর সমাজভয়ে কার্যে অন্যরূপ ব্যবহার করি। সুতরাং আমরা সকলেই ভণ্ড ও মিথ্যাচারী। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সমুদয় প্রাণীতে মিথ্যা আচরণ বিধান করিয়াছেন। প্রবল শক্তিশালী সিংহ ব্যাঘ্রও লুক্কায়িত থাকিয়া অতর্কিতভাবে মৃগকে আক্রমণ করে। বহু কীটপতঙ্গ আত্মরক্ষার জন্য অন্য প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়া থাকে। এ সমস্তই মিথ্যা ব্যবহার বলিয়া জানিবে। অতএব আমাকে যদি মিথ্যাচারী ভণ্ড বলিয়া ঘৃণা করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতে হয়। সত্যের ন্যায় মিথ্যাও ভগবানেরই বিধান; নচেৎ ক্ষুদ্র মনুষ্যের বা অন্য কোন প্রাণীর সাধ্য কি যে সর্বশক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিথ্যার সৃষ্টি করে?

'যদি আমাকে পরস্বাপহারক মনে করিয়া দোষ দিতে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমাকে আমি পুনরায় বলিব যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোকই পরস্বাপহারক। তুমি যে শাক যে অন্ন যে ফল ভোজন কর, তাহা সেই সেই বৃক্ষলতাদিকে বঞ্চিত করিয়াই কর। আমিষাশী মনুষ্য অপর প্রাণীর প্রাণ হিংসা করে। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু কিছুই নাই। ধনাপহরণ অপেক্ষা প্রাণাপহরণ গুরুতর অপরাধ বলিতে হইবে। আরও দেখ, ভগবান কাহাকেও কোনও ধন বা ঐশ্বর্য্য দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন

নাই। এই পরিমাণ ভূমি অর্থ পশু তোমার এবং এই পরিমাণ অপরের, এমন বিভাগ তিনি কাহাকেও করিয়া দেন নাই। মানুষ নিজ বাহু ও বুদ্ধিবলে যাহা অর্জন করে, তাহাই তাহার সম্পত্তি। রাজা পরস্বাপহরণ করিয়া রাজা হন। যখন পাণ্ডবদিগের রাজত্ব ছিল, তখন তাঁহারা পরের নিকট হইতেই রাজ্যৈশ্বর্য আহরণ করিয়াছিলেন; আবার যখন তাঁহারা বিতাড়িত হইলেন, তখন কৌরবেরাই তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। রাজার অধিকার বাহুবলেরই অধিকার, রাজার তাহাতে' পাপ স্পর্শে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রাজ্যই পুনরায় অধিকার করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই কুরুপাণ্ডবেরা এখন কোথায়? বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। রাজারা বহুব্যক্তির ধনাপহরণ করেন; সেই তুলনায় আমি অল্প কয়েকজনেরই অর্থ বাহুবলে লইয়াছি।'

'নরহন্তা ভাবিয়া তুমি আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছ। সাধারণ বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া অর্জুনেরও তোমার মতই নরহত্যা সম্বন্ধে ভ্রান্তজ্ঞান মনে উঠিয়াছিল।

একি মহাপাপ মোরা করিতে বসেছি হায়,
রাজ্যসুখ লোভে ব্রতী বন্ধুবধ-ব্যবসায়।
প্রতিহিংসা প্রতিহত অশস্ত্র আমারে হত
করে যদি সশস্ত্র এ ধার্তরাষ্ট্রগণ,
তাহাও মানিব মম মঙ্গলকারণ। ১।৪৪-৪৫

কাহারও মৃত্যু ঘটিতে দেখিলে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির দুঃখবোধ স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুতে তুমি যদি অর্জুনের মত দুঃখবোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কথায় তোমাকে বলিব,

অ-শোকে করহ শোক কহ কথা বিজ্ঞপ্রায়,
মৃত বা জীবিত জনে পণ্ডিতে না শোক পায়।
কৌমার যৌবনজরা যথা এ দেহীর দেহে,
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা জ্ঞানী তাহে মুগ্ধ নহে।
জেনো তুমি অবিনাশী যেই আত্মা সর্বময়,
নাশিতে অব্যয় আত্মা, কেহই সমর্থ নয়।
অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য আত্মা যিনি,
অন্তবন্ত এই সব দেহধারী তিনি।

নাশ নাই কভু তাঁর শরীর সহিত,
হে ভারত, হও তুমি যুদ্ধে উৎসাহিত।
যে ইহারে হন্তা ভাবে, যেবা ভাবে হত,
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপত,
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত।
না জন্মেন না মরেন ইনি কদাচন,
জন্মবিনা নন স্থিত না ভাব এমন।
জন্মহীন সদা এক পুরাণ শাশ্বত,
শরীরের নাশে কভু না হয়েন হত। ২।১১,১৩,১৭-২০

তুমি বুদ্ধিমান ; গীতাশাস্ত্রের এই সমস্ত উপদেশে মনোযোগ করিলে তোমার শোক অপনোদন হইবে। আত্মা অবিনাশী হইলেও যদি মনে কর যে আমার দ্বারা শ্রেষ্ঠীর শরীর বিনষ্ট হইয়াছে, তবে তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

যদি তার জন্মমৃত্যু নিত্য বলি কহ
তবু মহাবাহো, তুমি শোকযোগ্য নহ।
জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মৃতে জন্ম ধ্রুব,
হেন অনিবার্যে শোক অনুচিত তব।
যথা জীর্ণ বস্ত্রভার করি নর পরিহার
পরে নব বসন অপর।
তথাবৎ জীর্ণকায় দেহী পরিত্যজি যায়,
পুন পায় নব কলেবর। ২।২৬-২৭,২২

'ধনবীর বৃদ্ধ হইয়াছিল অথচ তাহার ভোগবাসনা বিরহিত হয় নাই। দেহ বিনাশে তাহার উপকার হইল। সে এখন কামনা অনুযায়ী নব কলেবর ধারণ করিবে। ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের জন্য শোক অনুচিত।

সর্বদেহে দেহী নিত্য অবধ্য ভারত,
অতএব কারও জন্য শোক অনুচিত। ২।৩০

নরহত্যা করিয়া লোকাচার লঙ্ঘন করিয়া আমি পাপভাগী হইয়াছি, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। দেখ, প্রত্যেকে নিজ নিজ কুলধর্ম পালন করে, ইহাতে তাহাদের পাপ হয় না। বরং কুলধর্ম বর্জন করিলে পাপভাগী

হইতে হয়। অর্জুন আত্মীয়স্বজনবধ ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

স্বধর্মেও চাহি কর চলচ্চিত্ত পরিহার,
ধর্মযুদ্ধ সম শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।
যদৃচ্ছা যুটেছে যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গ-দ্বার প্রায়,
সুখী ক্ষত্র তারা পার্থ, যারা হেন রণ পায়।
আর যদি ক্ষান্ত রও এ ধর্ম আহবে,
স্বধর্ম ও কীর্তিত্যাগে পাপভাগী হবে। ২।৩১-৩৩

কুলধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া ধনবীরকে হত্যা না করিলেই আমি পাপভাগী হইতাম। আমিই ধনবীরকে হত্যা করিয়াছি, এরূপ মনে করাও সমীচীন নহে। ভগবানই সকলকে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করেন। মনুষ্য নিমিত্তমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

লোকান্তক মহাকাল আমি হই
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত হেথায়
তুমি না হলেও রবে না কেহই
প্রতি সৈন্যস্থিত যোদ্ধা সমুদয়।
অতএব উঠ, লভ যশ তুমি
ভুঞ্জ সুখরাজ্য জিনি শত্রুদল
পূর্বেই করেছি সবে হত আমি
হও সব্যসাচী নিমিত্ত কেবল। ১১।৩২-৩৩

তোমার মনে যদি এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে পূর্ণজ্ঞানীর প্রতি এই সব উপদেশ প্রযোজ্য, তবে তাহাও ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। অর্জুনের দিব্যদৃষ্টিলাভের বহুপূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়

অতএব হে পুণ্ডরীক, সর্বজ্ঞানী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত বাণী স্মরণ করিয়া তুমি শোক মোহ বর্জন কর; সনাতন কুলধর্মপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ধর্ম অর্জন কর। তুমি অতি পবিত্র মহান্ বংশের সন্তান; সেই প্রাচীন বংশের কুলধর্মসূত্র কর্তন করিও না।

ভ'জো না ক্লীবত্ব, নহে তব যোগ্য কদাচন
হৃদয়-দৌর্বল্য ক্ষুদ্র ত্যজি উঠ অরিন্দম। ২।৩

পুণ্ডরীক একাগ্রমনে সকল কথা শুনিতেছিল। পিতৃমুখে গীতোক্ত সনাতন ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার মনের সকল দ্বন্দ্ব সূর্যালোকে অন্ধকারের ন্যায় অপসৃত হইল। রোমাঞ্চিত কলেবরে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পুণ্ডরীক বলিল,

মোহ গেল স্মৃতি এল অচ্যুত প্রসাদে তব
সন্দেহ বিগত হ'ল তব আজ্ঞাকারী হব। ১৮।৭৩

শর্বিলক উপাখ্যানে গীতার যে উপদেশ আছে, প্রকৃতপক্ষে কি গীতাশাস্ত্র ঐরূপ উপদেশ দেয়? পুণ্ডরীককে নরহত্যায় উৎসাহিত করা ও অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা কি একই ব্যাপার? অহিংসধর্মী জৈন বা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিবেন উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। শর্বিলক যদি গীতাশাস্ত্রের যথার্থ উপদেশ দিয়া থাকেন তবে সাধারণ নরহত্যাকারী, চোর, ঠগ, লম্পট প্রভৃতি সকলেই গীতার দোহাই দিবে। আর শর্বিলক যদি ভুল উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে সে ভুল কোথায়? শর্বিলক কথিত গীতার শ্লোকগুলির যথার্থ মর্মই বা কি? এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত গীতার কোন ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হইতে পারে না। শর্বিলকের উপাখ্যান মনে রাখিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গীতার ব্যাখ্যায় আমি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার অবতারণা কেন ?

গীতার উপদেশ সাংসারিক সর্ব ব্যাপারেই প্রযোজ্য। গীতাকার তাঁহার বক্তব্য প্রচারের জন্য যুদ্ধের ঘটনার আশ্রয় লইলেন কেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। তিনি কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইতেছেন,

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ১১।৩৩

অর্থাৎ, অতএব তুমি উঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।

সমস্ত সনাতন ধর্মশাস্ত্রের উপদেশের মূল উদ্দেশ্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। মোক্ষলাভের আগ্রহও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। সাধারণে পুনঃপুন জন্মগ্রহণের কষ্ট লইয়া মাথা ঘামায় না। এই জন্যেই সে যা কষ্ট ভোগ করে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় সে চিন্তা করে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইলে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ইত্যাদি সকল কষ্টেরই নিবৃত্তি হইবে আশা করা যায়। সংসারে থাকিলে কিছু না কিছু কষ্ট সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই কষ্ট নিবারণের জন্য নানা উপায় কল্পিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে সাংসারিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়-কল্পনার আদর্শের ধারা একেবারে বিভিন্ন। পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা নিজকে সংসারসংগ্রামের উপযোগী কর, পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহাতে নিজের অধিকার ও সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার চেষ্টা দেখ, জ্ঞানার্জন করিয়া প্রকৃতিকে নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নিয়োজিত কর; মোট কথা, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের সুবিধানুযায়ী পরিবর্তিত কর। সংসার-কণ্টকারণ্যের যতগুলি পার কণ্টক উৎপাটন কর। প্রাচ্যে যে এরূপ চেষ্টা নাই, তাহা নহে। তবে এখানকার সনাতন আদর্শ অন্যরূপ। সংসারের সমস্ত কণ্টক তুমি কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না। কাজেই তোমার নিজেকেই এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে কণ্টক তোমাকে না বেদনা দিতে পারে। রাস্তার কঙ্কর সব দূর করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া পায়ে জুতা পরাই ভাল। এক আদর্শে বহিঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব, এবং অপর আদর্শে

নিজের উপর প্রভুত্বের চেষ্টাই কাম্য। পাশ্চাত্য আদর্শ মতে সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভবপর নহে, তবে প্রকৃতিকে আমি তোমার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিজের কাজে লাগাইতে শিখিয়া অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারি, প্রচুর ধনোপার্জন করিয়া সুখে ইচ্ছামত আহার বিহার করিতে পারি। একেবারেই আমার কোনও কষ্ট থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারি না। রোগ শোক দুঃখ ইত্যাদির হাত হইতে একেবারে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

হিন্দু আদর্শ বলিবে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, মৃত্যু-ভয়, ইত্যাদি সকল প্রকার অশান্তি দূর করা যাইতে পারে এবং তুমি আমি চেষ্টা করিলে এইরূপ অবস্থায় পৌঁছিলেও পৌঁছিতে পারি। এত বড় কথা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ কখনও বলে নাই। এই দুঃখময় সংসারের সকল দুঃখ যে মৃত্যু ভিন্নও নিবারিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন। আমাদের দেশের আদর্শ যাঁহারা মানেন তাঁহাদের ভিতরেও কি উপায়ে এইরূপ আত্যন্তিক দুঃখনিবারণ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। কেহ বলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও ভোগবিলাসের মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া দণ্ড-কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া নির্জনে আত্মচিন্তাই ইহার উপায়। কৌপীন-বন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। তুমি আমি এই উপায় অবলম্বন করিতে বিলক্ষণ ইতস্তত করিব, কারণ সংসার পরিত্যাগের ইচ্ছামাত্রই সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর। তবে যদি কাহারও সংসারে বিরতি হইয়া থাকে, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কেহ বলিবেন, যাগ-যজ্ঞ ও ভগবানের উপাসনা ইত্যাদি কর, শান্তি পাইবে; কিন্তু এই উপায়ে কিরূপে রোগ শোক ইত্যাদি কষ্ট নিবারণ হইবে তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে এই সকল প্রক্রিয়ায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা হয় কিন্তু কষ্ট সহ্য করা এক ও কষ্ট না হওয়া আর এক। কেহ বলিবেন, যোগ অভ্যাস কর, যোগীর পৃথিবীতে কষ্ট নাই। প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখম্। যোগাগ্নিময় শরীর পাইলে তাহার রোগ জরা, দুঃখ থাকে না। কথাটি বড়ই অদ্ভুত। সত্যিই যদি এ প্রকার হয় তবে বাস্তবিকই এই মার্গ অনুসরণীয়। যোগ অভ্যাস সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং যদি কেহ যোগ অভ্যাস করিতে মনস্থ করেন, তবে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহ উঠা স্বাভাবিক যে, এত কষ্ট করিয়া যোগ অভ্যাস করিবার পর যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইবে তাহার সঠিক

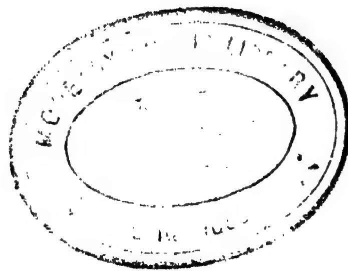
প্রমাণ কোথায় ? কোথায় সেই যোগী যিনি বলিতে পারেন এই দেখ আমি সাংসারিক সমস্ত দুঃখ কষ্টের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি। লঙ্কায় প্রচুর সোনা পাওয়া যায় শুনিলেও হয়ত অনেকেই সোনা আনিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে যাইতে রাজী হইবেন না। কাজেই অধিকাংশ ব্যক্তিই অনিশ্চিতের আশায় কঠোর যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত না হইয়া সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না।

ভক্তিমার্গে ভগবৎলাভ হয় ও ভগবৎলাভ হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, এ কথা হয়ত সত্য, কিন্তু আমার মনে যদি ভক্তি না উঠে, তার উপায় কি ? লঙ্কায় যাইলে সোনা মিলিতে পারে কিন্তু আমার যাইবার শক্তি কই ? যাঁহাদের মন ভক্তিপ্রবণ তাঁহারা এই মার্গের অনুসরণ করিতে পারেন।

নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ কেহ ভক্তিমার্গে, কেহ যোগমার্গে, কেহ সন্ন্যাসমার্গে যাইয়া থাকে। গীতাকার বলেন, তোমাকে কোন নূতন পন্থা ধরিতে হইবে না। তোমার নিজের মার্গে চলিয়াই কি করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, আমি তাহাই বলিব। এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, আমার উপদেশের সমস্ত না বুঝিলে বা তদনুসারে পূর্ণমাত্রায় চলিতে না পারিলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইবে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। গীতা শাস্ত্রের সামান্য মাত্র বুঝিয়াও তুমি মহৎ ভয় হইতে উদ্ধার পাইতে পার। সংসারে যে যতই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে থাকুক না কেন গীতোক্ত ধর্মের মহিমা বুঝিলে তাহার সমস্ত কষ্টের নিবৃত্তি হইবে। এ অতি আশ্চর্য কথা। তুমি ভিক্ষুক হও, পরের দাস হও, রোগী হও, ভোগী হও, ধনবান হও, যাহাই হও না কেন এবং যে অবস্থাতেই থাক না কেন, গীতার মর্ম উপলব্ধি করিলে তোমাকে কোন কষ্ট স্পর্শ করিতে পারিবে না। স্বল্প উপলব্ধিতেও অনেক লাভ।

সংসারে যত প্রকার কষ্ট আছে, কোন্ অবস্থায় তাহাদের সকলগুলি প্রকট হয় প্রশ্ন উঠিলে বলা যায় যে যুদ্ধ। যুদ্ধে অঙ্গহানির সম্ভাবনা ; রোগ শোক মৃত্যু ত আছেই, তাহা ছাড়াও যাহা কিছু মানুষের প্রিয়, সমাজের যাহা কিছু কল্যাণকর বন্ধন, সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। এমন কোনও কষ্টই আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না যাহা যুদ্ধের ফলে উৎপন্ন না হইতে পারে। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে নিজে ত এই সকল কষ্টভোগ করিতেই পারে, পরন্তু অন্যকেও এই সকল দুঃখ-কষ্টের অংশীদার

করে। অতএব এক কথায় যুদ্ধের মত দুঃখের ব্যাপার আর কিছুই নাই। এমন অবস্থায় পড়িয়াও যদি দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হয়, তবে সর্বাবস্থাতেই তাহা সম্ভব। এই জন্যই গীতাকার যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন। মহাভারতের যুদ্ধ বহুকাল পূর্বে হইলেও গীতার উপদেশ সর্বব্যক্তির পক্ষে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।



মহাভারতে গীতা

গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। বঙ্গবাসী সংস্করণ সংস্কৃত মহাভারতে ভীষ্মপর্বে মোট ১২২ অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে ২৫শ হইতে ৪২শ এই অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা। গীতা আরম্ভের পূর্ববর্তী ভীষ্মপর্বের অধ্যায়গুলির বক্তব্য সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি। গীতা অবতারণা কিরূপে হইল ইহাতে বুঝা যাইবে।

সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রের সমতল ভূমিতে পাণ্ডবেরা অবতীর্ণ হইয়া কৌরবদের অভিমুখী হইলেন এবং দুর্যোধনের সৈনিকবর্গের সম্মুখ দিয়া গমন পূর্বক পশ্চিমভাগে পূর্বমুখ হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে পাণ্ডবদিগের সহস্র সহস্র শিবির স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ শঙ্খ ভেরী ইত্যাদি নিনাদিত করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কি ভাবে যুদ্ধ চলিবে সে বিষয়ে উভয় পক্ষ মিলিয়া প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম স্থাপন করিলেন।

অনন্তর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধসংবাদ শুনাইবার জন্য সঞ্জয়কে নিয়োজিত করিলেন। ব্যাস বলিলেন, এই সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ শুনাইবেন, ইঁহার কিছুই পরোক্ষ থাকিবে না। সঞ্জয় দিব্যচক্ষু সমন্বিত হইয়া তোমাকে যুদ্ধকথা বলিবেন, ইনি সর্বজ্ঞ হইবেন, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে, দিবা বা রাত্রিতে যাহা কিছু ঘটিবে এবং মনে মনে যে যাহা চিন্তা করিবে সঞ্জয় সমস্তই জানিতে পারিবেন, ইঁহাকে শস্ত্র সকল ছেদন করিবে না, ইঁহাকে পরিশ্রম কাতর করিবে না, ইনি এই যুদ্ধ হইতে মুক্ত থাকিবেন।

যুদ্ধপ্রসঙ্গে ব্যাস তখন ধৃতরাষ্ট্রকে নানা দুর্নিমিত্তের কথা বলিতে লাগিলেন, কিরূপে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে ও দুই এক ব্যক্তির কাপুরুষতার ফলে কিরূপে বৃহৎ বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তাহা উল্লেখ করিলেন। ব্যাস প্রস্থান করিলে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হইয়া সঞ্জয়কে বলিলেন, তুমি ব্যাস প্রভাবে জ্ঞানচক্ষুরূপ দিব্যবুদ্ধিপ্রদীপযুক্ত হইয়াছ, যুদ্ধে সমাগত ব্যক্তিগণ যে দেশ হইতে আসিয়াছেন সেই সমস্ত দেশের বিবরণ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। উত্তরে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী,

নদী, পর্বত, কানন, দেশ বিদেশ ও জনপদসমূহ ও তাহাদের অধিবাসীদের বিস্তারিত বিবরণ শুনাইতে লাগিলেন।

অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের দশম দিবসে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তামগ্ন আছেন এমন সময়ে বিদ্বান সর্ব বিষয়ে ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিকট সহসা দ্রুতপদে আসিয়া ভীষ্মের পতনের সংবাদ জানাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পরম বিষাদগ্রস্ত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া কি প্রকারে ভীষ্মের মত মহাবীর নিহত হইলেন তাহার বিশদ বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। সঞ্জয় বলিলেন, শিখণ্ডীর হস্তে ভীষ্মের মৃত্যু সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া দুর্যোধন প্রথম হইতেই ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষার জন্য এবং শিখণ্ডী বধের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধস্থলে অর্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করায় তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দশ দিন যেরূপ নিদারুণ যুদ্ধের পর ভীষ্ম নিহত হইলেন সঞ্জয় তাহার বর্ণনা করিলেন। যুদ্ধের সূচনা হইতেই উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা কে কিরূপ আচরণ করিয়াছিল ধৃতরাষ্ট্র তখন তাহা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়, সেই রণে কোন পক্ষের যোদ্ধগণ অগ্রে হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, কাহারা উৎসাহিত ছিল এবং কাহারাই বা দীনচিত্ত হইয়াছিল, কোন পক্ষ অগ্রে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল, কোন পক্ষের সেনাদলে গন্ধ মাল্যের আধিক্য ছিল। সঞ্জয় উত্তর করিলেন, উভয় পক্ষ সমান হর্ষান্বিত ছিল এবং উভয় পক্ষে গন্ধমাল্যের সমান প্রাদুর্ভাব ছিল। উভয় সেনার মহান ব্যতিকর হইয়াছিল, এক পক্ষ যাহা করিতেছিল অপর পক্ষ তদনুরূপ আচরণেই তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছিল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়, অস্মৎপক্ষীয় যোধগণ ও পাণ্ডবগণ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছায় সমবেত হইয়া কিরূপ আচরণ করিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম শ্লোক।

গীতাব্যাখ্যা

গীতাব্যাখ্যা

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

॥ ১ ॥ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকামী হইয়া সমবেত মৎপক্ষীয়গণ এবং পাণ্ডবেরা কি করিয়াছিল ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার পার্শ্বচর সঞ্জয় ব্যাসপ্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিয়াও সমস্ত ঘটনাবলী দেখিতে পাইয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি বাস্তবিক সম্ভবপর কি না সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের জানা নাই। আমাদের দেশে দিব্যদৃষ্টির অস্তিত্বে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং পাশ্চাত্যেও অনেক মনীষী ক্লেয়ারভয়েন্স বা দিব্যদৃষ্টিতে বিশ্বাসবান। আমি এ পর্যন্ত দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি হওয়া না হওয়ার উপর গীতার উপদেশের মূল্য নির্ভর করে না। মহাভারতের অন্য অংশ বাদ দিলে সঞ্জয়ের যে দিব্যদৃষ্টি হইয়াছিল কেবলমাত্র গীতার মধ্যে এমন কথা নাই। ১৮।৭৫ শ্লোকে আছে, ব্যাসপ্রসাদে আমি এই পরমগুহ্য যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ কর্তৃক সাক্ষাৎ কথিত হইতে শুনিয়াছি। এই শ্লোকেও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি লাভের কথা নাই। আরও, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে অকুর্বত শব্দ আছে। এই শব্দ অনদ্যতন ভূতকাল সূচক। অনদ্যতনে লং। অর্থাৎ ঘটনা অদ্যকার নহে। যে ঘটনা পূর্বে ঘটিয়াছে ও অনেকে দেখিয়াছে সে সম্বন্ধে দিব্যদৃষ্টির অবতারণা নিরর্থক। 'মহাভারতে গীতা' শীর্ষক আলোচনায় দেখা যাইবে যে সঞ্জয় যখন হইতে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পূর্বেই

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১

ভারতযুদ্ধের নয় দিন অতিবাহিত হইয়াছে। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতনের পর সঞ্জয় গীতা বলিতেছেন। মহাভারতের বিবরণ পাঠে মনে হয়, সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে বার বার যাতায়াত করিতেন। তিনি সমস্ত ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং নিজবুদ্ধি সাহায্যে তাহাদের গুরুত্বাদি বিচার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছেন। যাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহা বুদ্ধি ও অনুমান সাহায্যে স্থির করিয়াছেন। বার বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাতায়াত সত্ত্বেও তিনি ক্লান্ত হন নাই, সৌভাগ্যক্রমে আহতও হন নাই। এই বিষয়গুলি স্মরণ রাখিলে সঞ্জয়ের বরপ্রাপ্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণে বর্ণনার ধারা এই যে ব্যক্তিবিশেষের গুণাবলী ও সৌভাগ্য বরপ্রসূত বলিয়া অভিহিত হয় এবং অবাঞ্ছনায় ঘটনা শাপের ফলে ঘটিয়াছে বলা হয়। মৎপ্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ' পুস্তকের ২৫৯ - ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সঞ্জয়কে ব্যাস বর দিলেন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, দিব্যচক্ষুসমন্বিত, সর্বজ্ঞ, অপরের মনোভাবজ্ঞাতা, জ্ঞানচক্ষুরূপ দিব্যবুদ্ধিপ্রদীপযুক্ত হইবেন, শস্ত্র তাঁহাকে ছেদন করিবে না এবং তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইবেন না। দিব্যদৃষ্টি অর্থে অমলদৃষ্টি অর্থাৎ যে দৃষ্টি ঘটনার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করায়। 'জ্ঞানচক্ষুরূপ দিব্যপ্রদীপযুক্ত' পদেও দিব্য শব্দ আছে। জ্ঞানচক্ষুই দিব্যপ্রদীপ। দিব্যদৃষ্টি শব্দ অলৌকিক দৃষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। সঞ্জয় নিজে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পরে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবিবরণ বলেন ভীষ্মপর্বে ইহাই পরিস্ফুট।

কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রের অপর নাম সমন্তপঞ্চক। ভারতযুদ্ধের বহুকাল পূর্ব হইতেই সরস্বতী তীরস্থ সমন্তপঞ্চক এক প্রধান তীর্থ বা ধর্মক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। কথিত আছে এই তীর্থে স্বীয় সন্তানগণের মৃত্যুর পর দিতি তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পঞ্চ হ্রদে রুধিরতর্পণ করিয়াছিলেন। আজও কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রই রহিয়াছে।

॥ ২ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহাকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া তখন রাজা দুর্যোধন আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ॥ ২ ॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

শ্লোকের আচার্য শব্দে দ্রোণাচার্য লক্ষিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ ৫৯ অধ্যায়ে আচার্যলক্ষণ বর্ণিত আছে, যথা, যাঁহারা বৃদ্ধ, অলোলুপ, আত্মবান, দম্ভহীন, সম্যক বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত, সরলচেতা তাঁহাদিগকে আচার্য বলা হয়। স্বয়ং আচার পালন করেন ও অপরকে আচারে প্রবর্তিত করেন এবং যমনিয়ম সহকারে শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করেন বলিয়া তাঁহারা আচার্য কথিত হন।

॥ ৩-৬ ॥ দুর্যোধন আচার্যকে বলিলেন, আচার্য, আপনার শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যূহাকারে সংস্থাপিত পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্য দেখুন। এই স্থানে বীর মহাধনুর্ধর যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের মত শক্তিমান যুযুধান, সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান কাশিরাজ, কুন্তিভোজ পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ উপস্থিত আছেন। ইঁহারা সকলেই মহারথ **॥ ৩-৬ ॥**

যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন তাঁহাকে মহারথ বলে। ৫ শ্লোকের নরপুংগব শব্দের পুংগব অর্থে বৃষ। পুরাকালে বৃষ অতি সম্মানিত প্রাণী বলিয়া গণ্য হইত। বলবান বৃষে আরোহণ করিয়া অনেকে যুদ্ধ করিতেন। ভরতর্সভ শব্দের ঋষভ অর্থেও বৃষ। পুংগব, ঋষভ, শার্দূল প্রভৃতি শব্দ শ্রেষ্ঠত্ববাচক।

॥ ৭-১১ ॥ দুর্যোধন বলিতে লাগিলেন, দ্বিজোত্তম, আমাদের পক্ষে যে সকল বিশিষ্ট সেনানায়ক আছেন আপনাকে জ্ঞাপনার্থ তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি,

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

আপনি অবধারণ করুন। আপনি এবং ভীষ্ম এবং কর্ণ এবং যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং তদ্রূপ সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা এবং অন্য অনেক বীর আমার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া উপস্থিত আছেন। ইঁহারা সকলেই নানা শস্ত্রপ্রহরণপটু ও যুদ্ধবিশারদ। ভীষ্ম দ্বারা অভিরক্ষিত আমাদের সেনা অপর্যাপ্ত মনে হইতেছে কিন্তু ভীমের দ্বারা অভিরক্ষিত উহাদের বল পর্যাপ্ত। আপনারা ব্যূহের সকল দ্বারে যথানির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ৭-১১ ॥

তিলক ১।১০ শ্লোকের অপর্যাপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা অপরিমিত ও পর্যাপ্ত শব্দের অর্থ পরিমিত করিয়াছেন। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, দুর্যোধন বলিতেছেন, উহাদের সৈন্য বেশী, আমাদের কম। তিলকের ব্যাখ্যা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যথা, উহাদের পর্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত বা কম ও আমাদের অপর্যাপ্ত অর্থাৎ বেশী। আধুনিক বাংলায় পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা, ভোজে পর্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছে, ভোজে অপর্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছে। একই কথা যে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বাংলায় ও সংস্কৃতের পর্যাপ্ত তাহার প্রমাণ। ভাষাবিদ্‌গণ একই শব্দের বিরুদ্ধ অর্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার মতে সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাই ঠিক। ১।৩ শ্লোকে দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্য সমাবেশকে মহতী বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। দুর্যোধন মনে করেন, পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাঁহাদের সৈন্য পর্যাপ্ত অর্থাৎ যথেষ্ট কিন্তু ভীষ্মকে রক্ষা করিবার পক্ষে তাঁহার নিজ সৈন্য অপর্যাপ্ত অর্থাৎ যথেষ্ট নহে। শিখণ্ডীর হস্তে ভীষ্মের মৃত্যু সম্ভাবনার

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈবচ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

কথা যে দুর্যোধনের মনে উঠিয়াছিল তাহার উল্লেখ ভীষ্মপর্বে গীতার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আছে। এই শঙ্কার বশেই দুর্যোধনের চক্ষে কৌরবসৈন্য অপর্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে মনে হইয়াছিল। ১।১১ শ্লোকে আছে, আপনারা সর্বতোভাবে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। দুর্যোধন মহাযোদ্ধা ভীষ্মের রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত কেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। ভীষ্ম সেদিনকার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি, সেজন্য তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। শিখণ্ডীকে দেখিলে ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগের প্রতিজ্ঞা থাকায় তাঁহার অন্যায় যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এজন্য রক্ষার আবশ্যক। যে দুর্যোধন পরে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক।

দুর্যোধন যখন আচার্যকে ভীষ্ম সম্বন্ধে নিজ শঙ্কার কথা বলিতেছিলেন তখন

॥ ১২ – ১৯ ॥ তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিয়া শক্তিমান কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ করিয়া উচ্চরবে শঙ্খ পরিপূরিত করিলেন। তখন বহু শঙ্খ, ভেরী ও পণব, আনক, গোমুখ বাদ্য সকল সহসা বাদিত হওয়ায় তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। অনন্তর শ্বেতঅশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে অবস্থিত মাধব এবং পাণ্ডব অর্জুন দিব্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন। হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ভীমকর্মা বৃকোদর মহাশঙ্খ পৌণ্ড্র বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক এবং মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, এবং পৃথিবীপতে, দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীপুত্রেরা এবং মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু সকলেই সর্বদিকে পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন। সেই তুমুল শব্দ আকাশ এবং পৃথিবীতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া ধার্তরাষ্ট্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল **॥ ১২ - ১৯ ॥**

তস্য সংজনয়ন হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

পণব অর্থে ছোট ঢাক বা খন্তাল। আনক অর্থে ঢাক। গোমুখ এক প্রকার ভেরী। ১।২ হইতে ১।২০ শ্লোকে মহাভারতীয় যুদ্ধ ব্যাপারের কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আমরা পাই। তখন যুদ্ধের পূর্বে উভয় পক্ষ সজ্জিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইত ও নির্ধারিত সময় ব্যতীত যুদ্ধ হইত না। এই কারণেই অর্জুনের পক্ষে উভয় সৈন্যের মধ্যগত হইয়া কুরুসৈন্য পরিদর্শন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় বড় যোদ্ধাই যুদ্ধের পূর্বে শঙ্খ বাজাইতেন ও প্রত্যেকেরই শঙ্খনাদে বৈশিষ্ট্য থাকিত। শঙ্খের নামকরণ হইত। পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থি হইতে কৃষ্ণের শঙ্খ প্রস্তুত হইয়াছিল, এজন্য ইহাকে পাঞ্চজন্য বলা হইত। কৃষ্ণ এই অসুরকে বধ করেন। যুদ্ধকালে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নানাপ্রকার তূরী, ভেরী, ঢক্কা ইত্যাদি নিনাদিত হইত। শঙ্খের নাদে শত্রুপক্ষের ভীতি উৎপাদিত হইত। এই শঙ্খনাদ আধুনিক শঙ্খনাদের মত বলিয়া মনে হয় না। বাজাইবার কৌশলে যে সাধারণ শঙ্খ হইতেও ভীতি উৎপাদক ধ্বনি নির্গত হইতে পারে, তাহা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ১।১২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ শঙ্খনাদের সহিত উচ্চ সিংহনাদ করিলেন। মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত এই সিংহনাদ যে কত ভীষণ হইতে পারে, তাহা না শুনিলে অনুমান করা যায় না। এখনও ডাকাতেরা আক্রমণের পূর্বে হুঙ্কার করিয়া লোককে ভয়াভিভূত করে।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

॥ ২০-২৫ ॥ অনন্তর ধার্তরাষ্ট্রদিগকে প্রস্তুত দেখিয়া এবং শস্ত্রসম্পাত আসন্ন বুঝিয়া কপিধ্বজ পাণ্ডব অর্জুন ধনু উত্তোলিত করিয়া, মহীপতে, তখন হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, অচ্যুত, যতক্ষণ আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত ইঁহাদের দেখি তুমি ততক্ষণ উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর। এই আসন্ন রণে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে আমি দেখিতে চাই, দুর্বুদ্ধি ধার্তরাষ্ট্র-গণের প্রিয়কর্মসাধনকামী হইয়া এই যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন সেই যুদ্ধার্থি-গণকে, আমি দেখিব। সঞ্জয় বলিলেন, ভারত, গুড়াকেশ অর্জুন কর্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া হৃষীকেশ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সকল রাজাদের সম্মুখীন হইয়া উভয় সেনার মধ্যে রথশ্রেষ্ঠ স্থাপনা করিয়া এইরূপ বলিলেন, পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর **॥ ২০-২৫ ॥**

প্রসিদ্ধি আছে যে অর্জুনের রথের ধ্বজের উপর হনুমান বসিতেন। এজন্য অর্জুনকে ২০ শ্লোকে কপিধ্বজ বলা হইয়াছে। যুদ্ধে কোন জন্তুকে 'ম্যাসকট' রূপে রেজিমেন্টের সহিত লইয়া যাওয়ার প্রথা এখনও আছে। মোটরকারেও 'ম্যাসকট'

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

বসান হয়। ২৪শ শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলা হইয়াছে। 'গুড়াকেশ' শব্দের অর্থ টীকাকারেরা নানাভাবে করিয়াছেন। তিলক বলেন, 'গুড়াকেশ' শব্দের অর্থ যাহার ঘন কেশ এইরূপ হইতে পারে কিন্তু অর্জুনের এই নাম এখানে কেন ব্যবহৃত হইল তাহা বিবেচ্য। 'গুড়াকেশে'র অপর অর্থ নিদ্রা বা আলস্যবিজয়ী। তিলক বলেন, এমন ভাবিবার কোনই কারণ নাই যে, গীতাকার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার যখন যে নাম ইচ্ছা হইয়াছে তখন তাহাই দিয়াছেন। এই যুক্তি আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আমার মতে গীতাকারের মত শক্তিশালী লেখকের পক্ষে বিনা প্রয়োজনে কোনও শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আমি মনে করি 'আলস্য বা নিদ্রাবিজয়ী' অর্থই গুড়াকেশের ঠিক অর্থ। যে অর্জুন যুদ্ধের আয়োজনে নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে নিদ্রাবিজয়ী বিশেষণ উপযুক্ত। এত পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করার পর কে কে লড়িতে আসিয়াছে দেখিতে যাওয়া অর্জুনের পক্ষে স্বাভাবিক এবং এই জন্যই এই স্থলে তাঁহাকে 'গুড়াকেশ' বলা হইয়াছে। 'হৃষীকেশ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বিজয়ী। তিলক হৃষীকেশ শব্দের অর্থ করেন, যাঁহার প্রশস্ত কেশ। এ অর্থ সন্তোষজনক নহে। অর্জুন রথচালনার আদেশ দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অচ্যুত ও ইন্দ্রিয়বিজয়ী এই দুই নামই শ্রীকৃষ্ণের অবিচলিত মানসিক অবস্থা নির্দেশ করিতেছে। ২।৯ শ্লোকেও হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা, পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকার বলিবার পর যুদ্ধ করিব না এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

এখানে অর্জুনকে পরন্তপ ও গুড়াকেশ বলা হইয়াছে, কারণ যে অর্জুন শত্রুকে তাপ দেন ও যিনি নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন, তিনি বলিলেন কি না যুদ্ধ করিব না। এ অর্থ মানিলে 'গুড়াকেশ' শব্দের সার্থকতা বুঝা যাইবে।

॥ ২৬-৩৬ ॥ অনন্তর পার্থ দেখিলেন, তথায় পিতৃস্থানীয়গণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রস্থানীয়গণ, সখাগণ, শ্বশুরগণ এবং সুহৃদ্‌গণ

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬

রহিয়াছেন। সেই কুন্তীপুত্র উভয় সেনাতেই সেই সকল প্রিয়জনকে অবস্থিত দেখিয়া পরম কৃপাবিষ্ট এবং বিষণ্ণ হইয়া এইরূপ বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ, এই সকল যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণকে সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, শরীর কাঁপিতেছে ও রোমহর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, গাত্রদাহ হইতেছে, এক স্থানে স্থির হইতে পারিতেছি না এবং মন চঞ্চল হইয়াছে, কেশব, অমঙ্গল লক্ষণসমূহ দেখিতেছি, যুদ্ধে স্বজন বধে কোন শ্রেয় দেখিতেছি না। কৃষ্ণ, আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, রাজ্য ও সুখভোগও চাহি না। গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি হইবে, ভোগ বা জীবনেই বা কি প্রয়োজন। লোকে যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখ চায় সেই তাহারাই ধন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে, যথা, আচার্যগণ, পিতৃস্থানীয়গণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং সম্বন্ধিগণ। মধুসূদন, পৃথিবীর কথা দূরে থাক, তিন লোকের রাজত্বের জন্য নিজে হত হইলেও ইঁহাদের

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥ ২৭
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্॥ ২৮
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥ ২৯
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩

মারিতে ইচ্ছা করি না। জনার্দন, ধার্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে, এই সকল আততায়িগণকে বধ করিলে আমাদের পাপই আশ্রয় করিবে ॥ ২৬ – ৩৬ ॥

অর্জুন তাঁহার বিপক্ষে সমবেত আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতিকে দেখিলেন। দেখিয়া পরম করুণাগ্রস্ত হইলেন। যুদ্ধ করিতে গিয়া অর্জুনের দুঃখ স্বাভাবিক কিন্তু তাঁহার কৃপা হইল কাহার উপর, এবং কেনই বা হইল? অর্জুন নিজ শক্তিতে এতই আস্থাবান যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট সম্ভাবনা না মনে আসিয়া তাঁহার হস্তে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুশঙ্কা প্রথমেই মনে উঠিল। এই জন্যই তাঁহার মনে দয়া আসিল। ১।৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭ শ্লোকে স্বজনদিগের মৃত্যু ও তাঁহার বিজয়লাভের কথাই মনে আসিতেছে। ইহার পর নানারূপ পাপের সম্ভাবনা মনে আসিল। শেষে ১।৪৫ শ্লোকে অর্জুন বলিলেন, আমি লড়াই না করিলে উহারা যদি আমাকে মারিয়াও ফেলে তবে তাহাও ভাল। নিজের মৃত্যুর কথা অনেক পরে অর্জুনের মনে পড়িল।

যুদ্ধে নামিবার পূর্বে যে তাঁহাকে আত্মীয় কুটুম্বের সহিত মারামারি, কাটা-কাটি করিতে হইবে অর্জুন তাহা জানিতেন না এমন নহে; কাজেই পরবর্তী শ্লোকে যুদ্ধ না করিবার যে সব কারণ দেখাইয়াছেন সেগুলি তাঁহার পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল। যুদ্ধে স্বজন বধ হইবে, কুলধর্ম নষ্ট হইবে, তজ্জন্য পাপ স্পর্শ করিবে, নরকে বাস করিতে হইবে, ইত্যাদি আপত্তির কথা তাঁহার বহু পূর্বেই বিচার করা উচিত ছিল। হয় অর্জুন লোভপরবশ হইয়া সমস্ত ফলাফল না ভাবিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিংবা আত্মীয় স্বজনের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁহাদের বধাশঙ্কাজনিত দুঃখে বিচলিত হইয়া এই সকল আপত্তি তুলিয়াছিলেন।

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬

প্রকৃতপক্ষে আপত্তিগুলি অর্জুনের অন্তরের কথা নহে। দুঃখের বশে যুদ্ধ করিতে বীতরাগ হওয়ায় নিজ কার্য সমর্থনের জন্য এইগুলি ছুতামাত্র। অর্জুন ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের সমস্ত কার্য তিনি পূর্ব হইতেই মানিয়া লইয়াছিলেন। অতএব এখনকার অনিচ্ছা দুঃখপ্রসূত মাত্র, সমাজধ্বংসভয় বা পাপভয় হইতে উৎপন্ন নহে। অবশ্য ইহাও সম্ভবপর যে নিজের কুলাচারের দোষ ও কুলাচার পালনে পাপের সম্ভাবনা চিরকালই অর্জুনের ভিতরের মনে লুক্কায়িত ছিল। কালকালে তাহা পরিস্ফুট হইল।

যুদ্ধ না করার কারণ দেখাইয়া পরবর্তী শ্লোকগুলিতে অর্জুন যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আপত্তি আত্মীয়স্বজন বধে দুঃখবোধ। ইহা অর্জুনের ব্যক্তিগত আপত্তি। দ্বিতীয় বাধা সামাজিক। যুদ্ধে সমাজবন্ধন শিথিল হয়, এই জন্য যুদ্ধ করিব না। তৃতীয় আপত্তি অলৌকিক। মনুষ্যবধ করিলে নরকগামী হইতে হয়। নরক যে আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং কেহ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এমন কথাও জানা নাই। অতএব নরকের ভয় যুক্তির অতীত, বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত মাত্র।

যে জিনিস বুদ্ধিবিচারের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না অথচ আমরা অনেকেই যাহা বিশ্বাস করি ও যাহা দ্বারা জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করি, সেই অলৌকিক পদার্থই বহু ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের মূল। পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তিও অলৌকিক। একাদশীর দিন বিধবা অন্নগ্রহণ করিলে তাহার পাপ হইবে, এবং ইহকালে বা পরকালে সেই পাপের ফলভোগ করিবে, এই যে বিশ্বাস ইহাও অলৌকিক। খুন করিলে ধরা পড়িয়া ফাঁসি যাইব, এই সামাজিক শাস্তির ভয় অলৌকিক নয়, লৌকিক, কিন্তু খুন করিলে নরকে পচিব ইহা অলৌকিক বিশ্বাস। সমস্ত পাপের কল্পনার ভিত্তিই অলৌকিক। সামাজিক ব্যভিচারকেও পাপ বলা হয়, কারণ সেইরূপ ব্যভিচারের বুদ্ধিগম্য ফলাফল ব্যতীত যে একটা অলৌকিক ফলাফলও আছে তাহা অনেকে মানেন। অর্জুন যখন বলিতেছেন যে, কুলধর্ম নষ্ট করিলে নরকবাস হয়, তখন সেই সঙ্গেই এই কথাও বলিতেছেন যে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

অর্জুন প্রথমেই নিজের দুঃখজনিত ব্যক্তিগত আপত্তির কথাই বলিয়াছেন। ১।৩৬ শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকের আপত্তিগুলি এক হিসাবে অর্জুনের নিজেকে ঠকাইবার ছুতা মাত্র। দুঃখের আপত্তিই মূল আপত্তি। অর্জুন বলিলেন, ধার্তরাষ্ট্রদের বধ

করিলে পাপভাগী হইব, 'জনার্দন, কুলধর্ম হইতে উচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগের নরকে নিয়ত বাস হয় এইরূপ শুনিয়াছি' ॥ ১।৪৪ ॥

॥ ৩৭ - ৪৬ ॥ সে জন্য সবান্ধব ধার্তরাষ্ট্রগণকে হনন করা আমাদের উচিত নহে, মাধব, স্বজনবধ করিয়া সুখীই বা কি প্রকারে হইতে পারি। যদিও ইহারা লোভের বশে হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রহত্যার পাপ দেখিতেছে না, কিন্তু জনার্দন, আমরা ত কুলক্ষয়ের দোষ দেখিতেছি, আমরা কেন না এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব। কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম সকল নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে। কৃষ্ণ, অধর্মের প্রভাবে কুলস্ত্রীরা দোষযুক্তা হয়। বার্ষ্ণেয়, স্ত্রী দুষ্টা হইলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। সংকর সন্তান কুলনাশক ব্যক্তির এবং কুলের নরক প্রাপ্তির কারণ হয়, ইহাদের পিণ্ডোদকক্রিয়া লুপ্ত পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয়, ফলে কুলহন্তাদের এই সকল বর্ণসংকরকারক দোষের দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্মসমূহ উচ্ছিন্ন হয়। জনার্দন, কুলধর্ম্মভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের নরকে নিয়ত বাস হয় এইরূপ শুনিয়াছি। হায়, আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কারণ রাজ্যসুখ লোভের বশে স্বজনবধ

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩

করিতে উদ্যত হইয়াছি। নিজপ্রতি শস্ত্রাঘাতে প্রতিকারবিমুখ এবং অশস্ত্র হইলে যদি শস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে রণে বিনাশও করে তবে তাহা আমার অধিকতর মঙ্গলকর ॥ ৩৭-৪৬ ॥

এই সকল শ্লোকে যুদ্ধের সামাজিক বিষময় ফল দেখান হইয়াছে। ব্যক্তিগত আপত্তির পরেই ১।৩৬ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ হইতে এই সামাজিক পাপের আভাস দেখা যাইতেছে। আততায়ী ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করিলে পাপ হইবে। পরে বলিতেছেন স্বজনবধ করিয়া কি সুখ হইবে। তৎপরে কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহের কথা উঠিতেছে। তৎপরে কুলধর্ম নষ্টের কথা ও কুলধর্ম নষ্ট হইলে অধর্মের প্রভাব ও তৎফলে বর্ণসংকরের উৎপত্তির কথা বলা হইল। ১।৪০-৪১ শ্লোকে ধর্ম ও অধর্ম কথা আছে। এই দুইটি শ্লোকে যদিও মুখ্যত কুলধর্মের কথাই বলা হইল তথাপি ধর্ম ও অধর্ম কথাটা যে সামাজিক হিসাবে ন্যায় ও অন্যায় আচার (socially right ও socially wrong convention or code) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। ধর্ম কথাটার মধ্যে এই সামাজিকতার আদর্শ পরেও অন্যান্য শ্লোকে দেখাইবার চেষ্টা করিব। ১।৪২-৪৩ শ্লোকে অলৌকিক পাপফলের কথাই প্রধানত বলা হইল। ১।৪৩ শ্লোকে জাতিধর্ম ও কুলধর্ম দুইটা কথাও আছে। এখানেও ধর্মের অর্থ সামাজিক আচার বা convention করা যাইতে পারে। সামাজিক আচার নষ্ট হইলে পাপের উৎপত্তি হয়।

ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ভিতর সতীত্বের আদর্শ যে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। 'ওআর বেবী'দের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অর্জুনের কথাতেই বোঝা যায় যে, পুরাকালে যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশেও এইরূপ অবস্থা ঘটিত। যুদ্ধ সর্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, এ কথা মুখবন্ধে বলিয়াছি।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

॥ ৪৭ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, যুদ্ধকালে এই বলিয়া শোকাকুলহৃদয় অর্জুন ধনুঃ শর পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

এই শ্লোকে অর্জুনকে শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্থাৎ যাঁহার মন শোকে উদ্বিগ্ন হইয়াছে, বলা হইয়াছে। শোকই যে অর্জুনের যুদ্ধত্যাগের প্রধান কারণ এখানে তাহাই সূচিত হইল।

রথোপস্থ অর্থে রথের অভ্যন্তর বা পরিরক্ষিত আসন। তখনকার দিনে রথের উপর দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে হইত, এই জন্যই রথাসনে বসিয়া পড়িলেন বলা হইল। তিলক বলেন, 'মহাভারতের কোন কোন স্থলে রথের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ প্রায় দুই চাকার হইত। বড় বড় রথে চার চার ঘোড়া জোতা হইত এবং রথী ও সারথি উভয়ে সম্মুখভাগে পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর একপ্রকার বিশেষ ধ্বজা লাগান হইত। ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, অর্জুনের ধ্বজার উপর স্বয়ং হনুমানই বসিয়া থাকিতেন।'

সঞ্জয় উবাচ

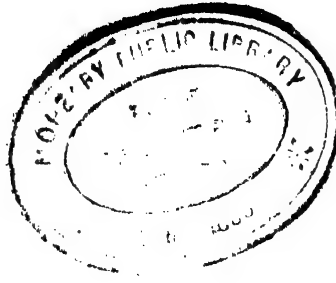
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

অর্জুনবিষাদযোগ নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।



গীতাব্যাখ্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

॥ ১ - ১০ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, অর্জুনকে সেই প্রকার কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ আকুলনেত্র ও বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন, অর্জুন, এই বিষম সংকটকালে তোমার অনার্যজনোচিত, স্বর্গহানিকর, অকীর্তিকর চিত্তমলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত হইল, পার্থ, দুর্বলতা পরিহার কর, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে, পরন্তপ, ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপযুক্ত এই হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও। অর্জুন বলিলেন, অরিসূদন মধুসূদন, ভীষ্ম এবং দ্রোণের মত পূজার পাত্রের প্রতি শরনিক্ষেপ করিয়া আমি কি করিয়া যুদ্ধ করি, মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোগ করা ভাল, গুরুজনদিগকে বিনাশ করিলে সংসারে রুধিরলিপ্ত অর্থকামসমূহ ভোগ করিতে হইবে। আমাদের জয় লাভ বা পরাজয় কোনটি আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, যাহাদের হত্যা করিলে আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না সেই ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে উপস্থিত, আমার স্বভাব দৈন্যদোষে অভিভূত হইয়াছে, আমি কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মোহগ্রস্ত হইয়াছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহা আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও। যদি পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্ব সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ হয়, এমন কি যদি দেবতাগণের আধিপত্যও পাই তথাপি এমন কিছুই দেখিতেছি না যাহাতে ইন্দ্রিয়গণের পীড়াদায়ক আমার এই শোক দূর হইতে পারে। সঞ্জয় বলিলেন, পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া আমি যুদ্ধ করিব না বলিলেন এবং মৌনাবলম্বন করিলেন। ভারত, উভয় সেনার মধ্যে

অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে তখন হৃষীকেশ যেন ঈষৎ হাস্য সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ১ - ১০ ॥

এখানে ২ শ্লোকে অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যম্ কথা আছে। নৈতিক বা সামাজিক অন্যায় কার্যকে অনার্যসেবিত ও স্বর্গহানিকর বিশেষণে অভিহিত করার ধারা বহুকাল হইতে প্রচলিত। রামায়ণ ৮২।১২-১৪ শ্লোকে ভরত বলিতেছেন, আমি যদি রামের রাজ্য গ্রহণ করি তবে অনার্যজুষ্ট, অস্বর্গ্য পাপকার্য করিব এবং ইক্ষ্বাকুকুলপাংসন হইব। ৮ শ্লোকে দেবতাগণের আধিপত্য শব্দে ইন্দ্রত্ব বুঝাইতেছে।

অর্জুন যখন ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, তোমাতে এইরূপ তোমার অনুপযুক্ত মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল, দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ, যুদ্ধ কর। কোথা হইতে অর্জুনের এই দৌর্বল্য আসিল বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ যে তাহা বুঝেন নাই এমন নহে। তিনি অর্জুনের দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। সখা সখাকে যে ভাবে উৎসাহিত করে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাহাই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার মোটেই অতিমানবের মত নহে। তিনি সাধারণভাবেই অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছেন। এইরূপ পিঠ চাপড়াইবার ফলে কিছু উপকার হইল। অর্জুন বলিলেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমেসমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

কি করা উচিত হইবে, কৃষ্ণ, তুমিই আমাকে উপদেশ দাও। অর্জুনের মন যুদ্ধে এখন আর তত অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হইতেছে না। পরক্ষণেই অর্জুনের আবার মনে আসিল যে শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধ করিতে বলেন তবে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আমার এই ভয়ানক শোক কিসে যাইবে, আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিব না, যুদ্ধ করিব না; এই বলিয়া পুনরায় তিনি যুদ্ধ করিব না বলিয়া চুপ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে শুধু উৎসাহ দিয়া ফল হইল না। উৎসাহে কার্যসিদ্ধি না হইলে অনেক সময় শ্লেষে কার্যোদ্ধার হয়। সাধারণ লোকের মতই শ্রীকৃষ্ণ এইবার শ্লেষের আশ্রয় লইলেন। আমার মতে এই শ্লেষোক্তি ২।১১ হইতে ২।৩৮ শ্লোক পর্যন্ত চলিয়াছে। শংকরাচার্য প্রভৃতি অন্যান্য সকল ব্যাখ্যাকারই মনে করেন যে ২।১১ শ্লোকেই এই শ্লেষ শেষ হইয়াছে ও পরের শ্লোকগুলি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক উক্তি। আন্তরিক উক্তি হিসাবেই তাঁহারা এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্লেষোক্তির উদ্দেশ্য অপরকে নিজমতে আনয়ন করা, এজন্য সব সময়ে তাহা সত্য না হইতেও পারে। পরস্পর-বিরোধী কথা বলিয়াও যদি কাহাকেও নিজমতে আনা যায় তবে শ্লেষপ্রয়োগকারী তাহা বলিতে দ্বিধা করেন না কিন্তু যিনি কোন বিষয়ের

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

সঠিক মর্ম বিচারের দ্বারা বুঝাইতে চাহেন তিনি কখনই পরস্পর-বিরোধী বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। শ্লেষ হিসাবেও সত্য কথা যে বলা হয় না তাহা নহে, তবে তাহার উদেশ্য কার্যসিদ্ধি, সত্যপ্রচার নহে। কেন আমি ২।১১ হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিকে শ্লেষ বলিয়া ধরিতেছি শ্লোকগুলির অর্থ বিচারের পর তাহার আলোচনা করিব। অর্জুনের যুদ্ধ না করিবার শোক ভিন্ন অন্যান্য কারণগুলি যেমন নিজের মনকে ঠকাইবার উপায় মাত্র, এই সব আপত্তির উত্তরও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক উক্তি না হইয়া শ্লেষোক্তি মাত্র। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে অর্জুনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অলৌকিক আপত্তিগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শংকরভাষ্যে গীতার প্রথম হইতে ২।১০ পর্যন্ত শ্লোকের কোনও ব্যাখ্যা নাই। শংকর ২।১১ শ্লোক হইতে ধারাবাহিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির সংক্ষেপ তাৎপর্য মাত্র শংকর কতৃক তল্লিখিত ভাষ্যের অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে। শংকর যে উদ্দেশ্যে গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে হিসাবে ১।১ হইতে ২।১০ পর্যন্ত শ্লোকগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। শংকরবাদ প্রমাণের পক্ষে এই সকল শ্লোক নিরর্থক।

॥ ১১ – ২৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, যাহাদের জন্য শোক করা উচিৎ নয় তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ আবার জ্ঞানের কথা বলিতেছ, মৃতই হউক বা জীবিতই হউক কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। জন্মের পূর্বে তোমার আমার বা এই সকল রাজাদের অস্তিত্ব ছিল না এ প্রকার মনে করিও না, আবার মরিবার পর আমাদের কাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না তাহাও নহে, মনুষ্যের যেমন জন্ম হইতে পর পর কৌমার, যৌবন ও জরা দেখা দেয় সেইরূপ মৃত্যুর পর অপর দেহ লাভ ঘটে, সে জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাহারও মৃত্যুতে মোহগ্রস্ত হন না। কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২

সহিত বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে শীতলতা, উষ্ণতা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির বোধ জন্মে, এ সকলের আরম্ভ ও শেষ আছে, সে জন্য এ সকল অনুভূতি অনিত্য। ভারত, তোমার শোক, গাত্রদাহ প্রভৃতি যাহা কষ্ট হইতেছে সে সকল সহ্য কর। পুরুষর্ষভ, যে বুদ্ধিমান পুরুষ এই সকলে কষ্ট পান না এবং যিনি সুখ দুঃখে সমভাব তিনি অমৃতত্ব লাভের যোগ্য। যাহা অনিত্য তাহা অসৎ, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই, সৎ বস্তুর কোনও কালে অবিদ্যমানতা বা অভাব নাই। জ্ঞানীরা সৎ ও অসৎ উভয়েরই অন্ত অর্থাৎ চরম তথ্য অবগত আছেন। এই সমস্ত বিনাশশীল পদার্থ এক সৎ বস্তুর দ্বারা ব্যাপ্ত, ইহাকে অবিনাশী সত্তারূপেই জানিও, কেহই এই অব্যয় সত্তাকে বিনাশ করিতে পারে না। আমাদের এই দেহসমূহ বিনাশশীল কিন্তু দেহবাসী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাহার ইয়ত্তা পায় না। জ্ঞানিগণ কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়াছে। অতএব, ভারত, যুদ্ধ কর। যে মনে করে আত্মা অপরকে হত্যা করিতে পারে এবং যে মনে করে আত্মা হত হইতে পারে ইহাদের উভয়ের কেহই যথার্থ তত্ত্ব

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

জানে না, আত্মা হনন করে না হতও হয় না। ইহা কদাচ জন্মে না, কদাচ মরে না, পূর্বে জন্মিয়াছিল এবং পরে জন্মিবে তাহাও নহে। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর বিনস্ট হইলেও আত্মা নষ্ট হয় না। পার্থ, যে আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় বলিয়া জানে সে কি করিয়া বলিতে পারে যে, সে কাহাকেও হত্যা করাইয়াছে বা হত্যা করিয়াছে। মনুষ্য যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে তাহা ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। শস্ত্র আত্মাকে কাটিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে পচাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, ইহা নিত্য, সর্বব্যাপী, শাখাহীন বৃক্ষকাণ্ডের মত স্থির, অচল এবং সনাতন। ইহা চক্ষু প্রভৃতির গ্রাহ্য নহে, ইহা চিন্তার অগম্য ও ইহার কোন বিকার বা পরিবর্তন নাই। আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া শোক করা কর্তব্য নহে ॥ ১১ - ২৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের অন্বয় এই প্রকার করিয়াছি, অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে ন বা ম্রিয়তে, ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা বা ন, অয়ং অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। অজ অর্থে যাহার কোন কালে জন্ম নাই, নিত্য যাহা চিরকাল আছে, শাশ্বত যাহা পরবর্তী কালেও অপরিবর্তিত থাকিবে, পুরাণ যাহা পুরাকালেও বর্তমানের মতই ছিল। ২১ শ্লোকে অব্যয় শব্দের অর্থ যাহার অপচয় নাই, অবিনাশী অর্থে যাহার বিনাশ নাই। অজ প্রভৃতি এই সমস্ত শব্দই আত্মার বিশেষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি অবিজ্ঞোচিত কার্য্য করিতেছ অথচ বিজ্ঞের মত বড় বড় কথা বলিতেছ, বিজ্ঞেরা কাহারও মরা বাঁচার

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

জন্য কখনও কি শোক করেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণ যে সব কথা বলিলেন তাহা বিজ্ঞ জনেরা কি বলেন সেই হিসাবেই। অর্জুনের কথা ও কার্যের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। এ জন্য শ্লেষ হিসাবেই এই সকল কথা বলা হইয়াছে। ২।১৬ শ্লোকে তত্ত্বদর্শীরা এই সবের মর্ম অবগত আছেন বলা হইয়াছে, ইহা হইতেও বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তই বলিতেছেন। ১৯-২০ শ্লোকও এইরূপ উদ্ধৃত মত। তর্কে কোন ব্যক্তিকে পরাস্ত করিয়া নিজের মতে আনিতে হইলে নিজে মানি বা না মানি আমরা সুবিধামত অপরের মত উদ্ধার করিয়া থাকি। ২।১৯-২০ শ্লোক কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীর ১৮ ও ১৯ শ্লোকের অনুরূপ। কঠোপনিষদে আছে,

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

গীতায় এই দুই শ্লোকে যে পারম্পর্য আছে, কঠোপনিষদে তাহার বিপরীত। ন জায়তে শ্লোক কঠোপনিষদে প্রথম, গীতায় দ্বিতীয়। গীতা ও কঠোপনিষদের শ্লোকগুলি ঠিক একরূপ নহে কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে কঠোপনিষদ হইতেই এই দুই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কঠোপনিষদের কোন সংস্করণেই

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫

এই শ্লোক দুইটি ঠিক গীতার ভাষায় নাই। শ্লোকের গীতানুযায়ী পাঠ কঠোপনিষদের সময় প্রচলিত থাকিলে কোন না কোন সংস্করণে তাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কার্যসিদ্ধির জন্য যে পরের মত উদ্ধৃত করে, সে অপরের ভাষা ও ভাব বিশুদ্ধভাবে বলিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হয় না। কঠের শ্লোকে বিপশ্চিৎ কথা আছে ও সেই স্থানে গীতায় কদাচিৎ আছে। বিপশ্চিৎ অর্থে মেধাবী, জ্ঞানবান, অর্থাৎ জ্ঞানবান আত্মার জন্মমৃত্যু নাই। কঠে আছে যে এইরূপ আত্মা কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহা হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। জ্ঞানবান আত্মা মায়া দ্বারা অভিভূত নহে। কাজেই তাহা পুনঃ পুনঃ শরীরে জন্মগ্রহণও করে না, মরেও না ও তাহা হইতে বহির্বস্তুরূপ কিছু উৎপন্নও হয় না। শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকটি বদলাইয়া বলিলেন, কোন আত্মাই কখনও জন্মায় না, আর মরেও না। ইহাও নহে যে ইহা একবার হইয়া আবার জন্মিবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই শ্লোকটি বদলাইয়াছিলেন মনে হয়। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে মিথ্যাকথা বলিয়াছেন।

॥ ২৬ - ৩০ ॥ আর যদি তুমি আত্মাকে জন্মরহিত ও অবিনাশী না মানিয়া তাহা নিত্য জন্মিতেছে ও তাহার নিত্য মৃত্যু হইতেছে মনে কর তাহা হইলেও, মহাবাহো, ইহার জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে, কারণ যে জন্মায় তাহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলে পর তাহার আবার জন্মও ধ্রুব অতএব এরূপ অপরিহার্য অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে তোমার শোক করা উচিত নহে। ভারত, প্রাণিসমূহ জন্মিবার পূর্বে ও মরিবার পরে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তাহারা কি ভাবে থাকে তাহা প্রকাশ পায় না এবং কেহ তাহা জানে না, কেবল তাহাদের মধ্যাবস্থাই ব্যক্ত অর্থাৎ যত দিন তাহারা জীবিত থাকে তত দিনের ব্যাপারই আমরা জানিতে পারি, এক্ষেত্রে

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

মৃত্যুর পরবর্তী অজ্ঞাত অবস্থার জন্য কিসের শোক। লোকে আত্মাকে অদ্ভুত ভাবে দেখে, অদ্ভুত বস্তুর ন্যায় ইহার কথা বর্ণনা করে এবং আশ্চর্য হইয়া ইহার কথা শোনে কিন্তু আত্মার বর্ণনা শুনিয়াও কেহই তাহাকে জানিতে পারে না। ভারত, এই আত্মা যে কোন দেহেতেই থাকুক না কেন তাহা সর্বকালেই অবধ্য বা অবিনাশী অতএব তুমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে কাহারও জন্য শোক করিতে পার না ॥ ২৬-৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমে বলিলেন আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই, পরে ২।২৬ শ্লোকে বলিলেন যদি বা জন্ম মৃত্যু আছে মনে কর তত্রাপি শোক উচিত নহে। এই প্রকার তর্ক কেবল কাহাকেও নিজ মতে আনিবার জন্যই আমরা করিয়া থাকি। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই ও আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে, এ দুই-ই সত্য হইতে পারে না। যিনি সত্যকথা বুঝাইতে চাহেন তিনি একই কথা বলিবেন। যে দিক দিয়াই যাও আমি ঠিক বলিতেছি এ কথা কার্যোদ্ধারের কথা। দুই পরস্পর-বিরোধী প্রতিজ্ঞা (proposition) মানিয়া লইয়া তর্ক করিতে যাওয়া সত্যনির্ধারণের অনুকূল নহে।

ক্ষণবিধ্বংসী বস্তুরও বিনাশে শোক স্বাভাবিক। এরূপ শোক উচিত নহে বলিলেই সে শোক কাহারও যায় না। শরীর স্বভাবতই নষ্ট হয় জানিয়াও শরীরের ধ্বংসে শোক যাইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণ এখন পর্যন্ত এমন কোন উপায়ই দেখাইতে পারেন নাই যাহাতে এই শোক দূর হয়। তিনি যেন-তেন-প্রকারে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতক্ষণ অর্জুনের বড় বড় কথার বড় বড় জবাব দিলেন মাত্র। চিরকাল হাত দিয়া খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত থাকিয়া কেহ যদি হঠাৎ বলে, আমি আর হাতে করিয়া ভাত খাইব না কারণ হাতে বেরিবেরির বীজাণু আছে, এবং তখন যদি তাহাকে বোঝান যায় যে হাতে কখনও বেরিবেরির বীজাণু থাকে না, আর যদিই বা থাকে মনে কর, পাকস্থলীর অম্লরসে তাহা যে নষ্ট হয় তাহা কি তুমি জান না, তবে এই জবাব শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের অনুরূপ হইবে।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

॥ ৩১ - ৩৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, আর স্বধর্মের দিকে দেখিলেও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে, কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে যুদ্ধে ধর্মলাভ হয় তাহার তুলনায় অন্য কিছুই মঙ্গলকর নাই এবং সেইরূপ যুদ্ধই আজ স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে। পার্থ, যে সকল ক্ষত্রিয় সৌভাগ্যশালী তাঁহারাই এ প্রকার যুদ্ধে যোগদান করিবার সুযোগ পান। আর তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্মচ্যুত হইবে, কীর্তি হারাইবে এবং পাপভাগী হইবে এবং লোকেরাও তোমার চিরস্থায়ী অযশ ঘোষণা করিবে। তোমার মত সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মরণেরও অধিক। মহারথগণ ভাবিবেন তুমি ভয়ে যুদ্ধত্যাগ করিয়াছ, তাঁহারা তোমাকে বহুগুণবান্ মনে করেন কিন্তু যুদ্ধত্যাগে তুমি তাঁহাদের নিকট মান হারাইবে। তোমার শত্রুরা এই সুযোগে তোমার বীরত্বের নিন্দা করিয়া বহু অকথ্য কথা বলিবে, তাহার অপেক্ষা আর কি অধিকতর দুঃখকর হইতে পারে। যুদ্ধে নিহত হইলে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিবে আর জিতিলে তুমি পৃথিবী ভোগ করিবে, অতএব কৌন্তেয়, যুদ্ধের জন্য মনস্থির করিয়া উঠ, সুখদুঃখ লাভালাভ, জয়পরাজয় সমান বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে যোগ দাও ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না **॥ ৩১ - ৩৮ ॥**

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে অর্জুনের ব্যক্তিগত শোকের আপত্তির জবাব দিয়া এইবার শ্রীকৃষ্ণ সামাজিক ও অলৌকিক বিষয়ভূত আপত্তির উত্তর দিলেন। তুমি যুদ্ধ করিলে কুলধর্ম লোপ হইবে বলিয়া ভয় করিতেছ কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই স্বধর্ম এবং তাহা না করিলেই তোমার পাপ হইবে, লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলিবে, তোমার

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪

সামাজিক মানহানি হইবে; যুদ্ধে মরিলে তোমার স্বর্গলাভ ও জিতিলে রাজ্যলাভ, অতএব কোন দিকেই তোমার ক্ষতি নাই, তুমি সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধ কর।

গীতার ২।৩১ শ্লোকে স্বধর্ম কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩।৩৫ শ্লোকে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ বাক্যের মানে লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। ১৮।৪৭ শ্লোকেও স্বধর্ম কথা আছে। শেষোক্ত দুইটি শ্লোকে স্বধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলেও ২।৩১ শ্লোকের স্বধর্মের সামাজিক কর্তব্য (social duty) অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ সমীচীন হয় না। অতএব আমি সর্বস্থলেই স্বধর্মের এই অর্থই করিব।

স্বজনবধে পাপ হয়, এ কথার উত্তর না দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাই ধর্ম বলিলেন, কারণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি তর্কে সুবিধামত নিজের দিকটাই দেখাইলেন। ২।৩৭ শ্লোকে বলিলেন, মরিলে স্বর্গলাভ, জিতিলে রাজ্যলাভ, অতএব যুদ্ধ কর। অর্জুন ইহার উত্তর দিতে পারিতেন, জিতিলে আত্মীয়বধের পাপে নরকবাস ও মরিলে রাজ্যনাশ। বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের তর্কের ফাঁকি জানিতেন না তাহা মনে করিবার কারণ নাই। তিনি কার্যসিদ্ধির জন্যই এইরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি কেন ২।১১ হইতে ২।৩৮ শ্লোককে শ্লেষোক্তি বলিয়াছি এইবার তাহা পরিস্ফুট হইবে। ২।৩৯ শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ আন্তরিক সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাই আমার মত। শ্লেষোক্তির প্রমাণগুলি পুনরায় উল্লেখ করিলাম,

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

(১) ২। ১০। অর্জুন চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাস্য শ্লেষের পরিচায়ক।

(২) ২। ১১। তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ বলিয়া ঠাট্টার.ছলে শ্রীকৃষ্ণ জবাব আরম্ভ করিলেন।

(৩) ২।১৯-২০। কঠোপনিষদের শ্লোক দুইটি পরিবর্তিত করিয়া উদ্ধৃত করিলেন।

(৪) ২। ২৬। আত্মার জন্ম মৃত্যু হয় মানিয়া লইলেন।

(৫) ২। ৩১-৩৩। আত্মীয়বধের পাপের কথা উল্লেখ না করিয়া যুদ্ধ না করা পাপ বলিলেন।

(৬) ২। ৩৭। ফাঁকির বুঝান বুঝাইলেন, মরিলে স্বর্গলাভ ও জিতিলে রাজ্যলাভ।

(৭) শোক দূর করিবার কোন কার্যকর উপায় এখন পর্যন্ত দেখাইলেন না।

(৮) ২। ৩৭। এই শ্লোকে স্বর্গলাভের লোভ দেখাইয়াছেন কিন্তু ২।৪৩ শ্লোকে স্বর্গকামীদের নিন্দা করিয়াছেন।

(৯) ২। ৩১। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম এ কথা বলিলেন কিন্তু যে ধর্ম শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রুতিকে ২।৫৩ শ্লোকে নিন্দা করিলেন।

(১০) শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিগুলিকে যথার্থ ও তাঁহার অন্তরের কথা বলিয়া মানিলে পূর্ববর্ণিত উপাখ্যানে শর্বিলকের ব্যবহার ও তর্ক অনুমোদন করিতে হয়।

(১১) পরবর্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা দেখিলেও এই শ্লেষ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমি যে ভাবে এই সব শ্লোকের ব্যাখা করিয়াছি তাহা সকল স্থানে সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। সমস্ত শ্লোকগুলির সংগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আমার ব্যাখ্যার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, তাহা অবিনাশী, জন্মমৃত্যু অপরিহার্য ব্যাপার, শোক কষ্ট অস্থায়ী অতএব তাহা সহ্য করা উচিত, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তাহা হইতে চ্যুত হইলে নিন্দা ও পাপভাগী হইতে হয় ইত্যাদি উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ পরে অর্জুনকে বলিতেছেন

॥ ৩৯ ॥ পার্থ, যে বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে পারিবে সাংখ্যমতে সেই বুদ্ধির কথা এতক্ষণ তোমাকে বলিলাম কিন্তু এইবার যোগমতে সেই

বুদ্ধির কথা শুন, যে বুদ্ধি অবলম্বন করিলে তুমি যুদ্ধ করিয়াও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকিবে॥ ৩৯॥

তিলক এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস নিষ্ঠা অনুসারে তোমাকে বুঝাইলাম এখন যে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইলে তুমি কর্মবন্ধন ছাড়িবে সেই কর্মযোগের কথা তোমাকে বলিব।

আমার মতে ভাবার্থ এইরূপ হইবে,

এতক্ষণ তোমাকে বড় বড় জ্ঞানীদের বড় বড় বুদ্ধির কথা বা সিদ্ধান্ত বলিলাম, এসব কথা ছাড়িয়া দাও, কর্মযোগ বিষয়ে বুদ্ধি বা সিদ্ধান্ত বুঝিবার চেষ্টা কর, এই বুদ্ধিদ্বারাই তুমি কর্মবন্ধ এবং তদানুষঙ্গিক শোক, মোহ, পাপ পুণ্য ইত্যাদির উপরে উঠিবে। শ্লোকে 'যোগে তু ইমাং শৃণু' আছে। এখানে তু নিরর্থক নহে ও কেবল পাদপূরণে ব্যবহৃত হয় নাই; বড় বড় জ্ঞানের কথা বলিলাম কিন্তু এইবার কর্ম্মযোগ বিষয়ে বুঝিবার চেষ্টা কর এইরূপ মানে করিলে তু কথার সার্থকতা বুঝা যায়।

এই শ্লোকে ও পরবর্তী অনেক শ্লোকে বুদ্ধি কথা আছে। বুদ্ধি কথাটার সোজাসুজি বুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। তিলক এখানে জ্ঞান অর্থ করিয়াছেন ও পরে কোথাও বাসনা ও কোথাও বুদ্ধির অর্থ বুদ্ধিই করিয়াছেন।

॥ ৪০ ॥ আমি এখন তোমাকে যে ধর্ম বা সাংসারিক জীবনযাত্রা বিধির কথা বলিব তাহার কালক্রমে ফলক্ষয় হেতু বার বার আরম্ভের আবশ্যকতা নাই বা অনুষ্ঠানের দোষে সমুদায় ফলহানির কিংবা পাপের সম্ভাবনা নাই। যাগ যজ্ঞাদির ফল ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে পতন হয় ও অনুষ্ঠানের ত্রুটিতে যাগযজ্ঞাদি সম্পূর্ণ বিফল হয় কিন্তু এ ধর্ম সেরূপ নহে। ইহার অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে তুমি শোকতাপ ইত্যাদির মহৎ ভয় হইতে উদ্ধার পাইবে॥ ৪০॥

পূর্ব্বের শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বেদপন্থীদের কথাও বলিয়াছেন, কাজেই ২।৩৯ শ্লোকে যে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে বেদবাদও তাহারই অন্তর্গত হইল। অতএব

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

এস্থলে সাংখ্য মানে আধুনিক সাংখ্যযোগ মাত্র না বুঝিয়া সাধারণ জ্ঞানীদের কথা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে, নচেৎ স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানমার্গ বা সাংখ্যযোগকে ২।৪০ শ্লোকে কর্মযোগের তুলনায় অনেক ছোট করা হইল। যদি ২।৩৯ শ্লোকের আমার ব্যাখ্যা মানা হয়, অর্থাৎ বড় বড় জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দাও এই অর্থ ধরা হয়, তবে কোন গোলই থাকে না। পরের শ্লোকগুলিতেও এই ব্যাখ্যা সমর্থিত হইবে।

॥ ৪১ ॥ কুরুনন্দন, এই মার্গ মতে চলিলে বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা ও একমার্গী হয় অর্থাৎ কি করিতে হইবে তাহা নিশ্চিত ও দৃঢ় রূপে বুঝা যায় ও সেই এক উদ্দেশ্যেই সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হয় কিন্তু অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি বহু শাখা যুক্ত ও অশেষ প্রকারের অর্থাৎ তাহা নানা পথে লইয়া যায় ॥ ৪১ ॥

অব্যবসায়ীদের অর্থাৎ আনাড়ীদেব বুদ্ধি নানা দিকে ধাবিত হয়। আসল কাজ তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় না কিন্তু ব্যবসায়ী বুদ্ধি মানুষকে একই অভীষ্ট পথে লইয়া যায়। অর্জুন শোক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি চান। তিনি বেদবাদীদের কথামত চলিলে তাঁহার অভীষ্ট লাভ হইবে না। কিসে নানাপ্রকার ভোগ ঐশ্বর্য লাভ হয় বেদমার্গীরা তাহারই নানা পন্থা দেখাইতে পারেন কিন্তু আসল কথা শোক দূর করার উপায় তাঁহারা জানেন না, অতএব এ বিষয়ে তাঁহারা অব্যবসায়ী।

তিলক এক শব্দের মানে একাগ্র করিয়াছেন ও শ্লোকের অর্থ ভিন্ন প্রকারের করিয়াছেন যথা, হে কুরুনন্দন, এই মার্গে ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ কার্যাকার্যের নির্ণায়ক (ইন্দ্রিয়রূপী) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয় : কারণ যাঁহার বুদ্ধি (এই প্রকার এক) স্থির না হয়, তাঁহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা সকল নানা শাখাতে যুক্ত ও অনন্ত (প্রকারের) হয়।

পরের শ্লোকে ভোগৈশ্বর্য ও স্বর্গকামীদের নিন্দা আছে। আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা ব্যতীত এই নিন্দার উদ্দেশ্য সন্তোষজনকরূপে উপলব্ধি হইবে না। কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি আত্মীয়স্বজনবধে পাপভোগ ও নরকবাসের কথা বলিয়াছিলে ও আমি তোমাকে ধর্মযুদ্ধে স্বর্গলাভের কথা বলিয়াছি। বেদে বা শ্রুতিতে কিসে স্বর্গলাভ ও কিসে নরকবাস হয় ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বেদনির্দিষ্ট স্বর্গলাভেও তোমার

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

শোকদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে না, অতএব যাহারা বেদের কথা বলিয়া তোমার মনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতেছে তাহাদের কথা শুনিও না। আমি তোমাকে এমন এক মার্গ নির্দেশ করিব যাহাতে তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে।

উপরে উক্ত অর্থ মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, কেন শ্রীকৃষ্ণ বেদবাদীদের অব্যবসায়ী ও বহুশাখা বুদ্ধিযুক্ত বলিয়াছেন। নচেৎ হঠাৎ বেদনিন্দার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

॥ ৪২ – ৪৪ ॥ পার্থ, বেদবাদে নিরত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, বেদের উপদেশ বহির্ভূত অপর কিছুই করণীয় নাই, এই মতাবলম্বীরা নানা পুষ্পিত বাক্যে নানা বৈদিক ক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। কামনাময় স্বর্গাভিলাষী এই অজ্ঞানীরা ভোগৈশ্বর্যের লোভ দেখাইয়া ভোগৈশ্বর্যকামী ব্যক্তিদের চিত্ত মোহিত করেন, ফলে তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চিত পথ নির্দেশ করিতে পারে না এবং একাগ্রও হয় না ॥ ৪২ – ৪৪ ॥

এই শ্লোকের সমাধি শব্দের অর্থ ২।৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেদবাদীদের বাক্যে মোহিত হইয়া যাহারা নানাপ্রকার সুখৈশ্বর্যের প্রতি ধাবিত হয়, সমাধিসাধনে তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধিলাভ হয় না অর্থাৎ তাহারা শ্রেয় স্থির করিতে পারে না এবং তাহাদের মন একনিষ্ঠ হয় না। ইহাই বলা উদ্দেশ্য।

গীতাতেই যে কেবল বেদনিন্দা আছে তাহা নহে। এই শ্লোকগুলির অনুরূপ ভাব মুণ্ডক উপনিষদে ১।২।৭-৮,১০ শ্লোকগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি॥

অর্থাৎ, এই অষ্টাদশাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্র কর্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়, যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ৭।

যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা জরা রোগাদি অনর্থসমূহ দ্বারা অতিশয় পীড্যমান হইয়া অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। ৮।

অজ্ঞানী লোকেরা ইস্ট অর্থাৎ যাগাদি কর্ম ও পূর্ত অর্থাৎ বাপী কূপ খননাদি কর্মকে প্রধান মনে করে এবং অন্য শ্রেয় জানে না। (নান্যদস্তীতি বাদিনঃ—গীতা, ২।৪২) তাহারা নিজ পুণ্যকর্মলব্ধ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় এই লোক কিংবা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে। ১০। (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)

॥ ৪৫ - ৪৬ ॥ বেদ ত্রিগুণবিষয়ক এবং যতক্ষণ ত্রিগুণ আছে ততক্ষণ শোক তাপের হাত হইতে উদ্ধার নাই। অতএব তুমি বেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া ত্রিগুণাতীত হও। ত্রিগুণাতীত হইতে হইলে তুমি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ ও শীতোষ্ণাদিরূপ যে দ্বন্দ্ব, নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছারূপ যে যোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষাকরণরূপ যে ক্ষেম, তাহার অতীত ও নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ নিত্য সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত ও আত্মজ্ঞানবান হও। বেদের শিক্ষা ছাড়িয়া দিলেও তোমার কোনই ভাবনা নাই। সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে কূপের যেমন আবশ্যকতা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

থাকে না সেইরূপ আমার উপদেশ মত চলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে বেদের আবশ্যকতা থাকিবে না ॥ ৪৫ - ৪৬ ॥

দ্বন্দ্ব অর্থে রাগ দ্বেষ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী অবস্থা। ক্ষুধাতৃষ্ণাকেও অনেক সময় দ্বন্দ্ব বলা হয়। ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রহ্মবিৎ। ত্রিগুণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। গীতায় ৮।২৮ শ্লোকেও এই ভাবের কথা আছে,

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ৮।২৮

অর্থাৎ, বেদে যজ্ঞে তপস্যায় ও দানে যে পুণ্যফল দেখান হইয়াছে ইহা জানিলে যোগী সে সমুদয় অতিক্রম করিয়া আদ্য পরম স্থান লাভ করেন।

॥ ৪৭ ॥ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কদাচ নহে, কর্মফলের হেতু হইও না অর্থাৎ এমন ভাবে কর্মানুষ্ঠান করিও না যাহাতে বন্ধনপ্রদ কর্মফল উৎপন্ন হয়, কর্ম করিব না এমন আগ্রহও যেন তোমার না হয় ॥ ৪৭ ॥

এই শ্লোকের প্রথমার্ধে যে ফল শব্দ আছে তাহার অর্থ কর্মের সিদ্ধিরূপ ফল এবং দ্বিতীয়ার্ধের কর্মফলহেতু শব্দের অন্তর্গত ফল শব্দের অর্থ বন্ধনরূপ ফল। আসক্তি লইয়া কর্ম করিলে সিদ্ধিরূপ ফল লাভ হউক বা না হউক, বন্ধনরূপ কর্মফল ভোগ করিতে হয়। অকর্ম অর্থে কর্মত্যাগ।

তোমার কর্মের অধিকার, ফলের অধিকার নাই, হঠাৎ এ কথা কেন বলিলেন এবং ইহার সহিত পূর্ববর্তী শ্লোকের সংগতিই বা কি ? হিতলাল মিশ্র বলেন, যদি এমত বল তবে সমস্ত কর্মের ফল সকল পরমেশ্বর আরাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইবেক, এই বিবেচনায় ভগবদারাধনাতে প্রবৃত্ত হই, অন্য কর্ম করিবার প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কা করিয়া তাহা নিবারণপূর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন। তিলক বলেন, এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

যে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন, এই কথা গীতার সম্মত নহে।

আমার মতে শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ হইবে। পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অর্জুন, তুমি বেদবিহিত ভোগৈশ্বর্য-ফলপ্রদ কর্মের আচরণ করিও না। ত্রিগুণবিষয়ক বেদের উপরে উঠ। ব্রহ্মজ্ঞানীর বেদে আবশ্যকতা নাই। এই শ্লোকে সেই কথাই অন্য প্রকারে বুদ্ধিদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেখ ফলাফল অনিশ্চিত, তাহা মনুষ্যের অধিকারে বা আয়ত্তে নহে; বেদবিহিত কর্মেরও ফলাফলের নিশ্চয়তা নাই। ফল আশা করিয়া যে কর্ম করে, কোনও কারণে সেই ঈপ্সিত ফললাভ না হইলে তাহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব তুমি ফলের আশা রাখিয়া কোন কাজ করিও না। এমনও মনে করিও না যে, ফলের আশা যদি নাই রহিল তবে কাজ করিয়া লাভ কি? কাজের সমস্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করাই ভাল। সঙ্গ মানে আমি জোড়, আসক্তি বা আগ্রহ ধরিয়াছি। ২।৬২ শ্লোকেও সঙ্গ কথা আছে। সেখানেও এই মানেই করিব। ব্যাখায় আমি শ্লোকের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য শ্লোকে যাহা নাই এমন কথাও বলিলাম। কর্মফলে তোমার অধিকার নাই, এখানে অধিকার মানে শাস্ত্রীয় অধিকার বা ধর্মের অধিকার বা moral right নহে। কর্মফলে অধিকার নাই মানে তাহা সাধনায়ত্ত নহে। কর্মের সম্যক অনুষ্ঠান সত্ত্বেও ফললাভ না হইতে পারে। ১৮।১৪ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, কর্মের সিদ্ধি পাঁচটী কারণের উপর নির্ভর করে, যথা (১) অধিষ্ঠান বা যে দ্রব্য লইয়া কর্ম (object), (২) কর্তা (subject), (৩) করণ বা সাধন দ্রব্য (instrument), (৪) চেষ্টা বা সাধন দ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা (exertion and capacity) এবং দৈব (unknown factor)। এই কারণ বা factorগুলির মধ্যে দৈব একেবারেই অধিকারের বাহিরে। এই শ্লোকের বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করিব।

॥ ৪৮ - ৪৯ ॥ ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া সফলতা বিফলতায় সমজ্ঞান

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

হইয়া যোগ আশ্রয় করিয়া কর্ম সকল কর, সমত্বকে যোগ বলে। ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ হইতে দূরে থাকিলে বা বিচ্ছিন্ন হইলে কর্ম নিকৃষ্টই হয়, অতএব বুদ্ধির শরণ লও, কর্ম-বন্ধনরূপ ফলপ্রদ কর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ কৃপার পাত্র ॥ ৪৮ - ৪৯ ॥

ফললাভের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। এখানে যোগস্থ কথায় ধ্যানস্থ বা রাজযোগ বা হঠযোগ প্রভৃতি উদ্দিষ্ট হয় নাই। যোগের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এখানে ধরিলে চলিবে না। পাছে এইরূপ ভুল হয়, সে জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে এবং ২।৫০ শ্লোকে যোগ শব্দের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করিয়াছেন। কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়কে সমান মনে করিয়া কাজ করার নাম যোগস্থ হইয়া কর্ম করা। ২।৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আমার মতে ২।৪৯ শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে, ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ (হেত্বর্থে তৃতীয়া) কর্ম অবরং হি, (তস্মাৎ) বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। ফলহেতবঃ কৃপণাঃ। এখানে দূর শব্দ অব্যয় না হইয়া বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষ্যরূপে দূর শব্দের প্রয়োগ মহাভারতের অপর স্থানে, শতপথ ব্রাহ্মণে এবং কাব্যেও দেখা যায়। মুণ্ডক ৩।১।৭ শ্লোকে আছে 'দূরাৎ সুদূরে' ; এখানেও দূর শব্দ বিশেষ্য পদ। সাধারণ প্রচলিত অর্থ অন্যরূপ। বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট অথবা কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধির সাম্যযোগ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। আমার ব্যাখ্যায় বুদ্ধি কথাটার সোজাসুজি মানে ধরিয়াছি।

॥ ৫০ - ৫৩ ॥ যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ফলাফলে সমজ্ঞান রাখিয়া কর্ম করে সে পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠে। অতএব যোগযুক্ত হও। যোগ আর কিছুই নহে, উপযুক্ত ভাবে কর্ম করিবার কৌশল মাত্র। কর্ম করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিলাভ হইলে মনীষীরা কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়াই জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

হন। তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কালুষ্য হইতে মুক্ত হইবে তখন তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ বা যাহা কিছু শুনিবে সকল বিষয়েই নির্বেদ অর্থাৎ সুখ দুঃখ বোধহীন হইবে। শ্রুতির অমুক কর্মের অমুক ফল, অমুকে পাপ, অমুকে পুণ্য, এই সকল কথায় তোমার বুদ্ধি বিকল হইয়াছে ও ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। শ্রুতি অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহের চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধিকে স্থির ও নিশ্চল কর। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইলে সমাধিতে অচলা স্থিতি লাভ করিবে ও তখন যোগপ্রাপ্তি ঘটিবে ॥ ৫০ – ৫৩ ॥

৫১ শ্লোকে অনাময় পদ শব্দের অর্থ সর্বপ্রকার রোগ অর্থাৎ উপদ্রব রহিত ব্রহ্মপদ। মোহ শব্দের অর্থ অন্যায় আসক্তি, কলিল কথার অরণ্য অর্থ না করিয়া শংকরানুযায়ী কালুষ্য করিয়াছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে কলিল কথা আছে। এ স্থলে কলিলের সংগত অর্থ অবিদ্যা বলিয়া মনে হয়। যথা,

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

অর্থাৎ, অনাদি অনন্ত অবিদ্যা মাঝে বিশ্বের স্রষ্টা বহুরূপে রাজে
বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতারে, জানিলে সর্ব পাশ বিদারে।

গীতার ২।৩৯-৫৩ শ্লোকগুলিতে যে যোগ ও যে সমাধির কথা আছে তাহা পাতঞ্জল যোগ ও তদন্তর্গত সমাধি নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে যোগ বিবৃত হইয়াছে তাহা শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদিত বুদ্ধিযোগ। এই যোগকে কৃষ্ণ ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিযোগ জীবনযাত্রা নির্বাহের এক বিশেষ আচার পদ্ধতি ॥ ২।৪০ ॥ ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্মফলের বন্ধন এড়াইয়া একমার্গী বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম করিবার কৌশলই এই যোগ। বুদ্ধিকে নানা দিকে দৌড়াইতে না দিয়া একমার্গী করাকেই এই যোগের সমাধি বলা হইয়াছে। অর্জুনের

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমাধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণসমূহ বলিয়াছেন তাহাতেও সমাধির এই অর্থ পরিস্ফুট হইবে। স্থিতবুদ্ধি সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া জড়বৎ অবস্থান করেন না, তিনি নিস্পৃহ, নির্মম, নিরহংকার হইয়া বিচরণ করেন, এই অবস্থাকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলা হইয়াছে ও ইহা হইতেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়। ২।৬১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বেদের নিন্দা করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বক্তব্য শেষ করিলেন ॥ ২।৫৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বেদের উপর এই আক্রোশ কেন? পূর্ববর্তী শ্লোকেও এই আক্রোশ দেখা গিয়াছে। ইহার উত্তরে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই বলেন যে, সমগ্র শ্রুতিকে নিন্দা করা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল শ্রুতিবচনে স্বর্গ ফলাদির উল্লেখ আছে কেবল সেই সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রযোজ্য। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণের বেদ নিন্দার উদ্দেশ্য এই যে, বেদকে জীবনযাত্রার প্রদর্শক করিও না। বুদ্ধিকে জীবনযাত্রার নিয়ামক কর। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিলেন তাহার সার মর্ম দাঁড়াইতেছে এই যে, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের বশীভূত না হইয়া সহজ বুদ্ধিতে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা কর। উপযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইলে তুমি ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের উপরে উঠিবে ও সংসারের সর্বকষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ করিবে। জীবনযাত্রা বিধির অলৌকিক ভিত্তি (religious code of life) না মানিয়া বুদ্ধির উপর (rational code of life) নির্ভর কর।

এই ব্যাখ্যা হয়ত অনেকের অনুমোদিত হইবে না কিন্তু সমস্ত শ্লোকগুলির সংগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ বিচার্য। কৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সাংখ্যবুদ্ধি বলিতেছিলেন তখন বার বার বলিতেছিলেন, ন শোচিতুমর্হসি, কারণ অর্জুনের দুঃখ দূর করাই উদ্দেশ্য। অতএব আশা করা যাইতে পারে যে, যখন তিনি নিজের প্রিয় ও অনুমোদিত যোগবুদ্ধির ব্যাখ্যা করিলেন তখন নিশ্চয়ই দুঃখ দূর করিবার উপায়ও দেখাইলেন। ২।৫২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাঁহার নির্দিষ্ট মার্গে কেবল যে আত্মীয় বধ ও যুদ্ধজনিত শোক তাপ দূর হইবে তাহা নহে কিন্তু বুদ্ধি স্থির হইলে তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্তি হইবে। কথাটা অত্যন্ত অদ্ভুত। এজন্যই অর্জুনের মনে প্রশ্ন উঠিল, স্থিরবুদ্ধি বা স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার ব্যক্তি। পরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধ করিব না বলিয়া অর্জুন যে সব আপত্তি

করিয়াছিলেন, যথা আত্মীয় বধে শোক ও পাপ, সমাজে ব্যভিচার, নরকবাস ইত্যাদি, তাহাতে বোঝা যায় যে, তিনি বেদবিহিত ও সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট লোকযাত্রা বিধির বশে চলিতেছিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, ভোগৈশ্বর্যের দিকেই বেদের ঝোঁক, তাহাতে তুমি বিভিন্ন সুখের পথে চালিত হইবে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা সংসার যাত্রার নানাবিধ অবশ্যম্ভাবী শোক দুঃখ কি করিয়া দূর হইবে, এই উপায়ে তুমি যাহা চাও তাহা পাইবে না, আনাড়ীদের মত নানাদিকে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইবে, আসল কাজ হইবে না। আমি যাহা বলিতেছি সেই মত লোকযাত্রা নির্বাহ করিলে সর্বপ্রকার শোক কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে। গীতার অন্যান্য অধ্যায়েও দেখা যাইবে যে এই ব্যাখ্যাই সংগত ব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সকল বিষয় দেখিবার চেস্টা করিলে নির্বেদ প্রাপ্তি হয়, তখন দুঃখাবিষ্ট অর্জুনের মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণকথিত স্থিরবুদ্ধি লোক নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যক্তি হইবে। তাহার লাভালাভ জ্ঞান নাই, শোক দুঃখ নাই, কর্মে আসক্তিও নাই অনিচ্ছাও নাই, এ আবার কি প্রকার! অর্জুনের মনে এখন শোকের বদলে কৌতূহল উঠিয়াছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,

॥ ৫৪ ॥ কেশব, সমাধিস্থ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিকা একমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞের বা বা স্থিরবুদ্ধিযুক্ত লোকের লক্ষণ কি? এইরূপ লোক কি সাধারণ লোকের মতই থাকেন, কথাবার্তা ও চলাফেরা করেন, না তাহাদের ব্যবহার অন্য প্রকারের ॥ ৫৪ ॥

সমাধি কথার অর্থ ২।৪৪ ও ৫৩ শ্লোকের অনুযায়ী করিয়াছি। অর্জুনের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন সমস্ত গীতার তাহাই সার কথা। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে কি করিয়া এই স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায়, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়াছেন। ২।৫৫ হইতে ২।৭২ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের কথা আছে। এই শ্লোকগুলির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়া পরে ইহাদের সারাংশ উদ্ধৃত করিব। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য কেন আসিয়াছে।

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

॥ ৫৫ - ৫৮ ॥ যাঁহার মনোগত সমস্ত কামনার বিষয় ত্যাগ হইয়াছে এবং যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট, যাঁহার দুঃখে কষ্ট নাই, সুখে আসক্তি নাই, কোনও বিষয়ে স্পৃহা নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই, যিনি সর্বত্র স্নেহবর্জিত, নিজের ইষ্টানিষ্টে আগ্রহান্বিত বা বিরক্ত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, তাঁহারই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কচ্ছপ যেরূপ নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শরীরের মধ্যে গুটাইয়া লইয়া বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিজের আবরণের মধ্যে স্থির থাকে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটাইয়া লইতে পারেন তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত বা স্থির হইয়াছে **॥ ৫৫ - ৫৮ ॥**

গীতায় ৫৫ শ্লোকের কাম শব্দের অর্থ কামনার বস্তু। ২।৭০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কঠোপনিষদে আছে,

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥
পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

অর্থাৎ, পরমুখ হ'ল দ্বার স্বয়ম্ভূবিধানে, দৃষ্টি পরমুখী, নহে অন্তরাত্মা পানে।
কদাচিৎ কোন ধীর অমৃত সন্ধানে আবরিয়া চক্ষু দেখে প্রত্যক্ আত্মনে॥
পর কাম লোভে ধায় বালমতি যার, বিস্তৃত মৃত্যুর পাশে পড়ে বার বার।
কিন্তু ধীর জন সদা অমৃতে জানিয়া অধ্রুবে না বাঞ্ছা করে ধ্রুবকে মানিয়া॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

অর্থাৎ, স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়-দ্বার সমূহকে বহির্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জন্য মানুষ বাহিরের জিনিসিই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোনও কোনও ধীর ব্যক্তি অমৃতকামী হইয়া বহির্বিষয় হইতে চক্ষুকে আবৃত করিয়া প্রত্যগাত্মার দর্শন লাভ করেন। বালবুদ্ধি ব্যক্তি বহির্বিষয়ের অনুসরণ করে। তাহারা বারংবার মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশবন্ধনে গিয়া পড়ে। ধীর ব্যক্তি অমৃতকে জানিয়া সংসারের অধ্রুব বস্তুসমূহে আকৃস্ট হন না। কঠের এই শ্লোক গীতার ২।৫৮ শ্লোকের একেবারে অনুরূপ। কঠে স্থিরবুদ্ধির বদলে ধীর কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব বুঝা যায় যে এই অধ্যায়ে বুদ্ধি কথার সোজাসুজি মানে ছাড়া তিলক প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার কৃত অন্য অর্থ সমীচীন নহে।

শ্রীকৃষ্ণ এই কয়টি শ্লোকে বড়ই সব আশ্চর্য কথা বলিতেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের ভয় ক্রোধ বা কোনও বিশেষ কামনা নাই। কি করিলে এই অবস্থা হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা পরে বলিবেন। উপযুক্ত স্থানে তাহার আলোচনা করিব। ক্রোধ না হওয়া, ভয় না পাওয়া অবশ্য ক্রোধ ও ভয় চাপিয়া রাখা নহে। ভয় ক্রোধ ইত্যাদি না থাকার অর্থ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি কিন্তু ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার কি তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেহ মনে করিতে পারেন যে বিষয়ের উপলব্ধি না হওয়াই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার; চোখ বুজলেই বিষয় দেখিলাম না, অতএব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইল। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করা হইল ও তাহার ফলে বহির্জগতের কোন জ্ঞানই রহিল না, অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইল। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে বলিলেন,

॥ ৫৯ ॥ নিরাহারী পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল অশক্ত হইলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না কিন্তু মনের বিষয়বাসনা থাকিয়া যায়; পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে বিষয় ও তাহার বাসনা উভয়ই চলিয়া যায় ॥ ৫৯ ॥

এই শ্লোকে নিরাহার কথার অর্থ যে খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাই সহজ অর্থ। না খাইলে ক্রমে দুর্বলতায় মানুষকে অজ্ঞান করে ও তখন বিষয় উপলব্ধি

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ৫৯

হয় না। শংকর নিরাহারের অর্থ করেন অনাহাররত আতুর এবং বিষয়োপভোগ-পরাঙ্মুখ ক্লেশকর তপস্যানিরত মূর্খ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে। শ্বেতকেতু পিতৃআজ্ঞায় পঞ্চদশ দিবস উপবাসী ছিলেন। পরে যখন পিতা তাঁহাকে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে বলিলেন তখন অনাহারে দুর্বল শ্বেতকেতু অপারক হইয়া উত্তর করিলেন, এ সমুদায় আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না। শ্বেতকেতু ভোজন করিলে তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল।

বিষয়ভোগে অক্ষমতা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার নহে। তবে এই সংহরণ বা প্রত্যাহার কি? কি উপায়ে ইহা হইতে পারে তাহা এখানে আলোচনা করিব না। ব্যাপারটা কি তাহাই বলিব।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হাত দিয়া বরফ ছুঁইলাম, একটা ঠাণ্ডা জিনিসের বোধ হইল। এই বোধকে প্রত্যক্ষ বা perception বলা হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে উপস্থিত অনুভূতি ভিন্ন অপর প্রকারে লব্ধ জ্ঞানও মিশ্রিত আছে। ঠাণ্ডা ভিজা ও শক্ত জিনিস হাতে লাগিলে বলিলাম বরফ ছুঁইয়াছি। ত্বকের দ্বারা কেবল শৈত্যানুভূতি ও কঠিন বস্তুর স্পর্শবোধ পাইয়াছি। শৈত্যানুভূতি ও স্পর্শবোধ যে একটা বহির্বস্তু হইতে আসিতেছে ও সে বহির্বস্তুটি যে বরফ, এই জ্ঞান আমার উপস্থিত অনুভূতির মধ্যে নাই, তাহা অন্য প্রকারে লব্ধ। অবশ্য আমি ধরিয়া লইতেছি যে কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারাই বস্তু বিচার করিতেছি, চক্ষে দেখিয়া নহে। প্রত্যক্ষের মধ্যে দুইটি দিক আছে। একটি বহির্বস্তুবিষয়ক ও অপরটি নিজের অনুভূতিবিষয়ক। একটির বশে বলি বরফ ছুঁইয়াছি ও অপরটির বশে বলি ঠাণ্ডা লাগিতেছে। এই ঠাণ্ডা লাগাটার মধ্যে বাস্তবিক হিসাবে কোনও বস্তুজ্ঞান নাই। ইহা বাহিরের জিনিস নহে, নিজের অনুভূতি মাত্র। স্পর্শের সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। শব্দের অনুভূতি ও বাহিরের শব্দ বা শব্দায়মান বস্তু পৃথক। আলোর অনুভূতি ও আলো জিনিষটা পৃথক, যদিও এ কথা বোঝা সহজ নহে। পরিশিষ্টে 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয় যদি অনুভূতি ভিন্ন অন্য কিছুই না জানিতে দেয়, তবে বস্তুজ্ঞান আসিল কোথা হইতে? আবার অনুভূতি ব্যতীত বস্তু যে আমাদের জ্ঞানে আসিতে পারে তাহা বোঝা

যায় না। অনুভূতি হইতেই যে বস্তুজ্ঞান তাহা মানিলে বিশ্বাস করিতে হয় যে আমার অনুভূতি বহির্বিষয়ে তদাকারাকারিত হইয়া বহির্বস্তুর উপলব্ধি করায়। বহির্বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে অনুভূতির উৎপত্তি হইলেও সেই অনুভূতির কিয়দংশ বহির্বস্তুতে অভিক্ষিপ্ত (projected) হইয়া বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন করে। বাহিরের বস্তুর সহিত আমার ত্বকের সংযোগের ফলে আমার শৈত্য অনুভূতি হইল। এই শৈত্যের এক অংশ বাহিরে অভিক্ষিপ্ত হইলে পর বরফ ছুঁইয়াছি বুঝিতে পারিলাম। নচেৎ অনুভূতি অনুভূতি মাত্রই থাকিত। বস্তুর জন্য অনুভূতি, এ কথা বোঝা যাইত না। বৈদান্তিক বলেন যে বহির্বস্তুই নাই। আমারই ভিতরকার অনুভূতি প্রক্ষেপিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। বৈদান্তিক আরও বলেন অনুভূতির ভিতরে নানাত্ব নাই। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। নানাত্ববোধও এই প্রক্ষেপণ বা মায়ার ক্রিয়া। আছে কেবল একমাত্র সৎ অদ্বিতীয় বস্তু, এবং এই একমেবাদ্বিতীয় সৎ বস্তুই আমি, আত্মা বা পরমব্রহ্ম। সকল বেদান্তবাদী অবশ্য এ কথা বলেন না। কি করিয়া বস্তুর উৎপত্তি হইল দার্শনিকদের সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। আমি সে আলোচনা করিব না, আপাতত ধরিয়া লইব বস্তু আছে।

বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের সংহরণের অর্থ এইবার বুঝা যাইবে। অনুভূতির যে অংশ অভিক্ষেপের ফলে বহির্বস্তুতে গিয়াছে, স্থিতপ্রজ্ঞ কচ্ছপের অঙ্গসংহরণের ন্যায় তাহাই সংহরণ করিতে পারেন। চোখ বুজিয়া হাতে শৈত্যানুভূতি হইলে যাহার বরফ ছুঁইয়াছি মনে না আসিয়া ঠাণ্ডা লাগিতেছে মনে আসে, তাহার ত্বগিন্দ্রিয়ের সংহরণ হইয়াছে। এইরূপে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সংহরণ করিতে পারে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এইরূপ সংহরণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। চোখ খুলিলেই গাছপালা মানুষ বাড়ি ইত্যাদি সব জিনিসই দেখি। আমার ভিতর কি অনুভূতি হইতেছে সে বিষয়ে লক্ষ্য থাকে না। এই জন্যই কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দ্বার বহির্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন এবং কোন কোন ধীর ব্যক্তি দৃষ্টিকে অন্তর্মুখ করিতে পারেন। সাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় দৃষ্টি অন্তর্মুখ থাকিলে লোকযাত্রা নির্বাহ হয় না এবং ইহাতে বিপদের কথাও আছে। বাঘের সামনে পড়িয়া যদি নিজের কি অনুভূতি হইতেছে কেবল তাহারই দিকে লক্ষ্য থাকে, তবে সে অবস্থা বিশেষ নিরাপদ নহে। যাঁহার পক্ষে মরা বাঁচা সমান হইয়াছে ও যাঁহার কোন বিশেষ কামনা নাই, কেবল তিনিই এ কাজ করিতে পারেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিলেন,

প্রজহাতি যদা কামান সর্বান্ পার্থ মনোগতান্, তখনই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও কি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে তাহা পরে বিচার করিব। কেহ যেন এমন মনে না করেন, যে কালে কদাচিৎ কোন ধীর ব্যক্তি এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, তবে আর সাধারণের পক্ষে গীতার উপদেশের সার্থকতা কি। ইহারও উত্তর পরে পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে গীতোক্ত ধর্মের প্রত্যবায় নাই এবং স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ, অর্থাৎ এই ধর্মের স্বল্প মাত্রও আচরিত হইলে মহাভয় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

সংহরণ করা যে কত শক্ত তাহা বলিতেছেন।

॥ ৬০ – ৬১ ॥ কৌন্তেয়, বিদ্বান ব্যক্তিও এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও ইন্দ্রিয় সকল মনকে নিজের অভিপ্রেত দিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয়কে যে সংযত করিয়া নিজবশে রাখিতে পারে ও যে যোগযুক্ত ও মৎপরায়ণ হইতে পারে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে **॥ ৬০ – ৬১ ॥**

গীতার ২।৬১ শ্লোকে সংযম ও যুক্ত এই দুই পারিভাষিক শব্দ আছে। পাতঞ্জল যোগে সংযম কথার অর্থ কোন ধ্যেয় বস্তুতে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির প্রয়োগ। যুক্ত কথার অর্থ যোগযুক্ত। ২।৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি, এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগ বিবৃত করিতেছেন, পাতঞ্জল যোগ নহে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বিবরণ আছে। বুদ্ধিযোগে যোগ শব্দের অর্থ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া একাগ্রচিত্তে কর্ম করিবার কৌশল, এই যোগে সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়গণের সংহরণ ও তাহাদিগকে বশে রাখা। বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তিই ৬১ শ্লোকে যুক্ত শব্দের উদ্দিষ্ট। পরবর্তী শ্লোকে ধ্যায়তঃ শব্দ আছে, এই ধ্যানও পাতঞ্জল ধ্যান নহে, বিষয় ধ্যান অর্থে বিষয়ের প্রত্যয় বা প্রত্যক্ষানুভূতি। ৬২ শ্লোকে ধ্যান কথার অর্থ বিচার করিয়াছি।

ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করার কথা নাই। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। তাহাদের বশে আনিতে হইবে বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ বা অন্তর্মুখ হয়, বশে কথার ইহাই উদ্দেশ্য। স্থিতপ্রজ্ঞের অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয় না। মৎপর কথার

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

অর্থ আমার দিকে মন। তিলক বলেন, এস্থলে ভক্তিমার্গের আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এই প্রথম ভগবান বলিলেন। সাধারণ হিসাবে কথাটা বড়ই অহংকারের কথা। শ্রীকৃষ্ণের কথার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিলে কথাটাকে ভক্তিমার্গের বা অহংকারের কথা বলিয়া মনে হইবে না। ২।৫১ শ্লোকে বলিয়াছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে অনাময় পদলাভ হয়। ২।৫৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে পরমতত্ত্ব লাভ হয় ও বিষয়বাসনা রহিত হয়। বিষয়বাসনা রহিত হইলে মন অন্তর্মুখ হয় ও তখন আত্মদর্শন হয় ও মন আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে। আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ ॥ ২।৫৫ ॥ ইন্দ্রিয়-সংহরণের ফলে আত্মদর্শন হয়, এ কথা কঠোপনিষদেও আছে দেখাইয়াছি। এইজন্য আত্মদর্শন বা নিজেকে জানা, ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মকে জানা বা পরমতত্ত্ব বা অনাময় পদলাভ সব একই কথা। মৎপরায়ণ হও বলাও যা, নিজেকে জান বলাও তা। ইহাতে কোনই অহংকারের কথা নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ॥ ৪।৪।১৩ ॥, এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ করিয়াছেন তিনিই বিশ্বকৃৎ, তিনিই সকলের কর্তা। স্বর্গাদিলোক তাঁহারই এবং তিনিই এই সমুদায় লোক। (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)।

রাজশেখর বসু বলেন,

সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া যখন উপযুক্ত শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ দেন, তখন যদি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত আপনাতে আরোপ করিয়া কথা কহেন, তবে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান বা সমবায়ের একজন বিশ্বস্ত কর্মী যখন বলেন, আমরা এই করি, এই আমাদের নিয়ম, তখন তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান আপনাতে আরোপিত করিয়াই কথা কহেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত নহেন, অঙ্গ মাত্র, সে জন্য 'আমি' বলিতে পারেন না; অপরাপর অঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিয়া বহুবচনে বলেন, 'আমরা'। কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় sui generis; কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও সত্তা ব্রহ্মের সহিত উপমেয় নহে। বিশ্বের সহিত, তথা ব্রহ্মের সহিত একীভূত মানব যদি কেহ থাকেন, তিনি নির্ভয়ে নির্লজ্জায় বলিতে পারেন, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬ ॥

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

রামমোহোন রায় লিখিয়াছেন,

অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন।...অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরামাত্মাস্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষে তাৎপর্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ সূত্রে করিয়াছেন।...কৌষীতকি উপনিষদে ইন্দ্র উপদেশ করেন মামেব বিজানীহি কেবল আমাকেই জান ।...বামদেব কহিতেছেন যে 'আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য হইয়াছি' (শ্রুতি)। শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ভগবান্ কপিল কহিতেছেন, তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাহাকে আমি সংসার হইতে তারণ করি। এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্যেরা করিয়াছেন। (গ্রন্থাবলী, ২৯৫)

বিষ্ণুপুরাণ ২২।৮৫ শ্লোকে আছে,

অহং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দনো
নান্যৎ ততঃ কারণকার্যজাতম্।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি॥

অর্থাৎ, আমি হরি, এই সমস্ত জনার্দন, তদ্ভিন্ন কারণকার্যজাত অন্য কিছু নাই, যাঁহার মনে এই ধারণা হয় তাঁহার আর অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্বরূপ রোগ হয় না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংহরণের আবশ্যক কি? বিষয় উপলব্ধি হইলেই বা। তাহাতে লাভ বই লোকসান কোথায়? কি কি অবস্থায় বিষয়জ্ঞান দোষের হয়॥ ২।৬২-৬৩॥ এবং কি অবস্থায় বিষয়োপলব্ধিতে দোষ হয় না॥ ২।৬৪-৬৬॥ তাহা দেখাইয়াছেন।

ইন্দ্রিয় বহির্মুখ হইয়া বিষয়ের উপলব্ধি হইলে কি দোষ হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

॥ ৬২-৬৩ ॥ বিষয় সমূহের ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে সঙ্গ

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২

জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিলোপ হইতে বিনাশ হয় ॥ ৬২ - ৬৩ ॥

এই দুই শ্লোকের শংকরপ্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। তিলকের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম, ইহা শংকরানুযায়ী। বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্তি করে, তাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি বাড়িয়া যায়, আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসনা উৎপন্ন হয় যে আমার কাম (অর্থাৎ ঐ বিষয়) লাভ করিতে হইবে। এবং (এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে বিঘ্ন হইলে) ঐ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অবিবেক আসে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে (পুরুষের) সর্বস্ব নষ্ট হয়। এই অর্থ অনুসারে প্রথমে বিষয়চিন্তা, তৎপরে বিষয়াসক্তি বা প্রীতি, তৎপরে বিষয়কামনা, তৎপরে ক্রোধ, তৎপরে সম্মোহ অর্থাৎ অবিবেক অর্থাৎ কার্য ও অকার্য বিষয়ে বিভ্রম, তৎপরে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র এবং আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট অর্থ বিস্মৃতি এবং শেষে বুদ্ধিনাশ বা কার্যাকার্য বিষয়ে অবিবেকতা, অবিবেকতা হইতে অন্তঃকরণের বুদ্ধিনাশ হয়।

শ্লোকে ধ্যান ও সঙ্গ কথা আছে। ধ্যান মানে চিন্তা ধরিলে গোল বাধে। বিষয়চিন্তা হইতে বিষয়ে আসক্তি আসে, না আসক্তি হইতে চিন্তা আসে? আসক্তি ও কামনায় পার্থক্যই বা কি? আবার সম্মোহ মানেও কার্যাকার্য বিষয়ে বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ মানেও তাই। এতএব উপরের ব্যাখ্যায় অর্থ পরিষ্কার হইল না। ইংরাজীতে কথা আছে wish is father to the thought, এখানে কি তাহার বিপরীত বলা হইল? মনোবিদেরা বলিবেন এবং সাধারণেও বলিবে, আগে কামনা পরে তদনুযায়ী চিন্তা। আমার মতে বিষয়ধ্যান মানে বিষয়চিন্তা নহে, বিষয়বোধ বা perception or cognition। পূর্বের শ্লোকে ইন্দ্রিয়-সংহরণের কথা বলা হইয়াছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগই বিষয়ধ্যান বলিয়া ধরিলে পূর্বের শ্লোকের সহিত অর্থের সংগতি থাকে। ১৩।২৫ শ্লোকে ধ্যান কথা আছে। সেখানে শংকর মানে করিয়াছেন তৈল ধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ো ধ্যানম্ অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

ধ্যান। মনোবৃত্তি মাত্রই চিন্তন নহে। বহির্বিষয়-সংস্পর্শে বস্তুর প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় ইচ্ছাকৃত নাও হইতে পারে। বার বার বস্তুর প্রত্যয় হইতে থাকিলে তাহাতে অবিচ্ছিন্নতা আসে ও তখন সেইরূপ প্রত্যয়কে ধ্যান বলা যায়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে ধ্যানকে প্রত্যয়ৈকতানতা বা কেবল এক বিষয়ের প্রত্যয় বা অনুভূতি বলা হইয়াছে ॥৩।২॥ প্রত্যয় ও চিন্তন সমার্থবাচক নহে যদিও চিন্তনের ফলে প্রত্যয় হয় এ কথা সত্য। ৬১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। গীতার ২।৬২ শ্লোকে ইচ্ছাকৃত ধ্যানের কথা বলা হয় নাই। ইচ্ছাকৃত ধ্যানের মূলে কামনা আছে। সঙ্গ মানে জোড়া লাগা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বার বার সংযোগ হইতে থাকিলে পরস্পরের একটা বন্ধন হয়, এই বন্ধনই সঙ্গ। যে জিনিষ প্রত্যহ দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অভাব হইলে মনে একটা কষ্ট হয়। সঙ্গচ্ছিন্ন হওয়ায় এই কষ্ট। এই কষ্ট হইতেই জিনিসটি আবার দেখিবার বা শুনিবার কামনা জন্মে, এবং কামনা ক্রমে বৃদ্ধিও পাইতে পারে। যিনি পূর্বে কখনও চা খান নাই, এমন কোন ব্যক্তিকে যদি চা খাওয়ানো যায়, তবে প্রথমে তাঁহার তাহা নাও ভাল লাগিতে পারে কিন্তু প্রত্যহ খাইতে খাইতে, অর্থাৎ চায়ের স্বাদের প্রত্যয় হইতে থাকিলে সঙ্গ জন্মিবে। তখন ক্রমে তাঁহার চা না পাইলে কষ্ট হইবে, চা-পানের কামনা মনে উঠিবে। এই কামনা ভাল চা খাইব, গরম চা খাইব, ভাল বাটিতে খাইব, দিনে দুই বার খাইব, তিন বার খাইব ইত্যাদি নানাদিকে বর্ধিত হইবে। সঙ্গের সহিত কামনার পার্থক্য এই যে, সঙ্গের অস্তিত্ব অমনি বোঝা যায় না, বিষয় প্রাপ্তির অভাবের কষ্টে তাহা বোঝা যায়। সঙ্গকে কামনার negative phase বলা যাইতে পারে। কামনা বস্তুপ্রাপ্তির স্পষ্ট ইচ্ছা। কামনা বাধা পাইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ৩।৩৭ শ্লোকে কাম ও ক্রোধকে একই রিপু বলা হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কাম ও ক্রোধের সম্বন্ধ বিচার করিব। ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়। আমার মতে সম্মোহ মানে কোনও বিশেষ কার্যে মোহ বা অতিরিক্ত ঝোঁক। কাহারও প্রতি ক্রোধ হইলে তাহাকে মারিবার ইচ্ছা সম্মোহজনিত। সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানলোপ। সামাজিক রীতিনীতি, কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই স্মৃতিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। বুদ্ধি আমাদিগকে যেখানে নানাভাবে কার্য হইতে পারে সেখানে কোনও একটি বিশেষ কার্যে প্রবৃত্ত করায়; যথা, কেহ আমাকে মারিল, আমি তাহাকে তিরস্কার করিব, কি মারিব,

কি ক্ষমা করিব, তাহা বুদ্ধিদ্বারা স্থির করি। সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানের বশেই আমরা বুদ্ধিকে চালনা করি। এই জন্যই বলা হইল স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশের ফলে এমন কার্য করিয়া বসি যাহাতে নিজের অনিষ্ট হয়।

উপরে যে ব্যাখ্যা দিলাম তাহাতে এখনও গোল মিটিল না। এখানে বলা হইল, বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে কামনার উৎপত্তি। আমার মতে ভিতরে কামনা না থাকিলে বিষয়বোধই হইবে না। এবিষয় অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, প্রত্যেক বিষয়বোধ বা প্রত্যক্ষের (perception) একটা অর্থ আছে। এই অর্থ কি তাহা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। ছুরির প্রত্যক্ষ হইল অর্থাৎ জিনিসটা কি ও তাহার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি ও ছুরির দ্বারা কি কাজ হইতে পারে, ছুরির প্রত্যক্ষের মধ্যে এই সব অর্থই আছে। মনোবিদেরা বলেন, এই অর্থ ক্রিয়ামূলক। ছুরি দেখিলে তাহার দ্বারা কি কাজ হয় তাহা অজ্ঞাতসারে মনে আসে। প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা ইচ্ছা বা কামনা আছে। অবশ্য অনেক সময় আমরা এই ইচ্ছার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। এই ইচ্ছা না থাকিলে ক্রিয়ামূলক অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না এবং অর্থ না থাকিলে বিষয়ের প্রত্যক্ষই হইল না। আর এক দিক্ দিয়াও প্রত্যক্ষের মধ্যে ইচ্ছার বা কামনার অস্তিত্ব বুঝা যাইতে পারে। যখন আমরা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তখন সেই বিষয়মাত্র জানিতে ইচ্ছা করি ও অপর কিছু জানিতে চাই না; এই অবস্থার অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষই হয় না। লেখাতে মন দিলে ঘড়ি-বাজার শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না।

বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে কামনা বলা কি তাহা হইলে ভুল? শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন, কামনাই প্রথম। কি করিয়া সৃষ্টি হইল বা বহির্জগতের উৎপত্তি হইল বা বহির্বস্তুর প্রত্যক্ষ হইল, সে সম্বন্ধে ঋক্‌বেদে নাসদীয় সূক্তে (১০ম মণ্ডল ১২ সূক্ত) ঋষিগণের অনুভূতির বিবরণ আছে। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহাকৃত নাসদীয় সূক্তের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কামনার হল উদয় অগ্রে যা হ'ল প্রথম মনের বীজ;
মনীষী কবিরা পর্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।

সূক্তে স্পষ্টই বলা হইল, মনীষীরা নিজের নিজের মন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে কামনাই প্রথম। ঐতরেয়োপনিষদে প্রথমেই আছে, এই জগৎ পূর্বে এক আত্মা মাত্র ছিল। নিমেষক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন, আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব? এখানেও কামনাকে প্রথম বলা হইল।

গীতার শ্লোকে যে কামনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরিস্ফুট অবস্থার কামনা। উপনিষদে ও ঋক্‌বেদের শ্লোকে যে কামনার কথা বলা হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট কামনা নহে, অজ্ঞাত কামনা। মনীষীদের নিজ নিজ হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে হইয়াছিল, সোজাসুজি তাহা ধরা পড়ে নাই। বিষয়বোধের মূলে আমিও যে কামনার কথার উল্লেখ করিয়াছি তাহাও অজ্ঞাত কামনা। এই কামনা অজ্ঞাত বলিয়াই বিষয়বোধের পূর্বে গীতায় ইহার উল্লেখ নাই; শ্রীকৃষ্ণ ইহার কথা বলেন নাই।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা বিষয়বোধ থাকিলেও কি অবস্থায় দোষ হয় না, তাহাই বলিতেছেন

৮॥ ৬৪ - ৬৫ ॥ স্ববশীভূত আত্মা যার, এরূপ ব্যক্তি রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়া প্রসাদ প্রাপ্ত হন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সকল দুঃখ দূর হয় ও প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৬৪ - ৬৫ ॥

এখানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিবার উপায় রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ। বিষয়ভোগ ব্যতীত চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, কারণ মানুষের ধাতুগত প্রবৃত্তি বিষয়াভিমুখী। বিষয়বোধ না থাকিলে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ইন্দ্রিয়-সংহরণের কোন অর্থ থাকে না। কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়া বল্লী ২০ শ্লোকে আছে,

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

অর্থাৎ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা এই প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত। অকাম ও বীতশোক ব্যক্তির ধাতু প্রসন্ন হইলে আত্মা ও আত্মার মহিমার দর্শনলাভ হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ ইত্যাদি কারণে ধাতু অপ্রসন্ন হইলে মন চঞ্চল হয় ও বুদ্ধি স্থির হয় না। উপযুক্তভাবে বিষয়ভোগে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি প্রশমিত হইয়া ধাতু প্রসন্ন হয় ও শরীরে ও মনে উদ্বেগ থাকে না। প্রসাদ শব্দের অর্থ প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য (শংকর)। বায়ুপুরাণ ১১।১০ শ্লোকে আছে, ইন্দ্রিয়বিষয় সহ ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং পঞ্চ বায়ু যে অবস্থায় প্রসন্ন হয় তাহাকে প্রসাদ বলে।

চিত্ত প্রসন্ন না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার আশা বৃথা।

॥ ৬৬ ॥ অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই ও ভাবনা নাই, ভাবনার অভাবে শান্তি নাই। অশান্তের সুখ কোথা **॥ ৬৬ ॥**

অযুক্ত অর্থে যে যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যে কর্মের কৌশল জানে না, অর্থাৎ যে রাগদ্বেষবিমুক্ত হয় নাই। ভাবনা অর্থে তৃপ্তি (রাজশেখর বসু) বা কোন বিষয়ে অভিনিবেশ (শংকর)। যাহার ক্ষুধার জ্বালা প্রবল, তাহার পক্ষে চিত্তের প্রসন্নতা ও বুদ্ধি স্থির করা অসম্ভব। এজন্যই ধাতুর প্রসন্নতার কথা বলা হইয়াছে। গীতাকার ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে বলেন না। সংযত ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করিতে বলেন, তাহাতেই চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হয়। ভাবনার অর্থ তৃপ্তি করা হইয়াছে, কারণ ৩।১১-১২ শ্লোকে ভাবয়ত, ভাবিত শব্দও তৃপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (রাজশেখর বসু)। ৩।১১-১২ শ্লোকে ভাবনার অর্থ শংকরও তৃপ্তিই করিয়াছেন।

॥ ৬৭-৭০ ॥ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে মন যে-ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ দৌড়িতে চাহে, তাহা অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিকে জলে ভাসমান বায়ুচালিত নৌকার ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে। সেজন্য, মহাবাহো অর্জুন, যাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম তত্তৎ বিষয় হইতে নিগৃহীত বা সংহৃত হইয়াছে তাহারই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সকল লোকের যাহা রাত্রি অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা অন্ধকার, তাহাতে সংযমী, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন, জাগৃত থাকেন। সংযমীর আত্মদর্শন হয়, কিন্তু আত্মা সাধারণের কাছে অন্ধকারে নিহিত। সাধারণের

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

যাহাতে জাগরণ অর্থাৎ বহির্বিষয়ে সাধারণের যে প্রবৃত্তি, তত্ত্বদ্রষ্টা মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তাহা অন্ধকারময়। তিনি সে দিকে আকৃষ্ট হন না। সমুদ্রে শত শত নদী প্রবেশ করিলেও যেমন সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ থাকে অর্থাৎ উপচাইয়া উঠে না, সেইরূপ সমস্ত কাম অর্থাৎ ভোগবস্তু অর্থাৎ তজ্জনিত প্রত্যয় যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মনকে উদ্বেলিত করে না, সেই শান্তি পায়। যাহার মন কামকামী, অর্থাৎ বিষয়ানুভূতি হইলে তৎপ্রতি কামনাযুক্ত হইয়া ধাবিত হয়, অর্থাৎ বিষয়ভোগ ইচ্ছাজনিত বিক্ষোভ যাহার মনে উপস্থিত হয়, সে শান্তি পায় না। **॥ ৬৭ - ৭০ ॥**

প্রবাদ আছে, সমুদ্র নিজ বেলাভূমি অতিক্রম করেন না। ৬৮ শ্লোকে নিগৃহীত অর্থে সম্যক্ গৃহীত অর্থাৎ সংযমিত বা সংহৃত, অপর পক্ষে নিগ্রহ অর্থে পীড়ন। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩। ৩৩ ॥ ৭০ শ্লোকে প্রথমে কাম ও পরে কামকামী শব্দ আছে। শংকর প্রথম কাম শব্দের অর্থ করেন বিষয় সন্নিধানে সকল প্রকারে তাহার ভোগের জন্য ইচ্ছা ও দ্বিতীয় কাম শব্দের অর্থ করেন কামনার বিষয়ীভূত বস্তু ; সেই কামকে যে কামনা করে, সে কামকামী। শংকরমতে প্রথম কাম শব্দের অর্থ হইল ইচ্ছা ও দ্বিতীয় কাম শব্দের অর্থ হইল বস্তু। আমার মতে উভয় কাম শব্দের একই অর্থ ধরিতে হইবে। এখানে কাম শব্দে ইচ্ছা না বুঝাইয়া কামনার বিষয়ীভূত বস্তু এবং তৎসন্নিধানে সেই বিষয়জনিত প্রত্যয় বা বস্তুবোধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিশেষ অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্যই শেষ পদে কামকামী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

উপমার বিশিষ্টতা আলোচনা করিলেও এই অর্থই সংগত দেখা যাইবে। বহির্বস্তু-প্রত্যয়ই, সমুদ্রে নদীজলের ন্যায়, বাহির হইতে ক্রমাগত মনের ভিতর প্রবেশ করে। ইচ্ছা বাহির হইতে আসে না। তাহা মনে উৎপন্ন হইয়া মনকে উদ্বেলিত করিয়া বহির্মুখ হয় অর্থাৎ বহির্বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। পূর্বের শ্লোকসমূহের অর্থ বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্ত আসিবে।

॥ ৭১ ॥ যে-পুরুষ সমস্ত কামনার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন এবং যাঁহার মমত্ব ও অহংকার নাই, তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হন। ॥ ৭১ ॥

এখানে অহঙ্কার কথার অর্থ বড়াই নহে। আমি করিতেছি এই যে জ্ঞান ইহাই অহংকার। অহংকার সম্বন্ধে পরে আলোচনা আছে। মমত্ব মানে মমতা বা বস্তুপ্রীতি অর্থাৎ এই বস্তু আমার এই ভাব।

॥ ৭২ ॥ পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা পাইলে মনুষ্য মোহগ্রস্ত হয় না, এবং ইহাতে থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণ পায়। ॥ ৭২ ॥

এই অনুবাদ রাজশেখর বসু কৃত। তাঁহার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে, পার্থ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ; এনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ন ; অপি অস্যাং স্থিত্বা অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণং ঋচ্ছতি। সাধারণ প্রচলিত অর্থ, অন্তিম কালেও যদি ইহা লাভ হয়, ত ব্রহ্মনির্বাণ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়।

গীতার ২।৫৫ হইতে ২।৭১ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই,

বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া দেখ, কোন কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার না, কর্মের ফলের উপর তোমার অধিকার নাই অর্থাৎ কর্মফল তোমার আয়ত্তে নাই, অতএব তুমি ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কর্ম কর। রাগদ্বেষবিযুক্ত হইয়া কর্ম করার কৌশলকে যোগ বলে। তুমি যোগযুক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যোগযুক্ত ব্যক্তি বেদোক্ত পাপপুণ্যে বিচলিত হয় না, যোগযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিতাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

কামনা বা কোন বিষয়ে রাগদ্বেষ নাই, বহির্বিষয়ে তাহার মন ধাবিত হয় না। বিষয়সংযোগেও যোগীর বুদ্ধি বিচলিত হয় না, বরং চিত্ত প্রশান্ত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ঘটে। তিনিই শান্তি লাভ করেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। তিলক বলেন, এই অধ্যায়ের আরম্ভে সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের আলোচনা, এই কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সমস্ত অধ্যায়ে ঐ বিষয়ই আছে। যে অধ্যায়ে যে বিষয় উহাতে মুখ্য তদনুসারেই নামকরণ হইয়াছে।

সাংখ্যযোগ নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

॥ ১-২ ॥ অর্জুন বলিলেন, জনার্দন, যদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হইল তবে, কেশব বৃথা কেন আমাকে এই নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োজিত করিতেছ। গোলমেলে কথা বলিয়া তুমি আমার বুদ্ধি নষ্ট করিতেছ, ঠিক কি করিলে আমার মঙ্গল হয় তুমি কেবল তাহাই নিশ্চিত করিয়া বল ॥ ১-২ ॥

কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কিনা অর্জুন এই প্রশ্ন তুলিলেন। দুই বস্তুর তুলনা করিতে হইলে তাহারা একই বর্গের হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানযোগের সহিত কর্মযোগের তুলনা হইতে পারে, কর্মের সহিত অকর্মেরও তুলনা হইতে পারে, যেমন ৩।৮ শ্লোকে করা হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধির সহিত কর্মের তুলনার অর্থ কি? বুদ্ধি ও কর্ম একপ্রকারের বস্তু নয়। বুদ্ধির দ্বারাই আমরা স্থির করি কি কর্ম করিতে হইবে। ফলকামনায় যে কর্ম করা হয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, কেন না, কর্মের ফল কাহারও আয়ত্ত নহে। ফলেই যদি আগ্রহ না রহিল তবে কর্ম করায় লাভ বা আবশ্যক কি? ফলাফল সমান হইলে কর্ম

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

না হয় নাই করিলাম অথচ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম না করিবারও আগ্রহ করিও না ॥ ২।৪৭ ॥ কর্মের ফলাফল যদি সমান হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা যদি সেই সমস্ত লাভ হয়, তবে বুদ্ধি যাহাতে স্থির হয় তাহার চেষ্টা করিলেই হইল, কোন বিশেষ কর্মের দরকার কি ? এই অর্থেই অর্জুন বুদ্ধিকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলেন এবং অর্জুনের প্রশ্নেরও উদ্দেশ্য ইহাই। ৩।৪২ শ্লোকেও এইরূপ অর্থেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ।

শংকরের মতে এই শ্লোকে বুদ্ধির অর্থ জ্ঞান। অতএব তাঁহার মতে প্রশ্ন দাঁড়াইল, কর্ম হইতে যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কর্মমার্গ ভাল না জ্ঞানমার্গ ভাল। শংকরমতে জ্ঞানমার্গই সাংখ্যমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গ। জ্ঞানমার্গে কর্মত্যাগ বিধেয়। শংকরমতে কৃষ্ণ কেবল জ্ঞানেই শ্রেয় এই কথাই গীতায় বলিয়াছেন। যেখানে অর্জুনকে কর্ম করিতে বলিতেছেন সেখানে অর্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠাতে অধিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই। তৃতীয় অধ্যায়ের শংকরভাষ্যের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য। শংকর তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বাচার্যদের জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চয়বাদ খণ্ডনে ব্যস্ত। ৫।১ শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন কর্মযোগ ভাল না কর্মসন্ন্যাস ভাল। শংকরের ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে বলিতে হয়, অর্জুন একই প্রশ্ন দুই বার করিয়াছেন। আমি এই ব্যাখ্যা সংগত মনে করি না। আমার মতে বুদ্ধির অর্থ সোজাসুজি বুদ্ধি রাখিতে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন, নিষ্ঠুর কর্ম কেন পরিত্যাগ করিব না। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন, সর্বপ্রকারের কর্ম কেন পরিত্যাগ করিব না। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নের সহিত পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নের সম্পর্ক কি বুঝিতে হইলে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ পর্যন্ত অর্জুনের প্রশ্নের পারম্পর্য ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের ধারা লক্ষ্য করা আবশ্যক। বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম। দেখা যাইবে যে, অর্জুনের প্রশ্নে পুনরুক্তি দোষ নাই। এই প্রশ্নোত্তর-সংক্রান্ত ৩।৯ শ্লোকের অর্থ সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুরূপ করি নাই। শ্লোকে যে কথা উহ্য আছে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ পর্যন্ত অর্জুনের প্রশ্নের পারম্পর্য ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর,

অর্জুন। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার যুদ্ধ করা উচিত কি না, আমার কিসে শ্রেয় হয় বল ॥ ২।৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যুদ্ধের কথায় শোক ও পাপভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছ ও বড় বড় কথা বলিতেছ, সে সব ছাড়িয়া বুদ্ধির শরণ লও। বেদবাদীদের কথায় মোহিত হইও না। কর্মফল তোমার আয়ত্ত নহে। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গচিত্তে কর্ম কর। ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ হইবে।

অর্জুনের প্রশ্নে ॥২।৫৪॥ কৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। অসঙ্গচিত্তে বিষয়ভোগে ধাতু প্রসন্ন হয় ॥ ২।৬৪ ॥ ও ফলে বুদ্ধি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। অতএব ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।

অর্জুন। যে বুদ্ধিতে কর্ম করা যায় তাহাই যখন প্রধান কথা, তখন নিষ্ঠুর কর্ম কেন করিব ॥ ৩।১॥

এখানে সাধারণ সৎকর্মের কথা বলা হয় নাই। অর্জুনের প্রশ্নের অর্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে সব কর্মই যখন সমান ও যখন এই আদর্শই বড় তখন নিষ্ঠুর কর্ম না হয় নাই করিলাম, বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ভাল কাজই করি ও ক্রূর কাজ পরিত্যাগ করি।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে বুঝ যে একেবারে কর্ম ত্যাগ করিবার উপায় নাই। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই দুই মার্গ আছে সত্য কিন্তু যে মার্গই অবলম্বন কর না কেন, কর্ম করিতেই হইবে। কর্ম বিনা জীবনযাত্রাও চলিবে না। যদি মনে করিয়া থাক যজ্ঞকর্ম নির্দোষ তাহাও ভুল। যজ্ঞেরও বন্ধন আছে। অতএব অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর। ইহাতে পরম লাভ হইবে। আরও দেখ, লোকশিক্ষার জন্যও কর্ম দরকার। প্রকৃতিই মানুষকে কর্ম করায়। তুমি যুদ্ধ করিব না বলিলে কি হইবে, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবেই। বুঝিয়া চলিলে নিষ্ঠুর কর্মেও বন্ধন নাই। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের দিকে তোমার প্রবৃত্তি স্বভাবজ। কেবল মোহবশেই যুদ্ধ করিব না বলিতেছ। যুদ্ধ সমাজ অনুমোদিতও বটে। এই জন্য তাহা তোমার স্বধর্ম। অতএব ক্রূর কর্ম করিব না বলিয়া লাভ নাই। স্বধর্ম বিগুণ বোধ হইলেও পালনীয় কিন্তু নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য ভয়াবহ। সেরূপ কার্যে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে ও শ্রেয় লাভ হয় না।

অর্জুন। তুমি বলিতেছ প্রকৃতি আমাকে যুদ্ধ করাইবেই। কাহার বশে অর্থাৎ প্রকৃতির কোন্ গুণের জোরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে?

কাহার বশে মানুষে পাপ কাজ করে? এখনও অর্জুনের যুদ্ধকে পাপ বলিয়া মনে হইতেছে ॥৩।৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ। কাম অর্থাৎ কামনাই মনুষ্যকে পাপ কর্ম করায়। কাম অতি প্রবল ও তাহা পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। যদি মনে কর যে, তাহা হইলে কামেরই জয়জয়কার হয় না কেন ও পৃথিবী পাপে ভরিয়া যায় না কেন, তাহার উত্তর এই যে পাপ বৃদ্ধি পাইলে ও ধর্মের গ্লানি হইলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তাহার প্রতিকার করেন। অবতারতত্ত্ব জানিলে কর্মবন্ধন হয় না ॥ ৪।১৪ ॥ তুমি যুদ্ধকে ক্রূর কর্ম বলিতেছ কিন্তু কি কর্ম কি অকর্ম আর কি বিকর্ম সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরাও একমত নহেন। কর্মে যে অকর্ম দেখে সেই বুদ্ধিমান ॥ ৪।১৮ ॥ অসঙ্গ হইয়া শরীরই কেবল কর্ম করিতেছে এই জ্ঞানে কর্ম করিবে। বাস্তবিক মনুষ্যেরা যে কাজই করুক না কেন, আমার বশেই তাহা করিয়া থাকে। যজ্ঞের মত ভাল কাজেও বন্ধন আছে। অতএব বিবিধ যজ্ঞাদিও এই ব্রহ্মবুদ্ধিতেই করা উচিত। উপযুক্ত জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের অবসান হয় ॥ ৪।৩৩ ॥ যাহাকে পাপ কাজ মনে করিতেছ তাহাও জ্ঞানে দগ্ধ হয়। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই ॥ ৪।৩৬-৩৮ ॥

অর্জুন। তোমার কথা না হয় মানিলাম, ক্রূর কর্ম হইলেও স্বধর্ম আচরণীয়। আর ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে নিষ্ঠুর কর্ম ও যজ্ঞ কর্মে প্রভেদ নাই কিন্তু তুমি নিজেই বলিয়াছ যে, কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুই প্রকার সাধনাই লৌকিক। অতএব নিষ্ঠুর কর্ম, ভাল কর্ম সবই পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে আপত্তি কি? কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ এই দুইটির ভিতর কোন্‌টি বাস্তবিক ভাল ॥ ৫।১॥

শ্রীকৃষ্ণ। উভয়ের ফল একই কিন্তু কর্মসন্ন্যাস কষ্টকর ইত্যাদি। পঞ্চম অধ্যায়ের বক্তব্য যথাস্থানে আলোচনা করিব।

ক্রূর কর্ম কেন করিব অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

॥ ৩ - ৫ ॥ অনঘ, তোমাকে আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দুই প্রকার উপায় আছে। সাংখ্যেরা বা জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীরা কর্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মলাভ করেন কিন্তু মনে রাখিও যে, জ্ঞানযোগের দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইলেও এবং ইচ্ছা করিয়া কোন কর্ম না করিলেও বাস্তবিক নৈষ্কর্ম্য হয় না এবং সংন্যাস বা কর্মত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাও নহে। জানিবে যে প্রকৃতি নিজগুণে

সমস্ত মনুষ্যকেই কর্ম করিতে বাধ্য করায়। বাস্তবিক পক্ষে নিষ্কর্ম অবস্থায় কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, অতএব কেবল বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধি হইবে, কর্ম করিব না এ কথা বলা বৃথা ॥ ৩ - ৫ ॥

গীতার ৩।৩ শ্লোকে নিষ্ঠা কথা আছে। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সমার্থবাচক। কোন বিশেষ জ্ঞানলাভ বা ফললাভের উদ্দেশ্যে যে মনোবৃত্তি আমাদিগকে কোন এক উপদিষ্ট মার্গে যথোক্ত বিধিপালন করিয়া চলিতে প্রবর্তিত করে তাহার নাম নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা। ১৭।১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নৈষ্কর্ম্য অর্থ কর্মের অভাব বা কর্মত্যাগের ভাব। কর্ম কথাটার অর্থ এখানে খুবই ব্যাপক, যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম। এমন কি চিন্তা করাও কর্ম। আহার, বিহার, নিদ্রা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি সমস্তই কর্ম। আমি ইচ্ছা করি বা না করি আমার শরীরে ও মনে নানা ব্যাপার চলিতে থাকে ; প্রকৃতির বশেই এই সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। আমরা যে নানা প্রকার কামনা বা ইচ্ছা করি তাহাও সমস্তই প্রকৃতির বশে। স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই নাই। পরে বলা হইয়াছে অহংকারে বিমুগ্ধ হইলে আমি কর্তা এইরূপ মনে হয়। এই বিষয় মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে কাজ করা বা না করার কোন অর্থ হয় না। কেন না, আমার বা আত্মার সহিত কাজের কোনই সম্পর্ক নাই। সিদ্ধাবস্থা ভিন্ন এই ভাব অনুভূত হয় না। অতএব সাধারণ মনুষ্য যখন নিজেকে কর্তা মনে করিবেই তখন শ্রীকৃষ্ণের মতে সিদ্ধভাবের অনুকল্প অবস্থা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ রাগদ্বেষ ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করা উচিত। ইহাই কর্মযোগ। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে বিশেষ কোনই পার্থক্য রহিল না। কর্মযোগে যে বুদ্ধি বিকশিত হয় তাহাই জ্ঞানযোগ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়ে

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

১৩ শ্লোকেও এই দুই মার্গের কথা আছে, তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং অর্থাৎ সেই আদি কারণ সাংখ্য এবং যোগদ্বারা প্রাপ্তব্য। পরে গীতায় নানা প্রকার মার্গের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত জানা দরকার, কারণ তাহা না জানিলে অনেক স্থলে গীতার ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। পরিশিষ্টে এই সকল মার্গের আলোচনা করিয়াছি। 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

॥ ৬-৮ ॥ যে কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত রাখে অথচ মনে মনে বিষয়ভোগের অভিলাষ করে সে মূঢ় মিথ্যাচারী। অতএব যখন কর্ম করিতেই হইবে তখন ইন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ সংহরণ করিয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অসঙ্গ হইয়া কর্ম কর। এইরূপ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়ত এই ভাবে কর্ম করিতে থাক। অকর্ম হইতে কর্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না, অকর্মের চেষ্টা করা ও মিথ্যাচার একই কথা। বাস্তবিক একেবারে সমস্ত কর্ম বন্ধ হইলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইবে না। **॥ ৬-৮ ॥**

কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি। যে শক্তির দ্বারা কোন বিশেষ প্রকারের কর্ম করা যায় তাহা সেই কর্মের কর্মেন্দ্রিয়। স্থূল অঙ্গ কর্মেন্দ্রিয় নহে, যথা পদদ্বয় কর্মেন্দ্রিয় নহে কিন্তু যে শক্তির দ্বারা গমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই পাদ নামক কর্মেন্দ্রিয়। কেহ যদি পদদ্বয়ের সাহায্য ব্যতীত গড়াইয়া কোথাও যান তবে সেই গমন কার্যও পাদ নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা মনোভাব ব্যক্ত করি, ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বা না ইঙ্গিত করিলেও তাহা বাগিন্দ্রিয়ের কার্য হইল। পাণি ইন্দ্রিয়ের কার্য গ্রহণ ও দান। আহার কার্যও গ্রহণ কার্য, এ জন্য আহারের ইন্দ্রিয় পাণি। মুখ নামে কোনও পৃথক ইন্দ্রিয় কল্পিত হয় নাই। পাদেন্দ্রিয়ের কার্য গমন, উপস্থেন্দ্রিয়ের কার্য প্রজনন এবং পায়ু নামক ইন্দ্রিয়ের কার্য

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮

বিসর্জন। দেখা যাইবে যে তাবৎ শারীরিক কার্য এই পাঁচ বর্গে ফেলা যায়। এ জন্য কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি মাত্র। পরিশিষ্টে 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নিয়ত কথার অর্থ যাগযজ্ঞাদি কর্ম। অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমি নিয়ত কথার একটু ব্যাপক অর্থ করিতে চাহি। শ্রীকৃষ্ণ যাগযজ্ঞ করিবার উপদেশ দিতেছেন এমন নহে। নিয়ত কথার বাংলা অর্থ সতত। সমস্ত নিত্যকর্মই নিয়ত কর্ম। পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অর্থই সমীচীন বোধ হইবে। এখানে নিয়ত মানে যে সতত তাহার আরও প্রমাণ আছে, ৩।১৯ শ্লোকে সতত কার্য কর বলা হইয়াছে।

যজ্ঞকে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে দেখিয়াছেন তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩ হইতে ৩৩ পর্যন্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই অধ্যায়ে ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যজ্ঞ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ৩।৯-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহাই অনুসরণ করিব।

॥ ৯ ॥ অন্যত্র অর্থাৎ শরীরযাত্রা ব্যতীত অপর দিকেও দেখ যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে এই লোক কর্মবন্ধনযুক্ত হয় অতএব যজ্ঞার্থ কর্মও মুক্তসঙ্গ হইয়া অনুষ্ঠান কর। যজ্ঞকর্ম লোকরক্ষার জন্য অতএব তাহাতে আসক্তি দোষের নয় এরূপ মনে করা ভুল ॥ ৯ ॥

তিলক এই শ্লোকের অর্থ করেন, যজ্ঞের জন্য যে কর্ম কৃত হয়, তাহার অতিরিক্ত অন্য কর্মের দ্বারা এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কৃত কর্মও তুমি আসক্তি বা ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাক। প্রায় অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই ব্যাখ্যার অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার মতে এ ব্যাখ্যা ঠিক নহে। ৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম যখন করিতেই হইবে তখন যে অসঙ্গচিত্তে কর্ম করে সেই শ্রেষ্ঠ। ৮ শ্লোকে বলিলেন, অকর্ম অপেক্ষা কর্ম ভাল। অতএব তুমি সতত কর্ম কর। কারণ, কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই চলিবে না। উদ্দেশ্য শরীরযাত্রা সংক্রান্ত কর্মেও অসঙ্গ থাকা শ্রেয়। ৯ শ্লোকে বলিতেছেন, শরীরযাত্রা ব্যতীত লোকরক্ষার জন্যও তুমি যে যজ্ঞ কর তাহাতেও কর্মবন্ধন আছে এবং সেই সংক্রান্ত পাপপুণ্য আছে। অতএব যজ্ঞও যদি করিতে হয় তবে তাহাও মুক্তসঙ্গ হইয়া করিবে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

এখানে ৮ ও ৯ শ্লোকে কর্মের চরম প্রকারভেদ দেখান হইল। একটিতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ ব্যক্তিগত শারীরিক কর্মের উল্লেখ করা হইল ও অপরটিতে সমষ্টিগত যজ্ঞ উল্লিখিত হইল। যজ্ঞকার্য সমগ্র সৃষ্টির সহিত সম্পর্কিত।

আমি ৯ শ্লোকের যে ভাবার্থ দিলাম তাহাতে ৭ ও ৮ শ্লোকের সহিত সংগতি থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যে বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মের নিন্দা করিয়াছেন তাহার সহিত কোন বিরোধ হয় না। পরের শ্লোকগুলিতেও আমার ব্যাখ্যারই সার্থকতা দেখা যাইবে। তিলকের ও সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যা মানিলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বেদবিহিত যজ্ঞাদিকর্মের নিন্দার সহিত বিরোধ ঘটে এবং পরের শ্লোকগুলির সহিতও সামঞ্জস্য থাকে না। ৯ শ্লোকের আমি এইরূপ অন্বয় করিতে চাই,

অন্যত্র, যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ কৌন্তেয় তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ কর্ম সমাচর।

যজ্ঞার্থ কর্মে যদি বন্ধনই না থাকে তবে তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্ম মুক্তসঙ্গ হইয়া কর এ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। আবার পরবর্তী ১২, ১৩ শ্লোকে যজ্ঞ কর্মের সহিত পাপপুণ্যের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পাপপুণ্যের উর্ধ্বে উঠিতে বলিয়াছেন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। যজ্ঞকর্মের বন্ধন সম্বন্ধেই পরবর্তী শ্লোকের আলোচনা। পরবর্তী শ্লোকগুলির অর্থ বুঝিতে হইলে যজ্ঞ কি তাহা জানা দরকার।

পুরাকালে বৈদিকযুগে ও মহাভারতের সময়েও সাধারণের মধ্যে ধারণা ছিল যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি মনুষ্যের কার্যাকার্যের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনারই পৃথক পৃথক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিল। জলের দেবতা বরুণ বা ইন্দ্র। ঝড়ের দেবতা পবন ইত্যাদি। এখন পর্যন্তও এইরূপ ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত আছে যথা, বসন্তরোগের দেবতা শীতলা, কলেরার ওলাবিবি, সাপের মনসা, শিশুমঙ্গলের ষষ্ঠী ইত্যাদি। এই সকল দেবতা মনুষ্যের কার্যাকার্য বিচার করিয়া তাঁহাদের ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করেন। ইন্দ্রদেব পূজা না পাইলে রুষ্ট হইয়া বৃষ্টি বন্ধ করেন, সে জন্য এখনও ইন্দ্র পূজার দ্বারা অনাবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। শীতলা পূজায় আমরা অনেকে আশা করি বসন্তের প্রকোপ নিবারিত হইবে। মা ষষ্ঠীকে খুশী না রাখিলে শিশুসন্তানের অমঙ্গল হইবে। ভগবানের সৃষ্টি অর্থাৎ লোক নির্বিঘ্নে চলিতে হইলে মনুষ্যেরও সাহায্য আবশ্যক। এইরূপ অনুষ্ঠানই পুরাকালে যজ্ঞ

নামে অভিহিত হইত। যজ্ঞের দুই উদ্দেশ্য। প্রথম, কোনও বিশেষ দেবতাকে খুশী রাখিয়া সৃষ্টিচক্র প্রবর্তিত রাখা ও দ্বিতীয় নিজ অভীষ্টফল লাভ। যজ্ঞে যে কেবল যজমানেরই স্বর্গলাভ হয় তাহা নহে পরন্তু যজ্ঞধূমে মেঘ উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মিয়া থাকে। এইরূপ ধারণা হইতেই বলা হইত যে যজ্ঞ কর্তব্য। মানুষ নিজেকে সৃষ্টিচক্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। সৃষ্টিচক্রের অপরাপর অংশের কার্যের শৃঙ্খলা মানুষের কাজের উপর নির্ভর করে কেন না মানুষের স্বার্থ ও এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে ব্যাপাশ্রিত। এই সৃষ্টিচক্র প্রবর্তিত রাখিয়া মানুষ নিজের যদি কিছু সুবিধা করিতে পারে তবে সে তাহা নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে। অন্যথা সৃষ্টিচক্র প্রবর্তনে সাহায্য না করিয়া কেহ যদি কেবল নিজেই ফলভোগ করে তবে সে অন্যান্য অংশের প্রাপ্য জিনিষ নিজেই লইল এবং এই জন্যই সে চোর। আমরা এখন মিউনিসিপ্যালিটিকে যে ভাবে দেখি তখন সমগ্র সৃষ্টিকে ও ত্রিলোককে সেই ভাবে দেখা হইত। আমি যদি আমার বাড়ি দুর্গন্ধময় ও অপরিষ্কার রাখি তবে তাহা আমার প্রতিবেশীদের পক্ষে অনিষ্টকর এজন্য আমার তাহা কর্তব্য নহে, আমি যদি দেয় কর না দিয়া কলের জল ব্যবহার করি বা স্ফূর্তি করিয়া ইডেন গার্ডেনে বেড়াই তবে আমি চোর, কেন না, যে টাকার জোরে এই সব চলিতেছে তাহাতে আমার ন্যায্য দেনা না দিয়াই সুখভোগ করিতেছি। কর দিলে আমি মিউনিসিপ্যালিটির রক্ষারও সাহায্য করিলাম এবং নিজের সুখভোগেরও বন্দোবস্ত করিলাম। এইরূপ সুখভোগ তখন আমার ন্যায্য পাওনা।

যে যে কারণে মনুষ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় বা পুরাকালে হইত গীতাকার তাহারই আলোচনায় যজ্ঞের কথা আনিয়াছেন, তিনি নিজে যজ্ঞের উপকারিতা মানিতেন কি না এখানে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না। আমি পূর্বে বলিয়াছি, গীতার উপদেশ সকল মার্গের ব্যক্তির প্রতিই প্রযোজ্য, এজন্য গীতাকার নিজে এ সকল কথা না মানিয়াও লিখিতে পারেন। তিনি যে যজ্ঞের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন তাহা পূর্ব অধ্যায়েই দেখা গিয়াছে। এই অধ্যায়েও ১৭ শ্লোকে বলিতেছেন যে আত্মরত ব্যক্তির কোন কার্যই নাই। ১৮।৫ শ্লোকে যজ্ঞসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজ মত ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন, যজ্ঞ, দান, তপ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই ; তাহাতে মনীষীরা পবিত্র হন। এই সকল ক্রিয়ায় ইহার অধিক উপকার শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই।

এইবার ১০ হইতে ১৬ শ্লোকের ভাবার্থ দেখা যাক,

॥ ১০-১৬ ॥ প্রজাপতি পূর্বে যজ্ঞসহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমাদের বৃদ্ধি হউক এবং এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টফলদাতা হউক। তোমরা দেবতাদের সন্তুষ্ট করিলে তাঁহারা তোমাদের ঈপ্সিত ফল দিবেন, ইহাতে উভয়েরই শ্রেয় লাভ হইবে। দেবতাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহাদের না দিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ফল যে ভোগ করে সে চোর। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণে সকল পাপ মোচন হয় কিন্তু কেবল নিজ সন্তোষের জন্য প্রস্তুত ভোগ্য দ্রব্য সেবনে পাপ হয়। অন্ন হইতে জীবসকল জন্মে, অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টি মেঘ হইতে হয়। এই মেঘ যজ্ঞধূমে জন্মে এবং যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভব। কর্মের উদ্ভব বেদ হইতে এবং বেদ অক্ষর পুরুষ হইতে উৎপন্ন, অতএব যজ্ঞেও সর্বগত ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ যজ্ঞ করিলেই যে দোষ হয় তাহা নহে, যজ্ঞেও ব্রহ্মলাভ হয় যদি অসঙ্গ চিত্তে তাহা আচরিত হয়। এই প্রকার চক্রের নিয়মে না চলিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয়সুখের বশে চলিলে পাপ হয় **॥ ১০-১৬ ॥**

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যাহারা কেবল নিজ পরিতৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে তাহারা পাপ ভোজন করে। ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১১৭ সূক্তে ভিক্ষু ঋষি ধনদান প্রশংসা সম্বন্ধে বলিতেছেন, যিনি অন্নদান করেন তাঁহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়। যিনি অপ্রচেতা অর্থাৎ যাঁহার মন উদার নহে তাঁহার ভোজন মিথ্যা এবং মৃত্যুস্বরূপ। যিনি দেবতাকে দেন না, বন্ধুকে দেন না কেবল নিজে ভোজন করেন তাঁহার কেবল পাপই ভোজন হয়। কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।

শ্রীকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য এই, যদি তুমি যজ্ঞের উপকারিতা মান তাহা হইলে নিষ্কর্ম থাকা চলে না এবং যজ্ঞ না করিয়া কেবল নিজের সুখের জন্য কর্ম করিলে তস্করের ন্যায় আচরণ হয়। যজ্ঞ যদি করিতেই হয় তবে নিঃসঙ্গ চিত্তে কর, যজ্ঞের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ও পাপপুণ্যের উপরে উঠিবে। বাস্তবিক যাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই। পরের শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে।

গীতার ৩।১৫ শ্লোকে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শব্দব্রহ্ম বা বেদ। যে হিসাবে যজ্ঞে অক্ষর ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলা হইল সেই হিসাবে প্রত্যেক কর্মেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলা যায় অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্ঞের কোন বিশেষ সার্থকতা মানিলেন না।

॥ ১৭-২৪ ॥ কিন্তু যে মানবের বিষয়ে রতি না হইয়া আত্মাতেই রতি বা প্রীতি হয়, যাহার আকাঙ্ক্ষা বহির্বিষয়ে তৃপ্ত না হইয়া আত্মরতিতেই তৃপ্ত হয় এবং যে এইরূপে তৃপ্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত হওয়ায় অপর কোনও বিষয়ের কামনা করে না, তাহার কোনই কর্তব্য নাই। তাহার কোনও কর্তব্য কর্ম হইল বা না

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

হইল ইহাতে কিছুই যায় আসে না এবং সর্বভূতের কাহারও সহিত তাহার কোন প্রয়োজন বা অবলম্বন বা সম্পর্ক থাকে না। অতএব তুমি যাহাতে এই অবস্থা পাইতে পার তাহার জন্য অসঙ্গচিত্তে নিয়ত বা সতত কর্তব্য কর্ম কর। শরীরযাত্রার জন্য কর্ম ও কর্তব্য কর্ম অসঙ্গচিত্তে করিলে পরম বা ব্রহ্মলাভ হয়। কর্ম করিব না একথা বলিতে হয় না। কর্ম করিয়াই জনকাদি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। লোকসংগ্রহ বা সাধারণের উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য ও তাহাদের শিক্ষার জন্যও কর্ম করা উচিত, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা করে সাধারণে না বুঝিয়াও সেইরূপ আচরণ করে। তিনি যাহা প্রমাণ (standard-রাজশেখর বসু) স্থাপন করেন লোকে তাহার অনুবর্তন করে। পার্থ, আমার নিজের ত্রিলোকে কোন কর্তব্যই নাই কোন অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই তথাপিও আমি কাজ করিতেছি, কারণ, পার্থ, আমি যদি আলস্যবশে কর্ম না করি তবে লোকে আমারই পথে চলিবে ও উৎসন্ন যাইবে; ফলে আমার দোষে বর্ণসংকর উৎপন্ন হইবে ও প্রজার সর্বনাশ ঘটিবে। ॥ ১৭ - ২৪ ॥

৯ শ্লোকে বলিলেন যজ্ঞ করিয়াও অসঙ্গচিত্ত থাকিলে বন্ধন হয় না। এখন বলিতেছেন যে স্থিতপ্রজ্ঞের যজ্ঞ করিবার বা অন্য কোনও কর্তব্য কর্মের আবশ্যক নাই। শ্লোকে কার্য মানে কর্ম নহে। কার্য কর্তব্যকর্ম এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কার্য অর্থাৎ করণীয়। স্থিতপ্রজ্ঞের কোনও কর্ম নাই একথা হইতে পারে না। কেন না, কর্ম বিনা শরীরযাত্রাও চলে না।

সর্বভূতের সহিত সম্পর্ক থাকে না বলার উদ্দেশ্য যে এইরূপ ব্যক্তি যজ্ঞ-

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্তা স্যাম্ উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

চক্রের বাহিরে। তাঁহার পক্ষে যজ্ঞের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব-ভূতের সহিত বা সমগ্র লোকের সহিত যে আদান-প্রদান আছে, যজ্ঞ তাহারই নিদর্শন। অর্জুনকে কৃষ্ণ কর্তব্য কার্যে উৎসাহিত করিতেছেন। কারণ এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম কেন করিব প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর পরে আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন স্থিতপ্রজ্ঞের কোন কর্তব্যই নাই তখন অর্জুনের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে তুমি যুদ্ধকে কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছ কেন ও নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়াছ কেন? শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন প্রধান ব্যক্তি, প্রধানেরা নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হইলে প্রজা ধ্বংস হয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে ভগবান মনে করিয়া কথা বলিতেছেন এমন ভাবিবার কোন কারণ নাই। তিনি প্রধান এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, প্রজারা তাঁহারই আদর্শে চলিবে ইহাই বলা উদ্দেশ্য। সমগ্র গীতাতে সামাজিক আদর্শকে যে কত বড় করিয়া ধরা হইয়াছে তাহা এই সকল শ্লোকে বোঝা যায়।

॥ ২৫ -২৬ ॥ ভারত, অবিদ্বানগণ যেমন আসক্তিবশে কর্ম করে বিদ্বান সেইরূপ লোকসংগ্রহার্থে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবেন। বিদ্বানগণ যেরূপ আচরণ করেন সাধারণেও তাহাই করে, অতএব বিদ্বানগণের এমন কোন কাজ করা উচিত নহে যাহাতে লোকশিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। যাহাদের কর্মে আসক্তি আছে তাহাদিগকে পাপপুণ্য সমান, স্থিতপ্রজ্ঞের কোন কর্তব্য নাই, ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই, কারণ আসক্তিবশে তাহারা মন্দ কার্য করিবে ও তাহাতে সামাজিক অনিষ্ট সম্ভাবনা। বিদ্বান লোকসংগ্রহের জন্য নিজে বুদ্ধিযোগযুক্ত হইয়া অনাসক্তভাবে কর্ম করিবেন ও পরকে করাইবেন **॥ ২৫ - ২৬ ॥**

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, কি করা উচিত, লাভালাভ যখন সমান বলিতেছে তখন যুদ্ধে কেন প্রবৃত্ত করিতেছ। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিয়াছেন এবার তাহার বিচার করিব।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

কেন কর্ম করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই সকল কারণ দেখাইলেন,

(১) ইচ্ছা করিয়া কর্ম না করিলেই যে কর্ম বন্ধ হয় তাহা নহে।

(২) কর্ম না করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে।

(৩) ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতি তাহাকে কর্ম করাইবেই।

(৪) জোর করিয়া কর্ম বন্ধ করিলেও মন বিষয়চিন্তা করিবে। এ অবস্থায় কর্ম বন্ধ করা মিথ্যাচার মাত্র।

(৫) যখন কর্ম করিতেই হইল ও যখন কর্ম না করিলে বাঁচিয়া থাকাও সম্ভবপর নহে, অথচ কর্মই যখন বন্ধনের কারণ, তখন ইহার একমাত্র উপায় অসঙ্গচিত্তে কর্ম করা।

(৬) যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্রূর কর্ম করিব না, কেবল সৃষ্টিচক্র প্রবর্তিত রাখিবার জন্য যজ্ঞ করিব ও তদুৎপন্ন ফলমাত্র ভোগ করিব এইরূপ মনে করাও ভুল। যজ্ঞ, কর্মসম্ভূত এবং বন্ধনের কারণ। যজ্ঞসংক্রান্ত পাপপুণ্য আছে।

(৭) তোমাকে যদি যজ্ঞ করিতেই হয় তবে অসঙ্গচিত্তে তাহা কর। আর আমি যাহা বলিতেছি যদি সেই অবস্থায় পৌঁছিতে পার তবে যজ্ঞ প্রভৃতি কোনও কার্যেরই আবশ্যক থাকিবে না।

(৮) অতএব মুক্তসঙ্গ হইয়া সমস্ত কার্য কর। এইরূপে কার্য করিয়াই জনকাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

(৯) অসঙ্গচিত্ত হইলে কোনও কার্যে বা অকার্যে যখন দোষ থাকে না তখন কার্য না হয় নাই করিলাম এবং ইচ্ছামত যদি কুকার্যই করি, তাহাতেই বা কি, এরূপ মনে করা ভুল। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন সাধারণে তাঁহারই দৃষ্টান্তে চলে। অতএব এমন কোন আচরণ উচিত নহে যাহাতে লোক উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে বা যাহাতে সমাজবন্ধন শিথিল হয়। সাধারণের কাছে এমন কোন কথা বলিবে না বা এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে তাহাদের ধর্মবুদ্ধি বা সামাজিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।

(১০) ইহাও জানিবে যে বাস্তবিক তুমি কর্ম করিতেছ না, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে। তোমার আত্মা নির্লিপ্তই আছে।

(১১) প্রকৃতি যখন তোমাকে তোমার স্বভাবানুযায়ী কর্ম করাইবেই তখন নিজের সামাজিক আদর্শ অনুসারে অর্থাৎ স্বধর্মে থাকিয়া কার্যই শ্রেয়। তোমার যুদ্ধই কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগুলিতে একটু গোল বাধিল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ও সকল অবস্থাতেই সামাজিক আদর্শ মানিয়া কার্য করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া অর্থাৎ যে অবস্থায় কোনও কামনা নাই। মানুষ নিজে নিজেতেই তৃপ্ত হয়। এই অবস্থায় পৌঁছিলে সমাজ বজায় থাকুক এমন ইচ্ছাই বা হইবে কেন ও এইরূপ ইচ্ছার মূল্যই বা কি? স্থিতপ্রজ্ঞের কেনই বা লোকসংগ্রহের অর্থাৎ লোক-শিক্ষার আগ্রহ থাকিবে। এইরূপ আগ্রহ থাকা মানেই যে সমাজরক্ষাকর্মে স্থিতপ্রজ্ঞের সঙ্গদোষ যায় নাই। সমাজরক্ষা করিতে গিয়া স্থিতপ্রজ্ঞত্ব রহিল না। আর যদি সমাজরক্ষায় স্থিতপ্রজ্ঞ অনাসক্ত হন তবে সমাজ থাকিলেই বা কি, যাইলেই বা কি? প্রকৃতির বশে স্থিতপ্রজ্ঞের যাহা খুসী ব্যবহার হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্থিতপ্রজ্ঞ। বলিলেন আমার কোন কর্তব্যই নাই, অথচ সমাজরক্ষাকেই বা কর্তব্য মনে করিতেছেন কেন?

আরও গোল আছে। ৩।১৭ শ্লোকে বলা হইল আত্মরত, আত্মতৃপ্ত মানবের কোন কর্মই নাই। আশা করা যায় যে, কোনও উপনিষদের সহিত গীতার বিরোধ থাকিবে না। মুণ্ডকোপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড, ৪ শ্লোকে আছে,

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

অর্থাৎ, যিনি সমুদায় ভূতের আত্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান অতিবাদী হন না অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হন অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন এবং ক্রিয়াবান অর্থাৎ সৎকার্যশালী হন, ইনিই ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মুণ্ডকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিৎ ক্রিয়াবান হন। তাঁহার কার্য নাই অথচ তিনি ক্রিয়াবান এ কিরূপে সম্ভবপর হয়? শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের ক্রিয়াবান হওয়ার যে কারণ দেখাইয়াছেন আমি তাহার অযৌক্তিকতা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। এই বিরোধের সমাধান কি? আমার মতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই এবং গীতার শ্লোক ও মুণ্ডকের শ্লোকেও বাস্তবিক কোন অসামঞ্জস্য নাই।

শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, প্রকৃতি আমাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়। আত্মা বাস্তবিকপক্ষে কর্মে নির্লিপ্ত থাকে। মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত প্রভৃতি কিছুই 'আমি' নহি। মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহম্। মায়াবশেই আমরা মনে করি যে আমিই কর্ম করিতেছি। আমরা যে প্রকৃতির বশেই চলি এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে কিছুই নাই তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না। আমি ইচ্ছা করিলেই হাত তুলিতে পারি বা না পারি অতএব আমার ইচ্ছা স্বাধীন কিন্তু শাস্ত্রকারের মতে আমার মনে হাত তুলিব কি না তুলিব এই যে দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে হাত তুলিব ইহাই যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহার সমস্তটাই প্রকৃতির বশে হইয়াছে। উদাহরণের দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। ঘড়ির যদি চৈতন্য থাকিত এবং সে যদি মনে করিত আমি ইচ্ছামত আমার ছোট কাঁটাটাকে আস্তে চালাইতেছি এবং বড়টাকে জোরে চালাইতেছি, পাঁচটার দাগে ছোট কাঁটাকে রাখিয়া বড় কাঁটাকে বারটার কাছে লইয়া গিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি বাজিব কি না, পরে ইচ্ছামত পাঁচটা বাজিলাম, ইচ্ছা করিলে নাও বাজিতে পরিতাম বা ছোট কাঁটাকে চারিটার দাগে আনিয়া পাঁচটা না বাজিয়া চারিটা বাজিতে পারিতাম, তবে ঘড়ির অবস্থা অনেকটা আমাদের মত হইত। আমাদের ইচ্ছার নানারূপ বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই মনে করি ইচ্ছা স্বাধীন। সাধারণ মনুষ্যই হউন আর স্থিতপ্রজ্ঞই হউন, আমার এইটা কর্তব্য ও এইটা কর্তব্য নহে মনে করাটাই ভুল। তবে সাধারণ হিসাবে বলিতে গেলে ঘড়ি যেমন বলিতে পারে চারিটার দাগে আসিলে চারিটা বাজা উচিত, পাঁচটা বাজা উচিত নহে, সেইরূপ আমরা বলি ইহা কর্তব্য, ইহা কর্তব্য নহে। কেহ যদি স্থির চোখে ধীরমনে ঘড়ি দেখে সে যেমন বলিতে পারে ঘড়িতে এইবার পাঁচটা বাজিবে, এইবার বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে ছাড়াইয়া যাইবে, সেইরূপ আমরাও স্থিরচিত্তে মনুষ্যচরিত্র আলোচনা করিলে কতকটা বলিতে পারি প্রকৃতি কোন দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। অবশ্য আমাদের জ্ঞান এমন পূর্ণ হয় নাই যে বলিতে পারি কোন্ মনুষ্য কোন্ অবস্থায় কি কার্য করিবে কিন্তু সাধারণ হিসাবে মোটামুটি কোন কোন স্থলে পূর্ব হইতেই বলা যায় যে, আমরা কিরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ব্যবহার করিব।

ব্যক্তিগত প্রকৃতির লীলা না বুঝিলেও এবং সে সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী না করিতে পারিলেও সাধারণভাবে প্রকৃতি আমাদিগকে কোন্ দিকে লইয়া

যাইতেছে বুঝিতে পারি। পাঠক মনে রাখিবেন স্বাধীন ব্যবহার না থাকিলে তবে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর। স্রোত দেখিলে যেমন বলা যায় যে অধিকাংশ কুটাই স্রোতের বশে ও স্রোতের দিকেই ভাসিয়া যাইবে সেইরূপ প্রকৃতির বশে মানুষের সামাজিক আদর্শে যে অধিকাংশ ব্যক্তিই চলিবে এ কথা বলা যায়! আদর্শ মানেই যে দিকে ঝোঁক বেশী অর্থাৎ যে দিকে প্রকৃতির স্রোতের মূলধারা প্রবাহিত হইতেছে। সব কুটাই যে স্রোতের বশে চলিবে এমন নহে। কুটা ভারি হইলে জলে ডুবিয়া যাইবে। স্রোতে চলা যেরূপ প্রকৃতির কার্য জলে ডোবাও সেইরূপ। অধিকাংশ কুটা হাল্কা বলিয়াই স্রোতের বশে যায়। ভারি কুটার স্রোতের বশে যাওয়ার ঝোঁক ছাড়াও নীচে ডোবার ঝোঁক আছে। মনুষ্যব্যবহার বিচার করিয়াই আমরা বুঝিতে পারি প্রকৃতির কর্ম করাইবার মূল ঝোঁক কোন্ দিকে। প্রাণিবিৎ যে সকল প্রবৃত্তিকে সহজ সংস্কার বলেন তাহা প্রকৃতির স্রোতের এক একটি ধারা। সহজ সংস্কারবশে যে কাজ হয়, ব্যক্তিগত হিসাবে তাহা স্বাধীন ইচ্ছার বশে হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। প্রাণীদের নানাপ্রকার সহজ সংস্কার আছে; ইহাদের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে যে যে প্রবৃত্তির বা ঝোঁকের উৎপত্তি হয় তাহাই ব্যক্তিগত হিসাবে সামাজিক আদর্শ বলা যাইতে পারে। প্রাণিবিৎ বলিতে পারেন বহুসংখ্যক নরনারী একত্রে মিলিত হইলেই তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রেমে পড়িবে ও সংসার পাতিবে, কতক সংখ্যক মারামারি করিবে ইত্যাদি। প্রাণিবিৎ জানেন প্রকৃতির মূল ধারাগুলি কোন্ দিকে চলিতেছে। এই সকল বিভিন্ন স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে সামাজিক ও যৌথপ্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি ও তাহারই বশে সামাজিক আদর্শ কল্পনা। যে মানুষ প্রেমে পড়ে ও সংসার পাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে না যে সে অন্ধ প্রকৃতিগত সংস্কারের বশে চলিয়া এমন কাজ করিয়াছে। সে প্রেমাস্পদের নানাগুণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে, কর্তব্য হিসাবে সে বিবাহ করিয়াছে, ভাল লাগে বলিয়া ছেলে মেয়েকে আদর করিতেছে, ইত্যাদি। যে দিন আমরা প্রকৃতির সবটা বুঝিব সে দিন প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিব। সবটা জানি না বলিয়াই বলিতে পারি না সামাজিক মূল ধারার বিরুদ্ধে কেনই বা কোন কোন ব্যক্তি যায়, কেনই বা দুই চারিটা কুটা ভারি ও জলে ডোবে, কেনই বা বিভিন্ন মনুষ্যের ব্যবহার বিভিন্ন। সামাজিক আদর্শের বশে বা কর্তব্যবোধে ভাল কাজ করি ও পাপ ইচ্ছাবশে খারাপ কাজ

করি বলাও যা ঐ সকল কাজ প্রকৃতির বশে করিতেছি বলাও তা। বাস্তবিক কাহারও কোন দায়িত্বই নাই, যে পাপ করে তাহারও নয়, যে শাস্তি দেয় তাহারও নয়। প্রকৃতির কোন্ গুণের বশে একটা কুটা স্রোতের মুখে চলে অর্থাৎ সামাজিক আদর্শ মানে আর কোন্টা ডোবে অর্থাৎ আদর্শ মানে না তাহার বিচার সম্ভবপর। এরূপ কৌতূহল হওয়াতেই অর্জুন ইহার পরেই ৩।৩৬ শ্লোকে প্রশ্ন করিলেন কিসের বশে মানুষ পাপ করে।

যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহার নিজের কোন কামনা নাই, অর্থাৎ কোন বিশেষ দিকে ঝোঁক নাই। নদীতে একটি ষ্টীমার ও একটি কর্ণধারহীন নৌকা ভাসিতেছে। বাস্পের জোরে ষ্টীমারের নিজের মতে চলিবার একটা ঝোঁক আছে; সব সময় সে স্রোতের বশে চলে না কিন্তু কর্ণধারহীন নৌকা স্রোতের বশেই চলে, ইহাতে তাহার কোনই আয়াস নাই; স্রোতকে সামাজিক আদর্শ ধরিলে এইরূপ কর্ণধারহীন অর্থাৎ কামনাবিহীন মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা সামাজিক আদর্শানুযায়ী চলিবে। সেই সকলের অপেক্ষা ক্রিয়াবান হইবে। ষ্টীমারও বাস্পের ঝোঁকে স্রোতের বশে চলিতে পারে, কামনাযুক্ত মনুষ্যও ক্রিয়াবান হইতে পারে কিন্তু এই দুই ক্রিয়াবানের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন অসঙ্গচিত্তে কাজ করেন ও অপর জন আগ্রহের সহিত সেই কাজ করেন। উভয়কে যদি উঠাইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও উল্টা আদর্শের সমাজের মধ্যে ফেলা যায়, এইরূপ দুই অহিংসধর্মী বৈষ্ণবকে যদি শাক্তসমাজে ফেলা যায়, তবে স্থিতপ্রজ্ঞ বৈষ্ণব সহজেই শাক্ত আদর্শমতে চলিতে পারিবেন কিন্তু অপর বৈষ্ণবের দারুণ অশান্তি হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রতিযোজন ক্ষমতা বা সর্বাবস্থায় নিজেকে মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা বেশী; কোন অবস্থায় তাহার কষ্ট নাই; মরিলেও নয়। সামাজিক মূল স্রোতের বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহা প্রকৃতির বশেই হইতেছে বুঝিতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়; এরূপ ব্যক্তি মনে করেন প্রকৃতিই তাঁহাকে পাপ করাইতেছে, তিনি বাস্তবিক নির্লিপ্ত; এরূপ অবস্থায় বাস্তবিক কোন পাপ নাই; সামাজিক হিসাবে দুই প্রকার ব্রহ্মবিৎ হইলেন, একজন ভাল ও একজন মন্দ। এই জন্যই মুণ্ডকের শ্লোকে ক্রিয়াবান ব্রহ্মবিদ্‌কে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অসঙ্গচিত্ত হওয়ার কথা ও সামাজিক কর্তব্যপালনের কথায় কোনই বিরোধ নাই। উপরে যাহা বলিলাম পরের শ্লোকে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

॥ **২৭ - ২৯** ॥ প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হয় কিন্তু অহংকার-বিমুগ্ধ আত্মা আমিই কর্তা মনে করে। অপর পক্ষে যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি প্রকৃতির গুণ ও কর্ম হইতে নিজেকে পৃথক জানিয়া ও ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় জানিয়া সঙ্গত্যাগ করেন অর্থাৎ বিষয় বা কর্মে লিপ্ত হন না ; যাহার বিষয়ে ও কর্মে আসক্তি যায় নাই অর্থাৎ যে প্রকৃতিগুণে বিমুগ্ধ এরূপ লোকের বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিকে বলা উচিত নহে যে, পাপপুণ্য কর্তব্য ইত্যাদি কিছুই নাই ॥ **২৭ - ২৯** ॥

প্রকৃতির গুণসমূহ হইতে জগতের তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় ও সকল কর্ম প্রবর্তিত হয়। যিনি আত্মা তিনি গুণ বা কর্ম কাহারও সহিত লিপ্ত নহেন। অহংকার, মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন বলিয়াই প্রকৃতিগুণজাত বস্তুর সন্নিপানে ক্রিয়াশীল হয়। ইহাই ২৮ শ্লোকের গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে বাক্যের অর্থ। শ্বেতাশ্বতরের ৬ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে আছে, পুরাকল্পে প্রকাশিত, বেদান্ত-প্রতিপাদিত এই গুহ্য বিদ্যা অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না এবং অযোগ্য পুত্রকে বা অযোগ্য শিষ্যকেও দিবে না।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।

॥ ৩০ ॥ অধ্যাত্ম বুদ্ধিতে অর্থাৎ প্রকৃতির স্বভাব বুঝিয়া আমাতে সকল কর্ম ন্যস্ত করিয়া ফলাশা ও মমতা পরিত্যাগ করিয়া অশোকচিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ **৩০** ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অধ্যাত্ম মানে প্রকৃতিজাত স্বভাব, ৮।৩ শ্লোকে অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। স্বভাব কাজ করে আত্মা নহে এই জ্ঞান অধ্যাত্মচিন্ততা।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমে বলিলেন, আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে সমুদায় কর্ম সমর্পণ কর, পরে বলিলেন, ফলাশা ত্যাগ কর ও তৎপরে বলিলেন, নিঃসঙ্গচিত্ত হও। ১২।৮-১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে, আমাতেই অর্থাৎ আত্মাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, সহজে না পারিলে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা কর তাহাতে সফল না হইলে আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ কর, তাহাও না পারিলে কর্মের ফলাশা ত্যাগ কর। প্রথম শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কেন যুদ্ধ করিব। শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণে তাহার উত্তর দিলেন, প্রকৃতিবশে তুমি যুদ্ধ করিবে ও সামাজিক আদর্শরক্ষার অর্থাৎ লোক-সংগ্রহের জন্য তুমি যুদ্ধ করিবে. যুদ্ধ যখন করিতেই হইবে তখন অনাসক্ত হইয়াই করিবে।

॥ **৩১ - ৩৫** ॥ যাহারা শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াহীন হইয়া অর্থাৎ আমার উপদেশের মিথ্যা দোষ দেখিতে না যাইয়া, যথোক্ত বিধানে তাহা সতত পালন করে তাহাদের কর্মবন্ধন হয় না কিন্তু যাহারা বৃথা ছিদ্রান্বেষণ করত আমার উপদেশ পালন করে না তাহাদের সমস্ত জ্ঞান মোহযুক্ত হয় ও তাহারা নষ্ট হয় জানিবে। সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রকৃতির বশে চলিয়া থাকে, এমন কি জ্ঞানবান ব্যক্তিও প্রকৃতির বশীভূত, অতএব নিগ্রহ বা বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে কি ফল লাভ হইবে। প্রকৃতির বশে প্রতি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে রাগদ্বেষ হইবেই, এই রাগদ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নহে কারণ ইহারা আমার উপদিষ্ট মার্গের বিরোধী ভাব। প্রকৃতির বশে যখন মনুষ্য কার্য করিবেই এবং যখন বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের রাগদ্বেষ হইবেই তখন নিজের সমাজনির্দিষ্ট কাজ করাই

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

কর্তব্য; পরের কর্ম নিজের নির্দিষ্ট কাজ অপেক্ষা ভাল ও সহজসাধ্য মনে হইলেও এবং তাহা সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও এবং স্বধর্মানুযায়ী কাজ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অথবা দোষযুক্ত মনে হইলেও স্বধর্মের অনুষ্ঠানই উচিত, স্বধর্মে মরণও শ্রেয় পরাধর্ম ভয়াবহ ॥ **৩১ - ৩৫** ॥

এই শ্লোকের স্বধর্ম ও পরধর্ম কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। পূর্ব অধ্যায়ে ধর্ম কথার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি এখানেও সেই অর্থই ধরিব। স্বধর্ম মানে সামাজিক ধর্ম বা আচারব্যবহার। মনুসংহিতায় আছে রাজদণ্ডভয় না থাকিলে লোকে স্বধর্ম ত্যাগ করিত। মনু। ৭।১৫। অতএব সমাজধর্ম স্বধর্মের মধ্যে। পরধর্ম মানে অন্য সমাজের আচারব্যবহার। মনুষ্যের সকল ইচ্ছাই যখন প্রকৃতির অধীন, তখন এ কাজ করা উচিত ও কাজ করা উচিত নহে, এ সকল কথার বাস্তবিক কোন মূল্যই নাই। আমি নিজ ধর্মে থাকিব বা পরধর্মে যাইব বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই তাহা নির্ধারণ করে, আমার নিজের তাহাতে কোন হাত নাই। ব্যক্তিগত মনের হিসাবে দেখিলেই উচিত অনুচিত পাপ পুণ্য ইত্যাদির কথা আসে। অতএব মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা মানিয়া লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই কথার বিচার করিব। প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিজ সমাজ রক্ষার একটা আগ্রহ আছে; যাহার যে সামাজিক কাজ নির্দিষ্ট আছে সে সেই কাজ না করিলে সমাজবন্ধন নষ্ট হইবে। মেথর যদি বলে আমি পায়খানা পরিষ্কার করিব না, চাকরে যদি বলে আমি জল তুলিব না, তবে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। প্রত্যেক সমাজেরই নানাবিধ নির্দিষ্ট কর্ম আছে ও আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক কর্মের জাতিগত বিভাগ পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। জাতি বংশানুক্রমিক অর্থাৎ জন্মগত; কাজেই কর্মের বিভাগ জন্মগত হইল। এখন কথা উঠিবে আমি যদি আমার বংশগত কাজ ছাড়িয়া অন্য কর্ম করি ও তদ্দ্বারা উন্নতিসাধন করি, তবে তাহা না করিব কেন? আমি মেথরের পুত্র হইয়া যদি লেখাপড়া শিখিয়া ডেপুটি হই তবে তাহাতে দোষ কি। মেথরের কাজ অন্য লোকে

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

করুক ; মেথরই বা চিরকাল কেন সামাজিক হীনতা স্বীকার করিবে ; শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-মত চলিলে মেথরের উন্নতি চিরকালের জন্য বন্ধ থাকিবে। সমাজকে যদি আরও বড় করিয়া দেখি তবে এক কাজের পরিবর্তে অপর কাজ করিলে সমাজবন্ধন নষ্ট হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। মেথরের পরিবর্তে ডেপুটি হইলে সামাজিক কাজই করিলাম। তবে স্বধর্ম কাহাকে বলিব? বংশগত স্বধর্ম না মানিয়া যদি শিক্ষামূলক বা নিজ প্রবৃত্তিমূলক স্বধর্ম মানি তাহাতেই বা দোষ কি? ১৮ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোক হইতে ৪৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বধর্মের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা, শম, দম, তপ, শৌচ ইত্যাদি কর্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজ। শৌর্য, তেজ, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতিগত ধর্ম। কৃষি, গোরক্ষা ইত্যাদি বৈশ্যের স্বভাবধর্ম ও পরিচর্যা শূদ্রের স্বাভাবিক ধর্ম। নিজ নিজ কর্ম করিয়াও মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। নিজ কর্মের দ্বারাই মনুষ্য পরমাত্মার অর্চনা করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা মন্দরূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্মানুযায়ী কর্ম শ্রেয় কারণ স্বভাবনিয়ত কর্ম করিলে মনুষ্যের পাপ হয় না। স্বাভাবিক কর্ম দোষযুক্ত মনে হইলেও ত্যাগ করা উচিত নহে কারণ যে কর্মই করিতে যাও না কেন তাহাতে কোন না কোন দোষ আছেই। অসক্ত বুদ্ধিতে কর্ম করিলে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ হয়।

পূর্বে বলিয়াছি স্বধর্ম মানে সমাজনির্দিষ্ট ধর্ম, এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মের আর একটি ব্যাখ্যা দিলেন। স্বধর্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম। স্বধর্ম মানে দাঁড়াইল এই, যে কর্ম নিজ প্রবৃত্তির বিরোধী নহে এবং যাহা সমাজ দ্বারা অনুমোদিত। আমার প্রবৃত্তি যদি আমাকে খুন করিতে বলে তবে তাহা সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া স্বধর্ম হইবে না। পিতা মাতা ও আর পাঁচ জনে যদি আমকে ডাক্তার হইতে বলেন ও আমার যদি ডাক্তার হইবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে ডাক্তার হইবার চেষ্টা করা স্বধর্ম হইবে না। আমার যদি চাকরি করিবার ইচ্ছা হয় ও লোকে যদি আমাকে চাকরি করার হীনতা দেখাইয়া কোন স্বাধীন কাজ করিতে বলে তাহা হইলেও চাকরিই আমার স্বধর্ম। কারণ চাকরিও সমাজ অনুমোদিত। এজন্যই দ্রোণাচার্য্য ও বিশ্বামিত্রকে স্বধর্মদ্রোহী বলা যাইতে পারে না।

এই ব্যাখ্যা মানিলে স্বধর্ম বংশগত এ কথা বলা চলে না। স্বধর্ম নিজ প্রবৃত্তি ও সমাজগত। কেবল ব্রাহ্মণকে লইয়াই সমাজ হয় না। চতুবর্ণ লইয়াই

সমাজ। এজন্য নিজ প্রবৃত্তিগত যে কোন বর্ণের কর্মই স্বধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ এমন কথা বলেন নাই যে, সকল ক্ষেত্রেই স্বভাবধর্ম বংশগত। যাহার ব্রাহ্মণের মত ব্যবহার ও মনোবৃত্তি সেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের মত মনোবৃত্তি হইলে সে ব্যক্তি শূদ্রই। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট হয় এ কথা সত্য, তবে সময়ে তাহা নহে। সমাজের বিশিষ্টতা শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ করিয়াছেন। ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে আছে, গুণ ও কর্মভেদে আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ স্বভাব ও কর্মভেদেই বর্ণভেদ। কোন State বা রাষ্ট্রের কার্যবিভাগ দেখিলেই চতুর্বর্ণ কথার অর্থ পরিষ্কার হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য রাষ্ট্রান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান ও মানসিক উন্নতি (moral and material progress of the people)। অতএব এক দল লোক অর্থাৎ সমাজের এক অঙ্গ শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিবে ও আর এক দল মানসিক উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে। মানসিক উন্নতিবিধানের উপর রাষ্ট্রের বা সমাজের কৃষ্টি (kultur) নির্ভর করে; বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চা এই বিভাগের অন্তর্গত। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক তাহা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উপর নির্ভর করে; চিকিৎসাশাস্ত্রও ইহার অন্তর্গত। কেবল এই দুই দল লোক হইলেই সমাজ চলিবে না। বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে সমাজ রক্ষা আবশ্যক। অপরাধীর দণ্ডবিধান, সমুদায় রাজকার্য ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সমস্ত বিভাগ সুচারুরূপে চালাইতে হইলে এমন কতকগুলি লোকের দরকার যাহারা পূর্বোক্ত তিন বিভাগের কর্মীদের আদেশপালনে নিযুক্ত থাকিবে ও তাহাদের ব্যক্তিগত অভাব প্রভৃতি দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে। সমাজের বা রাষ্ট্রের এই চারি অঙ্গ ব্যতীত অপর কোন অঙ্গের আবশ্যক নাই। সমাজের অন্তর্গত সমস্ত কর্মীই এই চারি বিভাগের কোন না কোনটির অন্তর্গত। যুদ্ধের পূর্বে ভারত-গভর্ণমেন্টের নয়টি বিভাগ ছিল। ইহাদের মধ্যে Home, Finance, Legislative, Foreign and Political, Railway এবং Army, রাজকার্যে ও সমাজ রক্ষায় ব্যাপৃত। Military বিভাগও এই বর্গের অন্তর্গত। Education, Health and Lands, Commerce, Industry and Labour মানসিক উন্নতি ও শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য নিয়োজিত। প্রত্যেক বিভাগের কার্যনির্বাহের জন্য পিয়ন, চাকর, মুটে মজুর ইত্যাদি আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই চারি বিভাগ অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি বিভাগ করিয়াছেন।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। ৪।১৩ ও ১৮।৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসমূহ স্বভাবোৎপন্ন গুণদ্বারা বিভক্ত। ব্রাহ্মণের গুণ শম, দম, তপ, শৌচ বা পবিত্রতা, শান্তি, সরলতা, অধ্যাত্মজ্ঞান ও বিবিধ বিজ্ঞান ও আস্তিক্যবুদ্ধি ॥ ১৮।৪২ ॥ ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, তেজস্বিতা, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে বিমুখ না হওয়া, দান ও কর্তৃত্ব ॥ ১৮।৪৩ ॥ বৈশ্যের কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য এবং শূদ্রের পরিচর্যা করাই স্বাভাবিক ধর্ম ॥ ১৮।৪৪ ॥ ১৮।৫৯-৬০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, যদি অহংকারবশে মনে কর যুদ্ধ করিব না তবে সে ধারণা মিথ্যা। কারণ প্রকৃতিজাত তোমার স্বভাবজ প্রবৃত্তি তোমাকে যুদ্ধ করাইবেই। কেবল মোহবশেই যুদ্ধ করিব না বলিতেছ।

এইবার পরধর্ম কাহাকে বলে তাহার বিচার করিব। এক সমাজের ব্যক্তি যদি পৃথক সমাজের আদর্শে চলে, তবে সে পরধর্মী। অথবা এক বর্ণের মনোবৃত্তি লইয়া যে অন্য বর্ণের আচরণপালনে চেষ্টিত হয় সেও পরধর্মী। দ্রোণাচার্য যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া যজনযাজনে নিজেকে নিযুক্ত করিতেন তবে তিনি পরধর্মী হইতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াও ক্ষাত্রধর্মপালনে তিনি স্বধর্মচ্যুত হন নাই। পরধর্ম ভয়াবহ বলা হইয়াছে, কারণ পরধর্মসেবীর কখনই চিত্তের বা ধাতুর প্রসন্নতা হয় না এবং তাহার পক্ষে সিদ্ধি অসম্ভব। নিজ প্রবৃত্তি মত সামাজিক কার্য ও কর্ম করিতে পারিলে ধাতু প্রসন্ন হইবার ও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা।

পূর্ববর্ণিত উপাখ্যানে শর্বিলক নিজ কুলধর্মানুযায়ী কর্ম করিয়াছিল; হয়ত ধনবীর শ্রেষ্ঠীকে হত্যা করিয়া সে তাহার স্বভাববশেই চলিয়াছিল; তথাচ তাহার কর্ম গীতার অনুমোদিত নহে, কারণ গীতার কর্মের আদর্শ সমাজধর্মের দ্বারা নিয়মিত স্বভাবসম্মত কর্ম। শর্বীলক ও অর্জুনের দুইজনের প্রকৃতিতেই স্বভাবজ নিষ্ঠুরতা আছে কিন্তু যুদ্ধ সমাজসম্মত বলিয়া অর্জুনের পক্ষে তাহা স্বধর্ম হইয়াছে এবং শর্বিলকের হত্যাকার্য সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা পাপ। শর্বিলক যদি যুদ্ধকার্যে যোগ দিত কিংবা যদি জল্লাদও হইত তাহা হইলে সে স্বধর্মে থাকিত। গীতার উপদেশ এই যে, যদি শর্বিলকের মত পাপী ব্যক্তিও গীতোক্ত ধর্মের যথার্থ মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় ও তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

আমরা প্রকৃতির বশেই যখন সকল কার্য করি এবং যখন আমাদের কোন কর্তৃত্বই নাই, তখন বাস্তবিক পক্ষে স্বধর্মেই থাকি আর পরধর্মেই থাকি নিঃসঙ্গচিত্ত

হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতার শেষের দিকে ১৮।৬৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, চিন্তা করিও না।

অর্জুনের মনে সন্দেহ উঠিল যদি প্রকৃতির বশেই আমরা সকলে চলি এবং প্রকৃতির মূল স্রোত যখন সমাজানুগামী তখন সমাজবিরুদ্ধ কাজ বা পাপ কাজই বা আমরা করি কেন। স্রোতের বশে সব কুটাই যে চলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই, কুটা ভারী হইলে তাহা ডুবিয়া যাইবে, এই ডোবাও প্রকৃতির নিয়মের বশেই ঘটে; অর্জুনের মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বভাবিক যে প্রকৃতিজাত কোন্ গুণে মানুষ সামাজিক মূল স্রোতে না চলিয়া বিপথে চলিয়া থাকে। অর্জুন বলিলেন, ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষ কিসের বশে পাপে প্রবৃত্ত হয়।

॥ ৩৬ - ৩৭ ॥ অর্জুন বলিলেন, কিন্তু বাষ্ণেয় কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া মানুষে ইচ্ছা না থাকিলেও বলপূর্বক নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় পাপ আচরণ করে। শ্রীভগবান বলিলেন, রজোগুণোদ্ভব কাম বা ক্রোধই মনুষ্যকে পাপে প্রবৃত্ত করায়। এই কামকে তৃপ্ত করা যায় না এবং ইহাই পাপের কারণ, ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিও **॥ ৩৬ - ৩৭ ॥**

কাম মানে কামনা। বঙ্কিমচন্দ্র ৩৭ শ্লোকের যে ব্যাখা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

'পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ, উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কাম ও ক্রোধ একই। দুইটি পৃথক রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পরিণত হয়, অতএব কাম, ক্রোধ একই।'

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

কামনা প্রতিহত হইলে কোন ক্ষেত্রে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং ক্রোধের স্বরূপই বা কি পরিশিষ্টে 'কাম ও ক্রোধ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

॥ ৩৮ - ৪৩ ॥ ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি, ময়লায় যেমন দর্পণ, জরায়ুর দ্বারা যেমন গর্ভস্থ সন্তান ঢাকা পড়ে সেইরূপ কামের দ্বারা ইহসংসার আবৃত। কৌন্তেয়, কামরূপ অনলকে তৃপ্ত করা যায় না, ইহা সর্বদাই মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের চেষ্টার শত্রুতা করে। কামের দ্বারা জ্ঞানীদের জ্ঞানও আবৃত। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে ; ইহাদের সাহায্যেই কাম দেহী অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান আবৃত করিয়া তাহাকে মোহগ্রস্ত করে। ভরতর্ষভ, এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে কামের বশীভূত না রাখিয়া আত্মবশে রাখ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশকারী পাপকারণ কামকে জয় কর। স্থূলদেহ ও বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহাবাহো, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি সেই আত্মাকে এই ভাবে জানিয়া নিজেকে নিজেতে অবিচলিত রাখিয়া দুর্ধর্ষ ও দুর্বিজ্ঞেয় কামরূপ শত্রুকে জয় কর **॥ ৩৮ - ৪৩ ॥**

এই শ্লোকগুলিতে কামকে ধ্বংস করিবার কথা নাই। কামকে জয় করিয়া আত্মবশে রাখিতে হইবে ইহাই বলা হইয়াছে। আমাদের সহস্র চেষ্টাতেও কাম বিনষ্ট

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

হইবার নহে। কাম প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি, এবং সংযত রাখিতে পারিলে কামই মনুষ্যের শ্রেয়োলাভে সহায়ক হয়। প্রত্যেক বস্তুর সহিত কোন না কোন কামনা জড়িত আছে। কামনা না থাকিলে বিষয়বোধ সম্ভবপর নহে। এজন্য ৩৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে কামের দ্বারা ইহসংসার আবৃত। ২।৬২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কঠের অষ্টম বল্লীর ৭।৮ শ্লোক গীতার ৩। ৪২-৪৩ শ্লোকের অনুরূপ, যথা,

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহৎ অধিক, মহৎ অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ যে পুরুষকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এযাবৎ বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ ইহাই তাঁহার উপদেশ। বুদ্ধি নিশ্চিয়াত্মিকা মনোবৃত্তি এবং এই জন্যই তাহা বিশেষ বিশেষ কর্মের নিয়ামক। কোন বিশেষ অবস্থায় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকারের কর্মসম্ভাবনা উপস্থিত হইলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব আমাদের বুদ্ধিই তাহা স্থির করে। সমস্ত কর্মই বিষয়াশ্রিত এবং পূর্বে বলিয়াছি বিষয়জ্ঞান অব্যক্ত কামনা হইতে উৎপন্ন। এই কারণেই বলা হইয়াছে বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান। এই বুদ্ধিকে কামনা হইতে মুক্ত করা যায় না কিন্তু ইহাকে ব্যবসায়াত্মিকা করা যাইতে পারে ও তখন এই বুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞানই চরম সাধন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সিদ্ধিলাভের উপায় মাত্র। এই জন্যই বলা হইল বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানই কামজয়ের উপায়।

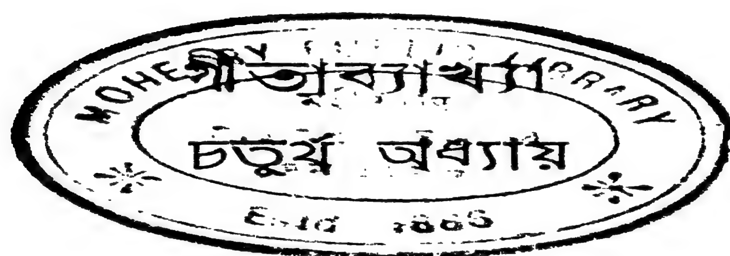
গীতার ৩।৪১ শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দ আছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই দুই শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শংকর বলেন, জ্ঞান অর্থে শাস্ত্র তর্ক যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে অনুভবসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞান। অধুনা বাংলায় বিজ্ঞান শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অনেকে বিজ্ঞানের তাহাই যথার্থ অর্থ বলেন। আমার মতে প্রত্যক্ষ ও অনুভবসিদ্ধ প্রতীতিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান যখন যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, বিচার ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে তখন তাহা বিশেষ জ্ঞানে বা

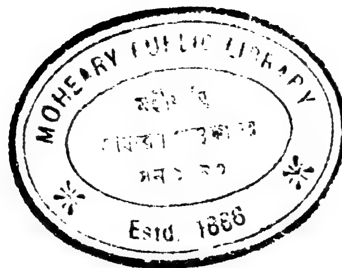
বিজ্ঞানে পরিণত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে বিজ্ঞান কথা আছে, সেখানে এই অর্থই পরিস্ফুট হইবে। দেখা যাইবে যে গীতায় অন্যত্র ও উপনিষদে সর্বত্র বিজ্ঞান শব্দের এই অর্থই সমীচীন। বাংলায় পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যথোপযুক্ত, কারণ এই সকল শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যুক্তি বিচার দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। Science ও Philosophy দুই-ই বিজ্ঞান।

কর্মযোগ নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

গীতাব্যাখ্যা

চতুর্থ অধ্যায়





গীতাব্যাখ্যা

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

পরিশিষ্টে গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গ ও ধর্মবিশ্বাসের আলোচনা করিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায় পাঠের পর ও চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভের পূর্বে পাঠককে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিসের বশে মানুষ পাপ কাজ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামই পাপের মূল এবং কামদ্বারাই সমস্ত আবৃত রহিয়াছে। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, যখন কাম এতই প্রবল তখন ক্রমশ পাপদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইয়া সমাজ ধ্বংস হইতে পারে, অতএব কি উপায়ে পাপের প্রভাব রহিত হইয়া সমাজ চলিতেছে। সমাজের ভিতর এমন কি শক্তি আছে যাহাতে পাপ বৃদ্ধি পাইতে পায় না। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উত্তর দিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি সেই আত্মাকে জানিয়া কাম-রূপ শত্রুকে জয় কর। আত্মাকে জানিবার উপায় বুদ্ধিযোগ।

॥ ১ - ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই চিরফলপ্রদ অব্যয় যোগ আমি পূর্বে বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, এইরূপে ক্রমে এই যোগ রাজর্ষিবৃন্দ অবগত হইয়াছিলেন। পরন্তপ, কালপ্রভাবে এই যোগ ইহলোকে নষ্ট হইয়া গেল। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেজন্য তোমাকে আমি সেই পুরাতন উত্তম যোগরহস্য বলিলাম **॥ ১ - ৩ ॥**

বিবস্বান্ সূর্যবংশ বা ইক্ষ্বাকুবংশের আদিপুরুষ। ইনি আকাশের সূর্য নহেন। বৈবস্বত মনুর কালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামানুসারে আকাশের জ্যোতিষ্কদিগের

নামকরণ হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সূর্য্যকে বিবস্বান্ নামে অভিহিত করা হয়। মৎপ্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ' পুস্তকের ২৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগে অভিক্রম নাশ ও প্রত্যবায় নাই বলিয়া ॥ ২।৪০ ॥ ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে।

মহাভারতে অন্য স্থানে ও অন্যান্য পুস্তকেও কাহার পর কে এই যোগরহস্য অবগত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে; ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যেই এই রহস্য প্রধানত বিদিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নাম শ্রীকৃষ্ণকথিত পরম্পরায় পাওয়া যায় না। উপনিষদেও অনেক স্থলে আছে, তত্ত্বান্বেষী ব্রাহ্মণ সমিধ হস্তে ক্ষত্রিয়রাজের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের জন্য গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন, ধাতু প্রসন্ন না হইলে ব্রহ্মদর্শন হয় না এবং ধাতু প্রসন্ন রাখিবার জন্যই বিষয়ভোগের আবশ্যক। ক্ষত্রিয়রাজের পক্ষে ইচ্ছামত বিষয়ভোগের সম্ভাবনা দরিদ্র ব্রাহ্মণের তুলনায় অনেক অধিক, এজন্য রাজর্ষিগণের মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞানী অধিক ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম খণ্ডে ১ ও ২ শ্লোকে আছে, বিশ্বের কর্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন, অথর্বা পুরাকালে ব্রহ্মা-কথিত সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরকে বলিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহকে বলিয়াছিলেন; ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন। অঙ্গিরসের নিকট হইতে শৌনক এই বিদ্যার বিষয় অবগত হন।

মুণ্ডক-কথিত পরম্পরা ও গীতোক্ত পরম্পরা বিভিন্ন। মুণ্ডকে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে মাত্র ও গীতায় যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয় তাহারই পরম্পরা

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যালাভের নানা উপায়ের মধ্যে বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ একটি বিশেষ উপায় এবং এই গুহ্য যোগ রাজর্ষিগণের মধ্যেই প্রবর্তিত ছিল। এই কারণেই নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে রাজবিদ্যা বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, আমি পূর্বে বিবস্বান্‌কে এই যোগের কথা বলিয়াছিলাম তখন অর্জুনের মনে স্বভাবতই সন্দেহ উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ত এখনকার লোক, বিবস্বান্ কত কাল পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। পুরাণমতে বিবস্বান্ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রায় ২৪০০ বৎসরের ব্যবধান। মৎপ্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ' ১৪০-১৪৭ পৃঃ সারণী দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বান্‌কে যোগের কথা বলিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়।

॥ ৪ - ৫ ॥ অর্জুন বলিলেন, তোমার জন্ম অল্পদিন পূর্বের ঘটনা, বিবস্বানের জন্ম বহুপূর্বের ঘটনা, অতএব তুমি আদিতে বলিয়াছিলে, ইহা কি করিয়া জানিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জুন, আমার ও তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, আমি সে সকল জন্মের কথা জানি, কিন্তু পরন্তপ, তুমি তাহা জান না ॥ ৪ - ৫ ॥

এই শ্লোক দুইটির প্রচলিত অর্থ মানিলে পুনর্জন্মবাদ ও জাতিস্মরতা স্বীকার করিতে হয় ; এই দুয়েরই প্রমাণাভাব। পরিশিষ্টে 'পুনর্জন্মবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। যদিও প্রচলিত অর্থই সোজা অর্থ স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এই শ্লোকবর্ণিত পুনর্জন্মবাদের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর এবং আমি যে ব্যাখ্যা দিতেছি পরবর্তী শ্লোকগুলির সহিত তাহার সংগতিও লক্ষিত হইবে।

আমার মতে, গীতায় এখানে যে অবতারতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রচলিত অবতারতত্ত্ব নহে। পরিশিষ্টে 'অবতারবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সাধারণে মনে করেন ভগবান কোন বিশেষ বিশেষ মনুষ্যরূপেই অবতার হইয়া দেখা দেন। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, যদু আমরা ভগবানের অবতার নহি। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

যাইবে যে, তিনি এরূপ বলেন না। তাঁহার মতে সকল মনুষ্যতেই ভগবান অবতীর্ণ হন। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ, আমার নির্দিষ্ট পথেই সমস্ত মনুষ্য চলিয়া থাকে।

১৩।২৭ শ্লোকে আছে, সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত নাশশীল পদার্থেও অবিনাশীরূপে বিদ্যমান ইঁহাকে যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন। ৪।১৩ শ্লোকে বলিলেন, আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই তাহাদের কর্তা। কর্তা হইলেও আমি লিপ্ত নহি বলিয়া অকর্তাই থাকি। ৪।৯ শ্লোকে বলিতেছেন, আমার জন্ম কর্ম-তত্ত্ব যে জানে সে মুক্ত হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও যা, আমার জন্মকর্ম জ্ঞানও তা। ৪।৩৫ শ্লোকে বলিলেন, এই জ্ঞান পাইলে সমস্ত প্রাণিগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে।

প্রত্যেক মনুষ্যতেই যদি ভগবান অবতীর্ণ হন তবে বিশেষ করিয়া অবতার কাহাকে বলিব? যিনি ধর্মসংস্থাপন করেন ও পাপ নষ্ট করেন তিনিই অবতার। পাপও ভগবানই করান, ধর্মরক্ষাও তিনিই করান। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে কাম হইতে পাপের উৎপত্তি ; কামও ভগবানের সৃষ্টি। কাম হইতে উৎপন্ন পাপ যে উপায়ে নিবারিত হয় তাহাও ভগবানের সৃষ্টি। সমাজে যেমন পাপের প্রবৃত্তি আছে সেইরূপ পাপনিবারণেরও প্রবৃত্তি আছে। ভগবানের যে অংশ এই পাপের বৃদ্ধি হইতে দেয় না তাহাই ভগবানের অবতার অংশ। তোমার আমার সকলের ভিতরেই এই অবতার আছেন। সমাজের পাপ বৃদ্ধি হইলেই স্বতই তাহা বারিত হয়। পরের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় এই অর্থ পরিস্ফুট হইবে।

দিব্যজ্ঞান জন্মিলে মানুষ দেখিতে পায় সবই ভগবানের লীলা ও এই ভগবান আমিই। পূর্বে যিনি জন্মিয়াছেন তিনিও আমি, পরে যিনি জন্মিবেন তিনিও আমি, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক যজুর্বেদ হইতে উদ্ধৃত, তাহাতে আছে,

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥

অর্থাৎ,
সেই সে দেব দশ দিশি সর্বে
আছে সে জাত সেই আছে গর্ভে
জনমিল সে জনমিবে পরে
সর্বতোমুখ সে সকল নরে॥

॥ ৬ ॥ আমি বাস্তবিক যদিও জন্মরহিত ও অব্যয় আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপে বিকারহীন ও সমস্ত প্রাণীদের প্রভু, তথাপি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি ॥ ৬ ॥

কেবল যে অবতাররূপেই জন্মগ্রহণ করেন এই শ্লোকের এমন অর্থ নহে। পরবর্তী শ্লোকে কি করিয়া সংসারে পাপ প্রবল হইতে পায় না তাহার কথা বলা হইতেছে।

॥ ৭-৮ ॥ ভারত, যে কালেই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় হয় তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি ॥ ৭-৮ ॥

এই দুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব অধ্যায়ের অর্জুনের প্রশ্ন স্মরণ করা কর্তব্য। অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিসের বশে মানুষ পাপ করে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, কামের বশে এবং এই কামই সমগ্র পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। কাম যখন এতই প্রবল তখন সংসার পাপে ভরিয়া যায় না কেন? কি উপায়েই বা সমাজধর্ম বজায় থাকে? এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যখনই পাপের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই তাহা নিবারণকল্পে ভগবান নিজেকে সৃষ্টি করেন। অন্য সময়ে যে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন না তাহা নহে। সাধারণ লোকের ধর্মপ্রবৃত্তি ও পাপ নিবারণের চেষ্টার ভিতর দিয়াই ভগবান আবির্ভূত হন; কোন বিশেষ জীব

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

বা মনুষ্য রূপে অবতার হন এরূপ নহে। ভগবান কোন বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি যুগে যুগে বা সকল যুগেই জন্মেন; ধর্মের গ্লানি হইবামাত্র তিনি জন্মিয়া থাকেন। গ্লানি মানে সম্পূর্ণ বিনাশ নহে, ধর্মহানি হইলেই ধর্মের গ্লানি হইল। অধুনা ধর্মহানি হইতেছে অথচ ভগবানের অবতার কোথায়? অতএব বিশেষ অবতার কল্পনা সমীচীন নহে; যে মনুষ্য যখন ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা করে সেই তখন ভগবানের অবতার। বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৩৬-৩৮ শ্লোকগুলিতে বলিতেছেন,

যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্ব জাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্বং বৈ হরেস্তনুঃ॥
হন্তি বা যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবর জংগমম্।
জনার্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ॥
এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা তথৈব চ।
জগদ্ ভক্ষয়িতা চেশঃ সমস্তস্য জনার্দনঃ॥

অর্থাৎ, দ্বিজ, কোন প্রাণী হইতে যদি কোন প্রাণীর উৎপত্তি হয় তবে সেই সৃষ্টজীবের কারণস্বরূপ যে জীব, তাহাকে সৃষ্টিব্যাপারে হরিরই তনু বলিয়া জানিবে। মৈত্রেয়, যদি কেহ কোন স্থাবর বা জংগম জীবকে বিনাশ করে তবে তাহাকে জনার্দনের সংহারকারী রৌদ্রশরীর বলিয়া জানিবে। এই প্রকারেই সকলের প্রভু জনার্দন জগৎস্রষ্টা, জগৎ-পালয়িতা এবং জগৎভক্ষয়িতা হন।

॥ ৯ ॥ অর্জুন, যে আমার দিব্য জন্মকর্মের তত্ত্ব অবগত আছে দেহত্যাগের পর তাহার পুনর্জন্ম হয় না এবং সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

কথাটা একটু বিচিত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমার জন্ম কর্মের তত্ত্ব অবগত হইলে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; নির্লিপ্ত থাকিয়া ভগবান কি প্রকারে জন্মান ও কর্ম করেন জানিলে মুক্তি। প্রত্যেক শরীরে ভগবান আত্মারূপে অবস্থিত; এই আত্মা নির্লিপ্ত থাকিয়াই আমাদের কর্ম করায়; এজন্য ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞানও যা, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানও তা; ভগবানের জন্মকর্মের তত্ত্ব জানিলেই নিজের মুক্তি। ভগবানের কোনও বিশেষ অবতারের জন্মকর্ম তত্ত্ব জানিতে হইবে এমন কথা নহে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৯

কি উপায়ে ভগবানের এই জন্মকর্মতত্ত্ব জানা যায়, পরের শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। এই শ্লোকে দিব্য কথার অর্থ এই যে জন্মব্যাপারকে লৌকিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

॥ ১০ ॥ রাগ অর্থাৎ আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া বহু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

মন্ময় অর্থে যিনি ভগবান বা আত্মাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন। কেবল এই প্রকারেই যে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা নহে। ভগবান বলিতেছেন, যে যেরূপ কর্মই করুক না কেন আমার জন্মকর্মতত্ত্ব অবগত হইলে তাহার তাহাতেই মুক্তি।

॥ ১১ - ১৫ ॥ যে ব্যক্তি যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমি সেইভাবে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি করি। পার্থ, মনুষ্যগণ যে কোন পথই অবলম্বন করুক না কেন আমার পথেই তাহারা চলে। মনুষ্যলোকে কর্মের ফললাভ শীঘ্র হয় এজন্য কর্মফলের অভিলাষী ব্যক্তি ইহলোকে দেবতাদিগের পূজা করে, ইহারাও আমার পথেই চলে। আমিই গুণকর্ম বিভাগ অনুযায়ী চতুর্বর্ণসম্বলিত সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাদের আমি কর্তাও বটে এবং অব্যয় অকর্তাও বটে। আমার নিজের কর্মফলের স্পৃহাও নাই ও আমি কর্মে লিপ্তও হই না, এই যে জানে সে যে কোন কাজই করুক না কেন তাহার কর্মবন্ধন হয় না। ইহা অবগত হইয়া পূর্বের মুমুক্ষুগণ কর্ম করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও সেইরূপ জানিয়া সনাতন সমাজবিহিত কর্মসকল কর ॥ ১১ - ১৫ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে জনকাদি রাজর্ষিগণের কর্মজীবন ও মোক্ষলাভ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদেরও পূর্বকাল হইতে যে সকল কর্ম বিহিত ছিল তাহা তাঁহারা পালন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের মোক্ষলাভে কোন ব্যাঘাত

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২

ঘটে নাই। এই দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে জনকাদি যে ভাবে কর্ম করিয়াছিলেন অর্জুন যদি সেই ভাবে সনাতন কাল হইতে সমাজানুমোদিত যুদ্ধাদি কর্তব্য পালন করেন তবে তাঁহারও তাহাতে মোক্ষলাভে বাধা হইবে না।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥

অর্থাৎ, সর্বলোকচক্ষু সূর্য হইয়াও যথা
চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্যদোষে নাহি লিপ্ত হন।
এক সেই সর্বভূত অন্তরাত্মা তথা
বাহ্য থাকি লোক দুঃখে নিরলিপ্ত রন॥ কঠ।৫। ১১॥

সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা যে একই এবং তিনি যে বাস্তবিক নির্লিপ্ত এই শ্লোকেও তাহা বলা হইয়াছে। ৪।১১-১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মকর্মের দিব্য তত্ত্ব বলিলেন। ইহা হইতেও দেখা যাইবে যে কোন বিশেষ জীবে অবতারকল্পনা নিরর্থক। ৪।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের জন্মগত ভেদ না মানিয়া গুণ ও কর্মগত ভেদ প্রতিপাদিত করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহার সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

পূর্বের শ্লোকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করিতে উৎসাহিত করিলেন, এখন বলিতেছেন কিরূপ কর্ম ভাল। পাপের প্রভাব এবং কিরূপে তাহা নিবারিত হয় এই আলোচনায় এই অধ্যায়ের আরম্ভ। সামাজিক আদর্শ হিসাবে পাপ বা পুণ্য কর্ম নিরূপিত হয় কিন্তু এই আদর্শই পরিবর্তনশীল হওয়ায় কি কর্ম, কি অকর্ম, কি বিকর্ম, এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়; এই জন্যই উপদেশ আছে ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যাহা কিছু কর

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ১৩
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ১৫

অসঙ্গচিত্তে করিলেই বন্ধন হইল না ; তুমি এই আদর্শমতেই চল বা ঐ আদর্শমতে চল, বাস্তবিক তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না।

॥ ১৬ – ১৮ ॥ কি কর্ম আর কি অকর্ম এ বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানেরও ভ্রম হয়। তোমাকে আমি এমন কর্মের কথা বলিব যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ বা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কর্মই বা কি, বিকর্ম বা দুষ্কর্মই বা কি, আর অকর্মই বা কি, এই সমস্তই জানা উচিত ; কর্মের গতি গহন বা দুর্জ্ঞেয়। যিনি কর্মেতে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বান এবং সমস্ত কর্ম করিলেও তিনি যোগযুক্তই থাকেন **॥ ১৬ – ১৮ ॥**

এই যোগ বুদ্ধিযোগ। শ্লোকগুলির অর্থ-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। এই শ্লোকগুলির সহিত পূর্ব ও পরের শ্লোকের সংগতি লক্ষ্য করিলে উপরের প্রদত্ত অর্থই যুক্তিযুক্ত বোধ হইবে। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে নির্লিপ্ত থাকেন বলিয়া সমস্ত কর্মই আত্মার পক্ষে অকর্ম। আবার বিনা কর্মে যখন শরীর ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না তখন বাস্তবিক শরীরের পক্ষে অকর্ম অসম্ভব তা আমি যত বড়ই সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হই না কেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই ইহার আলোচনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সার এই যে কর্ম কিছুতেই বন্ধ করা যায় না ও কর্মের ভালমন্দের বিচারেরই আবশ্যক থাকে না, যদি নিস্পৃহ বা যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করা যায়। কর্মের অপেক্ষা যে বুদ্ধিতে কর্ম করা যায় তাহাই বিচার্য।

॥ ১৯ - ২২ ॥ যাঁহার সমস্ত কর্মের উদ্যোগ ফলকামনা ও সংকল্পশূন্য, যাঁহার সমস্ত কর্মবন্ধন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন। কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় অর্থাৎ কোন বহির্বিষয়ের উপর যিনি নির্ভর করেন না, তিনি কর্মের মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

করেন না। নিষ্কাম, সংযতচিত্ত এবং সর্বপরিগ্রহত্যাগী অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তুর আহরণ সম্বন্ধে উদাসীন পুরুষ কেবল শরীর দ্বারাই কর্ম করেন বলিয়া পাপভাগী হন না। লোভ না করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, সর্ববিধ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, মাৎসর্যহীন, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন পুরুষ কর্ম করিয়াও আবদ্ধ হন না ॥ ১৯ - ২২ ॥

যে কর্ম কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বা কোন প্রতিজ্ঞার বশে অনুষ্ঠিত হয় তাহা সংকল্পাত্মক কর্ম। আত্মা কর্মে লিপ্ত নহেন এই জ্ঞান হইলে কোন কর্মেই বন্ধন হয় না। অগ্নিদগ্ধ বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ ও ফল জন্মে না সেরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে কর্মবীজ নষ্ট হয় ও তাহা হইতে কর্মফল উৎপন্ন হয় না। আত্মা সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত এই জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীকে জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা বলা যায়।

॥ ২৩ ॥ যিনি আসক্তিশূন্য ও মুক্ত এবং যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি যজ্ঞার্থে কর্ম আচরণ করিলেও তাঁহার সমগ্র কর্ম বিলীন হয় ॥ ২৩ ॥

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ এইরূপ, আসঙ্গরহিত, রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত, সাম্যবুদ্ধিরূপ জ্ঞানে স্থিরচিত্ত এবং কেবল যজ্ঞের জন্যই কর্ম করেন যে ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র কর্ম বিলীন হইয়া যায়। আমার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে,

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

গতসঙ্গস্য, মুক্তস্য, জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় আচরতঃ সমগ্রং **কর্ম** (অপি) প্রবিলীয়তে। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় যজ্ঞকর্মের বন্ধন নাই মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। ৩।১৪ শ্লোকে যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভব বলা হইয়াছে। যজ্ঞের বন্ধন সৃষ্টিচক্রের সহিত জড়িত, এ কথা আমি তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। গতসঙ্গ হইলে কেবল যে সাধারণ কর্মের বন্ধন হয় না তাহা নহে, যজ্ঞকর্মও মনুষ্যকে বন্ধন করিতে পারে না। ৪।৩২ শ্লোকেও যজ্ঞকে কর্মজ বলা হইয়াছে। আমি যে অর্থ নির্দেশ করিয়াছি তাহা না মানিলে পূর্বাপর অর্থসংগতি থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক যজ্ঞের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞকর্মের ব্যাপক অর্থ করিয়াছেন এবং কি ভাবে দেখিলে যজ্ঞকর্মের বন্ধন হয় না তাহা বলিতেছেন। নানাপ্রকার কর্মকে শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে যজ্ঞনামে অভিহিত করিতেছেন। ৩।৯-২০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

॥ ২৪ – ২৫ ॥ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী অর্পণ অর্থাৎ হোমক্রিয়াকে ব্রহ্ম ভাবেন, হবি অর্থাৎ অর্পণদ্রব্যকে ব্রহ্ম ভাবেন, ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মই হোম করিতেছেন অর্থাৎ অগ্নিকেও ব্রহ্ম ও যজমানকেও ব্রহ্ম ভাবেন এইরূপ যাঁহার বুদ্ধিতে সমস্তই ব্রহ্মময় তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। কোন যোগী দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার বা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, কেহ বা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞের যাজন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞকে আহুতি দানরূপ যজ্ঞ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে যজ্ঞ পরিত্যাগ করেন **॥ ২৪ – ২৫ ॥**

ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধীয় যজ্ঞকেও দৈবযজ্ঞ বলা যায়। কারণ দেবতা বলিলে কেবল যে ইন্দ্র, বরুণ বুঝিতে হইবে তাহা নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে, ইন্দ্রিয়কে উপনিষদে অনেক স্থলে দেবতা বলা হইয়াছে।

॥ ২৬ – ২৭ ॥ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করেন, কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহের হোম

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

করেন অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সংহরণ করেন। কেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন ॥ ২৬ – ২৭ ॥

আত্মজ্ঞানহীন জীবাত্মা আমাদিগকে নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসারণাদি প্রাণকর্মে ও বিষয়ভোগে নিয়োজিত করে। এই জন্যই আত্মার সংযমের চেষ্টা। ইন্দ্রিয়সংহরণ ও ইন্দ্রিয়সংযম পৃথক। ইন্দ্রিয়সংযম, ইন্দ্রিয়সংহরণ ও আত্মসংযম সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

॥ ২৮ ॥ কেহ দ্রব্যদানাদি যজ্ঞ, কেহ তপোরূপ যজ্ঞ, কেহ যোগাভ্যাসরূপ যজ্ঞ এবং দৃঢ়ব্রত যতিগণ অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান অর্জনরূপ যজ্ঞ করেন ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানার্জনের জন্য পুনঃপুন বেদ ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার নাম স্বাধ্যায়। এখানে যোগ কথা সাধারণ প্রচলিত পাতঞ্জল যোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিলক এই শ্লোকে যোগের অর্থ কর্মযোগ করিয়াছেন, কারণ পরের শ্লোকে পাতঞ্জলযোগ অনুসারে প্রাণায়াম ইত্যাদির কথা আছে। আমার মতে পরের শ্লোকে এই পাতঞ্জলযোগের বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র। তপযজ্ঞের পর যোগযজ্ঞ থাকায় আমার অর্থই ঠিক মনে হয়। হঠাৎ কর্মযোগের কথা এখানে আসিতে পারে না। অবশ্য সমস্ত প্রকার যোগই কর্মযোগের অন্তর্গত বলা যায় এ কথা সত্য ; কর্মযোগ বলিয়া কোন বিশেষ প্রকারের যোগ নাই, যে কোন কর্মই অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে কর্মযোগ হয়।

॥ ২৯ ॥ প্রাণায়ামতৎপর হইয়া প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাণবায়ুকে অপানে হবন করেন এবং কেহ অপান বায়ুকে প্রাণে হবন করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

পূরক, রেচক ও কুম্ভকের কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। তিলক এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যখন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন প্রাণ বহিরাগত অর্থাৎ উচ্ছ্বাস বায়ু এবং অপান অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থে লওয়া হয়। মনে রেখো যে অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন।' শাস্ত্রকারগণের মতে শরীরের সমস্ত পেশীয় ও প্রাণক্রিয়া সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তির সাধারণ নাম বায়ু বা প্রাণ। দেহে পঞ্চপ্রাণ আছে। মূর্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিকাবিবর পর্যন্ত স্থানের প্রাণক্রিয়া উদান বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয়। নাসিকা-বিবর হইতে হৃদয় পর্যন্ত স্থান প্রাণবায়ুর অধিকারে। হৃদয় হইতে নাভি সমানবায়ুর অধিকারে এবং নাভি হইতে পদতল অপানের অধীন। ব্যানবায়ু সর্ব শরীর ব্যাপিয়া আছে। প্রাণবায়ু শব্দে শ্বাস ও শ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি উভয়ই বুঝায়। বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্বাস, প্রশ্বাস ও নিশ্বাস শব্দ বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

॥ ৩০ - ৩১ ॥ অপর কেহ আহার নিয়মিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণের যজ্ঞ করেন। এই সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা যজ্ঞের দ্বারা স্ব স্ব পাপ বিনাশ করেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃততুল্য অন্ন ভোজনে অর্থাৎ যজ্ঞফলভোগে সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কুরুসত্তম, যে যজ্ঞ করে না তাহার পরলোকের ত কথাই নাই, ইহলোকও নষ্ট হয় **॥ ৩০ - ৩১ ॥**

প্রাণশক্তি সকলপ্রকার শারীরিক ক্রিয়ার কারণ, পাতঞ্জল যোগ অভ্যাস-কালে চেষ্টা করিয়া অর্থাৎ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করিয়া শরীরকে নিশ্চল করিতে হয় অর্থাৎ প্রাণসমূহের আহুতি দিতে হয়। ৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে কোনও না কোন প্রকার যজ্ঞ অর্থাৎ সাধনা অবলম্বন করা কর্তব্য এবং নিষ্কাম চিত্তে তাহা অনুষ্ঠেয়। সাধারণের মতে যোগ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি কর্মদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, কৃষ্ণ বলেন, এ সকল কর্মও অসঙ্গচিত্তে করিবে তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যজ্ঞ করিয়া অবশিষ্টভাগ গ্রহণকর্তা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় কিন্তু যজ্ঞ না করিয়া যে নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করে সে পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। এই শ্লোক ও তৎপরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ বেদবিহিত যজ্ঞাদির বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে যজ্ঞের অর্থ অতিশয় ব্যাপক করিয়া ধরিয়াছেন। সকল প্রকার সাধনা যজ্ঞ নামে কথিত হইয়াছে। ৪।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা পড়িয়া হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি বৈদিক যজ্ঞই কর্তব্য এই কথা বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

॥ ৩২ ॥ এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মার মুখে উক্ত হইয়াছে, এই সমুদয়ই কর্মজ জানিবে। ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি মুক্ত হইতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

যজ্ঞকে কর্মজ বলার মানেই তাহার বন্ধন আছে। এই জন্যই পূর্বে যজ্ঞকর্মও নিঃসঙ্গচিত্তে করার উপদেশ আছে।

॥ ৩৩ ॥ পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানেতেই সর্ব অখিল কর্মের অবসান হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই এক কথাতেই কৌশলে সাধারণে প্রচলিত যজ্ঞের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিলেন।

শ্লোকের অখিল শব্দ সর্বকর্মের বিশেষণ ধরিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন ফল সমেত সমস্ত কর্ম। অপরে অখিল শব্দকে জ্ঞানের বিশেষণ করিয়া অর্থ করেন পূর্ণজ্ঞানে সর্বকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। আমার মতে অখিল শব্দ কর্মের বিশেষণ। ৭।২৯ শ্লোকেও অখিল কর্ম কথা আছে। ৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অখিল কর্ম কাহাকে বলে নির্দেশ করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য।

॥ ৩৪ - ৩৫ ॥ জ্ঞানই যখন শ্রেয় তখন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রণিপাত দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা ও সেবার দ্বারা এই জ্ঞানের উপদেশ পাইতে চেষ্টা কর। তাঁহারা

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

তোমাকে জ্ঞান দিবেন। জ্ঞান জন্মিলে তোমার মোহ নষ্ট হইবে এবং পাণ্ডব, সমগ্র জীবকে তুমি আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে দেখিবে ॥ ৩৪ - ৩৫ ॥

এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে তবে ভগবানের প্রকৃত অবতারতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্বের শ্লোকের অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই অর্থই আছে দেখাইয়াছি।

॥ ৩৬ ॥ যজ্ঞ ইত্যাদি না করায় অথবা পাপ করায় যদি তুমি নিজেকে সর্বাপেক্ষা পাপী মনে কর তাহা হইলেও এই জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ৩৬ ॥

এই অধ্যায়ে পূর্বে কি কর্ম, কি বিকর্ম অর্থাৎ কি পাপ কি পুণ্য ইত্যাদির বিচার আছে। এখানে স্পষ্টই বলিলেন পাপ পুণ্য, কর্ম বিকর্ম, অকর্ম ইত্যাদি বিচারের আবশ্যকই থাকে না যদি তুমি জ্ঞানলাভ কর।

॥ ৩৭ - ৩৮ ॥ প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ, অর্জুন, এই জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্মকে দগ্ধ করে। পৃথিবীতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সত্যই আর কিছুই নাই, বুদ্ধিযোগসিদ্ধ ব্যক্তি উপযুক্তকালে আপনিই জ্ঞানলাভ করেন ॥৩৭ - ৩৮ ॥

এখানে জ্ঞানকে বুদ্ধি বা কর্মযোগ-লভ্য বলা হইল।

॥ ৩৯ - ৪২ ॥ শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করেন। অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮

ব্যক্তি নষ্ট হয়, তাহার ইহলোক পরলোক বা সুখ কিছুই হয় না। যিনি যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করেন এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিকে কর্ম বন্ধন করিতে পারে না, অতএব ভারত, তোমার অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা কাটিয়া যোগ অবলম্বনপূর্বক উঠ ॥ ৩৯ - ৪২ ॥

এখানে ৪২ শ্লোকে যোগ শব্দে পূর্বপ্রতিপাদিত জ্ঞানপ্রদ বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে উঠা সম্ভবপর নহে।

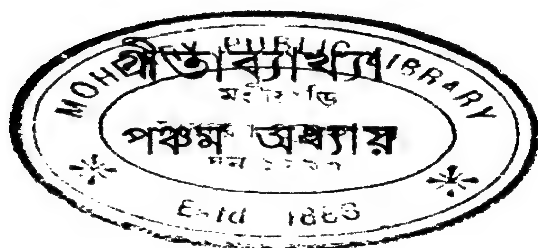
এই অধ্যায়ের তাৎপর্য এই যে, সমাজের মধ্যেই পাপের প্রতিকারের শক্তি নিহিত আছে। কি পাপ কি পুণ্য তাহা বিদ্বান ব্যক্তিও অনেক সময় নির্ধারণ করিতে পারেন না। পাপ ও পুণ্য কর্ম উভয়েরই বন্ধন আছে। যে কাজই কর না কেন, কর্মযোগের কৌশল জানিলে পাপপুণ্য সমান হইয়া যায় ও সমস্ত পাপই জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয়।

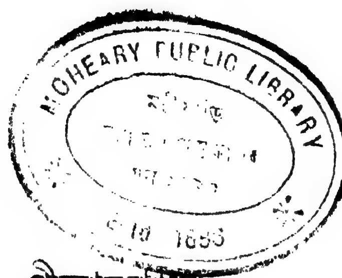
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

জ্ঞানযোগ নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

গীতাব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়





গীতাব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি কর্মত্যাগ ও কর্মের আচরণ দুই-ই করিতে বলিতেছ; এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় ঠিক করিয়া আমাকে বল ॥ ১ ॥

এই শ্লোকে শংসসি কথা আছে, ইহার অর্থ ইঙ্গিত করিতেছ অর্থাৎ কৃষ্ণ এরূপ কথা স্পষ্ট বলেন নাই, তাঁহার কথার ভাবে ইহা মনে হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন ছিল ক্রূর কর্ম কেন করিব ও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন ভালমন্দ-নির্বিশেষে সমস্ত কর্মই কেন পরিত্যাগ করিব না। এই প্রশ্ন অর্জুনের মনে কেন উঠিল ৩।১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। পরিশিষ্টে গীতায় উল্লিখিত বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর বিচারকালে বলিয়াছি যে তখনকার দিনে এখনকার মতই অনেক ধার্মিক ব্যক্তি সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। এই সন্ন্যাসমার্গ সাংখ্যমার্গের অন্তর্গত। গীতাকার প্রশ্নোত্তরছলে অতি নিপুণভাবে তৎকালপ্রচলিত সকল প্রকার নিষ্ঠার আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সন্ন্যাসমার্গ আলোচিত হইয়াছে। অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, সংসারে থাকিয়া কর্তব্য কর্মাদি সম্পাদন করা ভাল না গৃহত্যাগী হইয়া ও সর্ব কর্ম বর্জন করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া ভাল।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১

॥ ২ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ কিন্তু ইহাদের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই উৎকৃষ্টতর ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসমার্গের পক্ষপাতী নহেন। সন্ন্যাসমার্গী ভাষ্যকার ও টীকা-কারগণ এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উক্তির নানা প্রকার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। সন্ন্যাসই একমাত্র সাংখ্যমার্গ এই ধারণা অনেককে ভ্রান্ত করিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের নিন্দা করিবেন তাহা হইতে পারে না, কাজেই তাঁহাদের এই শ্লোকের অর্থ বদলাইতে হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের বিশেষ এই যে, তিনি কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ দুষ্ট বলেন নাই। সন্ন্যাসমার্গের যাহা কিছু ভাল শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন ও কর্মমার্গে থাকিয়াও কি করিয়া সন্ন্যাসীর মত শ্রেয়োলাভ হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসের এক অভিনব নির্বচন দিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। নিত্যকর্মশীল গৃহীও সন্ন্যাসী পদবাচ্য হইতে পারে। কি অবস্থায় গৃহীর ও সন্ন্যাসীর পার্থক্য থাকে না পরের শ্লোকগুলিতে তাহার আলোচনা আছে।

॥ ৩ ॥ যিনি কোন বস্তু বা বিষয়ে দ্বেষও করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তিনি নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাত হন; কারণ, মহাবাহো, রাগদ্বেষ-দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসীকে যে গৃহত্যাগী হইতে হইবে এখানে তাহা বলা হইল না। সংসারে থাকিয়া দ্বন্দ্বহীন হইয়া সর্বদা সর্বপ্রকার কর্ম করিলেও মনুষ্য সন্ন্যাসী পদবাচ্যই হইয়া থাকে। ইহাই কৃষ্ণের অনুমোদিত সন্ন্যাস।

॥ ৪-৫ ॥ বালবুদ্ধি ব্যক্তি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম-মার্গকে পৃথক বলে কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। এই দুইয়ের যে কোনটিকে

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

সম্যক আশ্রয় করিলে উভয়ের ফললাভ হয়। জ্ঞানযোগলভ্য স্থানে কর্মযোগ দ্বারাও যাওয়া যায়। যিনি সাংখ্য ও যোগ এক দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৪ - ৫ ॥

এই দুই শ্লোকে সাংখ্য শব্দে সাধারণ ভাবে জ্ঞানমার্গই বুঝাইতেছে। সাংখ্যান্তরগত সন্ন্যাসনিষ্ঠার কথা বিশেষ করিয়া পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

॥ ৬ ॥ কিন্তু মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাসলাভ কষ্টকর। কর্মযোগ-পরায়ণ সাধক অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন ॥ ৬ ॥

কর্মত্যাগে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে বলিয়া বুদ্ধি স্থির হয় না ও ব্রহ্মলাভ কঠিন হয়। এই শ্লোকেও বুঝা যায় সন্ন্যাসমার্গ বলিলে সাধারণে যাহা মনে করে অর্থাৎ সংসারত্যাগ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমোদন করেন না। গৃহত্যাগ কখনই আচরণীয় নহে এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। কারণ প্রবৃত্তিভেদে কাহারও কাহারও সংসারত্যাগ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। সংসারে থাকিলেই বন্ধন হইবে এমন কথা ঠিক নহে।

॥ ৭ ॥ যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বভূত যাঁহার আত্মাতে উপলব্ধ হইয়াছে এমন ব্যক্তি কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

কেবল যে সন্ন্যাসমার্গেই সংসার বন্ধন কাটান যায় তাহা নহে, যোগযুক্ত সংসারীরও বন্ধন হয় না ইহাই বলা উদ্দেশ্য। শ্লোকে সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কথা আছে। ব্রহ্মের যে ভাব সর্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত তাহাকে সমষ্টিতে ভূতাত্মা কহে। যিনি নিজ আত্মাতে এই ভূতাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সর্বভূতাত্মভূতাত্মা।

॥ ৮ - ৯ ॥ তত্ত্ববিৎ যোগযুক্ত হইয়া বুঝিবেন যে, তিনি অর্থাৎ তাঁহার আত্মা কিছুই করিতেছেন না। স্বভাববশে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্তিত হইতেছে

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

ও তাহার বশেই তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, ঘ্রাণ করিতেছেন, আহার করিতেছেন, গমন করিতেছেন, ঘুমাইতেছেন, শ্বাস ফেলিতেছেন, কথা বলিতেছেন, মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন, চক্ষু উন্মীলিত নিমীলিত করিতেছেন, এবং এই সকল করিয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় আছেন ॥ ৮ - ৯ ॥

এখানে তাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের কাজের কথা বলা হইয়াছে; উদ্দেশ্য এই যে, সন্ন্যাসী হইয়া ইচ্ছাপূর্বক সকল কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করিলেও এই সকল কর্ম ত্যাগ হয় না। অতএব সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নিজেকে নিষ্ক্রিয় বলিলেও তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। যে ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ ও যোগযুক্ত কেবল তিনিই নিষ্ক্রিয়। কারণ তিনি বুঝিতে পারেন সকল কার্যে তাঁহার আত্মা নির্লিপ্তই রহিয়াছে; কর্মবন্ধন এড়াইবার জন্য সংসারত্যাগ বৃথা। তত্ত্ববিদের সংসারত্যাগের কোনই প্রয়োজন নাই। নিজ স্বভাবজাত প্রবৃত্তি যদি তাঁহাকে সংসারী করে তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ন হন না।

॥ ১০ ॥ যিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়া ও ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া কর্মসকল করেন, পদ্মপত্র জলদ্বারা যেরূপ লিপ্ত হয় না তিনি সেইরূপ পাপদ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মে কর্মসমর্পণ কাহাকে বলে তাহা বিচার্য। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে আছে কর্মের উদ্ভব ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রহ্মা অক্ষরপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন অতএব ব্রহ্ম সর্ব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। যাঁহার আত্মোপলব্ধি হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিই কাজ করিতেছে এই জ্ঞানে প্রকৃতিতেই কর্ম সমর্পণ করেন ও কর্তৃত্বাভিমান রাখেন না। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়া শক্তি অতএব প্রকৃতি কর্ম করিতেছে বুঝিলে ব্রহ্মে কর্মসমর্পণ করা হইল। পরের শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'রাজবিদ্যা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

॥ ১১ - ১২ ॥ যোগীরা অর্থাৎ যাঁহারা কর্মযোগ অবলম্বন করিয়াছেন আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম করেন অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মা নির্লিপ্ত থাকে। যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ ত্যাগ বা সন্ন্যাসনিষ্ঠালভ্য শান্তি প্রাপ্ত হন কিন্তু অযুক্ত পুরুষ কামের প্রেরণায় ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনপ্রাপ্ত হয় **॥ ১১ - ১২ ॥**

নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থ নিষ্ঠাজনিত। ৫।৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে স্থান সাংখ্য দ্বারা পাওয়া যায় অর্থাৎ যে পদ জ্ঞানলভ্য তাহা কর্মযোগ দ্বারাও পাওয়া যায়। এখানে বলিতেছেন কর্মযোগীও সেই জ্ঞাননৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। কামনাযুক্ত কর্মেই বন্ধন। কামনা পরিত্যাগ করিলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যক নাই।

॥ ১৩ - ২৪ ॥ বশী অর্থাৎ বিজিতেন্দ্রিয় দেহধারী পুরুষ সর্বকর্ম মনের দ্বারা বর্জন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে নির্লিপ্ত রাখিয়া স্বয়ং কিছু করিতেছেন না এবং কিছু করাইতেছেন না এই বোধযুক্ত হইয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরে সুখে অবস্থান করেন। প্রভু আত্মা লোকের কর্তৃত্বাভিমান সৃষ্টি করেন নাই, তিনি কর্মও সৃষ্টি করেন নাই এবং তাহাতে ফল সংযোগও করেন নাই। প্রকৃতিজাত স্বভাবের দ্বারাই এই সমস্ত প্রবর্তিত হইতেছে। বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী আত্মা সর্ববিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট থাকিলেও কর্মজনিত পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না। এই জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকায় জীবের উপলব্ধি হয় না এবং তাহাতেই জীব মোহপ্রাপ্ত হইয়া কষ্ট পায় কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের এই অজ্ঞান নাশিত হইয়াছে তাঁহাদের জ্ঞান মেঘনির্মুক্ত সূর্যের ন্যায়

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪

পরমতত্ত্বকে প্রকাশিত করে। আত্মাতেই যাঁহাদের বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট, আত্মার সহিত যাঁহারা নিজ ঐক্য বুঝিয়াছেন, আত্মার প্রতিই যাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মাই যাঁহাদের চরম গতি তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং পুনরাবর্তন হয় না। এই প্রকার জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, বৃষে, হস্তীতে, কুক্কুরে এবং শ্বপাকে অর্থাৎ কুক্কুরভোজী চণ্ডালে সমদর্শী হন। এই প্রকার সাম্য যাঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই সংসার জয় করিয়াছেন; তাঁহাদের মন ব্রহ্মবৎ পক্ষপাতহীন ও সমদৃষ্টিযুক্ত হওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া প্রিয়বস্তুলাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তুতেও উদ্বিগ্ন হন না। বহির্বিষয়ে অনাসক্ত, ব্রহ্মযোগে অবস্থিত ব্যক্তি আত্মাতেই যে সুখ বিদ্যমান আছে সেই অক্ষয় সুখ ভোগ করেন; কারণ, কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয় সহিত বহির্বিষয়সংযোগজাত যে সুখ তাহা আদি-অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা পরিণামে দুঃখের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে; জ্ঞানী তাহাতে রত হন না। যিনি শরীর ধারণ করিয়া জীবিতাবস্থাতেই ইহলোকে কামনা ও ক্রোধজনিত বেগ সহ্য করিতে বা শান্ত করিতে পারেন অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা যিনি বিচলিত হন না তিনিই যোগযুক্ত, তিনিই সুখী। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার রতি এবং আত্মাকেই যিনি জ্যোতিঃস্বরূপে উপলব্ধি করেন সেই যোগী ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ - ২৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

এখানে যোগী শব্দে কর্মযোগী বুঝাইতেছে। পাতঞ্জল যোগের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আছে। এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে এবং আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করিলে সংসারে থাকিয়াও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর লভ্য সুখদুঃখে অবিচলিত ভাব, সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্ন্যাস মার্গের অর্থাৎ কর্মত্যাগের কোনও বিশেষ আবশ্যক নাই ইহা দেখাইবার জন্য পরবর্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে যে সর্বভূতহিতে রত থাকিয়াও ঋষিরা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, প্রাণায়াম-ক্রিয়াপরায়ণ যতি, মুনিরাও ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি আমাকেই যজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদির ভোক্তা, সর্বলোকের ঈশ্বর ও সর্বভূতের হিতসাধক বলিয়া জানেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা, সর্বভূতের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মুক্ত হন। যজ্ঞ, তপস্যা, লোকহিতকর কর্মে নিযুক্ত থাকা সন্ন্যাসীরা অকর্তব্য মনে করেন, সে জন্যই এই সকল শ্লোকের অবতারণা।

গীতার ৫।১৩ শ্লোকে দেহকে নবদ্বারপুর বলা হইয়াছে। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ, এই নয়টি দেহরূপ পুরের দ্বারা। কঠোপনিষদে ৫।১ শ্লোকে দেহকে একাদশদ্বার পুর বলা হইয়াছে। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বার মনুষ্যের বহির্জগতের সহিত আদানপ্রদানের পথ। দেহকে নগর বা গৃহের সহিত তুলনা অতি প্রাচীন। আশ্চর্যের কথা এই যে, স্বপ্নে গৃহ বা নগর দেহের প্রতীকরূপেই দেখা দেয়। এতগুলি আগম নির্গমের পথ

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১
যেহি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

থাকায় দেহপুরে সর্বদাই নানাপ্রকার বিক্ষোভ ও উপদ্রব অবশ্যম্ভাবী। আত্মা এত বিক্ষোভযুক্ত পুরে অবস্থান করিয়াও নির্লিপ্ততা বশত সুখে অচল থাকেন। নিজেও কর্ম করেন না এবং মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকেও কর্মে নিযুক্ত করেন না। ৫।১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে, যোগযুক্ত ব্যক্তি কেবল মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণদ্বারা কর্ম করেন, তাঁহার আত্মা নির্লিপ্তই থাকে। ৫।১৩ শ্লোকে মন দ্বারা কর্মসন্ন্যাসের কথা আছে। এই কর্মত্যাগ আত্মা পক্ষে। যে মন দ্বারা বুঝা যায় যে কেবল মনই কাজ করে আত্মা নহে সেই মন দ্বারাই আত্মার কর্মসন্ন্যাসও উপলব্ধ হয়। এজন্য ১১ শ্লোকের মন দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হওয়ার কথা এবং ১৩ শ্লোকে মন দ্বারা কর্মত্যাগের কথা পরস্পর বিরোধী নহে।

সমদৃষ্টির উদাহরণে ৫।১৮ শ্লোকে একদিকে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও অপর দিকে ঘৃণিত চণ্ডাল ও কুকুরের কথা বলা হইয়াছে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ ব্যক্তি। কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া যজ্ঞোপবীতধারী হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। গুণকর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাসম্পন্ন ও বিনয়সম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ। বিনয় শব্দের অর্থ বিদ্যালব্ধ আচারনিষ্ঠা বা discipline।

॥ ২৫ ॥ যাঁহাদের কালুষ্য ক্ষয় হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের পাপাদি দোষ নষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের মন সংশয়শূন্য হইয়াছে, যাঁহারা আত্মসংযমশীল এরূপ ঋষিগণও সর্বভূত হিতে রত থাকিয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

সর্বভূতহিতে রত কথার অর্থ শংকর অহিংসাপরায়ণ করিয়াছেন। জীবের অনিষ্ট না করাই একমাত্র হিত কর্ম্ম নহে। সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধন হিত শব্দের অন্তর্গত। ঋষিরা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সৃষ্টিচক্র প্রবর্তিত রাখিতে সাহায্য করেন এ জন্যই তাঁহাদের সর্বভূতহিতে রত বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

॥ ২৬ ॥ কামনা ও ক্রোধশূন্য সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী যতিগণ উভয়ত অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

ইহলোকেই কি করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ হয় তাহা বলিতেছেন,

॥ ২৭ ॥ বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি রোধ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নাসার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে সম করিয়া অর্থাৎ সংযত করিয়া সমাধি অবস্থায় ইহলোকেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয় ॥ ২৭ ॥

প্রায় সকল ভাষ্যকারই ২৭ শ্লোকের অন্বয় ২৮ শ্লোকের সহিত করিয়াছেন। ২৮ শ্লোকে মুনিদের কথা আছে এবং ২৬ শ্লোকে যতিদের কথা আছে। ২৭ শ্লোকে বর্ণিত প্রাণায়াম সাধনা যতিদেরই সাধনা। ৪।২৯ শ্লোকেও প্রাণায়ামের কথা আছে এবং তাহার পূর্ববর্তী শ্লোকেই যতিদের কথা বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম যতিদেরই বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি ছিল বলিয়া মনে হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাণায়াম সম্পর্কে মুনিদের কোন উল্লেখ নাই। পরিশিষ্টে প্রাণায়ামের আলোচনা দ্রষ্টব্য। মুনি শব্দের ধাতুগত অর্থ মননশীল ব্যক্তি। মানসিক সাধনাই মুনিদের সাধনা। পরের শ্লোকেও তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

॥ ২৮ ॥ যে মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ, যাঁহার কামনা, ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে তিনি সর্বদা মুক্ত অবস্থাতেই আছেন ॥ ২৮ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫-২৮ শ্লোকের তাৎপর্য কেবল যে কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী মোক্ষলাভের অধিকারী তাহা নহে। মুনি, ঋষি ও যতিগণ কর্মযুক্ত সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। ৬ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে পাতঞ্জল যোগীও কর্মময় সাধনায় মুক্ত হন।

১॥ ২৯ ॥ আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তারূপে, সর্বলোকের মহেশ্বররূপে অর্থাৎ সর্বলোককে আমিই প্রবর্তিত করিতেছি, এবং সর্বভূতের সুহৃদরূপে অর্থাৎ সর্বভূতের আমিই হিতসাধনে রত আছি জানিলে সাধক শান্তিলাভ করেন ॥ ২৯ ॥

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে যজ্ঞাদি কর্মের ভোক্তা হইয়াও লোকসমূহের কর্তৃত্ব ও হিতসাধন করিয়াও ভগবান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবই থাকেন অতএব

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

সাধকও ইহা বুঝিয়া যজ্ঞাদি কর্মের বন্ধনে পতিত হয় না; তাহাকে সন্ন্যাসী হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টায় সর্বভূতের মঙ্গলজনক উত্তম কর্মসমূহ হইতেও বিরত হইতে হয় না। পরের অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি নিষ্কামভাবে কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। যজ্ঞাদি ক্রিয়া বর্জন করিলেই বা নিষ্ক্রিয় থাকিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না। সামাজিক আদর্শ গীতায় সর্বত্র উচ্চ স্থান পাইয়াছে।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

সন্ন্যাসযোগ নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

ষষ্ঠ অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে সংসারত্যাগ না করিয়াও সন্ন্যাসীর লভ্য সর্বভূতে সমবুদ্ধি, শান্তি ও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা যায়; সর্বভূতহিতে রত থাকিয়াও ঋষিরা ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, যতি ও মুনিগণ নিজ নিজ কর্মময় সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ব্রহ্মলাভের জন্য সন্ন্যাসই একমাত্র উপায় নহে এবং কর্মত্যাগে বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পাতঞ্জল যোগের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, এই উপায়েও ব্রহ্মলাভ হয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে যে যোগের কথা আছে আমি তাহাকেই পাতঞ্জল যোগ নামে অভিহিত করিতেছি। এই যোগ পতঞ্জলির বহুকাল পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল এবং ইহার নানাপ্রকার অনুষ্ঠানপদ্ধতি ছিল। পতঞ্জলি সূত্রাকারে তৎকালপ্রচলিত যোগ সাধনার সমস্ত উপদেশ একত্রিত করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাস বা সূত্রকার এবং সম্ভবত তিনিই যোগসূত্রের ব্যাসভ্যায্য প্রণেতা। পতঞ্জলি কৃষ্ণের বহু পরবর্তী কালের ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়।

॥ ১ – ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, যিনি কর্মফলের উপর নির্ভর না করিয়া কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিহোত্রাদি বর্জন করিলেই

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

এবং নিষ্ক্রিয় থাকিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না। পাণ্ডব, সন্ন্যাস ও যোগকে এক বলিয়াই জানিবে, কারণ যাঁহার কর্মে সংকল্প ত্যাগ হয় নাই তাঁহাকে কখনও যোগী বলা যায় না॥ ১ – ২॥

নিরগ্নি কথার অর্থ যিনি অগ্নি রক্ষা করেন না। পূর্বকালে গৃহস্থের পক্ষে অগ্নিরক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা অগ্নি রাখিতেন না। যে প্রতিজ্ঞা বা উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম করা হয় তাহার নাম সংকল্প।

এই দুই শ্লোকে যোগী কথায় পাতঞ্জলযোগী বুঝাইতেছে। পরবর্তী শ্লোকসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগ বিবৃত হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগ কর্মযোগেরই অন্তর্গত।

॥ ৩॥ পাতঞ্জল যোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির আরুরুক্ষু অবস্থায় কর্মই সাধনা এবং যোগারূঢ় অবস্থায় শম অর্থাৎ মননিগ্রহই সাধনার উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ৩॥

শংকরাচার্য এই শ্লোকে শম কথার অর্থ উপশম অর্থাৎ সর্বকর্ম হইতে নিবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে যোগারূঢ় সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিবেন। তিলক বলেন, 'পূর্বার্ধে শমের কারণ কর্ম কখন হয় তাহা বলিয়া উত্তরার্ধে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্মের কারণ শম কখন হয়। ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে কর্মই শমের অর্থাৎ যোগসিদ্ধির কারণ। ভাব এই যে যথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতেই চিত্ত শান্ত হইয়া উহা দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগ সিদ্ধ হয়, কিন্তু যোগী যোগারূঢ় হইয়া সিদ্ধাবস্থাতে পৌঁছিলে পর কর্ম ও শমের উক্ত কার্যকারণ ভাব বদলাইয়া যায় অর্থাৎ কর্ম শমের কারণ হয় না কিন্তু শমই কর্মের কারণ হইয়া যায়, অর্থাৎ যোগারূঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য এক্ষণে কর্তব্য বুঝিয়া ফলের আশা না রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়া যান। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ ইহা নহে যে, সিদ্ধাবস্থায় কর্ম দূর হয়। গীতায় কোথাও উক্ত হয় নাই, যে কর্মযোগীর শেষে

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

কর্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্যও নাই। অতএব অবসর পাইয়া কোন প্রকারে গীতার মধ্যস্থিত কোনও শ্লোকেরই সন্ন্যাসমূলক অর্থ লাগানো উচিত নহে।'

এই শ্লোকের শম ও যোগারূঢ় কথা দুইটির অর্থ লইয়াই যত মতভেদ। শম কথার অর্থ শংকরমতে উপশম বা কর্মনিবৃত্তি, তিলকের মতে যোগসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের অবতারণা করিয়াছেন, অতএব পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেই এই দুই শব্দের যথার্থ অর্থ পাওয়া যাইবে।

পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের মতে যোগসিদ্ধিকামী সাধকদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, (১) আরুরুক্ষু, (২) যুঞ্জান এবং (৩) যোগারূঢ়। আরুরুক্ষু সাধক যোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক হইয়া সাধনার নিম্ন স্তরে আছেন, ধ্যান ও সমাধির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এ সকল তাঁহার আয়ত্তে এখনও আসে নাই। যুঞ্জান সাধক মধ্যমাধিকারী; তিনি মোক্ষকামী হইয়া যোগসাধনার দ্বারা ভগবানে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছেন। যোগারূঢ় সাধকেরা উচ্চাধিকারী। পূর্বজন্মেই তাঁহাদের যৌগিক সাধনাগুলি আয়ত্ত থাকায় তাঁহারা একেবারেই সর্বোচ্চ সাধনায় রত হইতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা প্রণীত ইংরেজী যোগদর্শনের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

গীতায় যোগমার্গের সাধকদিগকে উচ্চ ও নিম্ন অধিকার হিসাবে মাত্র দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গীতার আরুরুক্ষু এবং যোগারূঢ় এই দুইটি শব্দ পারিভাষিক শব্দ এবং যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চাধিকারী সাধক বুঝাইতেছে। যোগারূঢ় মানে যোগসিদ্ধ নহে। যোগারূঢ়ের সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির চেষ্টা আছে কিন্তু তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই সে জন্য এখনও তাঁহার সাধনার আবশ্যক আছে। গীতায় যোগসিদ্ধকে যুক্ত বলা হইয়াছে ॥ ৬।৮ ॥

পাতঞ্জল শাস্ত্রে অধিকারভেদে তিন প্রকার সাধকের ভিন্ন ভিন্ন সাধনার উল্লেখ আছে। নিম্নাধিকারীর অর্থাৎ আরুরুক্ষুর সাধনা পাতঞ্জল সূত্রের দ্বিতীয় পাদের ২৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা, (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি। প্রথমাবস্থার মূল সাধনাগুলি প্রধানত কর্মময়, এই জন্যই গীতায় বলা হইল আরুরুক্ষুর কর্মই সাধনা।

পাতঞ্জলসূত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রে যুঞ্জান সাধকের অর্থাৎ মধ্যমাধিকারীর সাধনা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ, অর্থাৎ (১) তপ, (২) অধ্যয়ন ও (৩) ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াই মধ্যমাধিকারী যোগাবলম্বীর সাধনা। অতএব যোগশাস্ত্রেও নিম্ন ও মধ্যমাধিকারীর সাধনাকে কর্মপ্রধান বলা হইয়াছে। গীতায় আরুরুক্ষু শব্দে এই দুই প্রকার সাধকই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানকে দূরস্থ গন্তব্যস্থান ও পাতঞ্জলযোগকে অশ্বের সহিত তুলনা করিলে বলা যায় যে, আরুরুক্ষু সাধক ব্রহ্মপুরে যাইবার অভিলাষে অশ্বারোহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন মাত্র, এখনও তিনি অশ্বসংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; যুঞ্জান সাধক অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ অশ্বযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও অশ্বারোহণে সক্ষম হন নাই; যোগারূঢ় সাধক কেবল অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন কিন্তু এখনও তিনি ব্রহ্মপুরে পৌছান নাই। যুক্ত সাধক ব্রহ্মপুরে পৌঁছিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়াছেন। যোগারূঢ়ের সাধনা পাতঞ্জল সূত্রের প্রথম পাদে ১২ হইতে ১৬ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যথা, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সমুদয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়; চিত্তস্থৈর্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস, বহুকাল শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে এই অভ্যাস দৃঢ় হয়; দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে নিস্পৃহতার নাম বশীকার বৈরাগ্য; ইহা হইতে পরা বৈরাগ্য বা প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে; ইহাই যোগের অসাধারণ উপকরণ। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ১।৩৩ হইতে ৩৯ সূত্রে চিত্তস্থৈর্যের জন্য উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা অর্থাৎ পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপে যথাক্রমে সুখী, দয়ালু, আনন্দিত ও উদাসীন হইবার চেষ্টা, প্রাণায়াম, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে ধারণা ও ধ্যান দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয়ানুভূতির চেষ্টা, ধ্যান দ্বারা বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী নামক শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা, বৈরাগ্যযুক্ত অপর ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কল্পনা ও ধ্যান, স্বপ্নাবস্থা বা নিদ্রাবস্থার ধ্যান অথবা যে কোন প্রিয় বস্তুর ধ্যান। এই সমস্ত উপায় দ্বারা চিত্তস্থৈর্য আয়ত্ত হয়। চিত্তস্থৈর্যই যোগারূঢ়ের সাধনা, এজন্য গীতায় শম অর্থাৎ মনের স্থিরতাকে যোগারূঢ়ের সাধনা বলা হইয়াছে। শম মানে উপশম বা কর্মনিবৃত্তি বা যোগসিদ্ধি নহে। গীতায় ৬।৩ শ্লোক ব্যতীত ১০।৪, ১১।২৪ ও ১৮।৪২ শ্লোকে শম কথার উল্লেখ আছে। শংকরও এই সকল শ্লোকে শমের অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়ের উপশম বা মনের স্থিরতা বলিয়াছেন।

॥ ৪ ॥ যখন সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্তি থাকে না অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ই সংযমিত হইয়াছে তখন সেই সর্বসংকল্পপরিত্যাগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৪ ॥

যোগারূঢ় অবস্থা সিদ্ধাবস্থায় বা যুক্তাবস্থায় পৌঁছিবার সোপানমাত্র ; এই অবস্থায় পৌঁছিয়াও সাধনার আবশ্যক। এই জন্যই পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা।

॥ ৫ - ৬ ॥ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু অতএব আত্মার দ্বারা আত্মাকে উন্নত করিবে, আত্মাকে পতিত হইতে দিবে না। আত্মাকর্তৃক আত্মা জিত হইলে সেই আত্মা আত্মার বন্ধু হয়। অনাত্মের আত্মা অর্থাৎ অজিত আত্মা শত্রুবৎ ব্যবহার করে ॥ ৫ - ৬ ॥

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, যোগারূঢ় ব্যক্তি শমাদি সাধনার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সুখদুঃখে এবং সর্ববিধ সংসারকর্মে আত্মা নির্লিপ্ত আছেন এই অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবেন। আত্মজ্ঞান জন্মিলে সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তি হয়। পরবর্তী শ্লোকের তাহাই বক্তব্য।

॥ ৭ - ৯ ॥ জিতাত্মা অর্থাৎ যিনি আত্মাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত বা নির্লিপ্ত করিয়াছেন, প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ যাঁহার মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ বা স্থির হইয়াছে,

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

এইরূপ ব্যক্তির আত্মাই পরমাত্মারূপে প্রকাশ পায় এবং সেই পরমাত্মা শীত-গ্রীষ্মাদিরূপ শারীরিক দ্বন্দ্ব ও সুখ-দুঃখ, মান-অপমানরূপ মানসিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সমাহিত বা নির্বিকার থাকে। এই প্রকার অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চনে সমদর্শী সেইরূপ যোগীকে যুক্ত বলা যায়। তিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, অপ্রিয় ব্যক্তি, প্রিয় ব্যক্তি, সাধু ও পাপীতে সমবুদ্ধি বা সমদর্শী বলিয়া খ্যাত হন ॥ ৭ - ৯ ॥

৭ শ্লোকে জিতাত্মা শব্দ আছে। মৎস্যপুরাণ মতে জিতাত্মা শব্দের অর্থ যিনি পঞ্চাত্মক বিষয়ে ও অস্টলক্ষণ কারণে প্রতিহত হইয়াও ক্রুদ্ধ হন না॥ ১৪৫ অধ্যায় ॥ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরাই সাধারণত সমবুদ্ধিযুক্ত বা সমদর্শী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; সন্ন্যাস লাভের পরই সমদৃষ্টির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সন্ন্যাস মার্গের আলোচনায় ৫।১৮ শ্লোকে ও পরে ৯।২৮-২৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, কর্মীরও সমবুদ্ধি লাভ হয়, এখানে বলিতেছেন, পাতঞ্জল যোগীও ভগবানে যুক্ত হইলে সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হন। সুহৃৎ, মিত্র ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যত প্রকার সম্পর্ক হইতে পারে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুহৃৎ অর্থে অন্তরঙ্গ সখা, যিনি হিতৈষী তাঁহাকে মিত্র বলা হয়, যাঁহার সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা কোন সম্বন্ধই নাই তিনি উদাসীন, যিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের কল্যাণকামী তিনি মধ্যস্থ, যাঁহাকে ভাল লাগে না তিনি দ্বেষ্য ও প্রিয়ব্যক্তি বন্ধু নামে অভিহিত হন। ৬।৮ শ্লোকের বিজিতেন্দ্রিয় শব্দের অর্থ যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় প্রতি ধাবিত হয় না। এই শ্লোকের কূটস্থ শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। 'কূট শব্দের আভিধানিক অর্থ গিরিশৃঙ্গ, নিশ্চল লৌহকীলক বা ধুর যাহা আবর্তিত হয় না, গুপ্ত। কূটস্থ (১) উচ্চে অবস্থিত, অতএব অন্যের সহিত নিঃসম্পর্ক, isolated, উচ্চ স্থান হইতে সর্বদিক যুগপৎ অবলোকনশীল, সর্বসাধারণজ্ঞানৈকাকারাত্মনি স্থিতঃ ॥ রামানুজ ॥ (২) স্থাণু, অপ্রকম্প ॥ শঙ্কর ॥ (৩) নির্বিকার ॥ শ্রীধর ॥ (৪) লুক্কায়িত, গুহাহিত, সাধারণের অবোধ্য, mysterious' ॥ রাজশেখর বসু ॥ কূট শব্দের আরও অর্থ আছে, যথা, ছল ও গৃহ। কূট শব্দ হইতে কূটী, যথা, মূলগন্ধকূটী বিহার, কূটস্থ যিনি মায়ার দ্বারা বা ছলনার দ্বারা বদ্ধ, অথবা যিনি গৃহে বা দেহে অবস্থিত অর্থাৎ জীবাত্মা। গীতার ১৫।১৬ শ্লোকে অক্ষর বা অবিনাশী আত্মাকে কূটস্থ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার যে অবিকারী

অংশ জীবাত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে পঞ্চদশী নামক বেদান্তশাস্ত্রে তাহাকেও কূটস্থ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গীতার ৬।৮ শ্লোকে কূটস্থ শব্দ যোগীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অবিচলিত, অপ্রকম্প, নির্লিপ্ত ইত্যাদি অর্থই সংগত। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা শব্দের অর্থ যাঁহার আত্মা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যুক্তিবিচারসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়া সংসার প্রতি ধাবমান হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

রামমোহন রায় বলেন, 'যোগারূঢ় তিন প্রকার হয়েন। প্রথম (যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ইত্যাদি ৬।৪) যে কালে সকল সংকল্পকে মনুষ্য ত্যাগ করে, অতএব ইন্দ্রিয়বিষয়সকলে ও কর্মে আসক্ত না হয় সে কালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়। এ প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ যোগারূঢ় হয়েন।…পরে গীতাতে পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ইত্যাদি ৬।৮) অর্থাৎ গুরূপদেশ, জ্ঞান ও পরোক্ষানুভব ইহার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, অতএব নির্বিকার ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয় বিশিষ্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি তাঁহার হয়, তাঁহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহি। যুক্ত যোগারূঢ়কে পূর্বোক্ত যোগারূঢ় হইতে উত্তম কহিলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও নির্বিকার ভাব ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয় ও পাষাণ ও সুবর্ণে সমভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে নাই, এ নিমিত্ত তেঁহো যুক্ত যোগারূঢ়ের তুল্য গণিত হয়েন না। পরে মধ্যম যোগারূঢ় হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন (সুহৃন্মিত্রা ইত্যাদি ৬।৯) অর্থাৎ স্বভাবত যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহবশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও দ্বেষের পাত্র ও সম্পর্কীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি যাঁহার তিনি সর্বোত্তম যোগারূঢ় হয়েন। যেহেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে প্রাপ্ত হয়।' ॥ রামমোহন রায় গ্রন্থাবলী ২৯৩-২৯৪ ॥ শংকর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ তিন প্রকার যোগারূঢ়ের উল্লেখ না করিলেও ৬।৯ শ্লোকের বিশিষ্যতে শব্দের সর্বাপেক্ষা উত্তম এই অর্থ ধরিয়া যোগারূঢ়ের শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। রামমোহন রায় ৬।১ শ্লোকে যুক্ত শব্দকে মধ্যম যোগারূঢ়ের বিশেষণ করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যকারগণ যোগমার্গী সাধকদিগের মধ্যে উচ্চাধিকারী সাধককে যোগারূঢ় বলেন। তাঁহারা যোগারূঢ়ের কোন শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। ৭, ৮ এবং ৯ শ্লোকে যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ অতএব তাহা

যোগারূঢ় অবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই ৬।৮ শ্লোকে সিদ্ধাবস্থায় যোগীর বিশেষণরূপে যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যুক্ত শব্দ যোগারূঢ়ের বিশেষণ নহে। ৬।৪ শ্লোকে যোগারূঢ়ের নির্বচন দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরেই ৬।৫-৬ শ্লোকে যোগারূঢ়ের প্রতি আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টার উপদেশ আছে। যোগারূঢ়ের শ্রেণীবিভাগ দেখাইতে হইলে মধ্যে এই দুই শ্লোক আসিত না। পুনশ্চ যাহার শীতগ্রীষ্ম, মানঅপমান সমান হইয়া মৃত্তিকাকাঞ্চনে সমবুদ্ধি হইয়াছে ও যিনি কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তাঁহার যে সমাজের বিভিন্ন মনুষ্যের প্রতি সমবুদ্ধির উদয় হয় নাই একথা মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ৮ ও ৯ উভয় শ্লোকেই সমবুদ্ধির কথা আছে, অতএব এই দুই শ্লোকে বিভিন্ন অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে মনে হয় না। শংকর ৬।৯ শ্লোকে বিশিষ্যতে স্থানে বিমুচ্যতে এইরূপ পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও যোগারূঢ়ের শ্রেণীবিভাগ সমর্থিত হয় না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগী, যোগারূঢ় ও যুক্ত এই কয়টি শব্দের পার্থক্য সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যিনি পাতঞ্জল যোগের সাধনা করেন তিনি যোগী ; নিম্ন উচ্চাধিকার ভেদে যোগী আরুরুক্ষু ও যোগারূঢ় নামে অভিহিত হন। সমাধিতে সফল হইলে সাধক যোগযুক্ত হন অর্থাৎ যোগরূপ উপায় তাঁহার আয়ত্ত হয়। এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ যোগী বলা যায় না, কারণ উপায় তাঁহার জানা থাকিলেও তিনি এখনও আত্মোপলব্ধি করেন নাই। তিনি এখনও সিদ্ধ বা মুক্ত নহেন। আত্মার উপলব্ধির জন্য যোগ প্রযুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে। ৬।১৮ শ্লোকে আছে যখন চিত্ত বহির্বস্তু হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে এবং যখন সমস্ত কামনা নিবৃত্ত হয় তখনই যুক্ত অবস্থা বলা যায়। যুক্ত যোগীর সর্বত্র সমদর্শন হয়। সর্বত্র অর্থে মৃত্তিকা প্রস্তরাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যাদি সমুদয় পদার্থ। ৬।২৯ শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণনা আছে। যোগযুক্ত ও যুক্ত যোগীতে পার্থক্য আছে। যোগযুক্ত অর্থে যিনি যোগের অধিকারী অপর পক্ষে যুক্ত অবস্থাই মুক্ত অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় সাধক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়া যান। বিভূতি লাভের জন্য ব্যগ্র না হইয়া যে যোগী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন তাঁহাকে ৬।৩২ শ্লোকে পরমযোগী বলা হইয়াছে।

গীতার ৬।৪৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মপরায়ণ যোগী যখন ভগবানের ভজনায় রত থাকেন অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন তখন তাঁহাকে যুক্ততম বলা

হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ সাধনার উপদেশ আছে। ২।১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে একমাত্র আত্মতত্ত্বদ্রষ্টা দেহী কৃতার্থ ও বিগতশোক হন। ২।১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যুক্ত সাধক যখন দীপতুল্য আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন তখন তিনি অজ, ধ্রুব, বিশুদ্ধ দেবকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন। শ্বেতাশ্বতরও যুক্ত যোগীকে মুক্ত পুরুষ বলিতেছেন। অতএব যুক্তাবস্থা যোগারূঢ়ের কাম্য, তাহা রামমোহন কথিত যোগারূঢ়ের মধ্যমাবস্থা নহে।

শমগুণসম্পন্ন যোগারূঢ় সাধক কি করিয়া আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করিবেন তাহার উপদেশ দিতেছেন।

॥ ১০ ॥ যোগী নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করিয়া দেহ ও মন সংযত করিয়া ফলাশাশূন্য ও বিষয়ভোগে উদাসীন হইয়া সতত নিজেকে যোগসাধনে নিয়োজিত করিবেন ॥ ১০ ॥

নির্জন স্থানে একাকী থাকিবার উপদেশের অর্থ এই যে চিত্ত বিক্ষেপের কারণ থাকিবে না। যোগাভ্যাসের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া একাকী পর্বতগুহায় যাইতে হইবে এমন উদ্দেশ্য নহে। সতত অর্থাৎ 'সর্বদা, ঘন ঘন ; নিরবচ্ছিন্ন এমন তাৎপর্য নয়' ॥ রাজশেখর বসু ॥ যতচিত্তাত্মা কথার আত্মা শব্দের অর্থ দেহ, কারণ পরবর্তী শ্লোকে চিত্ত ব্যতীত দেহকেও সংযত করিবার উপদেশ আছে। অথবা যতচিত্তাত্মা শব্দ ধর্মাত্মা শব্দের অনুরূপ ও ইহার অর্থ যিনি সংযতচিত্ত।

॥ ১১ - ১৫ ॥ তিনি নির্মল স্থানে স্থির, অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম ও বস্ত্র উপরি উপরি বিছাইয়া আপনার আসন স্থাপন করিবেন ; সেই আসনে

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বংদিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

উপবেশন করিয়া দেহ, মস্তক ও গ্রীবা ঋজু ও নিশ্চল রাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হইবেন। প্রশান্তমনা, বিগতভয় অর্থাৎ সিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ভয়, ব্রহ্মচর্যব্রতধারী যোগী মনঃসংযম করিয়া মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া যুক্ত হইবেন। এই প্রকার সংযতচিত্ত যোগী সর্বদা আপনাকে যুক্ত রাখিলে নির্বাণপরমা ব্রহ্মাশ্রিতা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১১ – ১৫ ॥

গীতার ৬।১৪ শ্লোকে ব্রহ্মচারিব্রত শব্দ আছে। ব্রহ্মচারিব্রত যথা, শৌচ, ব্রত ও আচার অনুষ্ঠান, গুরুগৃহে বাস, গুরুশুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নি ও রবির উপাসনা, বিনয়, ভিক্ষালব্ধ অন্নভোজন, ইত্যাদি ॥ বিষ্ণু।৩।৯ ॥ স্ত্রীসংসর্গত্যাগের পৃথক উল্লেখ নাই। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে যে, নিষ্কাম আত্মরতিসম্পন্ন কর্মী, সর্বভূতহিতে রত ঋষি, কামক্রোধবিযুক্ত প্রাণায়াম সাধক যতি, সংযতমনোবুদ্ধি মুনি সকলেই ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এখানে বলা হইল পরমাত্মা প্রতি মননিবদ্ধ যোগীও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। যোগাসন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অতি সরল। এই উপদেশ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ অনুমোদিত। শ্বেতাশ্বতরের দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ হইতে ১০ শ্লোক পর্যন্ত যোগাসনের উপদেশ আছে। যথা,

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্স্রোতাংসিসর্বাণি ভয়াবহানি ॥
প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥
সমে শুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥

অর্থাৎ, ত্রিরুন্নত শরীরকে সমভাবে স্থাপনা করিয়া অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তককে ঋজু ভাবে রাখিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মরূপ

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

ভেলার দ্বারা বিদ্বান সর্বপ্রকার ভয়াবহ স্রোত সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপারসমূহ উত্তীর্ণ হন ; সচেষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণকে নিয়মিত করিবে অর্থাৎ অঙ্গ স্থির রাখিবে এবং প্রাণ ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ শরীর স্থির ও নিশ্চল হইলে নাসিকাদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস লইবে। এইরূপে বিদ্বান অবিচলিত হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় মনকে ধারণ করিবেন। সমতল, নির্মল, উপলখণ্ড বহ্নি ও বালুকাবর্জিত, মনের অনুকূল দৃশ্য শব্দ জল ও আশ্রয়াদি সম্পন্ন স্থানে অর্থাৎ আতপাদিরহিত নিরাপদ ও মনোরম স্থানে, বায়ুর উচ্ছাসশূন্য গুহা বা অন্য আশ্রয়ে সাধক নিজেকে প্রযোজিত করিবেন অর্থাৎ যোগ অভ্যাস করিবেন।

পাতঞ্জলসূত্রে যোগাসনের উপদেশ আরও সরল, যথা, স্থিরসুখমাসনম্ (২।৪৬) অর্থাৎ যে আসনে শরীর নিশ্চল থাকে ও যাহা সুখকর তাহাই উপযুক্ত আসন। পরবর্তী কালে যোগিগণের মধ্যে নানারূপ কষ্টসাধ্য আসনের প্রচলন হইয়াছে। এ সকল কৃচ্ছ্রসাধন শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নহে। পরের শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন।

॥ ১৬ – ১৭ ॥ অর্জুন, যে অত্যধিক আহার করে, যে অত্যল্প আহার করে, যে অত্যধিক নিদ্রা যায় এবং যে অত্যধিক জাগরণশীল সে যোগ প্রাপ্ত হয় না। উপযুক্ত আহারবিহারশীল এবং কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাশীল অর্থাৎ যে কোনপ্রকার উৎকট আয়াস করে না বা আলস্যের অধীন নহে এবং যে উপযুক্তকাল নিদ্রা যায় এবং জাগরিত থাকে তাহারই যোগ দুঃখনাশক হয় ॥ ১৬ – ১৭ ॥

এই দুই শ্লোকে স্বপ্ন অর্থে নিদ্রা এবং চেষ্টা অর্থে আয়াস। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই যে, যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিও না।

॥ ১৮ – ১৯ ॥ যখন চিত্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া বা নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অভিনিবিষ্ট হয় এবং সর্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হয় তখন যোগীকে যুক্ত বলা যায়।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

যোগদ্বারা আত্মার সহিত যুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর নিবাতনিকম্প প্রদীপের সহিত উপমা কথিত হইয়াছে ॥ **১৮ – ১৯** ॥

যোগীর আত্মোপলব্ধি হইলে যুক্তাবস্থা হয় এই নির্বচন দেওয়া হইল। ২০-২২ শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

॥ **২০ – ২২** ॥ এই অবস্থায় যোগ সেবার দ্বারা যোগীর চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া বিষয় হইতে উপরতি বা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং আত্মার দ্বারা আত্মোপলব্ধি হইয়া আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে অর্থাৎ আত্মরতি জন্মে। তখন অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ অনুভূত হয় এবং যোগী ইহা অনুভব করিয়া তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হন না। এই অবস্থা লাভ করিলে অপর কোন লাভই অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং গুরু দুঃখও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না ॥ **২০ – ২২** ॥

আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে, এই কথার অর্থ এই যে, আত্মাই সর্ববিষয়ের চরম দ্রষ্টা। দ্রষ্টাকে দেখিবার অপর দ্রষ্টা থাকিলে সেই অবস্থায় প্রথম দ্রষ্টা দৃশ্য বিষয় হইয়া পড়েন, অতএব তখন তাঁহাকে আর চরম বলা যায় না। অতএব কেবল আত্মার দ্বারাই আত্মাকে দেখা যায়। আত্মা আনন্দস্বরূপ এজন্য আত্মোপলব্ধিতে আত্যন্তিক সুখ অনুভূত হয় অথবা সুখ অনুভূত হয় বলা ঠিক নহে, কারণ আত্মাই সুখ ইহা অনুভবের জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক নাই এজন্য ইহাকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যদা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

অপরে এই সুখের ধারণা কেবল বুদ্ধিদ্বারাই করিতে পারেন এজন্য ইহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের উদয়ে বুদ্ধিরূপ পৃথক সত্তাও থাকে না অতএব বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থে আত্মজ্ঞানীর বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। এই আত্যন্তিক সুখ অর্থাৎ আত্মা কেবল আত্মার দ্বারাই উপভোগ্য। বুদ্ধি প্রভৃতি কোন সত্তা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ৬।২০ শ্লোকে নিরুদ্ধ চিত্তের কথা আছে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে আছে, যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।

॥ ২৩ ॥ পূর্বশ্লোক বর্ণিত সেই দুঃখসংযোগ বিয়োগকে অর্থাৎ যে অবস্থায় দুঃখসংযোগ হইতে মুক্তি হয় সেই অবস্থাকে যোগ বলিয়া জানিবে। এই যোগ নির্বেদশূন্য চিত্তে অর্থাৎ অবসাদ বা নৈরাশ্যশূন্য হইয়া বা ঔৎসুক্যসহকারে নিশ্চয় আচরণীয় ॥ ২৩ ॥

পূর্বশ্লোকসমূহে যোগাচরণের ও যুক্তাবস্থার বিবরণ আছে ও এই শ্লোকে যোগ আচরণীয় বলিয়া পুনরায় ৬।২৪-২৬ শ্লোকে যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই পুনরুক্তির কারণ কি ? শংকর বলেন, যোগের ফলকথন প্রস্তাব শেষপূর্বক আবার তাহার আরম্ভ করিয়া, যোগের কর্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, নিশ্চয় ও নির্বেদাভাব এই দুইটি বস্তুতে যোগের সাধনতা আছে ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য এই পুনরারম্ভ করা হইয়াছে ॥ প্রমথনাথ তর্কভূষণ ॥ এই যুক্তির সার্থকতা দেখা যায় না, কারণ কেবল যে যোগসাধনার কথার পুনরুক্তি আছে তাহা নহে, ৬।২৭-২৯ শ্লোকে পুনরায় যুক্তাবস্থার বর্ণনা আছে ও যুক্তের আত্যন্তিক সুখ ও সমদর্শন লাভ হয় ইহাও পুনরায় বলা হইয়াছে। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যোগসাধনার এক প্রকার উপায় বলিয়া পুনরায় অন্য প্রকার উপায় নির্দেশ করিতেছেন। এই দ্বিতীয় উপায়ে আসন ইত্যাদি কোন শারীরিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক নাই। প্রথমোক্ত সাধনাকে শারীরিক যোগ বলিলে দ্বিতীয় উপায়কে মানসিক যোগ বলা যায়। এই মানসিক যোগের ফলও শারীরিক যোগের অনুরূপ এজন্য ফল নির্দেশে পুনরুক্তি আসিয়াছে।

॥ ২৪ – ২৯ ॥ সংকল্পজাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে বর্জন করিয়া মনের দ্বারা সর্ববিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিবৃত্ত করিয়া ধৃতিগৃহীত বুদ্ধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে উপরতি

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মায় নিরুদ্ধ করিয়া কোন বহির্বিষয়ের চিন্তা করিবে না। চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিবে তাহাকে সেই সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আপনার বশে আনিবে। এইরূপে যাঁহার রজোগুণ, অর্থাৎ প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা মন বহির্বিষয়ে ধাবমান হইয়া ক্রিয়াশীল হয়, প্রশমিত হইয়াছে ও যাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে ও যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া পাপশূন্য হইয়াছেন তাঁহার উত্তম বা শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ হয়। এই প্রকারে সর্বদা আত্মাতে যুক্ত হইয়া যোগী বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ আত্যন্তিক সুখ উপভোগ করেন। তিনি সর্বত্র সমদর্শী হওয়ায় এবং যোগদ্বারা আত্মার সহিত যুক্ত হওয়ায় সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভূতকে দেখেন ॥ ২৪ - ২৯ ॥

জীবনের যে আদর্শ আমাদের মানসিক বৃত্তি ও কর্মচেষ্টাকে কোন এক নির্দিষ্ট গণ্ডিতে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধৃতি। উপযুক্ত আদর্শ না থাকিলে বুদ্ধিদ্বারা উপরতি অবলম্বনের চেষ্টা সম্ভবপর নহে এজন্যই ২৫ শ্লোকে ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। ১৩।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শারীরিক যোগের সহিত মানসিক যোগের পার্থক্য এই যে, ইহাতে কোন আসন করিতে হয় না এবং নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধও করিতে

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পার্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

হয় না এবং প্রাণায়ামেরও আবশ্যক নাই, যত্র তত্র এই যোগ প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মানসিক যোগ দ্বারাও ব্রহ্মনির্বাণ, আত্যন্তিক সুখ ও সমদর্শন লাভ হয়।

॥ ৩০ - ৩২ ॥ যিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং সমস্ত আমাতেই দেখেন আমি তাঁহার কাছে নষ্ট হই না অর্থাৎ লুপ্ত হই না এবং তিনি আমার কাছে নষ্ট হন না বা লুপ্ত হন না। যিনি একত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ সমস্তই এক এই অনুভব করিয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ সর্বত্রই একমাত্র ব্রহ্মদর্শন করেন তিনি যে অবস্থাতে থাকুন না কেন আমাতেই বর্তমান থাকেন। অর্জুন, যিনি আত্মাকে উপমা মানিয়া অর্থাৎ আত্মার নির্লিপ্ততা মনে রাখিয়া সুখ বা দুঃখকে সর্বত্র সমজ্ঞান করেন তিনি পরমযোগী বলিয়া বিবেচিত হন **॥ ৩০ - ৩২ ॥**

শংকর ৩২ শ্লোকের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করেন, যথা, 'যিনি সকলের সুখ দুঃখ আপনার বলিয়া গণ্য করেন এবং কাহারও প্রতিকূলাচরণ করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।' পরের সুখে সুখী হইলে এবং পরের দুঃখ আপনার দুঃখ মনে করিলে যোগীর নির্লিপ্ততা থাকে না। সর্বভূতে যোগী আপনাকে দেখেন বলিয়া তাহাদের সুখ দুঃখ ভোগ করেন এমন নহে, তিনি ব্রহ্মবৎ নির্লিপ্তই থাকেন।

॥ ৩৩ - ৩৪ ॥ অর্জুন বলিলেন, মধুসূদন, এই যে সাম্যবুদ্ধি দ্বারা যোগপ্রাপ্তির উপায় তুমি বলিলে এই অবস্থা চঞ্চল সেজন্য ইহার স্থির স্থিতির সম্ভাবনা দেখিতেছি

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

না, কারণ, কৃষ্ণ, মন স্বতই চঞ্চল, বিক্ষোভকর, প্রবল ও অনমনীয়। আমি সেই মনের নিগ্রহ বা নিরোধ বায়ুকে নিরোধ করার ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি ॥ ৩৩ - ৩৪ ॥

অর্জুনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, সমাধি অবস্থায় মনের সংযম সম্ভব হইলেও সাধারণ কার্যকালে তাহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব কৃষ্ণ পূর্বে যে বলিলেন সর্বাবস্থায় যোগী ব্রহ্মে অবস্থান করেন তাহা কিরূপে হইতে পারে।

॥ ৩৫ - ৩৬ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, মহাবাহো, মন যে চঞ্চল ও দুর্দমনীয় তাহা নিঃসন্দেহ কিন্তু কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশে আনা যায়। অসংযতচিত্ত ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার মত কিন্তু যথাবিধানে যত্নশীল আত্মজয়ী পুরুষের ইহা লভ্য ॥ ৩৫ - ৩৬ ॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি পাতঞ্জল সূত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ। চিত্তস্থৈর্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস। প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ৬।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

॥ ৩৭ - ৩৯ ॥ অর্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়া যোগ হইতে বিচলিতমানস অযতি অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত হইয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? মহাবাহো, উভয় বিভ্রষ্ট অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন অভ্রের ন্যায় আশ্রয়হীন সেই বিমূঢ় ব্যক্তি কি ব্রহ্মলাভের মধ্যপথেই নষ্ট হয় না? কৃষ্ণ, তুমিই আমার এই সংশয় নিঃশেষে দূর করিয়া দাও,

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

কারণ তুমি ভিন্ন এই সংশয় নিরাকরণের উপযুক্ত অপর ব্যক্তি দেখিতেছি না ॥ ৩৭ - ৩৯ ॥

অভ্র ও মেঘ এক পদার্থ নহে। অভ্র মেঘ অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সূর্যকিরণে জল শোষিত হইয়া প্রথমে অভ্ররূপ ধারণ করে। অভ্র মেঘে পরিবর্তিত না হইলে বৃষ্টিপাত হয় না। জল ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া ইহার নাম অভ্র ॥ বিষ্ণুপুরাণ।২।৯।১০ ॥ অভ্র ছিন্ন হইয়া গেলে তাহা হইতে আর মেঘ উৎপন্ন হয় না, তাহা বিফল হয়। সাধারণের মনে ধারণা আছে যোগমার্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে শারীরিক অনিষ্ট হয়। যোগমার্গ হইতে চ্যুত হইলে উভয়ভ্রষ্ট হইতে হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলাভও হয় না এবং ইহলোকেও কষ্ট পাইতে হয়। এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্যই অর্জুনের প্রশ্ন। উভয়ভ্রষ্ট শব্দের অর্থ শংকর জ্ঞান ও কর্মমার্গ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্বজন্মের সমস্ত কথা জানা আছে এজন্য অর্জুনের ধারণা যে পরলোকে যোগভ্রষ্টের কি দশা হয় সে সম্বন্ধে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারিবেন।

॥ ৪০ - ৪৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, ইহলোক বা পরলোকে তাহার বিনাশ বা ব্যর্থতা হয় না কারণ বৎস, কল্যাণ কর্মের অনুষ্ঠানকারীর কোন দুর্গতি হইতে পারে না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকে গমন করিয়া

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

বহুকাল অবস্থানের পর পৃথিবীতে শুচিস্বভাব ও লক্ষ্মীমন্ত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; অথবা ধীমান যোগীদের বংশে তিনি জন্মলাভ করিয়া থাকেন; এরূপ জন্মও মনুষ্যলোকে দুর্লভতর অর্থাৎ সাধারণের এই সৌভাগ্য হয় না। কুরুনন্দন, তখন তিনি পূর্বজন্মার্জিত বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন এবং পুনরায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। সেই পূর্বাভ্যাসের দ্বারা অবশের ন্যায় চালিত হইয়া যোগের জিজ্ঞাসু হন এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ এ সকলে আসক্ত হন না। এইরূপ যত্নপূর্বক যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপক্ষয় হইলে অনেক জন্ম পরে যোগী যোগসিদ্ধ হন ও তাহার পর পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪০ - ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিধ কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেও কোন অনিষ্ট হয় না বলিলেন। হঠ পূর্বক যোগ সাধনা করিতে যাইলে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির সম্ভাবনা আছে। এই প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইলে কি প্রকার আহার বিহার কতব্য এবং কি প্রকার চিকিৎসা আবশ্যক সে সম্বন্ধে পুরাণগুলিতে বিশদ আলোচনা আছে। উপযুক্ত উপদেষ্টা না পাইলে হঠযোগাদি বা কৃচ্ছ্রসাধ্য অন্য কোন প্রকার যোগাভ্যাস কর্তব্য নহে। অপর পক্ষে কৃষ্ণের নির্দিষ্ট যোগ অনুশীলন করিতে হইলে গুরুর উপদেশ নিতান্ত আবশ্যক নহে। সফলতা অর্জন করিতে না পারিলেও ইহাতে শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে যোগমার্গে অভিক্রমনাশ দোষ নাই অর্থাৎ কর্ম সম্যক্ সম্পাদিত না হইলেও যেটুকু করা হইয়াছে তাহা নষ্ট হয় না এবং পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয় না।

॥ ৪৬ ॥ অর্জুন, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মী হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে অতএব তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

তপস্বী অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধক, জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি কর্মবর্জন করিয়া কেবল জ্ঞান সাধনা করেন এবং কর্মী অর্থে যাঁহারা সংকল্প করিয়া যজ্ঞাদি বা অপর কর্ম করেন।

॥ ৪৭ ॥ যে যোগী শ্রদ্ধাবান হইয়া আমাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ করিয়া আমাকেই ভজনা করেন অর্থাৎ অন্য কিছু বা বিভূতির কামনা না করিয়া আত্মাকে পরমাত্মা জানিয়া তাহাতেই যুক্ত হন তিনিই যুক্ততম ইহাই আমার মত ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে যোগী পরমাত্মার প্রতি যোগ প্রয়োগ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। দ্বাদশ অধ্যায়ের মুখপত্র এবং ১২।৬-৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়

গীতাব্যাখ্যা

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

সপ্তম অধ্যায়ে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে। কাপিল সাংখ্যবাদই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের মূল ভিত্তি। কাপিল সাংখ্যবাদে ব্রহ্মসত্তা স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কাপিল সাংখ্যের ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ করিয়াছেন। ইহাতে বেদান্ত ও কাপিল সাংখ্যের সমন্বয় হইয়াছে। যোগীর সমস্ত বহির্বিষয়ের ও আত্মতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় ও তখন সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হয় এই সূত্রেই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গের আলোচনার পর সপ্তম অধ্যায়ে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা। যোগীর নিজ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান যখন যুক্তি বিচার ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত হয় তখনই তাহা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এই বিজ্ঞানেরই অপর নাম দর্শন। দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ যুক্তি বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যোগসিদ্ধি ব্যতীতও সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

॥ ১ - ২ ॥ পার্থ, আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আত্মার প্রতি মন নিবদ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে অর্থাৎ চরাচর বিশ্বসমেত নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে তাহা শোনো। আমি তোমাকে

শ্রীভগবানুবাচ

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

এই জ্ঞান সবিজ্ঞান অর্থাৎ তাহার বিজ্ঞানসমেত সমস্তই বলিতেছি; ইহা জানিলে পৃথিবীতে পুনরায় আর অন্য কিছুই জনিবার বিষয় থাকিবে না ॥ ১ – ২ ॥

ভাষ্যকারগণ বিজ্ঞান শব্দে অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান এবং জ্ঞান শব্দে বিচারসিদ্ধ-জ্ঞান এই অর্থ করেন। আমি এই দুই শব্দের অর্থ পূর্বে ও এখানে যাহা দিয়াছি তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ আমার মতে জ্ঞান মানে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান মানে যুক্তি বিচারসিদ্ধ জ্ঞান; অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান যখন যুক্তি বিচার দ্বারা সমর্থিত ও পুষ্ট হয় তখনই তাহাকে বিজ্ঞান বলা যায়। জ্ঞান শব্দ সাধারণত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই নির্দেশ করে, অতএব যোগলব্ধ অনুভূতি বা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানও ইহারই অন্তর্গত। বিজ্ঞান শব্দ বুদ্ধি এই অর্থে উপনিষদে বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা, বিজ্ঞানময় কোশ। অতএব বিজ্ঞান অর্থে বুদ্ধিসিদ্ধ জ্ঞান বা যুক্তিবিচারসিদ্ধজ্ঞান। এখানে শ্লোকের ভাষা দেখিলে এই ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইবে। ৭।১ শ্লোকে বলিলেন, যোগযুক্ত হইলে যাহা জানিতে পারিবে তাহা শোনো, তাহার পরের শ্লোকে বলিলেন, এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত তোমাকে বলিতেছি। যোগলব্ধ অনুভূতিকে এখানে স্পষ্ট জ্ঞান শব্দে অভিহিত করা হইল।

॥ ৩ ॥ মনুষ্যগণের মধ্যে সহস্রে কোন এক ব্যক্তি হয়ত সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে এবং সিদ্ধগণের মধ্যে চেষ্টা করিলেও ক্বচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বত অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ তত্ত্ব সহিত জানিতে পারে ॥ ৩ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য যথা, কদাচিৎ কেহ সিদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টিত হন এবং চেষ্টা করিয়াও অনেকে সফলকাম হন না, অতএব সিদ্ধযোগী অতিশয় দুর্লভ। আবার যোগসিদ্ধ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ কিরূপে অখণ্ড পরমব্রহ্ম হইতে বিশ্বসংসার বা সৃষ্টি প্রবর্তিত হইল তাহার যথার্থ বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। যোগসিদ্ধগণের মধ্যে চেষ্টা করিলেও সকলে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারগ হন না। সিদ্ধযোগী কদাচিৎ দেখা যায় এবং তত্ত্বদর্শী সিদ্ধযোগী ততোধিক বিরল। তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধযোগী

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

বলিতে পারেন কিরূপে এক অখণ্ড পরমাত্মা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে আমি তাহা অনুভব করিয়াছি এবং আমি সেই তত্ত্ব যুক্তি বিচার দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারি। তত্ত্বদর্শী সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল সর্বপ্রধান এবং তাঁহারই প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সাধারণের বুদ্ধিগম্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব যোগসিদ্ধি ব্যতীতও জ্ঞানীর বুদ্ধিগ্রাহ্য কিন্তু কেবলমাত্র যুক্তাবস্থাতেই তাহা অনুভবসিদ্ধ। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই শ্লোকের অর্থ বিশদ হইবে। বলা যাইতে পারে সমগ্র ইংরেজ জাতির মধ্যে সহস্রে এক জন সন্দেশ খাইবার জন্য চেষ্টিত হন এবং সন্দেশ খাইয়া থাকিলেও ইহার তত্ত্ব জানেন এমন ইংরেজ অতিশয় বিরল অর্থাৎ সন্দেশের আস্বাদজ্ঞান থাকিলেও কি করিয়া সন্দেশ প্রস্তুত হয় তাহার যথার্থ তত্ত্ব বা বিজ্ঞান না জানা থাকিতে পারে।

॥ ৪ - ৬ ॥ ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতিকে বিভাগ করা যায়। মহাবাহো, এই প্রকৃতির নাম অপরা প্রকৃতি। ইহা ব্যতীত আমার আরও এক প্রকৃতি আছে তাহার নাম পরা প্রকৃতি; এই প্রকৃতি জীবভূতা এবং ইহার দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। এই দুই প্রকৃতিকে সর্বভূতের যোনি বলিয়া জানিও। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও পলয়ের হেতু ॥ ৪ - ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব বর্ণনা করিলেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীরই হইতে পারে, অতএব সাধারণের পক্ষে সৃষ্টিতত্ত্বের সম্যক ধারণা করা দুঃসাধ্য: অর্জুনকে বিশদভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী শ্লোকসমূহেও এমন কোন ব্যাখ্যা নাই যাহাতে সাধারণের পক্ষে এই তত্ত্ব বুঝা সরল হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিতত্ত্ব কাপিল সাখ্য-

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার সাধনমার্গ ও ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে কাপিল সাংখ্যবাদ আসিয়াছে; এই জন্যই ইহার বর্ণনা এত সংক্ষেপ। কাপিল সাংখ্যও দুর্বোধ্য। পরিশিষ্টে কাপিল সাংখ্যের বিবরণে সাংখ্যবাদের মূল তত্ত্বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। কিরূপ যুক্তিবিচার দ্বারা এই মূল তত্ত্বগুলিতে পৌঁছান যায় তাহা বুঝা কঠিন। কি করিয়াই বা মহৎ হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইল তাহা আধুনিক যুক্তিবাদীর অবোধ্য। পঞ্চ মহাভূতেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? আমি এই সৃষ্টিতত্ত্ব যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে পরিশিষ্টে বলিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য।

গীতার ৭।৪ শ্লোকে প্রকৃতিকে অষ্টধা বলায় ভাষ্যকারেরা নানা প্রকার জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে সর্বত্র সৃষ্টিপ্রকরণে নিম্নলিখিত ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে,

১ **প্রকৃতি** — ১ প্রধান বা প্রকৃতি

৭ **প্রকৃতি-বিকৃতি** — ১ মহৎ বা বুদ্ধি

১ অহংকার

৫ পঞ্চ তন্মাত্রা

১৬ **বিকৃতি** — ৫ পঞ্চ মহাভূত — ১১ মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়

সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি আবির্ভূত হইয়াছে এবং ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ উপরের তালিকা দেখিলে তাহা সহজেই হৃদয়ংগম হইবে। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে মহতের উৎপত্তি কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহৎরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলেও প্রধান নিঃশেষ হইয়া যায় না। সেইরূপ মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হইলেও মহৎ থাকিয়া যায়। সাংখ্যের কোন তত্ত্বই পরবর্তী তত্ত্বে লোপ পায় না। একপাত্র দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হইলে দুগ্ধের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সমস্তটাই দধি হইয়া যায়, সাংখ্যের তত্ত্বগুলির পরিণাম সেরূপ নহে। পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইলে যেমন পিতা ও পুত্র উভয়েই বর্তমান থাকে, সেইরূপ সাংখ্যের এক তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হইলে

উভয় তত্ত্বই বর্তমান থাকে। এই জন্যই প্রকৃতি হইতে অন্যান্য তত্ত্বগুলি সন্তান-পরম্পরা ন্যায়ে উৎপন্ন হইয়া মোট চতুর্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

সাংখ্যে প্রকৃতি শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থে মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, ও অপর অর্থে কারণ বা যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। শেষোক্ত অর্থে মহতের প্রকৃতি প্রধান, অহংকারের প্রকৃতির নাম মহৎ। পঞ্চ তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত মনের প্রকৃতি অহংকার। পঞ্চ মহাভূতের প্রকৃতি পঞ্চ তন্মাত্রা। এই অর্থেই প্রধানকে মূল প্রকৃতি বলা হয়। পূর্বগামী তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন তত্ত্বের নাম বিকৃতি বা বিকার অর্থাৎ কারণরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থের নাম বিকৃতি। মহৎ প্রধানের বিকৃতি, অহংকার মহতের বিকৃতি। পঞ্চ তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়সমেত মন অহংকারের বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ তন্মাত্রার বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই ষোড়শ তত্ত্ব সাংখ্যমতে চরম বিকার। এই ষোড়শ তত্ত্ব অন্য কোন তত্ত্বের প্রকৃতি বা উৎপত্তিস্থান নহে অর্থাৎ এই সকল তত্ত্ব হইতে অন্য কোন নূতন তত্ত্ব উৎপন্ন হয় নাই। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে এই ষোলটিকে বাদ দিলে বাকী আটটি তত্ত্বের অর্থাৎ প্রধান, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্রা ইহাদের প্রত্যেকটি কোন না কোন তত্ত্বের প্রকৃতি। এই জন্যই বলা হয় অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ অর্থাৎ প্রকৃতিসংখ্যা আট ও বিকারের সংখ্যা ষোল। আট প্রকৃতির মধ্যে মূল-প্রকৃতি বা প্রধান কাহারও বিকার নহে কিন্তু বাকী সাতটি মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্রা, প্রত্যেকটি প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। এই জন্য এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতিও বলা হয়। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ১।৬১ সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন,

এত এব পদার্থাঃ পরস্পরপ্রবেশাপ্রবেশাভ্যাং ক্বচিৎ তন্ত্র একমেব ক্বচিৎ তু ষট্ ক্বচিচ্চ ষোড়শ ক্বচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশন্তে। বিশেষস্তু সাধর্ম্যবৈধর্ম্যমাত্র ইতি মন্তব্যম্। তথা চোক্তং ভাগবতে, একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ॥ ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্। সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্॥

অর্থাৎ, পদার্থ এই কয়টি (২৪) মাত্রই, এই সকল পদার্থ পরস্পরের অন্তর্ভুক্তি করায় বা বিভিন্ন রাখায় কোন শাস্ত্রে পদার্থের সংখ্যা এক, কোথাও বা ছয়, কোথাও বা ষোড়শ এবং কোথাও বা অন্য কোন সংখ্যা ধরা হয়। সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য

লক্ষ্য করিয়াই এই সকল সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, প্রথম তত্ত্বেই কখন কখন অন্যান্য সমস্ত তত্ত্ব প্রবিষ্ট করান হয়, কখনও বা কোন এক তত্ত্বে তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী তত্ত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এই প্রকারে ঋষিরা তত্ত্বসমূহের বিভিন্ন সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্তই বিদ্বান ব্যক্তিদের যুক্তিযুক্ত হওয়ায় কিছুমাত্র অশোভন না হইয়া ন্যায্যই হইয়াছে।

গীতার ৭।৪ শ্লোকে যদি শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রকৃতি অষ্টধা বিভক্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন তবে কোন গোলই হইত না। ষোল বিকার বাদ দিয়া প্রকৃতিকে অষ্টধা বলিলে কোন দোষ হইত না, কারণ যাহা হইতে বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। শংকর এই শ্লোকে প্রকৃতি শব্দের এই অর্থই ধরিয়াছেন; অগত্যা শ্লোকোক্ত ভূমি, আপ, অনল ইত্যাদিকে পঞ্চ মহাভূতরূপ বিকার না বলিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতি বা কারণরূপ তন্মাত্রা বলিতে হইয়াছে। শ্লোকোল্লিখিত বুদ্ধি ও অহংকারকে প্রকৃতি বলা যায় কিন্তু মন বিকারমাত্র, তাহা কারণরূপ প্রকৃতি হইতে পারে না। এই দোষ পরিহারের জন্য শংকর ৭।৪ শ্লোকে মনের অর্থ অহংকার করিয়াছেন। অগত্যা অহংকারের অর্থ মূলপ্রকৃতি করিতে হইয়াছে। বুদ্ধি শব্দ মহৎ অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শংকরব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। তিলকের ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয় তিনি প্রকৃতি শব্দের কারণ এই অর্থ না ধরিয়া প্রধান বা মূলপ্রকৃতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে অন্য প্রকার গোল আসিয়াছে। প্রকৃতিকে প্রধান (মূলপদার্থ) বলিলে তাহার আট প্রকার ভেদের মধ্যে আবার প্রধানকে আনা চলে না। সাত প্রকৃতি-বিকৃতিকেই মূলপ্রকৃতির ভেদ বলিতে হয়। তিলক বলিতেছেন, 'বেদান্তী, যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন, এই স্থানে এই বিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধ না রাখিয়া অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ-স্বরূপ অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে।' পূর্বে উদ্ধৃত বিজ্ঞানভিক্ষুর মন্তব্য অনুসারে তত্ত্বগুলির বিভাগ সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য অনুসারে নানা প্রকারের হইতে পারে সত্য কিন্তু তিলককৃত ব্যাখ্যা মানিলে স্বীকার করিতে হয় যে প্রকৃতিবিকৃতিরূপ পদার্থগুলির সহিত ভিন্নধর্মী বিকৃতিরূপ মনকে এক বর্গে ফেলা হইয়াছে; ইহাতে বর্গীকরণ ন্যায্য ও শোভন হয় নাই।

গীতার ৭।৪ শ্লোকের প্রকৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, প্রথমে তাহাই দেখা যাক্। ৭।৫ শ্লোকে জীবভূতা পরা প্রকৃতির কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার দুই প্রকৃতি, এক পরা ও দ্বিতীয় অপরা। পুরুষরূপ তত্ত্বকে সাংখ্যকার বলিয়াছেন ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ অর্থাৎ পুরুষ কাহারও কারণ নহে এবং কোন তত্ত্বের বিকারও নহে। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকেও প্রকৃতি শব্দের অন্তর্ভুক্ত করায় বুঝিতে হইবে যে এখানে প্রকৃতি শব্দের অর্থ মূলপদার্থ, শংকর-কথিত কারণ উপাদান নহে। শংকর পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যার সহিত সংগতি রাখিবার জন্য পুরুষকে প্রাণধারণ নিমিত্ত বলিয়া কারণবর্গের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ এই দুই শ্লোকে অর্জুনের বুদ্ধি-গ্রাহ্য সৃষ্টির প্রকটিত পদার্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই। ৭ হইতে ১১ শ্লোকগুলিতে এই কথার পোষকতা পাওয়া যাইবে। প্রকটিত জড় জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, এক মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থূল জড়রূপ বহির্বস্তুসমূহ ও অপর সূক্ষ্ম জড়রূপ মানসিক ব্যাপারসমূহ। গীতার শ্লোকে এই প্রকার বিভাগ দেখান হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াধিপতি মন শব্দের উল্লেখ থাকায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলির পৃথক উল্লেখ করা হয় নাই। ইন্দ্রিয়সহিত মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন সত্তা লইয়াই মানসিক জগৎ; ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ মহাভূতের সমষ্টিই বহির্জগৎ, অতএব প্রকৃতির এই আট প্রকার ভেদের কল্পনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, প্রধানরূপ অপরা মূল প্রকৃতি ভূমি, জল ইত্যাদি পঞ্চ স্থূল জড়ে ও মন, বুদ্ধি, অহংকার এই তিন সূক্ষ্ম জড়ে বিভক্ত হইয়া অষ্ট প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে। চেতনা ভিন্ন জড়ের ধারণা হয় না এজন্য এ সমস্তই পুরুষের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে বলা হইল। শ্লোকে ধার্যতে শব্দ আছে। যয়েদং ধার্যতে জগৎ, 'যাহার দ্বারা এই জগৎ ধার্য হয়, জগতের ধারণা (conception) উৎপন্ন হয়'॥ রাজশেখর বসু॥ সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় ভেদে জগতের সৃষ্টির কথা মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে যে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা গীতার শ্লোকের বর্ণনার অনুরূপ। মুণ্ডক ২।১।৩ শ্লোকে আছে,

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

অর্থাৎ, এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও যাবতীয় পদার্থের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্লোক গীতার ৭।৪ শ্লোকের

সদৃশ। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থার বর্ণনাই শ্লোকের উদ্দেশ্য। পুরাণেও অষ্ট প্রকৃতির উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা গীতোক্ত অষ্ট প্রকৃতি নহে। গন্ধতন্মাত্র ও পঞ্চীকৃত জগৎ লইয়া যে সংঘাত তাহা অণ্ড নামে কথিত। এই অণ্ড পর পর সাতটি আবরণে আবৃত। অণ্ড ও তাহার সপ্ত আবরণ লইয়া অষ্টধা প্রকৃতি, যথা, ১। অণ্ড, ২। আপ, ৩। তেজ, ৪। মরুৎ, ৫। আকাশ, ৬। অহংকার, ৭। মহৎ এবং ৮। প্রকৃতি॥ বিষ্ণু ।২।২॥ এতৈরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্। এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যামষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ॥ অর্থাৎ এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে অণ্ড আবৃত। এই অষ্টবিধ প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া অবস্থিত।

॥ ৭ ॥ ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর অন্য কিছুই নাই, মণিমালার সূত্রে যেরূপ সমস্ত মণি গ্রথিত থাকে সেইরূপ এই সমস্তই আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে **॥ ৭ ॥**

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তাঁহা হইতেই পরা ও অপরা প্রকৃতির উদ্ভব, এই শ্লোকে বলিতেছেন যে তিনিই চরম কারণ, তাঁহার আর কারণান্তর নাই, এবং তিনি সমস্ত জগতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু আছে তাহাতেই তিনি তাহার সত্তারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

॥ ৮-৯ ॥ কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র সূর্যে প্রভা, সমস্ত বেদে প্রণব বা ওঁকার, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষত্ব, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, বিভাবসুতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণে তপ **॥ ৮-৯ ॥**

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ পঞ্চভূতের গুণ অর্থাৎ এই কয়টির উপর পঞ্চ ভূতের ভূতত্ব নির্ভর করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন এই সমস্তই তিনি। এই দুই শ্লোকে পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ স্পষ্ট নহে। জল, আকাশ, পৃথিবী ও বিভাবসু বা অগ্নির কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে কিন্তু

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি সূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

সর্বভূতের জীবন অর্থাৎ প্রাণবায়ুরূপে বায়ুর নাম আসিয়াছে। শ্লোকে পৌরুষ শব্দের অর্থ সাংখ্যোক্ত পুরুষের পুরুষত্ব অর্থাৎ চেতনা। সাংখ্যের সমস্ত তত্ত্বে ভগবানই বীজরূপে রহিয়াছেন ইহাই বলা উদ্দেশ্য। কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথিত সাংখ্যের প্রভেদ এই কয়টি শ্লোকে (৭।৪-৯) স্পষ্ট হইয়াছে। কেবল যে মূল পঞ্চ ভূতের ও পুরুষের বীজরূপেই ভগবান রহিয়াছেন তাহা নহে। জগতের সমস্ত প্রকটিত ব্যাপারেও ভগবান আছেন। চন্দ্রসূর্যেও তিনি প্রভা, সর্ববেদের তিনিই সার বা প্রণব, তপস্বীদের তিনিই তপস্যা ইত্যাদি। পরের শ্লোকগুলিতে এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। পৃথিবীর গন্ধগুণকে পুণ্য বা পবিত্র কেন বলা হইল বুঝা যায় না। শংকর বলেন, পুণ্য বিশেষণ অন্যান্য ভূতেও প্রযোজ্য এবং পবিত্রতাই এই সকল গুণের স্বাভাবিক ধর্ম।

॥ ১০ – ১২ ॥ পার্থ, আমাকেই সর্বভূতের সনাতন বা অনাদি বীজ বলিয়া জানিও ; আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, ভরতর্ষভ, আমি বলবানের কামরাগ বিবর্জিত বল এবং সর্বভূতে ধর্মের অবিরোধী কামনা অথবা যাহা কিছু সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব আছে তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে কিন্তু আমি সে সকলের কবলে নাই তাহারাই আমার আশ্রয়ে রহিয়াছে ॥ ১০ – ১২ ॥

কামরাগ-বিবর্জিত বল অর্থে সাত্ত্বিক বল বুঝাইতেছে। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তির নাম রাগ। পূর্বশ্লোকে পবিত্র গুণ সকলের উল্লেখ আছে এবং ১১ শ্লোকেও উৎকৃষ্ট গুণাবলী উল্লিখিত হইয়াছে। কামনা মাত্রেই নিকৃষ্ট নহে, এজন্য বলা হইল ধর্মসম্মত কামনাই ভগবান। পাছে এইরূপ ধারণা জন্মে যে অপকৃষ্ট বিষয়সমূহ ভগবানের আশ্রয়ে নাই, কেবল উৎকৃষ্ট গুণাবলীতেই ভগবান বিদ্যমান, সেজন্য ১২ শ্লোকে বলিলেন যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

তামসিক সমস্ত ভাবই ভগবান হইতে উৎপন্ন। ১০ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ বস্তুকে ভগবদ্বুদ্ধিতে চিন্তা করা যায় তাহার উদাহরণ হিসাবে এক এক শ্রেণীর প্রধান পদার্থের নাম করা হইয়াছে। এখানে পদার্থের গুণমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ১০।৩৯ শ্লোকেও ভগবান নিজেকে সর্বপদার্থের বীজ বলিয়াছেন। শংকর ৭।১২ শ্লোকে ভাব শব্দের অর্থ পদার্থ করিয়াছেন এবং পরের শ্লোকে ত্রিবিধ গুণময় ভাব অর্থে রাগ দ্বেষ মোহ করিয়াছেন। গুণময় ভাব অর্থে গুণবিকার হইতে উৎপন্ন ভাব না ধরিয়া গুণযুক্ত ভাব এই অর্থ করিলে ব্যাখ্যায় সংগতি নষ্ট হয় না।

॥ ১৩ ॥ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ আমাকে ভাবত্রয়ের অতীত অব্যয় সত্তা বলিয়া জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

পদার্থে যে গুণ থাকায় তাহা মনকে অন্তর্মুখ করে তাহাই সত্ত্বগুণ; মন অন্তর্মুখ হইলে যথার্থ পদার্থজ্ঞান জন্মে এই জন্যই সত্ত্বকে প্রকাশগুণ বলা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান পদার্থকে প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সত্ত্বগুণান্বিত বলা হয়। যে গুণের বশে মন বহির্বস্তুর প্রতি ধাবমান হয় তাহাকে রজোগুণ বলা হয়। মন বহির্মুখ হইলে বিষয়কামনা জন্মে। বিষয়কামনা কর্মপ্রবৃত্তির মূল। এই জন্য রজোগুণকে প্রবৃত্তিমূলক বলা হয়। যে গুণ সত্ত্ব ও রজ অর্থাৎ প্রকাশ ও প্রবৃত্তি উভয়কে বাধা দেয় তাহাই তম। সত্ত্ব, রজ, তমের বিস্তারিত আলোচনা চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে। পরিশিষ্টে 'সত্ত্ব রজ তম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মানুষের মন সাধারণত বহির্বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে; কখনও কখনও তাহা অন্তর্মুখ হইয়া ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের স্বরূপচিন্তনও করিয়া থাকে; তমোগুণ প্রবল হইলে এই উভয়ই বাধিত হয়। যতক্ষণ মানুষ গুণত্রয়ের বশীভূত থাকে ততক্ষণ আত্মদর্শন সম্ভবপর নহে, কারণ আত্মা ত্রিগুণাতীত। তাহা বহির্বস্তুও নয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ অন্তরের অনুভূতিও নয়। এই উভয়ের জ্ঞাতাই আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন।

॥ ১৪ ॥ আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়, যাহারা আমাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে তাহারা ঐ মায়া উত্তীর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

সাংখ্যের প্রকৃতির গুণত্রয়কে এখানে মায়া শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই মায়াকে ভগবানের শক্তি হিসাবে স্বীকার করায় তাহাকে দৈবী বলা হইয়াছে।

॥ ১৫ ॥ দুরাচার মূঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া অসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং আমার শরণাপন্ন হয় না ॥ ১৫ ॥

যাহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের কথা পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগে উন্মত্ত থাকিয়া আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে না। ১৬।৪-২০ শ্লোকে আসুরী স্বভাবের বর্ণনা আছে। যথাস্থানে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

॥ ১৬ - ১৯ ॥ ভরতর্ষভ অর্জুন, চতুর্বিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে ভজনা করে, আর্ত অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ যাহার জানিবার কৌতূহল আছে, অর্থার্থী অর্থাৎ ভোগকামী এবং জ্ঞানী। তন্মধ্যে জ্ঞানী সতত যুক্তাবস্থায় থাকায় অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি করায় একভক্তি বিশেষণে অভিহিত হন অর্থাৎ আত্মরত জ্ঞানী অপর কোন বিষয়ে প্রীতি করেন না, কারণ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়। ইঁহারা সকলেই অর্থাৎ চতুর্বিধ ভগবৎকামীই উদারচরিত কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই অর্থাৎ আমার সহিত অভিন্ন ইহাই আমার মত কারণ তিনি যুক্তাত্মা

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়ায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় আমাতেই অবস্থান করেন। বহু জন্ম জন্মান্তে, এই সমস্তই বাসুদেব, এই জ্ঞান লাভ হয় ও তৎফলে জ্ঞানী আমার শরণাপন্ন হন। এই প্রকার মহাত্মা সুদুর্লভ ॥ ১৬ - ১৯ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুক্ত যোগীর যে বিবরণ আছে জ্ঞানী সম্বন্ধে সেই সমস্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানী ও যুক্তযোগী একই। আর্ত ব্যক্তি বিপদের তাড়নায় ও অর্থার্থী অভাব ও লোভের বশে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। কেবল মাত্র বিপদে পড়িলে অথবা নিজ কার্যোদ্ধার মানসে যে ভগবানের শরণাপন্ন হয় অথচ অন্য সময় ভগবানকে ভুলিয়া থাকে তাহাকে আমরা হীনচক্ষে দেখিয়া থাকি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এরূপ ব্যক্তিকেও সুকৃতিশালী ও উদার বলিয়াছেন. কারণ ভিতরে ভগবৎপ্রীতি না থাকিলে বিপদের সময়েও মানুষ ভগবানকে ডাকে না, বিপদ উপলক্ষ্য মাত্র। এরূপ ব্যক্তিরও ভগবানে ভক্তি কালে বিকশিত হয়।

বিপদে পড়িয়া বা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যে ভগবানের সাধনা করে তাহার কারণ এই যে নিজের ক্ষমতায় সাধ্যবস্তু না মিলিলে স্বভাবতই মানুষের মনে এই ইচ্ছা জাগে, এমন কি কোন শক্তিমান পুরুষ নাই যাঁহার ইচ্ছামাত্রে আমার কাম্যবস্তু লাভ হয়। বালক যেমন বিপদে পড়িলেই শক্তিমান পিতার অন্বেষণ করে, সেইরূপ বয়স্ক ব্যক্তিও কাম্য লাভের জন্য বৃহত্তর সর্বশক্তিমান পিতার অনুসন্ধান করে। পার্থিব পিতার আদর্শেই পরমপিতার কল্পনা করিয়া মানুষ ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে। আধুনিক বিজ্ঞানবাদী শুধু জানিবার জন্যই যেমন বিজ্ঞান আলোচনা করেন, মেরুদেশে ধাবিত হন, হিমালয়শৃঙ্গে উঠিতে চান, ভূত আছে কিনা নির্ণয়ের জন্য প্রেততত্ত্ব আলোচনা করেন, সেরূপ জিজ্ঞাসু কেবল সহজাত কৌতূহলপ্রবৃত্তির বশে ভগবানকে অনুসন্ধান করেন। জ্ঞানী ভগবানকে জানিয়াছেন বলিয়াই ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহার আর অপর কোন বিষয়ে প্রীতি থাকে না। তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান অনাবশ্যক। শংকর ৭।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, 'জ্ঞানী সমাহিত চিত্ত হইয়া গন্তব্য পরব্রহ্মরূপ আমাকে পাইবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পথে যাইতে উদ্যত হন।' শ্লোকে গতি শব্দ থাকায় শংকর গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু জ্ঞানীকে নিত্যযুক্ত বলায় বুঝিতে হইবে যে তিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ১।৮-১০ খণ্ডে গতি শব্দের বারবার উল্লেখ আছে, যথা, স্বরের গতি কি? জলের গতি কি? স্বর্গলোকের গতি কি? পৃথিবীর গতি কি? আকাশের গতি

কি ? ইত্যাদি। ছান্দোগ্যে গতি শব্দের অর্থ চরম আশ্রয়। এখানেও এই অর্থই যুক্তিযুক্ত, অন্যথা ব্যাখ্যায় সংগতি নষ্ট হয়।

॥ ২০ ॥ হৃতজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া অপর দেবতাগণের শরণাপন্ন হয় ॥ ২০ ॥

ফললাভের আশায় অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার দেবতার উপাসনা করে ; আর্ত ব্যাধি হইতে উদ্ধারের জন্য তারকেশ্বরের মানত করে, অর্থার্থী মকদ্দমা জিতিবার আশায় ষোড়শোপচারে কালীঘাটে পূজা দেয়, যে জিজ্ঞাসু সে সন্ন্যাসী, সাধু প্রভৃতির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা শুনিয়া তত্তৎ ব্যক্তির সঙ্গ করে, ইত্যাদি।

॥ ২১-২৩ ॥ যে যে ভক্ত যে যে মূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই প্রকার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহারা নিজ নিজ উপাস্য দেবতার আরাধনায় চেষ্টিত হয় এবং তাহা হইতে আমার দ্বারাই নির্দিষ্ট কামনার বস্তুসকল লাভ করে কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধিযুক্ত সাধকের লব্ধ ফলসমূহ বিনশ্বর। দেবতার উপাসকেরা দেবগণকে পাইয়া থাকে, পক্ষান্তরে আমার ভক্তেরা আমাকেই অর্থাৎ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ২১-২৩ ॥

পরমেশ্বরই একমাত্র নিয়ন্তা, সেজন্য দেবতাপূজার দ্বারা যে ফললাভ হয় পরমেশ্বরই তাহা বিধান করিয়া থাকেন। ব্যাধি ইত্যাদি বিপদ হইতে মুক্তি, অর্থ, যশ, মান প্রভৃতি দেবতার কৃপায় মিলিতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এ সমস্তই নশ্বর অর্থাৎ চিরভোগ্য নহে। যে দেবতা ফল দান করেন তিনিও নশ্বর, প্রলয়কালে

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩

তাঁহারও বিনাশ আছে কিন্তু ব্রহ্মের আশ্রয় লইলে ব্রহ্মজ্ঞানীর কখনও বিনাশ হয় না। তিনি অব্যয় পদ লাভ করেন। পরের শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে।

দেব-উপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ইহা শ্রীকৃষ্ণের মত। ব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মলাভ করেন ইহার অর্থ যুক্তিদ্বারা বুঝা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মারই সরূপ অর্থাৎ সমানরূপ এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মা ব্রহ্মভূত হইয়া যায়; এ কথা অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। দেবতা-উপাসক দেবতাকে প্রাপ্ত হন ইহার অর্থ কি? দেবতা ইষ্টফল দান করিতে পারেন; দেবতাকে ইষ্টফলের প্রতীক মানিলে দেব-উপাসক দেবতাকে পান বলা যাইতে পারে কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। উপাসক উপাস্যের সহিত এক হইয়া যান এ কথা হিন্দুশাস্ত্রে বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শিব-উপাসক শিবত্ব প্রাপ্ত হন, বিষ্ণু-উপাসক বিষ্ণুত্ব লাভ করেন এ সকল কথা প্রসিদ্ধ। উপাসনার দ্বারা উপাস্য পদ লাভ করা যায় এই উক্তি যুক্তিসহ কিনা তাহা বিচার্য।

প্রথমে উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ কি তাহা বলিব। উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, পূজা, অর্চনা, ভজনা, ধ্যান প্রভৃতি কথার ধাতুগত অর্থে পার্থক্য আছে। উপাসনা অর্থে উপাস্য দেবতার সন্নিকটস্থ হওয়া, আরাধনা অর্থে দেবতার তুষ্টিবিধান করা, প্রার্থনা অর্থে কোন বস্তু যাচ্ঞা করা, পূজা অর্থে ফল পত্র পুষ্পাদি উৎসর্গ করিয়া দেবতার প্রীতিসাধন করা, অর্চনা অর্থেও পূজা, ভজনা, অর্থে সেবা এবং ধ্যান অর্থে দেবতার মূর্তি বা অঙ্গবিশেষে বা গুণবিশেষে চিত্তবৃত্তি একাগ্র করা। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা শব্দে ভগবানের মহিমা কীর্তন, ধ্যান, প্রার্থনা বা অনুগ্রহভিক্ষা সমস্তই বুঝায়। হিন্দুসমাজে দেবতার বা বীজমন্ত্রের ধ্যান পূজার অন্তর্গত; অনেক স্থলেই কোন বিশেষ সংকল্প লইয়া অর্থাৎ অর্থসিদ্ধির জন্য এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গীতায় ৭।২১ শ্লোকে অর্চনা, ৭।২২ শ্লোকে আরাধনা কথার উল্লেখ আছে এবং ৭।২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে দেবযাজী অর্থাৎ যিনি দেবতার যজনা করেন তিনি দেবতার সকাশে যান অতএব যজনা, আরাধনা, অর্চনা প্রভৃতির পার্থক্য না মানিয়া ব্যাখ্যায় উপাসনা শব্দ ব্যবহার করিব এবং আরাধনা, অর্চনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিব।

মানুষ কোন বিশেষ কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই দেবতার উপাসনা করে। যাহা নাই অথচ যাহা চাই তাহা পাইবার জন্যই দেবতার উপাসনা, অতএব কাম্য বস্তু

দেবতার আয়ত্তে আছে ইহা মানিয়া লইয়া মানুষ উপাসনা করে। দরিদ্র ধনীর উপাসনা করে কারণ দরিদ্রের কাম্য যে ধন তাহা ধনীর আয়ত্তে আছে। দরিদ্র উপাসকের নিকট ধনীর ধন মাত্রই প্রতিভাত হয়; ধনীর রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ইত্যাদি অন্যান্য গুণ তাহার উপাসনার বহির্ভূত। অবশ্য ধনীর রূপ বা গুণ বর্ণনা করিলে যদি সহজে অর্থ পাওয়া যায় তবে দরিদ্র উপাসক তাহা উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করে সত্য কিন্তু এই আরাধনা ধনপ্রাপ্তির সহায়ক মাত্র। উপাসনার মূল অঙ্গ ধন প্রার্থনা। ধনী ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরিদ্র ধন প্রার্থনা করিতে পারে কিন্তু দেবতার নিকট যাওয়া যায় না, দেবতা অদৃশ্য থাকেন। ধনীকে যদি দেবতার মত অদৃশ্য করিয়া দেওয়া যায়, তবে দরিদ্র ধনীর কোন কাল্পনিক মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে পারে; এই কাল্পনিক মূর্তি যে প্রকারই হউক না কেন দরিদ্র উপাসকের চক্ষে ইহার মাত্র একটি গুণ প্রতিভাত হইবে; মূর্তিতে ধনবত্তা গুণ আরোপিত হইলে তবে তাহা দরিদ্রের উপাস্য হইবে। এই মূর্তির উপাসনা করিতে হইলে দরিদ্র উপাসককে মূর্তির ধনবত্তা গুণ সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। মানুষ উপাসনাকালে আকাঙ্ক্ষিত এক বা ততোধিক গুণ দেবতাতে আরোপ করে এবং এই সকল গুণাবলীর চিন্তন বা ধ্যান এবং তদনুরূপ প্রার্থনা উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে অবলম্বন করে। উপাসক দেবতাতে যে কয়টি গুণ আরোপ করে তাহার নিকট সেই দেবতা সেই কয়টি গুণের সমষ্টি মাত্র। গীতার বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে দেবতা-উপাসক তাঁহার উপাসনা অনুযায়ী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। যিনি মাত্র রোগ-আরোগ্যের জন্য শিবের উপাসনা করিবেন তিনি মাত্র আরোগ্যরূপ শৈবগুণ লাভ করিবেন, পূর্ণ শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন না। যদি কেহ শিবের সমস্ত গুণের উপাসনা করেন, তবে গীতামতে তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

উপাসনাকালে উপাসকের চিত্তবৃত্তি প্রথমত দ্বিধা বিভক্ত হয়; দরিদ্র উপাসকের মনে একদিকে নিজের দরিদ্রতা ও অপর দিকে দেবতার ধনবত্তার কথা উঠে। উপাসনা-বিধি এই যে একাগ্রমনে দেবতাকে চিন্তন করিতে হইবে অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দরিদ্রতার প্রতি মন না দিয়া একাগ্রচিত্তে ধনবত্তা চিন্তন করিবেন। উপাস্য ও উপাসকের গুণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনবত্তা ও দারিদ্র্য পরস্পর-বিরোধী ভাব। এই উদাহরণে ধনবত্তার মূলে ধনদানের ইচ্ছা এবং দারিদ্র্যের মূলে ধনগ্রহণের ইচ্ছা আছে ধরা যাইতে পারে। ধনবত্তার ধ্যান করিতে করিতে যদি দরিদ্র সাধকের

চিত্ত তাহাতে তন্ময় হইয়া যায় তবে সে তাহার আরাধ্য দেবতার ন্যায় ধন দান করিব এই ইচ্ছাই অনুভব করে অর্থাৎ সে দেবতার সহিত একাত্মা হইয়া যায়। এক হিসাবে এই অবস্থাকে উপাস্য দেবতা প্রাপ্তি বলা যায়। এই অবস্থায় দরিদ্রতার কোন কষ্ট অনুভূত হয় না সত্য কিন্তু ধ্যানচ্যুত হইলেই পুনরায় দরিদ্রতার কথা মনে আসিবে। উপাসনার দ্বারা মনে যে শান্তি আসে তাহার কয়েকটি কারণ আছে। ক্রন্দনে যেমন মনের আবেগ প্রশমিত হয় সেইরূপ দুঃখ-কষ্ট দেবতার নিকট নিবেদনে মনে কথঞ্চিৎ শান্তি আসে। দেবতা দুঃখ নিবারণ করিবেন এই বিশ্বাসেও কষ্ট নিবারিত হয়। ধ্যানে দেবতার সহিত একাত্মা হইলে দরিদ্রের মনে যেরূপ ধনীর ভাব আসে সেইরূপ উপাসকের মনে উপাস্যের ভাব আসে। এই মনোভাব উপাসকের দুখযুঃক্ত মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। উপাসনায় শান্তিলাভের ইহাই প্রধান কারণ। এই ভাবের বশেই দেবতার কৃপালাভের কথা মনে উঠে। উপরি উক্ত যে সকল কারণে উপাসকের মনে শান্তি আসে মানসিক অবস্থার পরিবর্তনই তাহার মূল।

উপাসনায় মন শান্ত হয় স্বীকার করিলেও তাহাতে উপাসকের কাম্য বস্তু লাভ হয় কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর উপাসনা করিলে মনে শান্তি পাইতে পারে দেখা গেল কিন্তু এই উপায়ে তাহার বাস্তবিক ধনলাভ হয় কি? যিনি দেবতায় বিশ্বাসী তিনি বলিবেন, দেবতা তৃপ্ত হইলে বাস্তবিক ফল দান করেন অতএব উপাসনায় মনেও আপাতত শান্তি আসে এবং কাম্য বস্তুও লাভ হয়। যুক্তিবাদী বলিবেন, ফলদাতা দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, অতএব উপাসনায় মনের শান্তি মাত্রই লভ্য; অভাব দূরীকরণের জন্য অলৌকিক দেবতায় আস্থা রাখিয়া অলস হইয়া থাকিও না, পুরুষকার অবলম্বন কর এবং লৌকিক উপায়ে কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা কর। অসুখ হইলে বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লও। মনোবিৎ বলিবেন, যদি তুমি দেবতায় বিশ্বাস কর তবে উপাসনা কর, উপাসনার দ্বারা তোমার পুরুষকার স্ফুর্তি পাইবে এবং তাহাতে কাম্যবস্তু লাভ সুগম হইবে। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছাসমূহ বর্তমান আছে। কেবল যে আমাদের মনে ধনী হইবার ইচ্ছাই আছে তাহা নয়, ইহার বিরুদ্ধ ইচ্ছা অর্থাৎ দরিদ্র হইবার ইচ্ছাও মনের অজ্ঞাত প্রদেশে লুক্কায়িত আছে। এই দুই বিরোধী ইচ্ছার সংঘাতের ফলে অনেক সময় আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হয় এবং

কার্যশক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়। দরিদ্র হইলে ধনী হইবার ইচ্ছা পীড়া দেয়, এবং ধনী হইবার-চেষ্টা করিলে দরিদ্র হইবার ইচ্ছা তাহাতে বাধা দেয়, ফলে ক্রিয়াশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় ও পুরুষকার ব্যাহত হয়, কি উপায়ে ধন অর্জন করা যায় তাহা মনে প্রতিভাত হয় না এবং সর্বান্তঃকরণে ধনার্জনের চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না। পরস্পর বিরোধী ইচ্ছার মধ্যে কোন একটির যদি সম্যক স্ফুরণ হয় তবে দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। বিরুদ্ধ ইচ্ছা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমার 'স্বপ্ন' পুস্তকে দ্রষ্টব্য। ধনবত্তার ধ্যান করিলে দরিদ্রের এই বাধা কাটিয়া যাইতে পারে। তখন ধনার্জনের চেষ্টা ফলবতী হয়। অতএব কোন অলৌকিক ব্যাখ্যা না মানিলেও বলা যায় দরিদ্র ধনীর ধ্যান করিলে যেমন ধনী হয়, সেইরূপ ভক্ত উপাসনার দ্বারা উপাস্য দেবতার পদ লাভ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ॥ ১।৪।১০॥ অর্থাৎ যে অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং মনে করে এই দেবতা পৃথক এবং আমি পৃথক সে কিছুই জানে না।

পূর্ব্ব শ্লোকে দেবতা-পূজকের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল দেবতা প্রধান বা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিমাত্র। ব্রহ্মের দুই প্রকৃতি; এক অপরা ও অন্য পরা। দেবতা-উপাসনা অপরা প্রকৃতিরই উপাসনা। নিম্নাধিকারী অপরা প্রকৃতির উপাসনা করে, উচ্চাধিকারী পুরুষরূপ পরা প্রকৃতির তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে। অপরা প্রকৃতিও ব্রহ্মোদ্ভূত এজন্য উপযুক্ত ভাবে অপরা প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারাও ব্রহ্মলাভ হইতে পারে; এই সাধনা অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মবাদ নামে পরিচিত। পরিশিষ্টে অধি-বাদের আলোচনা আছে। বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পরা প্রকৃতির উপাসনার কথা বলা হইতেছে।

॥ ২৪ - ২৮ ॥ আমার অব্যয় শ্রেষ্ঠ পরমস্বরূপ না জানিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ততা প্রাপ্ত অর্থাৎ মূর্ত বা শরীরবিশিষ্ট মনে করে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ পুরুষ বা আত্মাকে দেহ বলিয়া কল্পনা করে। আমি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। মনুষ্যগণ মোহগ্রস্ত হইয়া আমাকে অজ ও অব্যয় বলিয়া

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

বুঝিতে পারে না। অর্জুন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রাণিবর্গকে জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। পরন্তপ ভারত, সংসারে অবস্থিত সর্বপ্রাণী ইচ্ছা-দ্বেষ সমুৎপন্ন দ্বন্দ্বজাত মোহবশে সম্মোহিত হইয়া থাকে, কেবল যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে সেইরূপ পুণ্যকর্মা ব্যক্তি দ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া অচলচিত্তে আমাকে ভজনা করে ॥ **২৪ - ২৮** ॥

সাধারণ মনুষ্য ইচ্ছা-দ্বেষ সমুৎপন্ন সুখ-দুঃখের বশে বহির্বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। সুখ-দুঃখে নির্বিকার না হইলে আত্মদর্শন হয় না। আত্মা অজ অব্যয় এবং আত্মাই সর্বভূতের জ্ঞাতা. আত্মার জ্ঞাতা কেহ নাই। যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সাধারণে আত্মদর্শনে সক্ষম হয় না। যোগমায়া শব্দে প্রকৃতির গুণত্রয় বুঝাইতেছে। অথবা 'ঈশ্বরকে যখন কর্মপর মনে করা যায়, তখন তিনি যোগী ; যথা ১১।৯ শ্লোকে মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। এই তথাকথিত যোগী নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও স্রষ্টা, পাতা, হর্তা রূপে কর্মপর প্রতীয়মান হন। ইহাই তাঁহার যোগমায়া।' (রাজশেখর বসু)। অথবা 'সরস্বতী ও যমুনা যেমন গঙ্গায় সংগমিত হইয়াছেন সেইরূপ প্রকৃতি ও জীবের অদৃস্ট-রূপিণী দুই মায়া নদী, ব্রহ্মসনাতনী মহামায়াস্বরূপিণী গঙ্গাতে আসিয়া মিলিয়াছেন। এই সংযোজিত শক্তিকে যোগমায়া কহা যাইতে পারে।' (চন্দ্রশেখর বসু)। মায়া শব্দের তিনটি বিভিন্ন অর্থ স্মরণ রাখা কর্তব্য (১) প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা সাংখ্যের মূল প্রকৃতি এবং জগতের জড় উপাদান কারণ। সাংখ্য ইহাকে মায়া না বলিলেও বেদান্তে ইহাকে মায়া বলা হইয়াছে। (২) জীবের অনাদি কর্ম বা অদৃষ্ট। ইহা প্রকৃতির আশ্রয়ী। ইহাকে জৈবিকী শক্তি বলা হয়। জীবকে অনাদি বলিয়া ধরায় এই শক্তির কল্পনা এবং (৩) উপরি উক্ত দুই প্রকার মায়ার আধার পরব্রহ্ম হইতে

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অভিন্ন সৃষ্টিশক্তি। ইনি চৈতন্যরূপিণী মহামায়া ও জগতের বিবর্তকারণ। চন্দ্রশেখর বসুর মতে এই তিনের সংযোগই যোগমায়া।

অপরা প্রকৃতির উপাসনায় অর্থাৎ দেবতা-উপাসনায় পরা প্রকৃতির জ্ঞানলাভ হয় না কিন্তু পরা প্রকৃতির তত্ত্ব অবগত হইলে অপরা প্রকৃতির তত্ত্বও প্রতিভাত হয়।

॥ ২৯ - ৩০ ॥ যাঁহারা জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাকে আশ্রয় মানিয়া সাধনা করেন তাঁহারা ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্মের স্বরূপ জানিতে পারেন ; অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানিয়া যুক্তাত্মা পুরুষ মৃত্যুকালেও আমার স্বরূপ উপলব্ধি করেন ॥ ২৯ - ৩০ ॥

অখিল কর্ম পদের অর্থ ৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ শব্দের অর্থ যাহার অধীনে আত্মা, ভূত, দেবতা এবং যজ্ঞ অর্থাৎ নিখিল কর্ম আছে। অধ্যাত্ম পদের আত্মা অর্থে প্রাণবন্ত দেহ, ভূত অর্থে পৃথিবীর জড় উপাদানসমূহ, দেবতা অর্থে ইন্দ্রিয়াদি ও সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভক্তি-উদ্রেককারী জড়বস্তুর অভিমানী দেবতা বা প্রকাশিকা শক্তি। পরিশিষ্টে অধিভূত, অধিদৈব ইত্যাদির বিচার দ্রষ্টব্য। প্রাণবন্ত দেহ, ভূতগ্রাম, দেবতা ও কর্ম এই সমস্তই অপরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ; এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনায় ইহাদের উল্লেখ আসিয়াছে। তত্ত্বসমাস নামক কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের সপ্তম সূত্রে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের উল্লেখ আছে। অধ্যাত্ম, অধিভূত ইত্যাদি শব্দগুলি এক বিশেষ সাধনমার্গের পারিভাষিক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে অতি কৌশলে এই সাধনমার্গের অবতারণা করিলেন। অষ্টম অধ্যায়ে অধিবাদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মৃত্যুকালে ওঁকার স্মরণ অধিবাদের সাধনা।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ নামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

অষ্টম অধ্যায়

গীতাব্যাখ্যা

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর ব্রহ্মযোগ

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে পরা ও অপরা প্রকৃতির বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম ও বিভিন্ন দেবতার পূজার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন।

॥ ১-২ ॥ পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কাহাকে বলে, অধিদৈবই বা কি? মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কি প্রকারে অবস্থিত এবং তিনি কে এবং সংযতচিত্ত ব্যক্তির মরণকালে কি প্রকারে তুমি তাহার ধ্যেয় হও ॥ ১-২ ॥

অর্জুন অধিবাদের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকগুলিতে অধিবাদ সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিলেন। অধিবাদ তখনকার দিনের এক বিশেষ সাধনমার্গ। অধিবাদীরা ব্যক্ত চরাচরের তাবৎ পদার্থকে অধিদৈব, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম এই তিন বিভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। অধিবাদ এই হিসাবে কতকটা সাংখ্যবাদের অনুরূপ। অখিল কর্মের স্বরূপনির্ণয় এবং অন্তকালে

অর্জুন উবাচ

কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

ওঁকারের ধ্যানও অধিবাদের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। পরিশিষ্টে অধিবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

॥ ৩ - ৪ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পরম অক্ষরই ব্রহ্ম এবং স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়, ভূতভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ তাহারই নাম কর্ম, ক্ষরভাব অধিভূত এবং পুরুষই অধিদৈবত এবং হে দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ ॥ ৩-৪ ॥

এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। অক্ষর শব্দের অর্থ যাহার ক্ষয় নাই। অক্ষর শব্দে ওঁ এই অক্ষর, জীবাত্মা, কূটস্থ ও পরম ব্রহ্ম ইহার যে কোনটি বুঝাইতে পারে কিন্তু যখন অক্ষর শব্দে পরম বিশেষণ যোগ করা হয় তখন ইহা পরমাত্মা বা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে। স্বভাব শব্দে নিজের ভাব অর্থাৎ আত্মভাব কিংবা সাধারণ প্রচলিত অর্থে প্রকৃতিজাত স্বভাব যাহার বশে আমরা সমস্ত কর্ম করি। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ ব্যাক্যের অন্তর্গত ভূত শব্দের অর্থ পঞ্চ মহাভূত বা প্রাণী উভয়ই হইতে পারে; ভাব শব্দের অর্থ সত্তা কিংবা পদার্থ। উদ্ভব শব্দের অর্থ উৎপত্তি বা সম্যক বিকাশ এবং বিসর্গ শব্দের অর্থ বিসর্জন, ত্যাগ বা সৃষ্টি।

এই দুই শ্লোকের শংকরব্যাখ্যা, 'অক্ষর যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহাই পরামাত্মা। পরম এই বিশেষণটি নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষরেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এই প্রকার মতই উপপন্নতর হয়। সেই পরব্রহ্মেরই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্মভাবে অবস্থিতিকেই স্বভাব কহা যায়; ইহাই স্বভাব অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। দেহরূপ আত্মাকে অধিকৃত করিয়া প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরমব্রহ্মরূপ পরমার্থ বস্তু পর্যন্ত সকল পদার্থকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি যে ভাব অর্থাৎ বস্তু তাহাই ভূতভাব; সেই ভূতভাবের উদ্ভব যে করে তাহার নাম ভূতভাবোদ্ভবকর; বিসর্গ এই শব্দটির অর্থ বিসর্জন অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্য যে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যাগ তাহাই বিসর্গ শব্দের অর্থ, এই বিসর্গই ভূতনিচয়ের উৎপাদক। সেই বিসর্গ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যার্থ যজ্ঞ; কর্ম শব্দের দ্বারা যজ্ঞই অভিহিত, এই যজ্ঞরূপ বীজ হইতে

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমংব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ৩

স্থাবর-জঙ্গমরূপ দ্বিবিধ ভূতনিচয় উৎপন্ন হয়। প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই অধিভূত কহা যায়। যাহা বিনষ্ট হয় তাহাই ক্ষর, এমন যে ভাব তাহাই অধিভূত অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন হয় এমন সকল বস্তুই অধিভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। পুরুষ অর্থাৎ যাহার দ্বারা জগৎ সকলই পরিপূরিত অথবা যিনি দেহরূপ পুরে বিরাজমান, তিনিই পুরুষ। সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভ; সেই পুরুষই অধিদৈবত। সকল যজ্ঞের উপর আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতার আছে, সেই বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ। শ্রুতিতেও নির্দিষ্ট আছে যে বিষ্ণুই যজ্ঞ, সেই বিষ্ণু আমিই, এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে আমিই বিদ্যমান আছি। দেহের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এইজন্য যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের ফল দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং যজ্ঞাভিমানিনী দেবতাও এইরূপ (অর্থাৎ দেহে থাকেন)'॥ প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত অনুবাদ॥

সংক্ষেপে শংকরব্যাখ্যা বলিতেছি,

ব্রহ্ম = অবিনাশী পরম সত্তা = পরম অক্ষর।

অধ্যাত্ম = দেহকে আত্মভাবে অধিকৃত করিয়া যাহা কিছু আছে = স্বভাব।

কর্ম = ভূতনিচয়ের উৎপাদক যজ্ঞ = ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ।

অধিভূত = উৎপত্তি বিনাশশীল সমুদয় বস্তু = ক্ষর ভাব।

অধিদৈবত = সমুদয় প্রাণীর ইন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্যান্তরগত দেবতা হিরণ্যগর্ভ = পুরুষ।

অধিযজ্ঞ = যজ্ঞ-ফলভোগী লিঙ্গশরীরকে অধিকৃত করিয়া যিনি আছেন = বিষ্ণু = শ্রীকৃষ্ণ।

এই পারিভাষিক শব্দগুলির শংকরব্যাখ্যা সর্বস্থলে সংগত হয় নাই। পরিশিষ্টে অধিবাদের বিচারে শ্রুতি প্রমাণাদির সাহায্যে দেখাইয়াছি যে, অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ শরীরের ইন্দ্রিয়াদি অধিকৃত করিয়া যাহা আছে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব। স্বভাব অর্থে পরমেশ্বরের আত্মভাব নহে। গীতায় অন্যত্রও সাধারণ অর্থেই স্বভাব শব্দ ব্যবহৃত

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪

হইয়াছে। অধিভূত শব্দের অর্থ যাহা ভূতবর্গকে অধিকৃত করিয়া আছে অর্থাৎ নশ্বরত্ব বা ক্ষরভাব। অধিদৈবত শব্দের অর্থ যাহা বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বস্তুর অভিমানী দেবতাদের অধিকৃত করিয়া আছে। দেবতা অর্থে প্রকাশমান বা দ্যোতন সত্তা। প্রকাশগুণ চেতনশীল জীবাত্মা বা পুরুষের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয় এজন্য পুরুষই অধিদৈবত। শংকর দেবতা শব্দে ইন্দ্রিয়াদিও ধরিয়াছেন। উপনিষদে অন্যত্র দেবতা শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হইলেও অধিবাদে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা শব্দে অভিহিত হয় নাই, ইন্দ্রিয়সমূহকে অধ্যাত্মের অন্তর্গত করা হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩১৪ অধ্যায়ে এবং আশ্বমেধিক পর্বে ৪২ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম ইত্যাদির উল্লেখ আছে, যথা, চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন অধিভূত এবং বিষ্ণু তাহার অধিদেবতা; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় অধিভূত এবং আত্মা তাহার অধিদেবতা; চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত এবং সূর্য তাহার অধিদেবতা, ইত্যাদি। মহাভারতের উদাহরণে অধি শব্দের অর্থ তদ্বিষয়ক; অধিভূত অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধীয়। গীতায় অধি শব্দের অর্থ, যাহা অধিকৃত করিয়া আছে। মহাভারতে এজন্য চক্ষুকেই অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে কিন্তু গীতামতে চক্ষু অধ্যাত্মের অন্তর্গত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত স্বভাব চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে ইহাই বলা উদ্দেশ্য। গীতা, মহাভারত ও উপনিষদে অধিবাদের বিবরণে বাস্তবিক ফলতঃ কোন পার্থক্য নাই। অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব শব্দের অন্তর্গত ভূত, আত্মা, দেবতা পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা তত্ত্বসমাস নামক কাপিলশাস্ত্রের সপ্তম এবং দ্বাবিংশ সূত্রের দীপিকা নামক ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না। দ্বাবিংশ সূত্রে ত্রিবিধ দুঃখের উল্লেখ আছে; এই ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধম্, শারীরম্ মানসঞ্চেতি। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং বৈষম্যনিমিত্তং দুঃখম্ জ্বরাতিসারবিসূচ্যাদিকম্। কামক্রোধশোকমোহলোভবিষাদের্ষ্যাদিকন্তু মানসম্। অধিভূতেভ্যো ভবং আধিভৌতিকম্। মনুষ্যপক্ষিসরীসৃপস্থাবরাদিভ্যা ভবং দুঃখমাধিভৌতিকম্। শীতোষ্ণবাতবর্ষাদিনিমিত্তং যৎ দুঃখমুৎপদ্যতে তদধিদৈবিকম্। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক; বাত পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্যজনিত জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ হইতে যে কষ্ট হয় তাহা শারীরিক এবং কামক্রোধাদিজনিত কষ্ট মানসিক। অধিভূত হইতে যে কষ্ট হয় তাহা আধিভৌতিক; অপর মনুষ্য, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি প্রাণী এবং স্থাবরাদি হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা

আধিভৌতিক। শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষাদিনিমিত্ত যে কষ্ট তাহা আধিদৈবিক। এখানে শরীর ও মনকে অধ্যাত্ম বলা হইল। স্থাবর ও প্রাণিবর্গকে অধিভূত বলা হইল এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অধিদৈব বলা হইল। পরিশিষ্টে 'ক্ষর ও অক্ষরবাদ' প্রবন্ধের শেষে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নির্লেখ দেখিলে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের পরস্পর সম্বন্ধ সহজে বুঝা যাইবে।

এইবার ৮।৩ ও ৮।৪ শ্লোকের কর্ম ও অধিযজ্ঞ শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিবাদের সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। কর্ম শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে কর্ম শব্দের সংজ্ঞার্থ দিয়াছেন, ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ। ৭।২৯ শ্লোকে এই কর্মকে অখিল কর্ম বলা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম শব্দের অর্থ এখানে অত্যন্ত ব্যাপক, কেবল জীবের কর্ম এখানে উদ্দিষ্ট হয় নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার কর্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখানেও যজ্ঞ ও কর্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকর্মই অধিযজ্ঞ। যিনি অখিল কর্মকে অধিকৃত করিয়া আছেন তিনিই অধিযজ্ঞ। জীবের সমস্ত কর্মও অধিযজ্ঞের অধীন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এই দেহে আমিই অর্থাৎ পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ। ১৮।৬১ শ্লোকে আছে, মায়াদ্বারা সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইতে থাকিয়া ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ অদৃষ্ট বা কর্মানুযায়ী পরিচালিত হইলেও সেই অদৃষ্ট বা কর্ম ঈশ্বরের মায়াশক্তির অন্তর্গত হওয়ায় ঈশ্বরই সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা। ঈশ্বরই প্রতি দেহে অধিযজ্ঞ। কৌষীতকি উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনার পর কর্মের উল্লেখ আছে। অজাতশত্রু বলিতেছেন, যস্যবৈতৎ কর্ম স বৈ বেদিতব্য অর্থাৎ এই জগৎ যাঁহার কর্ম তাঁহাকে জানিতে হইবে। এখানে জগৎ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে কর্ম বলা হইল। সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরের অহংকার কর্তৃপদবাচ্য এবং সমুদয় সৃষ্টি কর্ম। শাস্ত্রে অন্যান্য নানা স্থানেও সৃষ্টিকে কর্ম বলা হইয়াছে। এই কর্মই অধিবাদের কর্ম। অধিবাদের কর্মের নির্বচনে বলা হইয়াছে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গই কর্ম। ভূতভাব, উদ্ভব ও বিসর্গ এই তিনটিই পারিভাষিক শব্দ। চন্দ্রশেখর বসু 'সৃষ্টি' গ্রন্থে লিখিতেছেন, 'পঞ্চ ভূত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি, মন ও জীবাত্মা এই সকল যে একেবারেই স্ব স্ব বর্তমান অবয়বে সৃষ্ট হইয়াছিল শাস্ত্রের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। ঐ সমুদয় তত্ত্ব প্রথমে অতি সূক্ষ্মভাবে

উৎপন্ন হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিল।···ভাগবতে সে সূক্ষ্ম সৃষ্টিকে কেবল ভাবরূপী বলিয়াছেন যথা, এই সকল ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভাব পূর্বে অমিলিত ছিল, সুতরাং শরীর নির্মাণে সমর্থ হয় নাই (ভাগবত ২।৫।৩২)···পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্মভূতগণ পঞ্চীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রাসকল (জীবাত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি) উহাদের সহিত সমবেত হইয়া রহিল। মিলিত পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবাত্মা এই সকল কালক্রমে একটা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। ···মহত্তত্ত্ব হইতে অণ্ড পর্যন্ত সমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাহার নাম সর্গ অথবা প্রাকৃত। (ভাগবত ২।১০।৩ ও ৩।১০।১৭) এবং বৈরাজ পুরুষ ব্রহ্মা হইতে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে রচনা তাহার নাম বিসর্গ অথবা বৈকারিক। (ভাগবত ২।১০।৩)। সৃষ্টির নিমিত্তে পরমেশ্বরের যে পুরুষভাব প্রথমাবধি অব্যক্তপ্রকৃতির মধ্যে বর্তমান ছিল তাহাই পশ্চাৎ অণ্ডেতে প্রবেশ করিল। পরমেশ্বরের সেই ভাবটি ব্রহ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা প্রথমে উদ্ভিদ ও পরে অন্যান্য জীব সৃষ্টি করিলেন।' এই বিবরণ হইতে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভূতভাব বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উদ্ভব বা ক্রমবিকাশ-রূপ বিসর্গ বা সৃষ্টিই কর্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। জীবের অদৃষ্ট বা কর্মও ইহার অন্তর্গত। অধিযজ্ঞ বা পরমাত্মাই এই সৃষ্টিরূপ যজ্ঞের নিয়ন্তা এবং তিনিই মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়া জীবের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। এই দেব বিশ্বকর্মা ও মহাত্মা ও সর্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১৭ ॥

॥ ৫ - ৬ ॥ এবং অন্তিমকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হন এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কৌন্তেয়, আরও জানিবে যে অন্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া জীব দেহ ত্যাগ করে সদা সেই ভাবে অনুরক্ত থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ - ৬ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

মৃত্যুকালীন চিন্তা অনুযায়ী জীবের পরজন্মের গতি হয় এই বিশ্বাস অধিবাদের অন্তর্গত। ৮।৫ শ্লোকের চ বা এবং শব্দের দ্বারা পূর্ব শ্লোকের অধিবাদের সহিত এই শ্লোকের যোগ আছে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের এই মত ঈষৎ পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মৃত্যুকালীন চিন্তাদ্বারা পরজন্মের গতি নির্ধারিত হয় এ কথা নিঃসন্দেহ কিন্তু সদা তদ্ভাবভাবিতঃ অর্থাৎ জীবিতকালে সর্বদা সেই ভাবে অনুরক্ত থাকিলে তবে মৃত্যুকালে সেই চিন্তা মনে আসিবে। পরের শ্লোকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

॥ ৭ ॥ অতএব সর্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত হইলে নিশ্চিত আমাকেই পাইবে ॥ ৭ ॥

সমস্ত সময়ে যাহার চিত্ত ভগবানে অর্পিত আছে সে নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে; এই জন্যই এই শ্লোকে যুদ্ধের কথা আসিয়াছে।

॥ ৮ - ১০ ॥ পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত ও অনন্যগামী চিত্তে অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য সহকারে মনকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া ধ্যান করিলে সাধক দিব্য পরমপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যিনি তমের অতীত, আদিত্যের ন্যায় দ্যোতনস্বভাব, অচিন্ত্যরূপ, সকল জগতের আধার ও নিয়ন্তা, অণু হইতে সূক্ষ্মতর, চিরন্তন, সর্বজ্ঞ পুরুষকে মরণকালে অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক স্থাপিত করিয়া স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮ - ১০ ॥

অভ্যাসযোগযুক্ত শব্দের অর্থ অভ্যাসরূপ যোগের সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন; চিত্তস্থৈর্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস ॥ পাতঞ্জলসূত্র ১।১২ ॥ অতএব যিনি চিত্তস্থৈর্য

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি অভ্যাসযোগযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বলিলেন অনন্যগামী চিত্তে চিন্তা করিলে পরমপুরুষকে পাওয়া যায় অর্থাৎ সর্বদা পরমব্রহ্মের প্রতি মন নিবিষ্ট থাকিলে ব্রহ্মলাভ হয়; পরে বলিলেন, মরণকালে অবিচলিত মনে ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে জীবিতকালে সর্বদা ব্রহ্ম স্মরণ করিলে মরণকালেও অবিচলিত ব্রহ্মধ্যান সম্ভবপর হয়। ৮।৫-৭ শ্লোকেও এই ধরণের কথা আছে।

॥ ১১ - ১৪ ॥ বেদবিদ্‌গণ যে অক্ষরের কথা বলেন, বীতরাগ অর্থাৎ বাসনাশূন্য হইয়া যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে সংযমিত করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরস্ত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া আপনার প্রাণ মূর্ধায় স্থাপিত করিয়া যোগধারণা অবলম্বনপূর্বক ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। পার্থ, যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সর্বদা আমাকে প্রত্যহ স্মরণ করেন আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে অনায়াস-লভ্য ॥ ১১ - ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, যে প্রত্যহ আমাকে স্মরণ করে সে মৃত্যুকালে অবিচলিত চিত্তে ওঁকার-রূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে পারে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে ধারণা শব্দটি পারিভাষিক। দেশবন্ধচিত্তস্য ধারণা॥ পাতঞ্জল সূত্র ৩।১ ॥ অর্থাৎ চিত্তকে দেশ-বিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। ধ্যেয় মূর্তির কোন অঙ্গে বা নিজ শরীরের কোন অংশে দৃষ্টি বা মন নিবদ্ধ করার নাম ধারণা। যখন যোগী স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

নিবদ্ধ রাখিয়া কোন বিষয়ের ধ্যান করেন তখন নাসিকাগ্রেই তাঁহার যোগের ধারণা ; যখন উপাসক দেবমূর্তির চরণে মন নিবদ্ধ করিয়া দেবতার ধ্যান করেন তখন সেই চরণেই তাঁহার যোগের ধারণা। গীতায় ৬।১৩ শ্লোকে স্বীয় নাসিকাগ্রে, ৮।১০ শ্লোকে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে এবং ৮।১২ শ্লোকে মূর্ধায় যোগধারণার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রমতে কোন বিশেষ অঙ্গে ধারণা অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সাধক নিজ দীক্ষামত যে কোন ধারণা অবলম্বন করিতে পারেন। নাসিকাগ্রে সহজেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় কিন্তু ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী স্থান বা মূর্ধা সাধকের দৃষ্টিগোচর নহে, এজন্য তথায় প্রাণকে স্থাপিত করিয়া তাহাতে মনোনিবেশের কথা বলা হইয়াছে। প্রাণস্থাপনা কাহাকে বলে তাহা বুঝা চাই। শরীরের যাহা কিছু কর্ম নিষ্পন্ন হয় প্রাণবায়ুর সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে, এজন্য কোন কোন উপনিষদে প্রাণকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের মূল উপদেশ এই যে প্রাণ পৃথক ইন্দ্রিয় নহে তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণক্রিয়া জড়িত আছে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ২।৩১ সূত্রে আছে সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ অর্থাৎ প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু করণগুলির সাধারণী বৃত্তি। করণ শব্দে মন, বুদ্ধি ও অহংকাররূপ অন্তঃকরণত্রয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝায়। মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, মন নিশ্চল না হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রাণক্রিয়া সংযমিত হইবে না। মনের স্থান হৃদয়, এজন্য হৃদয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্ববিধ শারীরিক চেষ্টাই প্রাণের ক্রিয়া ; শরীর নিশ্চল না হইলে যোগ সফল হয় না, এজন্য প্রাণসংযম আবশ্যক। প্রাণক্রিয়া দুই প্রকারের। ইচ্ছাসহকারে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল কর্ম করা যায় তাহা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। মন নিরুদ্ধ হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়াও নিরুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলিও নিশ্চল হয়। মনই এই সকল ক্রিয়ার অধিপতি। ঐচ্ছিক ক্রিয়া ব্যতীত শরীরের আর এক প্রকার ক্রিয়া আছে, যথা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, বিভিন্ন স্থানের স্পন্দন, অন্ত্রের নড়াচড়া ইত্যাদি ; এই সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অত্যধিক বিক্ষেপ থাকিলেও যোগ সিদ্ধ হয় না। পেট কামড়াইলে মন স্থির হয় না। মূর্ধাকে ধারণাস্থান করিয়া প্রাণের ধ্যানে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক সমস্ত প্রাণক্রিয়া সংযমিত করিবার জন্য মূর্ধায় প্রাণকে স্থাপনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৪।৩০ শ্লোকে এবং পরিশিষ্টে ইন্দ্রিয়াদি সংযমের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মূর্ধায় প্রাণ স্থাপিত করিবার উপদেশের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এখানে যোগ অবলম্বন পূর্বক দেহত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। ইহা অধিবাদীদের সাধনার এক অঙ্গ। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া সাধক যোগাবলম্বন করেন এবং ব্রহ্মস্মরণ করিতে করিতে ইচ্ছাপূর্বক দেহত্যাগ করেন। এইরূপ ইচ্ছামৃত্যুকে কালবঞ্চনা বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মলদ্বার, উপস্থ, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং ব্রহ্মরন্ধ্র, এই কয়টি স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। অধচ্ছিদ্র দিয়া প্রাণ নিঃসরণ হইলে মৃত্যুর পর অধোগতি হয় এবং ঊর্ধ্বছিদ্র দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে ঊর্ধ্বগতি লাভ হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং এই রন্ধ্র দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। এই কারণে অধিবাদী সাধক প্রাণত্যাগের পূর্বে প্রাণকে মূর্ধায় স্থাপিত করেন। যাঁহারা কোনও বিশেষ কালে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মলাভ হয় মনে করেন তাঁহারাও কালবঞ্চনা সাধনা করেন। ইঁহাদের কথা ৮।২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত ৮।২৭-২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে তাহার আলোচনা করিব।

গীতার ৮।৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন অন্তকালে যিনি আমাকে স্মরণ করেন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন, ৯।১০ শ্লোকে বলিলেন যিনি প্রয়াণকালে সকল জগতের আধার পুরাণ পুরুষকে স্মরণ করেন তিনি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ; পুনরায় ১৩ শ্লোকে বলিতেছেন যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। একই প্রকার কথার কেন পুনরুক্তি হইল তাহা বিচার্য। ওঁকার-সাধনা অধিবাদের অঙ্গ একথা পূর্বে বলিয়াছি। এজন্য ১৩ শ্লোকের উল্লেখ। অনুমান করা যায় মহাভারতের যুগে সাধারণের মধ্যে মৃত্যুকালে ওঁকার-ধ্যান ব্যতীত আরও দুই প্রকার সাধনা প্রচলিত ছিল। অধিবাদিগণ যোগাবলম্বন-পূর্বক ওঁকার ধ্যান করিতে থাকিয়া কালবঞ্চনা করিতেন অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু সাধনা করিতেন এবং অপরে ওঁকার-রূপ বিশেষ আলম্বন গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে যোগাবলম্বনপূর্বক কালবঞ্চনা সাধনা করিতেন, ইঁহাদের কথা ৯ ও ১০ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শেষোক্ত সাধনায় যোগ ধারণা ভিন্ন প্রকারের। ওঁকার সাধনায় যোগধারণার স্থান মূর্ধা এবং এই সাধনায় ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী স্থান। কালিদাসের রঘুবংশে সূর্যবংশীয় নৃপতিগণকে যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইঁহারা অন্তিমকালে যোগের সাহায্যে মৃত্যুবরণ করিতেন।

প্রাচীন ভারতে এই ভাবে শরীর ত্যাগের চেষ্টা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ওঁকার-সাধনার সময়ও শ্রীকৃষ্ণ মামনুস্মরন্ এই কথা বলিয়া পরমাত্মা চিন্তনের উপদেশ দিয়াছেন। খুব সম্ভব ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব উপদেশ, অধিবাদিগণ হয়ত কেবল ওঁকার রূপ অক্ষরের ধ্যান করিতেন। ৯-১০ এবং ১২-১৩ শ্লোকে যে দুই প্রকারের সাধকের কথা বলা হইয়াছে ইচ্ছামৃত্যুই ইঁহাদের উভয়ের সাধনা, কেবল উপায় সম্বন্ধে ইঁহাদের সামান্য পার্থক্য আছে। ৫ শ্লোকে যোগাবলম্বনপূর্বক ইচ্ছামৃত্যুর কথা নাই। এখনও অধিকাংশ হিন্দু যেরূপ মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম নাম স্মরণ করেন মহাভারতের যুগেও সেইরূপ করিতেন বলিয়া মনে হয়; ৫ শ্লোকে তাঁহাদেরই কথা বলা হইয়াছে। অতএব মনে হয়, পুনরুক্তি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ৫ হইতে ১৪ শ্লোকে তৎকাল প্রচলিত বিভিন্ন সাধন প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই যদি মৃত্যুকালে পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির আশা কর, তবে সদাসর্বদা ব্রহ্মচিন্তা কর।

॥ ১৫ ॥ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হন এবং দুঃখের আলয়-স্বরূপ অনিত্য সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ১৫ ॥

এখানে পুনর্জন্মের কথা বলায় পরের শ্লোকে অহোরাত্র বিদ্যার অবতারণার সুযোগ হইল।

॥ ১৬ – ১৯ ॥ অর্জুন ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় লোক পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ তাহাদের পুনঃপুন উৎপত্তি বিনাশ আছে কিন্তু কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্রহ্মার দিন এক সহস্র যুগ স্থায়ী এবং ব্রহ্মার রাত্রিও এক সহস্র যুগ ব্যাপী। ব্রাহ্মদিবসের প্রারম্ভে অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত চরাচরের উৎপত্তি হয় এবং ব্রাহ্মরাত্রির আগমনে

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

সেই অব্যক্তেই চরাচর বিলীন হইয়া যায়। পার্থ, এই সেই ভূতগ্রামই বার বার জন্মিয়া জন্মিয়া ব্রাহ্মরাত্রের আরম্ভে অবশ হইয়া প্রলীন হয় এবং পুনরায় ব্রাহ্মদিবাগমে উৎপত্তিলাভ করে ॥ ১৬ - ১৯ ॥

শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, ব্যক্ত চরাচর কালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বার বার উৎপন্ন হয় ও বার বার প্রলয়ে লীন হয়। ১৯ শ্লোকে স এব অয়ং ভূতগ্রামঃ অর্থাৎ সেই এই ভূত গ্রামই বাক্যের তাৎপর্য এই যে একই ভূতবর্গ বার বার জন্মে। নূতন কল্প প্রবর্তিত হইলে পুরাতন কল্পানুযায়ী সৃষ্টি হয় ॥ বিষ্ণু।১।৫।৪ ॥ যাহার যাহা কর্ম ছিল পুনঃপুন সৃজ্যমান হইয়া সে তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥ বিষ্ণু।১।৫।৫৯ ॥ পূর্বকল্পে যাহার যাহা রূপ ও নাম ছিল ভবিষ্যৎ কল্পেও সে প্রায়শ তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥ বায়ু ৮।৩৪ ॥ অহোরাত্রবিদের কালমান ৯।৭-৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

মহাভারতের যুগে অহোরাত্র বিদ্যা নামে এক বিশেষ বিদ্যা প্রচলিত ছিল। পরিশিষ্টে অহোরাত্র বিদ্যার আলোচনা দ্রষ্টব্য। অহোরাত্রবিদ্‌গণ সম্ভবত কালকেই চরম সত্তা মনে করিতেন; তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মরাত্রিতে সমস্তই লয় পায়, কাল ব্যতীত কোন সত্তাই অবশিষ্ট থাকে না। অহোরাত্রবিদ্‌গণ ব্রহ্মসত্তা মানিতেন বলিয়া মনে হয় না। এই দোষ পরিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অহোরাত্রবিদের অব্যক্ত সত্তার আশ্রয় হিসাবে এক সনাতন ব্রহ্মসত্তা আছে বলিতেছেন।

॥ ২০ - ২৫ ॥ কিন্তু সেই অব্যক্তের পরবর্তী অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব বা সত্তা আছে তাহা সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। সেই শেষোক্ত অব্যক্ত অক্ষর বা অবিনাশী বলিয়া উক্ত হন, তাহাকেই পরমাগতি বা পরম আশ্রয় বলে; তাহাই আমার পরমধাম এবং তাহা পাইলে আর পুনরাবর্তন হয় না। পার্থ, এই ভূতসমূহ যাঁহার অভ্যন্তরে স্থিত এবং যিনি এই সমস্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

সেই পরম পুরুষ অনন্যভক্তির দ্বারা লভ্য। ভরতর্ষভ, যোগিগণ যে কালে প্রয়াণ করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে আর ফিরিয়া আসেন না অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং যে কালে প্রয়াণ করিলে আবার ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন ও উজ্জ্বলতা সম্পন্ন ছয় মাস ব্যাপী উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মবিৎ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলাভ করেন এবং ধূম, রাত্রি ও অন্ধকারময় ছয়মাসব্যাপী দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে যোগী চন্দ্রের জ্যোতি লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২০ - ২৫ ॥

এখানে ২১ শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরম অক্ষর বা ব্রহ্মসত্তা বুঝাইতেছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ২৩-২৫ শ্লোকগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে এক প্রকার গতি এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে অন্য প্রকার গতি হইবে, এই মত অত্যন্ত অদ্ভুত। শংকর বলেন, অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, ষণ্মাস, উত্তরায়ণ, ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তত্তৎ অভিমানী দেবতা বুঝাইতেছে। এই সকল দেবতা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর যোগিগণকে কালক্রমে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকর্তা কর্মপর যোগীকে চন্দ্রলোকোদ্ভব সুখ ভোগ করান। তিলক বলেন, ২৪-২৫ শ্লোকে যে দুই কালের বর্ণনা আছে তাহা উত্তরমেরু প্রদেশের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বর্ণনা, কারণ একমাত্র মেরুপ্রদেশেই উত্তরায়ণের ছয়মাস শুক্লজ্যোতিসম্পন্ন এবং দক্ষিণায়ণের ছয়মাস অন্ধকারময়। তিলকের মতে মেরুপ্রদেশই আর্যদের আদিম বাসভূমি এবং শুক্লকৃষ্ণগতিদ্বয়ে বিশ্বাস সেই আদিম সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে শ্লোকগুলি রূপকমাত্র। ধূমরূপ বাসনা-বিরহিত, নিশ্চল জ্যোতিস্বরূপ যে মন তাহাই অগ্নিজ্যোতি নামে অভিহিত। দিবস-সদৃশ প্রকাশময় যে জ্ঞানে নিরন্তর জাগৃতি তাহাই অহঃ শব্দদ্বারা আখ্যাত। শুক্লপক্ষীয়

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

রাত্রির নির্মল ও শান্ত চন্দ্রিকার ন্যায় মনের যে অবস্থা তাহাই এ স্থলে শুক্লপক্ষ। চিত্তের পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থা এস্থলে ষণ্মাসা উত্তরায়ণ শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট। ইহার বিপরীত বাসনাবিশিষ্ট মনের অবস্থা ধূমসদৃশ। জ্ঞানবিমুখ বলিয়া উহা মোহময় নিদ্রায় শায়িত থাকায় রাত্রির সহিত তুলনীয়। তমিস্রা রজনীর ন্যায় মনের যে অবস্থা তাহাই কৃষ্ণপক্ষ। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারময় অবস্থায় শরীরত্যাগই ষণ্মাসা দক্ষিণায়ন সহ তুলনীয় ॥ শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী ॥ অপর ব্যাখ্যাকারের মতে শ্লোকগুলির সোজাসুজি অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুর বিভিন্ন ফল স্বীকার করিতে হইবে এবং এই দুই পথের যে বিবরণ আছে তাহাও সত্য বলিয়া মানিতে হইবে, কারণ যোগবলের দ্বারা এই সত্য ঋষিরা জানিতে পারিয়াছেন। কেহ কেহ শুক্লকৃষ্ণগতিদ্বয়কে অন্ধবিশ্বাস, কষ্টকল্পনা বা কবিকল্পনা বলিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত সকল প্রকার মতের অযৌক্তিকতা ও অপূর্ণতা মুখবন্ধে ও পরিশিষ্টে শুক্লকৃষ্ণগতির আলোচনাকালে বিবৃত করিয়াছি এবং শ্লোকগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা দিবারও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য। এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার পুনরুল্লেখ করিতেছি। বহু পুরাকাল পূর্বে আর্যেরা উত্তরমেরু প্রদেশে বাস করিতেন ॥ তিলক ॥ এবং তখন এই প্রদেশকে ব্রহ্মলোক বলা হইত এবং তাহার অধিপতির নাম ছিল ব্রহ্মা। আধুনিক মঙ্গোলিয়া এবং পূর্বতুর্কীস্থান স্বর্গলোক এবং তাহার অধিপতিকে ইন্দ্র বলা হইত। সেইরূপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম ছিল ॥ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ॥ মঙ্গোলিয়া হইতে আর্যগণ ভারতবর্ষে আসেন এজন্য মঙ্গোলিয়াকে পিতৃলোকও বলা হইত। পিতৃলোক ও ভারতবর্ষ হইতে অনেকে ব্রহ্মলোকে যাতায়াত করিতেন। যে পথে তাঁহারা যাইতেন তাহা দেবযান পথ এবং যে পথে পিতৃগণ ভারতবর্ষে আসিতেন তাহা পিতৃযান পথ। কালক্রমে ব্রহ্মলোক ও পিতৃলোকে গমনাগমন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহার যথার্থ তত্ত্ব লোকে ভুলিয়া গেল ও ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে যাওয়া ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সমার্থবাচক বলিয়া মনে করিলেন।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

ব্রহ্মলোকের পথ দুর্গম হওয়ায় সেখান হইতে কদাচিৎ কেহ ফিরিয়া আসিতেন কিন্তু স্বর্গলোক বা পিতৃলোক হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্তন করিতেন; ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে প্রত্যাবর্তন হয় না এবং স্বর্গভোগের পর ফিরিয়া আসিতে হয়, এই বিশ্বাস মূলত ভৌম ব্রহ্মলোক ও ভৌম স্বর্গলোক সম্বন্ধেই প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয় একথা ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন, কেবল ব্রহ্মবিদের আত্মা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্তন করে না। জীবাত্মা শরীর হইতে উৎক্রমণ করিলে অন্য আশ্রয় অবলম্বন করে অতএব ঋষিরা অনুমান করিলেন চিতাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত হইলে কোন কোন আত্মা চিতাগ্নির জ্যোতির আশ্রয়ে ঊর্ধ্বে গমন করে; এই সকল আত্মার প্রত্যাবর্তন নাই; তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অপর আত্মা চিতাগ্নির ধূম আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোকে যায় এবং তথা হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ও ব্রীহি যবাদিতে সংক্রমিত হইয়া পুরুষশরীরে প্রবেশ করে ও পরে স্ত্রীর গর্ভ হইতে সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ভৌম ব্রহ্মলোকে ছয় মাস জ্যোতি ও ছয় মাস অন্ধকার। ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মা উত্তরায়নে দেহত্যাগ করিলে তাহার জ্যোতির আশ্রয় নষ্ট হয় না। কর্মীর আত্মা দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করে, কারণ তাহা ধূম ও অন্ধকার পথেই যায়। ধূম হইতে বৃষ্টি জন্মে এবং বৃষ্টির আশ্রয়ে আত্মা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিদ্বয়ে বিশ্বাস থাকায় যাঁহারা ইচ্ছামৃত্যু অবলম্বন করিতেন তাঁহারা মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। পাছে দক্ষিণায়নে মৃত্যু হয় এজন্য অনেকে উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে শুক্লকৃষ্ণগতিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিশ্বাসকে তিনি শাশ্বত বা বহুকাল হইতে প্রচলিত বলিয়াছেন; এই দুই গতির কথা জানিয়াও যোগীর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকিবার কারণ নাই। ২।৫২ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন বুদ্ধি যখন মোহকালুষ্য পার হয় তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ জন্মে। যোগী বেদবিহিত সকলপ্রকার পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে। সর্বদা যোগযুক্ত থাকিলে যে কোন কালেই মৃত্যু হউক না কেন যোগী পরমস্থান প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ অতিকৌশলে প্রচলিত মত এড়াইয়া গেলেন অথচ শুক্লকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেন না; সাধককে সর্বদা যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দেওয়ায় অন্ধবিশ্বাসের দোষ পরিত্যক্ত হইল। সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের ইহাই বিশিষ্টতা।

২৫

॥ ২৬ - ২৮ ॥ জগতের এই শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি শাশ্বত বলিয়া সম্মত অর্থাৎ বহুকাল হইতে এই প্রকার বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে; একটির দ্বারা অনাবৃত্তি ও অপরটির দ্বারা পুনরাবর্তন লাভ হয়। পার্থ, এই দুই গতির কথা জানিয়াও কোন যোগী মোহমান হন না, সেজন্য অর্জুন তুমি সর্বকালে যোগযুক্ত হও। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে পুণ্যফল কথিত হইয়াছে তাহা জানিয়াও যোগী এই সমুদায়কে অতিক্রম করেন এবং আদ্য পরমস্থান প্রাপ্ত হন **॥ ২৬ - ২৮ ॥**

২৮ শ্লোকের অন্বয় এইরূপ করিয়াছি, বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিস্টম্ তৎ বিদিত্বা যোগী সর্বম্ ইদং অত্যেতি আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি চ। অর্থাৎ, যোগী শাস্ত্রনির্দিষ্ট পাপপুণ্য বা শুক্লকৃষ্ণ গতির ভাবনায় মোহমান হন না। তিনি এই সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

অক্ষরব্রহ্মযোগ নামক
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

নবম অধ্যায়

গীতাব্যাখ্যা

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ

অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান ও সাধন মার্গের আলোচনা করিয়া নবম অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিজমতের উপদেশ বিশদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিজ নির্দিষ্ট উপায়কে শ্রীকৃষ্ণ রাজবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাজবিদ্যা কোনও একটি বিশেষ মার্গ নহে কিন্তু সকল সাধনাতেই রাজবিদ্যার সূত্রগুলি প্রযোজ্য। নিজ সমাজগত ধর্মমত মানিয়া কি করিয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে রাজবিদ্যা তাহারই উপদেশ দেয় এজন্য রাজবিদ্যার বিবৃতিতে নবম অধ্যায়ে তৎকাল প্রচলিত প্রধান প্রধান সমস্ত সাধনমার্গের পুনরুল্লেখ আসিয়াছে। রাজবিদ্যার বিবরণ নবম অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। রাজবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণের নিজের উদ্ভাবিত কোন নূতন মত নহে। বহু পুরাকাল হইতে রাজর্ষিবৃন্দ এই বিদ্যা অবগত ছিলেন কিন্তু কালক্রমে এই বিদ্যা লুপ্ত হয় ॥ ৪।১-২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুনরুদ্ধার করেন। রাজবিদ্যাকে রাজগুহ্য বলা হইয়াছে কারণ ইহা রাজন্যবর্গের মধ্যে পরম্পরা ক্রমে গোপনীয় তত্ত্বরূপে উপদিষ্ট হইত, সাধারণে ইহা অবগত ছিল না। গুহ্যতত্ত্বের লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। শ্রীকৃষ্ণই এই তত্ত্ব সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রথম প্রকাশ করিলেন। এই তত্ত্ব মহাভারতের অন্তর্গত গীতায় উপদিষ্ট হওয়ায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক প্রভৃতি সকলেরই অধিগম্য হইল। ক্ষত্রিয় রাজর্ষিবৃন্দের গুহ্যতত্ত্ব আর গুহ্য রহিল না ॥ ৯।৩২-৩৩ ॥ ১৫।২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই যে গুহ্যতম শাস্ত্র মৎকর্তৃক উক্ত হইল ইহা অবগত হইলে মনুষ্য বুদ্ধিযুক্ত হয় ও কৃতকৃত্য হইয়া যায়। সাধারণের মধ্যে এই গুহ্যশাস্ত্র প্রচলিত হইলে

পাছে কোন অল্পবুদ্ধি বা দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি গীতার কদর্থ করিয়া সমাজধর্মের কোন হানি করে সেই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন অজ্ঞানী মুর্খদিগকে জ্ঞানের কথা বলিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ করিতে নাই ॥ ৩।৩২ ॥ তপ ও অনুষ্ঠানশূণ্য অর্থাৎ শুদ্ধাচারহীন, অভক্ত, শ্রদ্ধাশূণ্য ছিদ্রান্বেষীকে এই তত্ত্ব বলিবে না ॥ ১৮।৬৭ ॥ পাছে গীতা পাঠে নিম্নাধিকারীর কোন অনিষ্ট হয় এজন্য নিজে অনুমোদন না করিলেও কৃষ্ণ কোনও ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি দ্ব্যর্থবাচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। এই উপায়ে বিশ্বাসীর বিশ্বাসভঙ্গ হয় নাই অথচ পূর্বাপর সংগতি বিবেচনা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম বুঝা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রত্যেক স্থলেই নিম্নাধিকারী কি করিয়া নিজ বিশ্বাসের সাহায্যেই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারেন কৃষ্ণ তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি। ২।৩৭ শ্লোকে আছে যুদ্ধে মরিলে স্বর্গলাভ ও জিতিলে রাজ্যলাভ হইবে অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সমাজানুমোদিত ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মলাভের উপদেশ দিয়াছেন, স্বর্গলাভের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা নাই অথচ সমাজধর্ম বজায় রাখিবার জন্য এখানে স্বর্গলাভের লোভ দেখাইলেন। স্বর্গলোভী যাহাতে উচ্চাধিকারের উপযুক্ত হয় তজ্জন্য পরের শ্লোকে বলিলেন, যুদ্ধ করিবে বটে কিন্তু সুখদুঃখ লাভালাভ ও জয় পরাজয়ে সমবুদ্ধি হইয়া যুদ্ধে নামিবে, ইহাতে পাপ স্পর্শ করিবে না। ৩।৯ শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ হয়। এক অর্থে যজ্ঞকর্মে বন্ধন নাই ও অপর অর্থে যজ্ঞেরও কর্মবন্ধন আছে। মুক্তসঙ্গ হইয়া যজ্ঞ করিতে বলায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর উচ্চাধিকার প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ৪।২৩ শ্লোকেরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা হয়। এক অর্থে যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম লয় হইয়া যায় আর দ্বিতীয় অর্থে অসঙ্গ হইয়া অনুষ্ঠান করিলে যজ্ঞকর্মও লয় হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাসমার্গের আলোচনায় অতি কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ সমাজ ও কর্মত্যাগ নিষেধ করিয়াছেন। অসঙ্গ কর্মীকেও সন্ন্যাসী বলায় সন্ন্যাস শব্দের দোষবর্জিত এক ব্যাপক অর্থ গৃহীত হইয়াছে। ৪।৩৮ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিলেন জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছু নাই আবার পাতঞ্জল যোগ মার্গের আলোচনায় বলিলেন যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬।৪৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক জ্ঞানী ও যোগীর প্রভেদ মানেন না ॥ ৫।৪ ॥ ৮।৫ শ্লোকে বলিলেন অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিলে মুক্তি হয় এবং এই অদ্ভুত মতের দোষ-ক্ষালনের জন্য ৮।৭ শ্লোকে বলিলেন, অতএব সর্ব সময়ে আমাকে স্মরণ কর।

৮।২৬ শ্লোকে প্রথমে বলিলেন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণে মরিলে বিভিন্ন গতি হয় পরে ৮।২৭ শ্লোকে বলিলেন, এই দুই গতির কথা জানিয়া কোনও যোগী মোহমান হন না। শুক্লকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাসী অর্থ করিবেন এই দুই গতি জানিবার ফলে যোগী তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া মোহমান হন না। অবিশ্বাসী অর্থ করিবেন যোগী এই দুই গতির কথা জানিয়াও অকালে মৃত্যু সম্ভাবনার ভয়ে মোহমান হন না অর্থাৎ তিনি এই মত গ্রাহ্য করেন না। সর্বকালে যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দেওয়ায় কৌশলে শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হইতেছে অথচ বিশ্বাসীর বিশ্বাসভঙ্গ করা হইতেছে না।

অন্ধবিশ্বাসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কোন উগ্রতা নাই। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বাস অন্ধের যষ্টির ন্যায়। দৃষ্টিশক্তি দান না করিয়া অন্ধের যষ্টি কাহারও কাড়িয়া লইবার অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকারের সাধকের দৃষ্টির আবরণ মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টিলাভ হইলে অন্ধ যেমন আপনিই যষ্টি ত্যাগ করে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা রাখে না জ্ঞানলাভ হইলে সেইরূপ সর্বপ্রকার অন্ধবিশ্বাস আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হয়। নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতেছেন যে সর্বপ্রকার সাধনার তিনিই আশ্রয় এবং ইহা জানিয়া যে কোন মার্গের সাধক মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি আমার উপদেশের ছিদ্রান্বেষী নহ সেজন্য তোমাকে সবিজ্ঞান এই গুহ্যতম জ্ঞানও বলিব, ইহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

শ্লোকে তু শব্দের তাৎপর্য পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহার অতিরিক্ত, অর্থাৎ এতক্ষণ তোমাকে নানাবিধ সাধনমার্গের কথা বলিতেছিলাম এইবার রাজবিদ্যার কথা শোন। কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি রাজবিদ্যার জ্ঞানভাগ ও বিজ্ঞানভাগ দুইই শুনাইবেন। জ্ঞান অর্থে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে 'সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে যুক্তি ও বিচারসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে।

॥ ২ - ৩ ॥ এই রাজবিদ্যা রাজগুহ্য, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ, ধর্মপ্রদ, সুখে প্রযোজ্য এবং অব্যয়। পরন্তপ, এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন মনুষ্যেরা

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার পথে ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তাহাদের বার বার সংসারে আসিয়া মৃত্যুর অধীন হইতে হয় ॥ ২ - ৩ ॥

রাজবিদ্যা শব্দের অর্থ দুইপ্রকার হইতে পারে, যথা, বিদ্যার রাজা অর্থাৎ বিদ্যাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কিংবা যে বিদ্যার তত্ত্ব রাজগণের মধ্যে আবদ্ধ। রাজগুহ্য শব্দেরও এইরূপ দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এই যোগ বা উপায় বা বিদ্যা রাজর্ষিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কালে তাহা লুপ্ত হয়। উপনিষদ্ পাঠ করিলেও দেখা যায় যে জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় জানিতেন এবং তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ ঋষিগণও উপদিষ্ট হইবার নিমিত্ত গমন করিতেন। গীতায় ৩।২০ শ্লোকে আছে জনক প্রভৃতি ঘোরতর রাজকর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদিত রাজবিদ্যার মূলসূত্র এই যে তুমি যে কর্মেতেই লিপ্ত থাক না কেন উপযুক্ত ভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারাই তোমার মুক্তিলাভ হইবে। ব্রহ্মবুদ্ধিতে কর্ম করিলে বন্ধন হয় না। এই সমস্ত যুক্তি বিচার করিয়া দেখিলে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য শব্দদ্বয়ের 'যে বিদ্যা রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যাহার রহস্য কেবল রাজর্ষিরাই জানিতেন' এই অর্থই সংগত মনে হইবে। রাজবিদ্যা সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি কোন প্রকার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মের বিরোধী নহে এজন্য ইহাকে ধর্ম্য অর্থাৎ ধর্মপ্রদ বলা হইয়াছে। এই বিদ্যার অনুষ্ঠানে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় না এজন্য ইহা কর্তুং সুসুখম্ অর্থাৎ সুখসাধ্য। সহজে আচরণীয় হইলেও ইহা ব্রহ্মলাভরূপ অনুত্তম ফলদান করে এজন্য ইহা উত্তম এবং ইহার অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় ও অভিক্রমনাশ দোষ নাই অর্থাৎ আচরণের দোষে ইহার সবটা পণ্ড হয় না এবং পণ্ড হইলে প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয় না ; ইহার আচরণে যে সফলতা অর্জিত হয় তাহা নষ্ট হয় না এজন্য ইহা অব্যয়। কোন আপ্তবাক্য বা অলৌকিক বিশ্বাসের উপর এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার ফল প্রত্যক্ষবোধসিদ্ধ এজন্য ইহা প্রত্যক্ষাবগম। এই প্রত্যক্ষাবগম

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

বিশেষণে বুঝা যায় যে অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ চালিত হন নাই। তাঁহার উপদেশ প্রত্যক্ষ অনুভব ও যুক্তি বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ব অধ্যায়সমূহেও রাজবিদ্যার মূলসূত্রগুলির বার বার উল্লেখ আছে কিন্তু নবম অধ্যায় হইতেই ইহার ধারাবাহিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহা শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইতেছেন যে ক্ষাত্রধর্ম পালন করিয়াই তিনি শ্রেয় লাভ করিবেন। রাজবিদ্যা নিশ্চেষ্ট হইয়া পরমার্থ সাধনের উপদেশ দেয় না। ব্যাবহারিক জগতের সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ হয় ইহাই রাজবিদ্যার গুহ্য তত্ত্ব। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য শান্তিবাদী আধুনিক মনীষিগণ যুদ্ধাদি ক্রূর কর্মকে মনুষ্যের ধর্মজীবনের পরিপন্থী মনে করেন কিন্তু কৃষ্ণের মত এই যে যুদ্ধাদিতে যোগ দিয়াও মনুষ্য আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, এবং সমাজের পক্ষে আবশ্যক হইলে ধর্মযুদ্ধে যোগদান ক্ষত্রিয়মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষ নিবারণকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু যখন অকৃতকার্য হইলেন ও যুদ্ধ অনিবার্য বুঝিলেন তখন ধর্মবুদ্ধিতেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। তিনি শস্ত্রধারণ করেন নাই বলিয়া যুদ্ধে যোগ দেন নাই বলা চলে না। বহু অত্যাচারী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল।

॥ ৪-৫ ॥ আমার মূর্তি অব্যক্ত অর্থাৎ তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আমার এই অব্যক্ত মূর্তির দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সমস্ত ভূত আমাতে বর্তমান আছে অর্থাৎ আমাতে আশ্রিত আছে কিন্তু তাহারা আমার আশ্রয় নহে আবার ভূতসমূহ বাস্তবিক যে আমাতে আছে তাহাও নহে। আমার ঐশ্বরীয় যোগ বা কর্মকৌশল বুঝিবার চেষ্টা কর, আমার আত্মা বা সত্তা ভূতগণের আশ্রয় ও পালক হইয়াও ভূতগণে অবস্থিত নহে **॥ ৪-৫ ॥**

ঐশ্বরযোগ শব্দের অর্থ শংকর মতে ঐশ্বরিক যুক্তি বা ঘটনা অর্থাৎ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ। ১১।৮ শ্লোকেও ঐশ্বরযোগ কথা আছে। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্বে কৃষ্ণ বলিতেছেন আমার ঐশ্বরযোগ দেখ। পরমাত্মার যে ভাব

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

সৃষ্টিব্যাপারে নিযুক্ত তাহাই ঐশ্বরভাব। পরমাত্মা নিজে সর্বব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিয়া যে কৌশলে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহাই তাঁহার ঐশ্বরযোগ। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। সূর্যালোকের আশ্রয়ে যেমন দৃশ্যবস্তু প্রকাশ পায় সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরসত্তার আশ্রয়ে জগৎব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। সূর্যালোক যেমন দৃশ্যবস্তুর সুরূপ কুরূপের জন্য দায়ী নহে ঈশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত নহেন। পরের শ্লোকে অন্য উদাহরণের সাহায্যে ইহাই বলা হইয়াছে।

॥ ৬ ॥ যেমন নির্লিপ্ত আকাশের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া মহান বায়ু সর্বদা সর্বত্র বিচরণ করে সেইরূপ মহাভূতসমূহ ও প্রাণিবর্গ নির্লিপ্ত আমাতে স্থিত হইয়া জগৎব্যাপারে প্রবর্তিত হয়, ইহা অবধারণ কর **॥ ৬ ॥**

সর্বব্যাপারে পরমাত্মা নির্লিপ্ত আছেন এই জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয় এবং ইহাই রাজবিদ্যার মূল সূত্র। পরবর্তী শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দিতেছেন যে সর্বপ্রকার সাধনার মূলে নির্লিপ্ত ভগবৎসত্তা আছে।

॥ ৭ - ১০ ॥ কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্ম দিবার অবসান হইলে ভূতসমূহ আমা হইতে উৎপন্ন প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনরায় কল্প আরম্ভ হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্ম দিবারম্ভে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি। নিজজাত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির বশে অবশ অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বারা চালিত সেই ভূতগ্রাম আমি বার বার সৃষ্টি করি অথচ, ধনঞ্জয়, আমি প্রকৃতির এই সকল কর্মে অনাসক্ত ও উদাসীনের মত কেবল

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ ১০

দ্রষ্টারূপে থাকায় সেই সকল কর্ম আমাকে বন্ধন করে না। আমি অধ্যক্ষরূপে থাকায় প্রকৃতি চরাচর সহিত জগৎ প্রসব করে, কৌন্তেয়, ইহাই জগতের বার বার সৃষ্টি, বিকাশ ও প্রলয়রূপ আবর্তনের কারণ **॥ ৭ - ১০ ॥**

এই শ্লোকসমূহে ৮।১৭-১৯ শ্লোকোল্লিখিত অহোরাত্র বিদ্যার ও সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। ৮।১৭-১৯ শ্লোকে আছে যে অহোরাত্রবিদ্‌গণ বলেন যে সহস্রযুগস্থায়ী ব্রাহ্ম দিনের প্রারম্ভে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত চরাচর উৎপন্ন এবং ব্রাহ্ম দিবার অবসান ঘটিলে তাহারা লয়প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম রাত্রিকাল অর্থাৎ আরও সহস্র যুগ অব্যক্তে বিলীন হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে ভূতগ্রামের বার বার সৃষ্টি ও প্রলয় হয়। ৯।৭ শ্লোকেও বলা হইল কল্পাদিতে সৃষ্টি ও কল্পক্ষয়ে ভূতগ্রামের লয় হয়। পুরাণমতেও সহস্র যুগে এক কল্প ॥ বায়ু ৫।৫২ ॥ এবং তাহাই ব্রহ্মার দিবস ॥ বায়ু। ৭।৫৮ ॥ এই কল্পকাল অহোরাত্রবিৎ ও মনু মতে ১৪৪,০০০,০০০,০০০ মানুষবর্ষ ॥ মনু।১।৬৯- ॥ এবং বিষ্ণুপুরাণমতে ৪৩২০,০০০,০০০ মানুষবর্ষ। পৌরাণিক-গণ বলেন যে এই কালের দ্বিগুণ কাল ব্রাহ্ম অহোরাত্র, ব্রাহ্ম অহোরাত্রের ৩৬০ গুণ কাল ব্রাহ্ম বর্ষ এবং ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শত ব্রাহ্ম বর্ষ। অহোরাত্রবিদ্‌গণের মানে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ১০৩৬৮,০০০,০০০,০০০,০০০ মানববৎসর। কল্পাবসানে চরাচর যেমন অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে লীন হয়, পুরাণমতে তেমনি ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হয়, তখন এক নির্গুণ ব্রহ্মসত্তা মাত্র থাকিয়া যায়। মৎপ্রণীত পুস্তক 'পুরাণপ্রবেশ' ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

॥ ১১ ॥ আমি এই ভূতসমূহের মহেশ্বর। ভূতমহেশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ মনুষ্যশরীরাশ্রিত আমাকে ছোট করিয়া দেখে **॥ ১১ ॥**

এখানে পুরুষরূপ পরা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, ইহার দ্বারাই জগৎ বিধৃত হইয়া আছে॥৭।৫॥ ইহাই ভূতমহেশ্বর তত্ত্ব। প্রত্যেক মনুষ্যে ভগবানের চৈতন্যময়ী পরা প্রকৃতি জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। এই জীবাত্মা জগৎব্যাপারে বাস্তবিক উদাসীন বা দ্রষ্টামাত্র ইহা উপলব্ধি করিতে অপারগ হওয়ায় জীব নিজেকে সামান্য মনুষ্য মনে করে। ৭।২৪ শ্লোকেও এই কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞানোদয়ে নির্লিপ্ত পরম সত্তা উপলব্ধ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

হয় ও তখন মোক্ষলাভ হয়। ভগবানের ইহাই অবতারতত্ত্ব ॥ ৪।৬-১০ ॥ ৯।১১ শ্লোকে সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব এবং অবতারতত্ত্ব এই দুইয়েরই আভাস আছে। এই দুই তত্ত্বই মূলত এক। পরিশিষ্টে 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় 'অবতারবাদ' দ্রষ্টব্য।

॥ ১২ - ১৫ ॥ মোহকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকেই যাহারা আশ্রয় করে তাহাদের আশা বৃথা হয়, কর্ম বৃথা হয়, জ্ঞান বৃথা হয় এবং তাহারা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া থাকে। পার্থ, মহাত্মাগণ দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করায় আমাকে ভূতসমূহের আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যমনা হইয়া ভজনা করেন। তাহারা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করিতে থাকিয়া অর্থাৎ স্মরণ ও বর্ণন করিতে থাকিয়া এবং দৃঢ়ব্রত যত্নশীল হইয়া আমাকে নমস্কার করিতে থাকিয়া ভক্তিসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। আবার অপরে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজনা করিয়া একত্ব বা পৃথকত্ব কল্পনা করিয়া বহুধা বিশ্বতোমুখ আমাকে ভজনা করেন **॥ ১২ - ১৫ ॥**

এখানে দুই প্রকার প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, এক রাক্ষসী বা আসুরী ও অপর দৈবী। ৭।১৫ শ্লোকে আসুর ভাবের কথা আছে এবং ১৬।৪-২০ শ্লোকে আসুরী সম্পদের কথা এবং ১৬।১-৩ শ্লোকে দৈবী সম্পদ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বকালে দেব ও অসুর নামে পৃথক জাতি ছিল এবং যাহারা দস্যু ও তস্করবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করিত তাহাদের রাক্ষস বলা হইত। এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্বভাব ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াই দৈবী ও আসুরী বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল। যাহারা প্রকৃতিজাত জড়বস্তুসমূহকেই চরম লভ্য বিবেচনা করিয়া ধন মান অর্জন ও বিবিধ ভোগলাভের জন্য সাধনা করে তাহাদের স্বভাব আসুরী ও যাহারা এই সকল বিনশ্বর কাম্য পদার্থে মোহিত না

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

হইয়া তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ অবিনাশী ব্রহ্মসত্তার প্রতি মনোনিবেশ করে তাহাদের স্বভাব দৈবী। ভগবানের দুই রূপ, অপরাপ্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতির যে মোহকর গুণের বশে মনুষ্য পরমসত্তা না জানিয়া জড়প্রকৃতিকেই চরম লভ্য মনে করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় তাহাই আসুরী প্রকৃতি, এই প্রকৃতিজাত স্বভাবই আসুরী স্বভাব এবং তদুৎপন্ন গুণাবলী ও কর্মচেষ্টা এবং তদর্জিত সম্পদ আসুরী সম্পদ। প্রকৃতির যে গুণে অপরা ও পরা প্রকৃতির আশ্রয়স্বরূপ চরমসত্তা ব্রহ্মের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয় তাহাই দৈব প্রকৃতি।

অধিবাদীরা জড়প্রকৃতির পশ্চাতে এক অবিনাশী সত্তার অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন এজন্য তাহারা সূর্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিকে দেবতারূপে কল্পনা করিলেও জড়োপাসক নহেন। তাহাদের ভাব দৈবীভাব। যোগীরা ধ্যানের দ্বারা পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ চিন্তন করেন। পরমাত্মাই আত্মার স্বরূপ এজন্য যোগীরাও দৈবীভাব-সম্পন্ন। ৭।১৩-১৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে, প্রকৃতিজাত ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা মোহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ আমাকে ভাবত্রয়ের অতীত অব্যয়সত্তা বলিয়া জানিতে পারে না। আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়, যাহারা আমাকে আশ্রয়-রূপে গ্রহণ করে কেবল তাহারাই ঐ মায়া উত্তীর্ণ হয়। দুরাচার মূঢ় নরাধমগণ মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং আমার শরণাপন্ন হয় না। পুনশ্চ ৭।২৪-২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, আমার অব্যয় পরম স্বরূপ না জানিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমাকে শরীরধারী সামান্য মনুষ্য মনে করে। আমি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া আমাকে অজ ও অব্যয় বলিয়া বুঝিতে পারে না।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিনশ্বর জড়বস্তুসমূহে মোহিত হন না কিন্তু এই ভূতবর্গের যিনি আদি ও অব্যয় কারণ তাহাকেই ভজনা করেন। সেই আদি কারণ বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জীবশরীর প্রভৃতি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত সকল পদার্থে ওতপ্রোত থাকায় বহুভাবে বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছে, এজন্য ইহাকে বহুধাবিশ্বতোমুখ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য অধিবাদের আলোচনায় এই বিশ্বতোমুখ পরমসত্তাকেই জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানিগণ এই সত্তাকে দুই ভাবে দেখেন, একত্বেন এবং পৃথক্‌ত্বেন। যিনি একত্ব দেখেন তিনি বলেন নেহ নানাস্তি কিঞ্চন অর্থাৎ এই জগতে নানাত্ব নাই,

একমেবাদ্বিতীয়ম্ এক এবং অদ্বিতীয় সত্তামাত্র আছে। যিনি পৃথকৃত্ব দেখেন তিনি বলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ কঠ। ৫।৯॥

অর্থাৎ,
একই অনল যথা ভুবনে প্রবেশি
রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করিল।
সর্বভূত অন্তরেতে একই আত্মা পশি
নানারূপ ধরি পুন বহিঃ বিস্তারিল॥

॥ ১৬ ॥ আমিই ক্রতু অর্থাৎ বেদবিহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, আমিই যজ্ঞ অর্থাৎ স্মৃতিবিহিত ব্রতদানাদি কর্ম, আমিই স্বধা অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অর্পিত অন্নাদি, আমিই ঔষধ অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি যাহার দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পত্তি হয়, আমিই মন্ত্র অর্থাৎ বিবিধ যজ্ঞমন্ত্র গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রাদি, আমিই আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞে নিহত পশুর মেধ এবং ঘৃত, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম **॥ ১৬ ॥**

এই শ্লোকে বৈদিক যজ্ঞাদির কথা, দৈনন্দিন হবন, পিতৃযজ্ঞ, মন্ত্র ও যজ্ঞৌষধির দ্বারা পরমার্থ সাধনার কথা বলা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন ক্রতু যজ্ঞ স্বধা সমস্তই তিনি। সর্বপ্রকার যজ্ঞ ভগবান, সর্বপ্রকার যজ্ঞ সাধন এবং যজ্ঞক্রিয়াও ভগবান। যজ্ঞে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, যে ঘৃতাদি ও ওষধি নিবেদন করা হয়, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, যে হবনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই ভগবান। পূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ সর্বপ্রকার সাধনাকে যজ্ঞ বলায় এখানে বৈদিক যজ্ঞের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞে চতুর্দশ প্রকার ওষধি নিবেদিত হইত, যথা, ব্রীহি, যব, মাস, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলথক, শ্যামাক, নীবার, জর্তিল, গবেধুক, বেণুযব এবং মর্কটক॥ বিষ্ণুপুরাণ। ১।৬॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

গীতার ৪।২৪ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যিনি অর্পণ অর্থাৎ হোমক্রিয়াকে ব্রহ্ম ভাবেন, হবি অর্থাৎ অর্পণদ্রব্যকে ব্রহ্ম ভাবেন, ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মই হোম করিতেছেন অর্থাৎ অগ্নিকেও ব্রহ্ম এবং যজমানকেও ব্রহ্ম ভাবেন তাহার ব্রহ্মে একাগ্রবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি ব্রহ্মলাভ করেন।

॥ ১৭ - ১৯ ॥ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, আমিই জ্ঞাতব্য পবিত্র ওঁকার এবং ঋক্ সাম ও যজু, আমি এই জগতের গতি অর্থাৎ চরম গন্তব্য স্থান বা আশ্রয়, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী বা নির্লিপ্ত দ্রষ্টা, নিবাস বা ভোগস্থান, শরণ বা রক্ষক, সুহৃৎ বা অন্তরঙ্গ, উৎপত্তিস্থান ও হেতু অর্থাৎ প্রভব, প্রলয় বা বিনাশকারণ, স্থান বা অধিষ্ঠান, নিধান বা অব্যক্ত কর্মফলরূপী অদৃষ্টের ভাণ্ডার এবং অক্ষয় বীজ। অর্জুন, আমিই আদিত্যরূপে তাপ দান করি, বর্ষার জল শোষণ করি এবং বর্ষণ করি, আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং আমিই সৎ ও অসৎ **॥ ১৭ - ১৯ ॥**

কেহ ভগবানকে পিতারূপে, কেহ মাতা, কেহ বা পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে উপাসনা করেন, কেহ বা বৈদিক মন্ত্র ওঁকারের সাধনা করেন, কেহ বেদবিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তুমি যে ভাবেই উপাসনা কর না কেন আমিই সেই ভাব। এখানে ১৯ শ্লোকে অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ কথাগুলির পর পর উল্লেখে মনে হয় উপনিষদুক্ত বৈদিক পবমান মন্ত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যজ্ঞে যখন প্রস্তোতা গান আরম্ভ করিবেন তখন তাঁহাকে পবমান মন্ত্র জপ করিতে হইবে, অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময় ইতি, অর্থাৎ অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যাও, তম হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ॥ ১।৩।২৮ ॥ কৃষ্ণ বলিতেছেন, সৎ, অসৎ, মৃত্যু, অমৃত সমস্তই ব্রহ্ম। এখানে অসৎ শব্দের অর্থ জগৎরূপ কার্য, মূলত

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোংকার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯

ব্রহ্মসত্তা হইতে জগতের পৃথক অস্তিত্ব নাই এজন্য ইহা অসৎ। ১৯ শ্লোকে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর কথা আছে কারণ যজ্ঞকাল ঋতু হিসাবে নির্দিষ্ট হইত। যজ্ঞকাল, যজ্ঞমন্ত্র, যজ্ঞদেবতা, যজ্ঞনিদেশক বেদ প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম।

॥ ২০ - ২২ ॥ ত্রিবেদের অনুগামী সোমপা নামক ঋষিগণ আমাকেই যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। তাঁহারা পবিত্র অর্থাৎ পুণ্যলব্ধ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ করেন। তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। ত্রয়ীধর্ম অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞাদির আশ্রয়কারী ভোগাভিলাষী ব্যক্তিগণ এইরূপে স্বর্গমর্ত্যে যাতায়াত করেন অপর পক্ষে অনন্যমনা হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন সেই নিত্য অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিদিগের যোগক্ষেম অর্থাৎ ফল অর্জন ও ফলরক্ষার ভার আমি বহন করি **॥ ২০ - ২২ ॥**

এই তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে যদিও সকল যজ্ঞে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন তথাপি বেদানুগামীরা যজ্ঞ হইতে স্বর্গলাভ মাত্র কামনা করেন বলিয়া তাঁহাদের স্বর্গে মর্ত্যে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। তাঁহারা মনে করেন যে যজ্ঞের ফললাভ ও ফলরক্ষণ তাঁহাদের নিজকর্মের উপর নির্ভর করে এবং সামান্য ত্রুটিতে সমস্ত যজ্ঞকর্ম পণ্ড হইয়া যায়, অপরপক্ষে সর্বকার্যে চিত্ত ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইলে ফল ব্রহ্মে অর্পিত হয়, এরূপ ব্যক্তির যোগক্ষেম ভগবান বহন করেন ও তাঁহাদের কার্যে প্রত্যবায় ও

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

অভিক্রমনাশ দোষ হয় না। যজ্ঞাদিতে ও দেবতাগণে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ব্রহ্মের প্রতি অভিনিবেশ না থাকিলে কি ফল হয় পরের শ্লোকে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

গীতার ৯।২০ শ্লোকে তিন বেদের উল্লেখ আছে, পরের ২১ শ্লোকেও ত্রয়ীধর্ম অবলম্বনকারীদের কথা আছে। পুরাকালে মাত্র তিন বেদ ছিল, অথর্ববেদের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিন বেদ বিভাগ করিয়া চার বেদ করেন। মহাভারতের যুগে সোমপা নামে এক বিশেষ যাজ্ঞিক ঋষিসম্প্রদায় ছিলেন। সোমপান এই সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৮৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে দক্ষযজ্ঞের সময় উষ্মপা, সোমপা, ধূমপা, আজ্যপা প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়াছিলেন। গীতায় ১১।২২ শ্লোকে উষ্মপার উল্লেখ আছে। ২১ শ্লোকের কামকামাঃ শব্দের অর্থ ২।৭০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

॥ ২৩ - ২৫ ॥ কৌন্তেয়, যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভিন্ন বুদ্ধিতে অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারাও অবিধিপূর্বক অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া আমারই উপাসনা করে এ কথা সত্য কারণ আমি সর্বপ্রকার যজ্ঞের অর্থাৎ কর্মের ভোক্তা এবং প্রভু কিন্তু তাহারা তত্ত্বত আমাকে না জানায় অর্থাৎ আমিই বাস্তবিক তাহাদের পূজার ভোক্তা ও প্রভু ইহা না জানায় শ্রেয় লাভ হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ পূজার দ্বারা যতটা ফল পাওয়া যাইত তাহা লাভ করিতে পারে না। দেবপূজকগণ দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়, পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকে পায়, ভূতপূজকগণ ভূতগণকে পায় আর আমার পূজকগণ আমাকেই লাভ করে **॥ ২৩ - ২৫ ॥**

গীতার ৪।১১ এবং ৭।২১-২২ শ্লোকেও এই শ্লোকগুলির অনুরূপ কথা আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। উপাসক উপাস্যদেবতাকে প্রাপ্ত হন ইহা হিন্দুশাস্ত্রের মত। এখানে নানা প্রকার উপাসকের কথা বলা হইয়াছে। ভূতপূজক শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ২৩
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

পারে, যথা, যাহারা ভূতের বা জড়দ্রব্যের উপাসনা করে অর্থাৎ যাহারা ধনাদি লাভের চেষ্টা করে এবং দ্বিতীয় অর্থ যাহারা উপদেবতার পূজা করে। সম্ভবত এই শেষোক্ত অর্থ এখানে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৭।৪ শ্লোকে আছে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতার পূজা করেন রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষাদির পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিগণ প্রেতান্ ভূতগণান্ অর্থাৎ ভূতপ্রেতের পূজা করে। ১৭।১ শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন অশাস্ত্রীয় অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত যজনের কি ফল। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর দ্রষ্টব্য। বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞাদি ও দেবপূজাতেও যে ফল পাওয়া যায় না ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে সামান্য সাধনে তাহা লভ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

॥ ২৬ - ২৮ ॥ যে নিয়তচিত্ত অর্থাৎ সংযতমনা পুরুষ ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল অর্পণ করে তাহার ভক্তিপূর্বক উপহার দেওয়া সেই দ্রব্য আমি গ্রহণ করি, অতএব কৌন্তেয়, যে কাজ তুমি কর, যে দ্রব্য আহার কর, যাহা কিছু উৎসর্গ কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধন কর সে সমস্তই আমাকে অর্পণ কর অর্থাৎ সকল দৈনন্দিন কাজ এবং পূজা অর্চনা প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান কর। এরূপ ভাবে চলিলে, শুভ ও অশুভ কর্মের যে বন্ধন ফল আছে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাসযোগের দ্বারা বন্ধনমুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে **॥ ২৬ - ২৮ ॥**

গীতার ৪।২৪ শ্লোকেও এই প্রকার উপদেশ আছে। নির্লিপ্ত মনে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করা রাজবিদ্যার মূল শিক্ষা। এই উপদেশ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইলে যে কোন সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মলাভ হইতে পারে। কোনও এক বিশেষ সাধনমার্গ অবলম্বন করিতে হইবে বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন কথা মনে করা উচিত নহে। রাজবিদ্যার উপদেশ মত চলিলে সামাজিক আচার

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬
যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

ব্যবহার পরিত্যাগের বা পরিবর্তনেরও কোন আবশ্যক থাকে না। গীতা প্রচারের প্রসাদে এখন অনেকের মুখেই এই উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কালে এই তত্ত্ব রাজবিদ্যার গুহ্যতত্ত্ব ছিল, সাধারণে তাহা জানিত না। লোকে মনে করিত আয়াসসাধ্য যজ্ঞ, পূজা, কৃচ্ছ্র সাধন ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকেই বলিতেছেন সকল সাধক এবং সকল ব্যক্তিই তাঁহার নিকট সমান। সকলেই তাঁহাকে পাইতে পারে।

॥ ২৯ - ৩৩ ॥ আমি সর্বভূতে সমদর্শী, আমার অপ্রিয়ও নাই প্রিয়ও নাই কিন্তু যে কেহ আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করে সে আমাতেই অবস্থান করে এবং আমিও তাহার অন্তরে প্রকাশ পাই। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে সে সাধু বলিয়াই গণ্য হয় কারণ তাহার ব্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উপযুক্ত পথাবলম্বী হইয়াছে অর্থাৎ কোন্ পথ ধরিতে হইবে সে স্থির করিয়াছে, সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় অর্থাৎ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপথ অবলম্বন করে এবং চিরস্থায়ী শান্তিলাভ করে। কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না এ কথা মানিও। পার্থ, যে সকল নীচকুলোৎপন্ন বা অন্ত্যজ এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা আমাকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহারাও পরমগতি প্রাপ্ত হয়, পবিত্র-কুলজাত ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণের আর কথা কি, অতএব এই অনিত্য ও সুখহীন সংসারে যখন জন্মিয়াছ তখন মুক্তির নিমিত্ত আমাকেই ভজনা কর **॥ ২৯ - ৩৩ ॥**

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণের যুগে সাধারণের ধারণা ছিল যে নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তি, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির মুক্তিলাভ হয় না কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই মুক্তির অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণের কোন জাত্যভিমান বা স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা নাই।

॥ ৩৪ ॥ আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই যজনা কর, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়া আমাকে পরম আশ্রয়রূপে অবলম্বন কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে **॥ ৩৪ ॥**

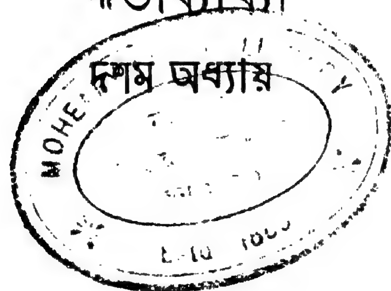
অনেকে মনে করেন রাজবিদ্যার উপদেশ এইখানেই শেষ হইয়াছে কিন্তু তাহা নহে। দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভূয় এব শৃণু অর্থাৎ আরও শুন বলিয়া নিজ বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে রাজবিদ্যার বিজ্ঞানও বর্ণিত হইবে বলিয়াছেন কিন্তু নবম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ নাই। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত রাজবিদ্যার উপদেশ। সমগ্র গীতাই রাজবিদ্যা বলিলে অন্যায় হইবে না। নবম অধ্যায়ে রাজ-বিদ্যার বিশদ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ
নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

দশম অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন যে সর্বপ্রকার সাধনার মূলে ব্রহ্মসত্তা বর্তমান আছে এবং তাহা উপলব্ধি করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্ম যে সকলপ্রকার সৃষ্ট পদার্থ ও সর্বপ্রকার মানসিক ভাবেরও মূল এই অধ্যায়ে তাহা বিশদ করিতেছেন। নিজ অহংএর সহিত ব্রহ্ম অভিন্ন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ কথা বলিতেছেন।

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, মহাবাহো, দেখিতেছি আমার কথায় তোমার আনন্দ হইতেছে সেজন্য তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে আমার যে পরম বাক্য বলিতেছি তাহা আরও শোন ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ পূর্বাধ্যায়ের উপদেশের পরম অর্থাৎ চরম কথা, অর্থাৎ ব্রহ্মই সকলের আদি এবং সকল বস্তুতে তিনিই উপাসিতব্য এই কথা পুনর্বার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

॥ ২ ॥ আমার প্রভব ও শক্তির কথা দেবতাগণও জানেন না মহর্ষিগণও জানেন না কারণ সর্বপ্রকারেই, অর্থাৎ যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

প্রভব কথার অর্থ শক্তি কিংবা উৎপত্তি। শ্লোকে এই উভয় ব্যঞ্জনাতেই প্রভব কথা প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়। ব্রহ্মের উদ্ভব যেমন অচিন্তনীয় শক্তিও তদ্রূপ। পুরাণমতে সুরগণ মানবগণের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে প্রজাপতিগণ, মনুগণ ও মহর্ষিগণ হইতে বিভিন্ন মানবজাতির উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম এ সকলেরও পূর্বগামী এজন্য তিনি আদি, আবার প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট যাবতীয় বিদ্যা এবং সাধনযোগ্য ও নিগ্রহযোগ্য গুণাবলী ব্রহ্মেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়াও ব্রহ্মই আদি। যাহা বিভূতি বা ঐশ্বর্য, শ্রী কিংবা শক্তিসম্পন্ন উপাসনার উদ্দেশ্যে তাহারই গুরুত্ব অধিক এজন্য দশম অধ্যায়ে প্রধানত এই তিনপ্রকার গুণবিশিষ্ট সত্তার উল্লেখ করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে তিনিই ইহাদের আদি ॥ ১০।৪১ ॥

॥ ৩ ॥ মনুষ্যমধ্যে যে মোহশূন্য ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত এবং অনাদি লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানেন তিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন **॥ ৩ ॥**

কোনও এক বিষয়ে অযথা আগ্রহের নাম মোহ। লোকমহেশ্বর শব্দের অর্থের জন্য ৪।৬ এবং ৯।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ভগবান সর্বলোকের অধীশ্বর হইয়াও যে নির্লিপ্ত আছেন ইহাই লোকমহেশ্বর বা ভূতমহেশ্বর তত্ত্বের প্রধান কথা।

॥ ৪ - ৫ ॥ আমা হইতেই ভূতবর্গের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হয় **॥ ৪ - ৫ ॥**

ভগবান বলিলেন ভাল মন্দ সর্ববিধ ভাবের তিনিই আদি। বুদ্ধি অর্থে যে মনোবৃত্তির সাহায্যে কোনও বিষয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে আমরা একটি বাছিয়া লই। বিভিন্ন বিষয়ের বোধের নাম জ্ঞান। কোন বিষয়ের প্রতি অযথা আগ্রহের অভাব অসম্মোহ। পরকৃত অনিষ্ট সহনশীলতার নাম ক্ষমা। নিজে কোন

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

বিষয় যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহা ঠিক সেই ভাবে অপরকে বুঝাইবার জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাহাকে সত্য বলে। বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম ও অন্তঃকরণ নিগ্রহকে শম বলে। ভব অর্থে উৎপত্তি কিন্তু এখানে মানসিক ভাব সকল উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ভব শব্দের অপর অর্থ অস্তিত্ব এ স্থলে সংগত। যোগসূত্রে অবিদ্যা অর্থে ভব শব্দের প্রয়োগ আছে ॥ যোগ। ১।১৯ ॥ অভাব ভবের বিপরীত ভাব বা নাস্তিত্ব বোধ। অহিংসা পরপীড়নে অনিচ্ছা। সমতা অর্থে সমচিত্ততা অর্থাৎ চিত্তের অবিকারিত্ব অথবা বিভিন্ন পদার্থে সমবুদ্ধি। প্রাপ্ত বিষয়ে পর্যাপ্তজ্ঞানকে তুষ্টি বলে। দান, যশ ও অযশ শব্দে তৎ তৎ সংক্রান্ত মনোভাবই শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে, দানাদি কার্য নহে।

॥ ৬ ॥ এই সমস্ত প্রজা যাঁহাদের সৃষ্টি মদ্‌ভাবে ভাবিত সেই সাত জন মহর্ষি এবং চারি জন মনু পূর্বকালে মানস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন **॥ ৬ ॥**

এই অধ্যায়ের ২ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন তিনি মহর্ষিগণেরও আদি, এখানে তাহাই বিস্তার করিতেছেন। পৌরাণিক ধারণা এই যে সমস্ত জীবজগৎ প্রজাপতিগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া প্রজাসর্জন মানসে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি জনকে উৎপন্ন করিলেন কিন্তু এই চারি জনই নিবৃত্তি-মার্গে গমন করায় প্রজা জন্মিল না। তখন ব্রহ্মা অপর মানসপুত্র সকল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা সর্বপ্রকার জীবের আদি হওয়ায় এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা প্রজাপতি নামে অভিহিত হইলেন। এই শ্লোকে উল্লিখিত সপ্ত মহর্ষি ও চারি মনুই প্রজাপতি এজন্য শ্লোকে প্রজা শব্দ আছে। ইহারা জীববর্গের উৎপত্তির কারণ হইলেও এবং ব্রহ্মার মানসজাত হইলেও ভগবান ইঁহাদের ও ব্রহ্মারও আদি।

গীতায় মহর্ষি, দেবর্ষি, মুনি প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন শ্লোকে আছে, তাহাদের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করিতেছি। যিনি সত্য, শ্রুতি, তপস্যা, বিদ্যা ইত্যাদি গুণান্বিত হইয়া ব্রহ্মে রত হন তিনি ঋষিপদবাচ্য। যে ঋষি অব্যক্ত পরমতত্ত্বে নিবিষ্ট হন তিনি পরমর্ষি, যিনি মহান্‌কে অবলম্বন করেন তিনি মহর্ষি। যাঁহারা দেবতাদিগকে জানেন তাঁহারা দেবর্ষি। যাঁহারা প্রজাগণকে রঞ্জন করিয়া তাহাদের মতিগতি জানিতে পারেন

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

তাঁহারা রাজর্ষি। দীর্ঘায়ুষ্কতা, মন্ত্রকারিতা, ঐশ্বর্য, দিব্যদৃষ্টিতা, জ্ঞানশালিতা, প্রত্যক্ষ-ধর্মসেবিতা ও গোত্রপ্রবর্তনকারিতা এই সপ্তগুণযুক্ত ঋষিকে সপ্তর্ষি বলে অথবা যাঁহারা পঞ্চতন্মাত্র এবং সত্যে সমাসক্ত তাঁহারাও সপ্তর্ষি। শ্রুততত্ত্বসমূহে যাঁহারা নিবিষ্ট তাঁহারা শ্রুতর্ষি। ঋষিপুত্রগণ ঋষিক নামে অভিহিত॥ বায়ু। ৫৯, ৬১ এবং মৎস্য ১৪৫ অধ্যায়॥ মননশীল, বিদ্বান, মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যক্তিকে মুনি বলা হয়, অনেক মুনি মৌনব্রতাবলম্বী।

পুরাণে কোথাও সাত, কোথাও নয় ও কোথাও দশ জন মহর্ষির নাম আছে। সপ্ত মহর্ষি, যথা, ভৃগু, অঙ্গিরস, দক্ষ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ও প্রজাপতি॥ বায়ু ।২৫।৮২॥ নব মহর্ষি, যথা, ভৃগু, অঙ্গিরস, দক্ষ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরীচি এবং অত্রি॥ বিষ্ণু ।১।৭।৫,৬॥ ইঁহারা পুরাণে নব ব্রহ্মা নামে পরিচিত। দশ মহর্ষি, যথা, ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি এবং নারদ। ইঁহাদিগকেও ব্রহ্মার দশ মানসপুত্র বলা হইয়াছে॥ মৎস্য ।৩।৬-৮॥ প্রচেতার পরিবর্তে কোন কোন স্থলে মনুর নাম দশ মানসপুত্রের মধ্যে উল্লিখিত হয়॥ বায়ু ।৫৯।৮৭॥

যে সকল রাজা প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রজাপালনের জন্য ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করাইয়াছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতে মনু নামে পরিচিত ছিলেন। মনুগণের নাম অনুসারে এক কালবিভাগও প্রচলিত ছিল, ইহাকে মন্বন্তর বলা হইত। এক কল্পকালে চতুর্দশ মন্বন্তর কল্পিত হইয়াছিল ॥৭।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ চতুর্দশ মনুকাল, যথা, স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম, রৌদ্র, রৌচ্য এবং ভৌত্য। সম্ভবত প্রথম চারি মনু গীতার ১০।৬ শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গসমূহের পরোক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন দশম অধ্যায়েও সেইরূপ তৎকালীন নানা ধর্মবিশ্বাসের এবং যে সকল বস্তু সম্মানিত ছিল বা উপাস্য বিবেচিত হইত তাহাদের গৌণভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

॥ ৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগকে, অর্থাৎ আমার সৃষ্টির বিস্তার এবং ঐশ্বর্যকে এবং কি প্রকার কর্মকৌশলরূপ যোগের দ্বারা আমি

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া সৃষ্টিকর্তা হইয়াছি তাহা, যথার্থত উপলব্ধি করেন তিনি অবিচলিত যোগের সহিত যুক্ত হন এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৭ ॥

যিনি ভগবানের যোগ বা কর্মকৌশল জানেন তিনি নিজেও ঐ প্রকার কর্মকৌশল আয়ত্ত করেন। এই ধরণের কথা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেও বলিয়াছেন। ৪।৯ শ্লোকে আছে, যে আমার দিব্য জন্ম কর্মের তত্ত্ব অবগত আছে দেহত্যাগের পর তাহার পুনর্জন্ম হয় না এবং সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ভগবান নির্লিপ্ত থাকিয়া কি করিয়া জন্মান ও কর্ম করেন জানিলে মুক্তি। নির্লিপ্ত থাকিয়া কর্ম করার কৌশল গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধিযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ভগবানই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের মূলে আছেন জানিয়া জ্ঞানিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করেন ও তাঁহারই আলোচনায় নিবিষ্ট থাকেন। এইরূপ সততযুক্ত ব্যক্তিদের ভগবান বুদ্ধিযোগ দান করেন যাহার দ্বারা তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

॥ ৮ - ১১ ॥ আমি সকলের উৎপত্তির মূল এবং আমা হইতে সমস্ত জগদ্ব্যাপার চলিতেছে ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ ভাবযুক্ত হইয়া অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। সেই সকল জ্ঞানীরা আমাতেই মন সমর্পণ করিয়া মদ্গত-প্রাণ হইয়া পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়া ও নিত্য আমার কথা আলোচনা করিয়া তুষ্টি ও প্রীতি লাভ করেন। সেই সকল সততযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজনাপর ব্যক্তিদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাবশেই আমি তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন তম নাশ করি ॥ ৮ - ১১ ॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

এখানে ৮ শ্লোকের ভাব শব্দের অর্থ প্রীতি। বাংলাতেও প্রীতি অর্থে ভাব শব্দের ব্যবহার আছে, যথা, রামের সহিত শ্যামের ভাব আছে। ২।৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাবনা শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। ভাব ও ভাবনা সমার্থবাচক। শংকর মতে ১০ শ্লোকের সততযুক্ত শব্দের অর্থ যাঁহার সকল প্রকার কামনা নিবৃত্ত হইয়া ভগবানে মন যুক্ত হইয়াছে। এ অর্থ সংগত মনে হয় না কারণ শংকর বর্ণিত সততযুক্তের অবস্থা স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা। বুদ্ধিযোগ আয়ত্তে আসিলে পর স্থিতপ্রজ্ঞত্ব অধিগম্য হয়। শংকর ব্যাখ্যা মানিলে সততযুক্তকে বুদ্ধিযোগ দান করি ভগবানের এই উক্তি অর্থশূন্য হয়। ১০।১৭ শ্লোকে সদা পরিচিন্তয়ন কথা আছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যোগিন্, আমি কি ভাবে সর্বদা চিন্তা করিলে তোমাকে জানিতে পারিব। সদা পরিচিন্তা করা ও সতত যুক্ত থাকার একই অর্থ। ১২।১,২ শ্লোকেও সততযুক্ত ও নিত্যযুক্ত কথা আছে।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুনের ভক্তি, বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে।

॥ ১২ - ১৫ ॥ অর্জুন বলিলেন, সমস্ত ঋষিগণ এবং দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে বলেন, আপনি পরম ব্রহ্ম পরম আশ্রয় পরম পবিত্র শাশ্বত পুরুষ দিব্য অর্থাৎ দ্যোতনশীল ও স্বপ্রকাশ আদিদেব জন্মরহিত বিভু বা সর্বব্যাপী। স্বয়ং তুমিও আমাকে তাহাই বলিতেছ। কেশব, তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে তাহা সমস্তই আমি সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি। ভগবন্, তোমার ব্যক্তি বা জগতের বিভিন্ন বস্তুরূপে তোমার প্রকাশ দেবতারা বা দানবেরা কেহই

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

জানেন না সামান্য মনুষ্যের কথাই নাই। পুরুষোত্তম, ভূতপালক, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে, তুমি স্বয়ংই নিজে নিজেকে জান ॥ **১২ - ১৫** ॥

আর কেহই ভগবানকে জানে না কেবল ভগবানই নিজে নিজেকে জানেন অর্জুনের এই কথার অর্থ এই যে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন সে জন্য ভগবানই ভগবানকে জানেন।

দেবর্ষি শব্দের অর্থ ১০। ৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। মহাভারতে শান্তিপর্বে ২৭৪ অধ্যায়ে অসিত ও দেবল ঋষির উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণ মতে অসিত ও দেবল নামে দুই জন কাশ্যপবংশীয় ব্রহ্মবাদী মুনি ছিলেন॥ ২৪৫ অধ্যায়॥

॥ **১৬ - ২০** ॥ তোমার নিজ দিব্য বিভূতিসমূহ যাহার দ্বারা তুমি এই লোক সকল ব্যাপ্ত করিয়া আছ তাহার বিবরণ আমাকে নিঃশেষ করিয়া বল। যোগিন্, সদা কি প্রকারে চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব, ভগবন্, কোন কোন ভাবেই বা তুমি আমার চিন্তনীয়। জনার্দন, বিস্তারিত করিয়া পুনরায় তুমি নিজের যোগ এবং বিভূতির কথা বল কারণ তোমার অমৃততুল্য বাক্য শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীভগবান বলিলেন, আচ্ছা, কুরুশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমার কয়েকটি প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতির কথা বাছিয়া বলিতেছি, সকল বিভূতির কথা বলা চলে না কারণ আমার ব্যাপকতার অন্ত নাই। গুড়াকেশ, আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা এবং আমিই ভূতগণের আদি এবং মধ্য এবং অন্ত ॥ **১৬ - ২০** ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

জীবাত্মার সংখ্যা অগণনীয় হইলেও মুক্তাবস্থায় তাহারা পরমেশ্বরের সহিত অভেদ। একই পরমাত্মা সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ ৫।৯ শ্লোকে বলিতেছেন,

সর্বভূত অন্তরেতে একই আত্মা পশি।
নানা রূপ ধরি পুন বহিঃ বিস্তারিল॥

॥ ২১ ॥ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসম্পন্ন বস্তুগণের মধ্যে কিরণযুক্ত সূর্য, মরুদগণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১ ॥

অদিতির সন্তান আদিত্যগণ দেবতা বিশেষ। তাঁহারা সংখ্যায় দ্বাদশ, যথা, বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ। ॥ বিষ্ণু।১।১৫ ॥ মৎস্যে অর্যমার পরিবর্তে যমের নাম আছে। মরুদ্গণ আদিতে অসুর-সেনানায়ক ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে নিজদলে ভাঙাইয়া লইয়া আসেন। এই সকল দেবতা ও অসুর ইলাবৃতবাসী মনুষ্য ছিলেন। দেবতাগণের রাজার সাধারণ নাম ইন্দ্র। ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মরুদ্গণের বিবরণ দ্রষ্টব্য। নক্ষত্র শব্দের অর্থ যাহা ক্ষয় পায় না, যে জ্যোতিষ্ক চিরকাল আছে তাহা নক্ষত্র নামে অভিহিত এজন্য নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রের উল্লেখ আসিয়াছে। নক্ষত্র ও star সমার্থবাচক নহে। যে সকল সত্তা বিভূতি, শ্রী বা শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ দশম অধ্যায়ে তাহাদেরই নাম করিয়াছেন।

॥ ২২ ॥ বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি বাসব, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের আমি চেতনা ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কালে অথর্ববেদ নামে পৃথক বেদ ছিল না। ঋক, সাম ও যজুঃ মাত্র ছিল। বেদব্যাস বেদকে চারি বিভাগ করেন। সামবেদ গীত হইত বলিয়া অধিক শ্রী সম্পন্ন বিবেচিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাধান্য দিয়াছেন। মনকে ইন্দ্রিয়াধিপতি বলা হয়। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের দ্যোতনগুণ হেতু কখন কখন দেবতা

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

বলা হয়। একজাতীয় দেবতার অধিপতি বাসব ও অপর প্রকার দেবতার অধিপতি মন হওয়ায় শ্লোকে বাসবের পর মনের উল্লেখ আসিয়াছে। চেতনার অভিব্যক্তি অনুসারে ভূতগণের বর্গীকরণ করা হয়, যথা, বহিরন্তঃ অপ্রকাশ, অন্তঃপ্রকাশ এবং বহিরন্তঃ প্রকাশ ॥ বিষ্ণু ।১।৫ ॥ প্রথম বর্গের পদার্থ, যথা, পর্বতাদি স্থাবরসমূহ। এই সকল বস্তুতে চেতনার বহিঃপ্রকাশ নাই অন্তঃপ্রকাশও নাই। দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত পশ্বাদিতে চেতনার অন্তঃপ্রকাশ আছে অর্থাৎ তাহাদের অনুভূতি আছে কিন্তু বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ তাহা সম্যক ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত দেবতা এবং মনুষ্যাদিতে চেতনার অন্তঃ ও বহিঃপ্রকাশ উভয়ই আছে। ভূতানামস্মি চেতনা বাক্যের ইহাই সার্থকতা।

৮॥ **২৩ ॥** রুদ্রগণের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষ রক্ষগণের মধ্যে কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি পাবক, শিখরীদের মধ্যে মেরু **॥ ২৩ ॥**

রুদ্রদিগের সংখ্যা একাদশ, যথা, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত ও পিনাকী ॥ মৎস্য। ৫ ॥ মৎস্যের অন্য দুই অধ্যায়ে রুদ্রগণের দুইটি বিভিন্ন তালিকা আছে, যথা, কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, গজেশ, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড এবং ধ্রুব ॥ ১৫৩ ॥ পুনশ্চ, নির্ঋতি, শম্ভু, অপরাজিত, মৃগব্যাধ, কপর্দী, দহন, খর, অহির্ব্রধ্ন, কপালী, পিঙ্গল, মহাতেজা এবং সেনানী ॥ ১৭১ ॥ বিষ্ণুপুরাণ মতে রুদ্রগণ, যথা, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব এবং কপালী ॥ ১।১৫ ॥ পুরাণোক্ত রুদ্রগণের নামের মধ্যে কোথাও শংকরের নাম পাই নাই। মহাভারতে শংকর নামা রুদ্রের উল্লেখ আছে। হয়ত শংকর অপর কোন নামে পুরাণের তালিকাতেই আছেন। বসুগণের নাম সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। মৎস্য। ৫ এবং বিষ্ণু। ১।১৫ মতে বসুগণ যথা, আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভাস। মৎস্য। ১৭১। মতে অষ্টবসু যথা, ধর, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, আপ, যম, বায়ু ও নির্ঋতি।

৮যে শৈলের মাত্র একটি চূড়া তাহার নাম শিখরী। যে শৈলের পর্ব বা গাঁট বা একাধিক চূড়া আছে তাহার নাম পর্বত। যে শৈল এককালে জলের দ্বারা নিগীর্ণ বা

রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

গ্রস্ত ছিল অর্থাৎ যাহা কোনও সময়ে সমুদ্রের নীচে ছিল তাহার নাম গিরি। মেরু-শৈলে ইলাবৃতবাসী দেবরাজগণ থাকিতেন এজন্য শিখরীদের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

॥ ২৪ ॥ পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিও, সেনানীদের মধ্যে আমি স্কন্দ, জলাশয় সমূহের মধ্যে আমি সাগর **॥ ২৪ ॥**

. বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধির খ্যাতি সুবিস্তৃত। তারকাসুরকে কোন দেবসেনাপতি পরাস্ত করিতে পারেন নাই অবশেষে স্কন্দ বা কার্তিকেয় তাঁহাকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেন।

॥ ২৫ ॥ মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে একাক্ষর ওঁ, যজ্ঞসকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় **॥ ২৫ ॥**

মহর্ষিগণের নাম ১০।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। কথিত আছে ভগবান স্বয়ং ভৃগুপদলাঞ্ছনা বক্ষে ধারণ করেন। মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু প্রথমে উৎপন্ন হন। ওঁ ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া শ্রেষ্ঠ বাক্য। জপযজ্ঞকে কেন শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইল ঠিক বুঝা গেল না। ৪।৩৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে দ্রব্যমূলক যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানমূলক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। আনন্দগিরি বলেন জপযজ্ঞে অন্য বৈদিক যজ্ঞের মত হিংসা নাই বলিয়া ইহার গৌরব। মনকে স্থির করিবার জন্য জপ সর্বাপেক্ষা সহজ সাধন। জপের অর্থ যদি ধ্যান ধরা যায় এবং যদি জপের সহিত তৎপূর্ববর্তী ওঁকার কথার সম্পর্ক আছে মানা যায় তবে প্রশ্নোপনিষদের কথায় বলা যাইতে পারে যিনি তিন মাত্রা ওঁকার ধ্যান করেন তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কঠ বলেন ওঁকার অবলম্বনে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়। ওঁকার সাধনা ধ্যানসাধ্য এজন্যই হয়ত জপ বা ধ্যানকে গৌরব দেওয়া হইয়াছে। যোগসূত্রে ওঁকারের জপ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১।২৮ ॥ কথিত আছে যোগীরা ওঁকার জপ ব্যতীত অন্য কোন উপাসনা করেন না। ১২।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য। হিমালয় অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন নগাধিরাজ এজন্য শ্লোকে হিমালয়ের উল্লেখ।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

॥ ২৬ ॥ আমি সর্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি **॥ ২৬ ॥**

অশ্বত্থ অতি পবিত্র বৃক্ষ। উপনিষদে এবং গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত ব্রহ্মের এবং সংসারের তুলনা আছে। ১০।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেবর্ষি কাহাকে বলে দ্রষ্টব্য। গন্ধর্ব ও সিদ্ধ পার্বত্য জাতিবিশেষ। গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ বিখ্যাত রাজা ছিলেন। সাংখ্যকার কপিল সিদ্ধজাতীয় এবং তিনি যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। শংকর বলেন জন্ম হইতেই যাঁহারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের আধিক্যসম্পন্ন তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলে। শংকর ব্যাখ্যা এই শ্লোকের সিদ্ধ শব্দের পক্ষে সংগত নহে। গন্ধর্ব পদের পর উল্লিখিত হওয়ায় সিদ্ধশব্দে সিদ্ধজাতি বুঝাইতেছে। মৎপ্রণীত 'পুরাণপ্রবেশ' ১৪, ২৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

॥ ২৭ ॥ অশ্বগণের মধ্যে আমাকে ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নরপতি **॥ ২৭ ॥**

অমৃতমন্থনের সময় অমৃতসাগর বা ক্ষীরসাগর হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব পাওয়া গিয়াছিল। ঐরাবত চতুর্দন্ত বৃহদাকার হস্তী। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত। ইরাবতী-তীরে চতুর্দন্ত গজ পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম ঐরাবত। ঐরাবত mamoth জাতীয় হস্তী।

॥ ২৮ - ৩১ ॥ আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, গাভীদের মধ্যে কামধেনু, প্রজা উৎপন্ন হেতু প্রজনয়িতা কাম, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি এবং নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচারিগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা, সংযমকারিগণের অর্থাৎ

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

ধর্মার্থ শাস্তিদাতাগণের মধ্যে আমি যম, দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারী-দের মধ্যে কাল এবং আমি মৃগদিগের মধ্যে মৃগেন্দ্র এবং পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতেয় বা বিনতানন্দন গরুড়, পবিত্রতা সম্পাদকগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম, ঝষদিগের মধ্যে আমি মকর, স্রোতস্বতীদের মধ্যে আমি জাহ্নবী ॥ **২৮ - ৩১** ॥

কামধেনুর নিকট যাহা কামনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায় ইহা প্রবাদ। বশিষ্ঠের এরূপ একটি কামধেনু ছিল। এখনও কোন কোন আশ্রমে, যথা দেওঘর বালানন্দাশ্রম, কামধেনু রাখা হয়, এই কামধেনু সকল সময়ে দুগ্ধ দিতে পারে বলিয়া কথিত। সর্প ও নাগ দুইটি বিভিন্ন নরজাতি। সর্পগণের বিখ্যাত রাজা বাসুকি ও নাগগণের রাজা অনন্ত বা শেষনাগ। সর্পজাতি বহু পূর্বে উচ্ছিন্ন হইলেও ভারতে নাগগণ বহুদিন যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল। অন্ধ্ররাজ শালিবাহন নাগজাতীয় ছিলেন। এখনও নাগ উপাধি দেখা যায়। বৈবস্বত মনুর রাজ্যকালে তদ্‌ভ্রাতা যমের উপর দুষ্টের শাসনভার অর্পিত ছিল, তদবধি যম ধর্মরাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ক্রমে মৃত্যুর দেবতা, পরলোকে দণ্ডবিধানকারী দেবতা এবং ইহলোকের দুষ্টের শাসক যম এক হইয়া গিয়াছেন। কঠোপনিষদের নচিকেতা মনুর ভ্রাতা যমের নিকট উপদেশের জন্য গমন করিয়াছিলেন। কঠে যমকে বৈবস্বত অর্থাৎ বিবস্বান নরপতির পুত্র বলা হইয়াছে। ৩০ শ্লোকের কলয়ৎ শব্দের অর্থ শংকরমতে গণনাকারী। এই শব্দের অর্থ গ্রাসকারীও হয় এবং এই অর্থই এখানে অধিকতর সংগত মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমি সকলের গ্রাসকারী মহাকাল। ১১।৩২ শ্লোকেও আছে কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ অর্থাৎ আমি লোকধ্বংসকারী কাল। ১০।৩৩ শ্লোকে সময়রূপী অক্ষয় কালের উল্লেখ আছে অতএব ১০।৩০ শ্লোকের কাল এবং ১০।৩৩ শ্লোকের কাল বিভিন্ন। শংকর মৃগেন্দ্র শব্দের অর্থ করিয়াছেন সিংহ অথবা ব্যাঘ্র। পুরাকালে ভারতে সিংহের প্রতিপত্তিই অধিক ছিল এবং তখন ভারতের প্রায় সর্বত্র সিংহ দেখা

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১

যাইত। সিংহই তখন পশুরাজ। ক্রমে সিংহ ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে। এখন জুনাগড় অঞ্চল ব্যতীত আর ভারতে কোথাও সিংহ দেখা যায় না। ব্যাঘ্রই এখন মৃগেন্দ্রের পদ অধিকার করিয়াছে। শংকর হয়ত এজন্য মৃগেন্দ্র শব্দের রূঢ় অর্থ সিংহ ব্যতীত ব্যাঘ্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ভারতীয় ঈগলের নাম গরুড়। প্রাচীন ভারতে সর্প ও নাগের ন্যায় পক্ষী নামধারী এক নরজাতি ছিল। বিনতানন্দন এই জাতির এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরবর্তী ব্যাসের নাম দ্রৌণি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চতুর্থ অধ্যায়ে ইঁহাকে পক্ষীজাতীয় বলা হইয়াছে। অগ্নিকেই সাধারণত পাবক বা পবিত্রতা সম্পাদক বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ পবনকে কেন সেই মান দিয়াছেন বুঝা গেল না। অবশ্য পবনও পবিত্রতা সম্পাদক বলিয়া পরিগণিত। বোধ হয় সর্বত্রগ ও মহান ॥ ৯।৬ ॥ বলিয়া বায়ুকে অগ্নি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। রাম শব্দে দাশরথি রাম বুঝাইতেছে পরশুরাম নহে। পুরাণে আছে দাশরথি রামের কীর্তিতে পূর্ববর্তী পরশুরামের কীর্তি ম্লান হইয়াছিল। পুরাণমতে ঝষা নাম্নী স্ত্রী হইতে জলচরগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ঝষাবংশীয়গণ, যথা, সহস্রদন্ত মকর, পাটীন, তিমি, রোহিতাদি মীনগণ, গ্রাহ, নিঙ্ক, শিশুমার, কূর্মগণ, মুণ্ডক, শম্বুক, শুক্তি, জলৌকা প্রভৃতি ॥ বায়ু। ১৬৯ ॥

॥ ৩২ - ৩৩ ॥ অর্জুন, আমি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর আদি এবং অন্ত এবং মধ্য, বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদিগণের কথার মধ্যে বাদ, অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা **॥ ৩২ - ৩৩ ॥**

অধ্যাত্ম অর্থে স্বভাব ॥ গীতা।৮।৩॥ মনুষ্যের শরীর ও মন লইয়াই তাহার স্বভাব। এই শরীর ও মনকে অর্থাৎ অধ্যাত্মকে বা ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ। গীতায় ১৩ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিচার আছে এবং কৃষ্ণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানকে গৌরব দিয়াছেন। অধ্যাত্মবিদ্যা এই জ্ঞানের অনুশীলন করে বলিয়া

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। বাদিগণের বিচারে তিন প্রকার তর্কপদ্ধতি দেখা যায়, যথা, বিতণ্ডা, জল্প ও বাদ। স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনের জন্য যে তর্ক তাহার নাম বিতণ্ডা। যে প্রকারে হউক নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারের নাম জল্প এবং জয়পরাজয়ের কথা মনে না রাখিয়া কেবল প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের জন্য যে বিচার তাহার নাম বাদ। বাদে সত্য নির্ণয় হয় বলিয়া বাদ শ্রেষ্ঠ তর্কপদ্ধতি। আদি অক্ষর বলিয়া অকারের গৌরব। উভয় পদের প্রাধান্য হেতু সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেষ্ঠত্ব। ৩৩ শ্লোকের কাল অর্থে সময়। ইহা প্রবাহরূপে অক্ষয়। বিশ্বতো-মুখ শব্দের অর্থ বিশ্বের সর্বদিকে এবং সর্বত্র যাঁহার মুখ বিদ্যমান। যিনি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল বস্তুর ধাতা বা নিয়ন্তা তিনিই বিশ্বতোমুখ ধাতা।

॥ ৩৪ ॥ এবং আমি সর্বহর মৃত্যু এবং ভবিষ্যকালে যত পদার্থ বা প্রাণী জন্মিবে তাহাদের উৎপত্তির হেতু এবং নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

পুরাণে বহুপ্রকার মৃত্যু কথিত হইয়াছে। পদ্ম। ভূমি। ৬৬।১২২ শ্লোক, যথা,

একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাশ্চাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ, এই দেহে একশত এক প্রকার মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে একটি কালসংযুক্ত অবশিষ্ট আগন্তুক বলিয়া কথিত। পূর্ববর্তী শ্লোকে কালের উল্লেখের পরে কালসংযুক্ত সর্বহর মৃত্যুর কথা আসিয়াছে। কীর্তি, শ্রী, ইত্যাদিকে অনেকে নারীগণের গুণাবলী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত মনে হয়। স্মৃতি, মেধা, ধৃতিকে বিশেষ করিয়া উত্তম স্ত্রীস্বভাব মনে করিবার কোন কারণ নাই। কীর্তি, শ্রী, ইত্যাদি দক্ষকন্যাগণের নাম। ইহারা প্রসূতির গর্ভে উৎপন্ন হন এবং সংখ্যায় চতুর্বিংশতি, যথা, শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নীতি, অনসূয়া, উর্জা, স্বাহা এবং স্বধা। ইহাদের প্রথম তের জন ধর্মের পত্নী এবং শেষোক্ত এগার জন ভৃগু প্রভৃতির পত্নী॥ বিষ্ণু।১।৭॥ দক্ষকন্যাগণের এই তালিকায় শ্রী ও বাক্ এই দুই নাম নাই। লক্ষ্মীর

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

অপর নাম শ্রী। অন্যত্র কাশ্যপপত্নী বলিয়া দক্ষকন্যা বাকের উল্লেখ আছে। দক্ষ-কন্যাগণ হইতে প্রজাসৃষ্টি হইয়াছিল এজন্য তাঁহারা নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত হইয়াছেন।

॥ ৩৫ ॥ সাম সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু **॥ ৩৫ ॥**

বৈদিক বৃহৎসাম নামক স্তোত্রে ইন্দ্র সর্বেশ্বররূপে পূজিত হইয়াছেন। এই স্তোত্র সামবেদের অন্তর্গত। বেদে নানা ছন্দোযুক্ত মন্ত্র আছে, ইহাদিগকে ছন্দ বলা হয়, যথা, ত্রৈষ্টুভছন্দ, পঞ্চদশ ছন্দস্তোম, জগতীছন্দ ইত্যাদি। ছন্দঃসমূহের মধ্যে গায়ত্রীর গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক। পুরাণে আছে বেদের গায়ত্রীছন্দ সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়। মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ মাসের নাম। আনন্দগিরি বলেন এই মাসে পক্ক শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার উল্লেখ। পুরাকালে কোনও সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৎসর গণনা হইত কি না তাহা বিচার্য। অগ্রহায়ণ নামের অর্থই বৎসরের অগ্র বা প্রথম। মাঘ মাস এক সময়ে প্রথম মাস বলিয়া পরিচিত ছিল॥ বায়ু। ৫৩॥ বসন্ত বা কুসুমাকর চিরকালই ঋতুরাজ বলিয়া পরিচিত।

॥ ৩৬ ॥ ছলনাকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূত, তেজস্বীদিগের আমি তেজ, আমি জয়, আমি ব্যবসায়, বলবানদিগের আমি বল **॥ ৩৬ ॥**

ছলয়ৎ শব্দের অর্থ ছলনাকারী। কি কি ভাবে ভগবান চিন্তনীয় অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এ পর্যন্ত নিজ উত্তম বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন সে জন্য এই শ্লোকে ছলনাকারীদের কথা কেন আসিল তাহা বুঝা গেল না। ছলয়ৎ শব্দের অর্থ যদি ক্রীড়া ধরা যায় তবে অর্থ সুগম হয়। ক্রীড়ার মধ্যে দ্যূতক্রীড়া শ্রেষ্ঠ। এখনও দ্যূতসম্বন্ধীয় ঘোড়দৌড়কে king of sports বা ক্রীড়ার রাজা বলা হয়। শ্লোকের সত্ত্ব শব্দের বল অর্থ করিলে পূর্ববর্তী তেজ, জয়, ব্যবসায় শব্দের সহিত সংগতি থাকে। ব্যবসায় অর্থে উদ্যম।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্ ঋতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

॥ ৩৭ ॥ বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় এবং মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা কবি **॥ ৩৭ ॥**

মননশীল মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যক্তিকে মুনি বলে। উশনা বা শুক্র বা কাব্য ভৃগুপত্নী কাব্যার পুত্র। ইনি আদি কবি ও নীতিশাস্ত্র প্রণেতা। ধ্রুব ও তাঁহার মাতা সুনীতি সম্বন্ধে উশনাকৃত কবিতা পুরাণে ধৃত আছে, যথা,

অহোঽস্য তপসো বীর্যম্ অহোঽস্য তপসঃ ফলম্।
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতা॥
ধ্রুবস্য জননী চেয়ং সুনীতির্নাম সূনৃতা।
অস্যাশ্চ মহিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভুবি॥
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং স্থিরায়তি।
স্থানং প্রাপ্য বরং কৃত্বা যা কুক্ষিবিবরে ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ, অহো, ইহার তপস্যার বল, অহো, ইহার তপস্যার ফল যৎপ্রভাবে ইহাকে পুরোবর্তী করিয়া সপ্তর্ষিগণ স্থিত আছেন। আর এই ধ্রুবের সুনীতি বা সূনৃতা নাম্নী জননী, ইহার মহিমাই বা পৃথিবীতে কে বর্ণনা করিতে সক্ষম, যিনি ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্যের আশ্রয়প্রাপ্ত পরম স্থানে স্থির হইয়া আছেন।

॥ ৩৮ ॥ আমি দমনকারীদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপ্যগণের মধ্যে মৌন, জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান **॥ ৩৮ ॥**

মৎস্যপুরাণ ১২৫ অধ্যায়ে কথিত আছে যে সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে যাহারা বশে আসে না দণ্ডে তাহারা বশীভূত হয়। যেখানে দণ্ড না থাকে সেখানে লোকে স্ব স্ব মর্যাদা অতিক্রম করে। সমস্ত সমাজধর্ম দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্। মহাভারত শান্তি পর্ব ৫৬ অধ্যায়ে উশনাকৃত দণ্ডনীতি সংক্রান্ত অন্য দুইটি শ্লোক ধৃত আছে। উশনা দণ্ডনীতি লিখিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নামের পরেই দণ্ডের

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

ও নীতির কথা আসিয়াছে। সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি নীতির অন্তর্গত। গোপ্য শব্দে শ্লোকে গুপ্তির উপায় বুঝাইতেছে। দণ্ড, নীতি শব্দের পর গুপ্তির কথা আসায় রাজগণের মন্ত্রণাগুপ্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

॥ ৩৯ - ৪২ ॥ অর্জুন, সমস্ত ভূতবর্গের যাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি। চরাচরে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমা বিনা থাকিতে পারে। পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই। এই বিভূতির বিস্তৃতি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। যে যে সত্তা বিভূতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন অথবা শক্তিসম্পন্ন সেই সেই সত্তা আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে, অথবা, অর্জুন, তোমার বহু প্রকারে এত জানিয়া কি হইবে, আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশ দ্বারা আবিষ্ট করিয়া আছি **॥ ৩৯ - ৪২ ॥**

ভগবানের এক পাদমাত্র জগৎ ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত অবশিষ্ট তিন পাদ অব্যবহার্য ও ধারণার অতীত। পরিশিষ্টে 'গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কোন অধ্যায়ে কি আছে তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সে স্থলে দশম অধ্যায় সম্বন্ধে যে মন্তব্য আছে তাহা দ্রষ্টব্য।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

বিভূতি যোগ নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

একাদশ অধ্যায়





গীতাব্যাখ্যা

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শন যোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহবশে পরম গোপনীয় অধ্যাত্ম-বিষয়ক যে কথা বলিলে তাহাতে আমার যে মোহ হইয়াছিল তাহা অপগত হইল ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন যে সাধারণের বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই। অসঙ্গ-চিত্তে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম অকর্ম সব সমান হইয়া যায় এবং স্থিতপ্রজ্ঞের কর্তব্য বলিয়া কিছু নাই এ সকল গুহ্য কথা কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিকেই বলা যায়। অর্জুন সেই পরম গুহ্য কথা শুনিয়াছেন। অধ্যাত্মসংজ্ঞিত কথার অর্থ আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ক। অধ্যাত্ম অর্থে স্বভাব। এই স্বভাববশে ও সামাজিক ধর্মবশে অর্থাৎ স্বধর্মবশে অসঙ্গচিত্তে যুদ্ধাদি ক্রূর কার্য করিয়াও কি করিয়া মুক্তি লাভ হইতে পারে তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন এজন্য তাঁহার উপদেশ অধ্যাত্মসংজ্ঞিত। অর্জুনের মোহ অপগত হইল অর্থে যুদ্ধ করিব না এই যে অকীর্তিকর অনার্যজুষ্ট প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল তাহা নষ্ট হইল। অর্জুন যুদ্ধ করিতে রাজি হইলেন, বুঝিলেন ভাল না লাগিলেও তাঁহার যুদ্ধই কর্তব্য। অর্জুন অসঙ্গচিত্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ কিছুই হন নাই। আদর্শ ব্যবহারের বিচার শুনিয়া কেবল তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়াছে। তাঁহার কুতূহলেরও উদ্রেক হইয়াছে, কৃষ্ণ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১

বলিলেন তাবৎ চরাচরের তিনিই আশ্রয়, এই ব্যাপার স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় কি না জানিতে অর্জুনের আগ্রহ হইল। তিনি বলিলেন,

॥ ২ - ৪ ॥ কমলপত্রলোচন, তোমার নিকট আমি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বিস্তারিত শুনিলাম এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্যও জানিলাম। পরমেশ, পুরুষোত্তম, তোমার সেই ঐশ্বর রূপ, যাহা স্পষ্ট চরাচরে বিস্তৃত এবং যাহার কথা তুমি আমাকে নিজে বলিয়াছ তাহা, দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রভো, যদি তুমি মনে কর আমার তাহা দেখিবার শক্তি আছে তবে, যোগেশ্বর, তুমি আমাকে তোমার সেই অব্যয় স্বরূপ দেখাও **॥ ২ - ৪ ॥**

যোগেশ্বর সম্বোধনের সার্থকতা এই যে অর্জুনের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে স্বীয় যোগবলে অর্জুনকে অব্যয় রূপ দেখাইতে পারেন।

॥ ৫ - ৮ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, আমি তোমাকে শত শত সহস্র সহস্র নানাবিধ, নানা আকৃতিবিশিষ্ট, নানাবর্ণ আমার দিব্য রূপসমূহ দেখাইব। ভারত,

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ এবং বহু আশ্চর্য বস্তুসমূহ যাহা পূর্বে কেহ দেখে নাই তাহা তোমাকে দেখাইব। গুড়াকেশ, চরাচর সমেত সমস্ত জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর সে সকলই অদ্য এই স্থানেই আমার দেহে একত্রে অবস্থিত দেখিবে কিন্তু কেবল তোমার নিজ চক্ষুর সাহায্যে তাহা দেখিতে পাইবে না। তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিতেছি তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখিতে সমর্থ হইবে ॥ **৫ - ৮** ॥

দশম অধ্যায়ে নিজ বিভূতি বর্ণনকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, রুদ্রগণের মধ্যে শংকর, ইত্যাদি। এখন অর্জুনকে সেই সকল আদিত্য প্রভৃতি দেখাইব বলিতেছেন। এ সকল দেবতা অর্জুনের কালে দৃশ্য ছিলেন না এজন্য তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব বস্তুর সহিত একত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই দেবতারা নানা বেশ ও আকৃতিধারী। ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে মরুদ্গণ উজ্জ্বল বসন ও স্বর্ণনির্মিত বর্ম পরিধান করিতেন। তাঁহারা অশ্বারোহী ও উষ্ণীষধারী। মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহচর ছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় একোনপঞ্চাশৎ। দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥ বিষ্ণু।১।১১।৪০॥ অনুমান হয় ইন্দ্রের যে মহতী সেনা ছিল তাহা আদিতে সপ্ত নায়কের অধীন ছিল, পরে এক এক ভাগ সপ্ত সপ্ত গণে পুনরায় বিভক্ত হইয়া মোট ৪৯ বিভাগ হয়। প্রত্যেক বিভাগের অধিনায়ক এক একজন মরুৎ হওয়ায় মরুদ্গণের সংখ্যা ৪৯ হয়। বায়ুপুরাণ পাঠে মনে হয় মরুদ্গণ আদিতে অসুরসেনানায়ক ছিলেন। ইন্দ্র প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের নিজ দলে আনেন ॥ বায়ু।৬৭।১৩২॥ আদিত্যাদি দেবগণ উল্লিখিত হওয়ায় দিব্যরূপ দেখাইবার কথা আসিয়াছে। এ সকল দেবতা ভিন্নও অখিল চরাচরের সমস্তই ভগবানের দেহে দ্রষ্টব্য। অখিল চরাচরের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যাহা দেখিতে চাহ দেখ। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহাদের বিনাশের দৃশ্য কৃষ্ণ-শরীরে অর্জুন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥ ১১।২৪-২৬ ॥

বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কঠোর সাধনার দ্বারাও লভ্য নহে ॥ ১১।৪৮, ৫৩ ॥ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহপরবশ হইয়া নিজ যোগশক্তির সাহায্যে অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের যে দিব্যদৃষ্টির প্রবাদ আছে আর অর্জুনের এই দিব্য-দৃষ্টি বিভিন্ন ব্যাপার। যোগীরা ইচ্ছা করিলে অপরের শরীরেও নিজশক্তি সংক্রামিত

করিতে পারেন। যিনি যোগশক্তিতে বিশ্বাসবান তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণের অর্জুনকে দিব্য-চক্ষুদান কোন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে না। বর্তমানে আমরা এ প্রকার যোগশক্তির সহিত পরিচিত নহি সে জন্য যুক্তিবাদীর পক্ষে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা চলিবে না। ১।১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সংবেশন বা hypnotism প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংবেশিত ব্যক্তিকে যাহা ইচ্ছা দেখান যাইতে পরে সত্য কিন্তু এ প্রকারে দৃষ্ট বিশ্বরূপের মূল্য নাই। সংবেশক যাহা দেখিতে বলেন অভিভাব বা suggestion বশে সংবেশিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষের ন্যায় তাহারই অনুভূতি হয়। এরূপ প্রত্যক্ষ ভ্রান্তিমূলক। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভিভাবিত হইয়া যদি অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া থাকেন তবে বিশ্বরূপ ব্যাপারটা সত্য হইলেও অর্জুনের পক্ষে তাহা ভ্রান্তদর্শনই হইয়াছিল। মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ সংবেশনের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই এ কথা বলা যাইতে পারে। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন অলৌকিক ঘটনা বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে এবং আমাদের বর্তমান যে জ্ঞান আছে তাহার দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারিবে না।

ঐশ্বরযোগ শব্দের অর্থ যে শক্তির বলে ভগবান নির্লিপ্ত থাকিয়াও সৃষ্টি করেন। পরের শ্লোকে ঐশ্বররূপের কথা আছে। ঐশ্বরযোগের দ্বারা সৃষ্ট তাবৎ পদার্থের যে রূপ তাহাই ঐশ্বররূপ।

॥ ৯ - ১১ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, তার পর, রাজন্, এইরূপ বলিয়া মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে পরম ঐশ্বররূপ দেখাইলেন। পার্থ তখন অনেক বদন ও নেত্রযুক্ত, নানা অদ্ভুতদর্শন মূর্তিসমন্বিত, বিবিধ দিব্য আভরণ উদ্যত অস্ত্র দিব্য মাল্য বস্ত্রধারী দিব্য গন্ধ অনুলেপিত, সর্বপ্রকার আশ্চর্য বস্তুর আধার সেই অনন্ত বিশ্বতোমুখ দেবতাকে দেখিতে পাইলেন **॥ ৯ - ১১ ॥**

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

শ্লোকে রাজন্ শব্দে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিতেছেন। রুদ্রাদিত্য প্রভৃতি যে সকল দেবতার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাঁহারাই দিব্য অস্ত্র মাল্য বস্ত্র ও অনুলেপনধারী। এই সমস্ত দেবতার মূর্তি একস্থ হওয়ায় কৃষ্ণদেহে অনেক বদন নেত্র ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছিল। বিশ্বতোমুখ শব্দের অর্থ ১০।৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণকে ৯ শ্লোকে হরি বলা হইয়াছে। হরি, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দ সমার্থে প্রযুক্ত হইলেও বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন দেবকে নির্দেশ করে। বিষ্ণুর বহু মূর্তি। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মন নামক দেবতা হইতে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ বা বিষ্ণু নামা ব্যক্তি উৎপন্ন হন। ইনি প্রথম বিষ্ণু। স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতাগণের মধ্যে অজিত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় বিষ্ণু। ঔত্তমি মন্বন্তরে বশবর্তী নামা তৃতীয় বিষ্ণু, এই মন্বন্তরেই সত্য নামে আর এক বিষ্ণু জন্মেন। তামস মন্বন্তরে হর্যার গর্ভে হরি জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামা বিষ্ণু উৎপন্ন হন। বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্ম হইতে নারায়ণ নামা বিষ্ণু জন্মেন এবং অদিতির গর্ভে বামন বিষ্ণু জন্ম লন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণু নামে পরিচিত। ব্রহ্মের নরাবতারকে বিষ্ণু বলা হয়। এই সকল বিষ্ণুর বহু কাল পরে দাশরথি রাম এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণ বিষ্ণুপদবাচ্য হন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব হওয়ায় কৃষ্ণ বাসুদেব নামেও খ্যাত। কৃষ্ণের বহুপূর্ববর্তী এক বাসুদেব ব্রহ্মরূপে বা বিষ্ণুরূপে উপাসিত হইতেন। ইনি আদি বাসুদেব এবং কৃষ্ণ ইঁহার অবতার কল্পিত হইয়াছেন॥ ১১।৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং বিষ্ণুপুরাণ ।১।২।১২, ১৩ এবং ৩।১ এবং বায়ু ।৬৬ দ্রষ্টব্য॥ বিষ্ণুপুরাণ বাসুদেব শব্দের নিরুক্ত দিয়াছেন, যথা, সর্বত্র এবং সর্ববস্তুতে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে বাসুদেব বলা হয়।

॥ ১২ - ১৪ ॥ যদি আকাশে সহস্র সূর্য যুগপৎ উদিত হয় তবে সে প্রভা সেই মহাত্মার প্রভার তুল্য হইতে পারে। তখন পাণ্ডব অর্জুন দেবদেবের সেই শরীরে নানা বিভাগসম্পন্ন সমস্ত জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট এবং

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নতশিরে প্রণাম পূর্বক দেবকে বলিলেন ॥ ১২ - ১৪ ॥

॥ ১৫ - ২২ ॥ অর্জুন বলিলেন, দেব, তোমার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ এবং সকলপ্রকার প্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থিত প্রভু ব্রহ্মা, সমস্ত ঋষি এবং দিব্য উরগগণকে দেখিতেছি। বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, তোমার অনেক বাহু উদর মুখ ও নেত্র দেখিতেছি, তুমি অনন্তরূপে সর্বদিক ব্যাপ্ত করিয়া আছ। তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তোমাকে কিরীট গদা চক্রধারীরূপে সর্বদিকে দীপ্ত তেজোরাশি বিস্তার করিয়া অবস্থিত দেখিতেছি। তোমার দ্যুতি উজ্জ্বল অনল ও সূর্য সম, তুমি দুর্নিরীক্ষ্য, ইন্দ্রিয়গণ তোমার ইয়ত্তা করিতে পারে না, তুমি সর্বদিকে দৃশ্যমান। তুমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, চিরন্তন ধর্মরক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ, ইহাই আমার ধারণা। তুমি আদি মধ্য অন্তহীন, অনন্তপরাক্রম, অনন্তবাহু, শশিসূর্যনেত্র, দীপ্তানলমুখ হইয়া স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

দেখিতেছি। আকাশের ঊর্ধ্ব দৃষ্ট সীমা এবং পৃথিবীর মধ্যে এই যে অন্তরীক্ষরূপ অন্তরাল তাহা এবং সর্বদিক তুমি একাই ব্যাপ্ত করিয়া আছ। মহাত্মন্, তোমার এই অদ্ভূত উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে। ঐ সুরবৃন্দ তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা ভয় পাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, মহর্ষি ও সিদ্ধের দল স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিবিধ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ আর যে সাধ্যগণ আছেন, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, উষ্মপাগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধের দল সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন ॥ **১৫ - ২২** ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

৯ উরগ জাতিবিশেষ। মহাভারত শান্তিপর্ব ২৮৩ অধ্যায়ে উরগ জাতির এবং দক্ষ-যজ্ঞে সমাগত উষ্মপা, সোমপা, ধূমপা, আজ্যপা প্রভৃতি ঋষিগণের উল্লেখ আছে। ঋষি এবং দিব্য উরগ শব্দে আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল ও বৃত্র ও নহুষ নক্ষত্রও উদ্দিষ্ট হইতে পারে।

কেহ ভগবানে প্রবেশ করেন, কেহ বা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, কেহ বা ভগবান হইতে ভয় পান, কেহ বা ভগবানকে আশ্চর্যবৎ পশ্যতি। এই সকল প্রকার ব্যক্তিকেই অর্জুন ভগবানের দেহে দেখিতেছেন। অর্জুন প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন ॥ ১১।১৪ ॥ ক্রমে তাঁহার মনে ভয় দেখা দিল। অর্জুনের মত বীরও বিশ্বরূপ দর্শনে কেন ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা পরে আলোচনা করিব। অর্জুন বলিতে লাগিলেন

॥ ২৩ - ২৫ ॥ মহাবাহো, বহুমুখনেত্র, বহুবাহুউরুপাদ, বহু উদর, বহুদংষ্ট্রা-করাল তোমার মহৎ রূপ দেখিয়া লোকসমূহ এবং আমিও বিচলিত হইতেছি। বিষ্ণো, আকাশস্পর্শী, দীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিবৃতবদন, দীপ্তবিশালনেত্র তোমাকে দেখিয়া অন্তরে ব্যথিত হইতেছি, ধৈর্য ও মনের স্থিরতা রাখিতে পারিতেছি না। দংষ্ট্রাকরাল ও কালানলতুল্য তোমার মুখ সকল দেখিয়া দিশাহারা হইয়াছি, সুখ পাইতেছি না, দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও **॥ ২৩ - ২৫ ॥**

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহু দংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো না জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন তখন ভাবিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহার সুখ ও আনন্দ হইবে কিন্তু ফল উল্টা হইল।

॥ ২৬ - ৩১ ॥ ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, রাজবৃন্দের সহিত ভীষ্ম দ্রোণ এবং ঐ সূতপুত্র কর্ণ আমাদের প্রধান যোদ্ধৃগণের সহিত তোমার ভয়ানক দংষ্ট্রাকরাল মুখ সকলের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে, কাহারও বা মুণ্ড চূর্ণ হইয়া দন্তের অন্তরালে লাগিয়া আছে দেখা যাইতেছে। নদীসকলের জলস্রোত যেমন সমুদ্র অভিমুখেই ধাবিত হয় সেইরূপ নরলোকের ঐ বীরগণ তোমার সর্বদিকে স্থিত জ্বলন্ত মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। যেমন মরিবার জন্য পতঙ্গগণ দ্রুতবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরূপ সমস্ত লোক নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। তুমি প্রজ্বলিত বদনসমূহে সর্বদিকে সমস্ত লোক গ্রাস করিতে করেতে লেহন করিতেছ। বিষ্ণো, তোমার উৎকট প্রভারাশি সমস্ত জগৎকে তেজে আবিষ্ট করিয়া

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্
তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

সন্তাপিত করিতেছে। উগ্ররূপ, আপনি কে আমাকে বলুন। তোমাকে নমস্কার, দেববর প্রসন্ন হও। আদিস্বরূপ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি কারণ তুমি কোন কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছ বুঝিতেছি না **॥ ২৬ - ৩১ ॥**

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণকে একবার আপনি একবার তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। শংকরমতে অর্জুনের মনে যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ॥ ২।৬ ॥ অর্থাৎ আমরা জয়ী হইব বা আমাদিগকে জয় করিবে এই যে আশঙ্কা ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহাই দূর করিবার জন্য ভগবান তাঁহাকে উগ্ররূপ দেখাইলেন। অর্জুন দেখিলেন তিনি জীবিত থাকিবেন ও তাঁহার প্রতিপক্ষ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ভগবান কর্তৃক বিনষ্ট হইবেন। শংকরের এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না। প্রথমত, যদ্ বা জয়েম ইত্যাদি পদের অর্থ এমন নহে যে তাহাতে সংশয়জনিত পীড়া বা ভয় বা কোন প্রকার আশঙ্কার পরিচয় আছে। দ্বিতীয়ত, এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন বলিয়াছেন যে তাঁহার মোহ অপগত হইয়াছে অর্থাৎ আর তাঁহার যুদ্ধে অনিচ্ছা নাই। কৃষ্ণের পক্ষে এই অলৌকিক উপায়ে অর্জুনের তথাকথিত ভয় দূর করিবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হয় নাই। পরের ৩২ শ্লোকেও অর্জুনের পূর্বের অনিচ্ছার ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি তাহাদের যুদ্ধে বধ না করিলেও প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা মরিবে। শংকর এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা মরিবে কিন্তু তুমি মরিবে না।

॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, লোকসমূহ সংহার করিতে এখানে প্রবৃত্ত আছি। প্রতি সৈন্যবাহিনীতে যে সকল যোদ্ধা আছে

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ কর বা না কর তাহাদের কেহই ভবিষ্যতে থাকিবে না ॥ **৩২** ॥

শ্লোকের এমন অর্থ নহে যে প্রতি সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক যোদ্ধা বর্তমান যুদ্ধেই ধ্বংস হইবে। ভবিষ্যকালে ইহারা সকলেই মরিবে ইহাই বলা উদ্দেশ্য।

॥ **৩৩ - ৩৪** ॥ অতএব তুমি উঠ, যশ অর্জন কর, শত্রুদের পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। ইহারা পূর্বেই আমার দ্বারা হত হইয়াছে, সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমার দ্বারা নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে তুমি মার। ব্যথিত হইও না। যুদ্ধ কর, রণে শত্রুদের তুমি জয় করিবে ॥ **৩৩ - ৩৪** ॥

সব্যসাচী অর্থে যিনি সব্য অর্থাৎ বাম হস্তেও দক্ষিণ হস্তের সমান দক্ষতার সহিত শরনিক্ষেপ করিতে পারেন। অর্জুনের মোহ অপগত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন, বলিলেন প্রতিপক্ষীয়দের যুদ্ধে মারিলে মনঃক্ষোভের কোন কারণ নাই। শংকর ব্যথার অর্থ করিয়াছেন ভয়। শংকরব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না।

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

॥ ৩৫ - ৩৭ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এরূপ বাক্য শুনিয়া কম্পিতকলেবর কিরীটী অর্জুন কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে গদ্‌গদকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, হৃষীকেশ, তোমার মহিমা কীর্তনে জগৎ যে আনন্দানুভব করে ও অনুরাগযুক্ত হয় এবং রাক্ষসগণ যে দিকে দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধদল সকলে যে নমস্কার করেন তাহা ঠিকই। মহাত্মন্, ব্রহ্মার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আদিকর্তা তোমাকে লোকে কেনই বা না নমস্কার করিবে। অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, তুমি সৎ এবং অসৎ এবং তাহাদের অতীত যে অক্ষর তাহাও তুমি **॥ ৩৫ - ৩৭ ॥**

এখানে ৩৫ শ্লোকে অর্জুনের যে ভয়ের কথা আছে তাহা যুদ্ধজনিত নহে। বিশ্বরূপ দেখিয়াই অর্জুনের এই ভয় হইয়াছিল।

ভগবানের নামে সাধুব্যক্তিগণ আনন্দিত হন এবং দুষ্টগণ ভীত হয়। যাহারা লুটপাট ও নরহত্যাদি করিয়া জীবনযাপন করে পুরাকালে তাহাদের রাক্ষস বলা হইত। রাক্ষস কোনও বিশেষ মনুষ্যজাতি বা কোন অভিনব আশ্চর্য

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥ ৩৭

জীব নহে। সৎ অর্থে যাহাকিছুর অস্তিত্ব আছে, যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা অসৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দ্বিতীয় বল্লী সপ্তম অনুবাকে আছে অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে অসৎ বা অব্যক্তরূপে ছিল তাহা হইতে সৎ বা নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে অনেক সময় সদসৎ বলা হয়, তাহা সৎও বটে অসৎও বটে। আবার ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্তে আছে প্রথমে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। সৎ ও অসৎ শব্দে এইসকল যত প্রকার ভাবের ব্যঞ্জনা আছে ভগবান তাহা সমস্তই এবং তদতিরিক্ত অক্ষর নামেরও বাচ্য। ৯।১৯ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমিই সৎ আমিই অসৎ। ১৫।১৬ শ্লোকে কূটস্থ অর্থাৎ জীবাত্মাকে অক্ষর বলা হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'ক্ষর-অক্ষরবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

॥ ৩৮ - ৪০ ॥ তুমি আদিদেব, পুরাণপুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং পরমধাম। অনন্তরূপ, তোমার দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্র নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার, পুনরায় তোমাকে নমস্কার। তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, আবার পশ্চাতে নমস্কার, তোমাকে সর্বদিকেই নমস্কার, অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম তুমি সর্ববস্তু ব্যাপিয়া আছ এ জন্য তুমি সর্ব **॥ ৩৮ - ৪০ ॥**

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ৪০

পুরাণপুরুষ অর্থে সনাতন বা চিরন্তন দেহাধিকৃত চেতনসত্তা। ভৃগু কশ্যপাদি ঋষি যাঁহারা প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন পুরাণে তাঁহাদিগকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা পিতামহ, ব্রহ্মারও আদি যিনি তিনি প্রপিতামহ।

॥ ৪১ - ৪৬ ॥ তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশে তোমাকে সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এইপ্রকার যাহা হঠাৎ অবিবেচনার বশে সম্বোধন করিয়াছি এবং অচ্যুত, আহারে বিহারে শয়নে আসনে একাকী বা অপরের সমক্ষে পরিহাস করিয়া তোমার যে সম্মানের লাঘব করিয়াছি, অপ্রমেয় তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, তুমি পূজ্য, গুরু, গুরু হইতে গরীয়ান, ত্রিলোকেও তোমার সমান কেহ নাই, তোমার অপেক্ষা বড় আর কে কোথায় থাকিবে। সেজন্য নতকায়ে পূজনীয় ঈশ্বর তোমাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি। দেব, পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয়

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

যেমন প্রিয়ার অপরাধ মার্জনা করেন তুমি সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছি এবং ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইতেছে। দেব, আমাকে তোমার সেই পূর্বের রূপ দেখাও। দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে পূর্বের মত সেই প্রকার কিরীটগদাচক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করি। সহস্রবাহো বিশ্বমূর্তে, সেই চতুর্ভুজ রূপই ধারণ কর **॥ ৪১ - ৪৬ ॥**

১ কৃষ্ণ বসুদেবপুত্র হওয়ায় বাসুদেব বলিয়া কথিত হইতেন। কৃষ্ণের বহুপূর্ববর্তী এক বাসুদেব ছিলেন, তিনিই আদি বাসুদেব। এই বাসুদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইত এবং ইহার পূজা কৃষ্ণের কালেও প্রচলিত ছিল। লোকে কৃষ্ণকে এই বাসুদেবের অবতার মনে করিত এবং কৃষ্ণও আদি বাসুদেবের আদর্শে যুদ্ধকালে শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি এবং আদি বাসুদেবের অনুরূপ চতুর্ভুজ লাঞ্ছন ধারণ করিতেন। কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক বাসুদেব ছিলেন। পুরাণে ইনি পৌণ্ড্রবাসুদেব বলিয়া কথিত। ইনিও আদি বাসুদেবের অনুকরণে শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি ও চতুর্ভুজ লাঞ্ছনধারী ছিলেন। পৌণ্ড্রবাসুদেব কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন 'তুমি আমার চক্রাদি চিহ্নসকল এবং আমার বাসুদেব নাম সর্ব প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবনরক্ষার জন্য আমাকে প্রণতি জানাইবে'। ফলে যুদ্ধে ইনি কৃষ্ণের হস্তে নিহত হন ও কৃষ্ণই অবিসংবাদী বাসুদেবরূপে যশোলাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৪ ও গীতার ১১।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। রাবণের যেমন প্রকৃত দশ মুণ্ড ছিল না কৃষ্ণেরও সেইরূপ বাস্তবিক চার হাত ছিল না। ১১।৫১ শ্লোকে কৃষ্ণের বাসুদেব রূপকে অর্জুন মানুষরূপ বলিয়াছেন। অপর মনুষ্যের মতই কৃষ্ণ দ্বিভুজ ছিলেন।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

॥ ৪৭ - ৫০ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগ প্রভাবে তোমাকে আমার এই পরমরূপ দেখাইলাম। আমার এই তেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন অপরে পূর্বে দেখে নাই। কুরুপ্রবীর, তুমি ভিন্ন অন্যে না বেদ, না যজ্ঞ, না অধ্যয়ন, না দান, না ক্রিয়াসমূহ, না উগ্র তপস্যার দ্বারা ইহলোকে আমার এই রূপ দেখিতে সমর্থ হইতে পারেন। আমার এই প্রকার ঘোররূপ দেখিয়া তোমার যে কষ্ট ও বিমূঢ়ভাব হইয়াছে তাহা অপগত হউক, তুমি বিগতভয় ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় আমার সেই পূর্বরূপ দেখ। সঞ্জয় বলিলেন, অর্জুনকে এই কথা বলিয়া বাসুদেব পুনর্বার সেই নিজরূপ দেখাইলেন এবং মহাত্মা কৃষ্ণ সৌম্যবপু ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন **॥ ৪৭ - ৫০ ॥**

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্
ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

এই শ্লোকগুলির অর্থ এমন নহে যে অর্জুন ভিন্ন কেহ কখনও বিশ্বরূপ দেখে নাই বা দেখিতে পাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন তপ দান নানা ব্রতাদির দ্বারা এই রূপ দর্শনীয় নহে, ক্রিয়াসমূহের দ্বারাও বিশ্বরূপ দেখিবার সামর্থ্য আসে না। যোগশাস্ত্রে ক্রিয়া অর্থে তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। অর্জুনের কোন সাধনা ছিল না কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণয়বশে নিজ যোগবলে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। এ ভাবে বিশ্বরূপ দর্শন অর্জুন ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ৪৭, ৪৮ ও ৫৩ শ্লোকগুলির ইহাই তাৎপর্য। সাধক কি উপায়ে বিশ্বরূপ দেখিতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ ৫৪ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।

॥ ৫১ - ৫৫ ॥ অর্জুন বলিলেন, জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া এখন সুস্থির, সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি আমার এই যে সুদুর্দর্শ রূপ দেখিলে দেবগণও এই রূপের নিত্যদর্শনাকাঙ্ক্ষী। আমাকে তুমি যেরূপ দেখিয়াছ সেরূপ আমাকে কেহ বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না কিন্তু পরন্তপ অর্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমার এই প্রকার বিশ্বরূপ জ্ঞাতব্য, সাক্ষাৎদর্শনীয় এবং তত্ত্বত বা স্বরূপত প্রবেশের যোগ্য হয়। পাণ্ডব, যিনি জানেন যে সকল কর্মই ভগবান করেন, যিনি আমাকেই পরম আশ্রয়

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

মনে করেন, আমাতেই যাহার প্রীতি ও ভক্তি, যিনি সঙ্গবর্জিত এবং সর্বভূতে বৈরভাব শূন্য তিনি আমাকে পান ॥ ৫১ - ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ৫৫ শ্লোকে ৪৮ শ্লোকের উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। পরিশিষ্টে বিভিন্ন সাধনমার্গের আলোচনায় বলিয়াছি কৃষ্ণের কালে বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার বাড়াবাড়ি ছিল সে জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে এই সকল সাধনার বিফলতা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি। এই কারণেই পরবর্তী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল মার্গেরই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ বিস্তার করিয়া দেখান হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জুনের মনে ব্যথা ও ভয় কেন হইল তাহা বিচার্য। ভগবানকে আনন্দময় ও অমৃত বলা হয় অথচ সেই ভগবানের বিশ্বরূপ ভয়ানক। আমরা সাধারণত ভগবানকে পরম কারুণিক ও সর্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করি। তাহার যে আর একটা ভীষণ ক্রূর লোকসংহারক মূর্তি আছে তাহা দেখিয়াও দেখি না। ভাল মন্দ ভীষণ কমনীয় বীভৎস ইত্যাদি সমস্ত লইয়াই ভগবান। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লী সপ্তম অনুবাকে আছে, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে-ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি

অর্থাৎ, যখন এই সাধক এই অদৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, অনাত্ম্য বা দেহহীন, অনির্বচনীয় অনাধার ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয়ভাব প্রাপ্ত হন কিন্তু যখন এই সাধক ইহাতে অল্পমাত্রও অন্তর বা ভেদ দর্শন করেন তখন তাঁহার ভয় হয়। ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বজ্ঞানবিহীন বিদ্বানের পক্ষে ব্রহ্ম ভয়স্বরূপই। এ বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহার ভয়ে সূর্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চমত মৃত্যু ধাবমান হইতেছে। কঠের ষষ্ঠ বল্লী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে, মহদ্‌ভয়ং বজ্র-মুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, অর্থাৎ, ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক কিন্তু ইহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত হন। ব্রহ্মবিদের কাছে এক বই দ্বিতীয় সত্তা প্রতিভাত হয় না, এ অবস্থায় কে কাহার ভয়ের কারণ হইতে পারে। অর্জুন কৃষ্ণের

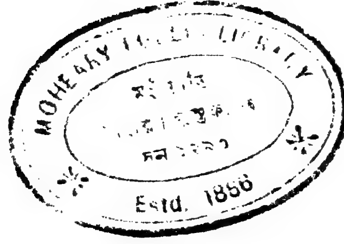
নিকট ধারকরা শক্তিতে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অভেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান ছিল না, তিনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াও যে ভগবানের করাল মহাকালরূপ দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



গীতাব্যাখ্যা

দ্বাদশ অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে জাগতিক তাবৎ পদার্থকে ভগবান আবিষ্ট করিয়া আছেন এবং সর্ববস্তুর সত্তাই ভগবৎসত্তা। অতএব দেখা যাইতেছে যিনি ভগবানকে পাইতে চাহেন তিনি যে কোন বস্তু বা ভাবের মধ্যেই তাঁহাকে পাইতে পারেন। ভগবানই জীবাত্মারূপে প্রত্যেক মানবদেহে অধিষ্ঠিত। এই দেহের সহিত দেহস্থিত আত্মা বা দেহীর সম্বন্ধ জানিলেই আত্মার স্বরূপ এবং ভগবানকে জানা যায়। অধ্যাত্মবিদ্যা দেহধারী ভগবানকে জানিতে শিক্ষা দেয় এজন্য ১০।৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে সর্ববিদ্যার মধ্যে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা। নিজদেহে বিশ্বের সকল বস্তু রহিয়াছে দেখাইয়া একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যিনি মদ্‌ভক্ত মৎকর্মকৃৎ হন তিনি আমাকেই পান অর্থাৎ যাঁহার আত্মাকে জানিয়া আত্মরতি জন্মে ও যিনি সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকর্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন তাঁহার ভগবান লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সর্বকর্মফলত্যাগী হইতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয় ও তখন ভগবদ্‌ভক্তি উৎপন্ন হয়, কষ্টসাধ্য তপস্যা যজ্ঞ বা যোগাভ্যাস ইত্যাদির আবশ্যক থাকে না। শ্রীকৃষ্ণকথিত এই রাজবিদ্যা তৎকালে গুহ্য ছিল এবং সাধারণে ইহার তত্ত্ব অবগত ছিল না। বিদ্বান ব্যক্তিরা নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, কায় মন ও বাক্যের অতীত ব্রহ্মলাভের জন্য যোগাবলম্বন দ্বারা অব্যক্তকে উপলব্ধির চেষ্টা করিতেন। কেহ বা মনে করিতেন বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়। সাধারণ লোকে শুনিয়াছিল যে ভগবানলাভের পথ অতি দুর্গম। দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তাঁহার উপদিষ্ট রাজবিদ্যার সাধনা অতি সহজে অনুষ্ঠান করা

যায় ও উহার অন্তর্গত কর্মযোগের সাহায্যে ব্রহ্মলাভ হয়। অর্জুনের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিল রাজবিদ্যা আশ্রয়কারী কর্মযোগী ভাল না অব্যক্তাশ্রয়ী ধ্যানযোগী শ্রেষ্ঠ। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই যে তুমি পাতঞ্জল যোগী হও বা শুদ্ধ জ্ঞানী হও বা স্থিতপ্রজ্ঞ হও তাহাতে বিশেষ যায় আসে না। সকল সাধনা তখনই মুক্তিপ্রদ হয় যখন সাধক তাহাদের পরমাত্মদর্শনের জন্য নিয়োগ করেন। পরমাত্মাকে দর্শনের ঐকান্তিক আগ্রহের নাম মদভক্ত হওয়া বা ভগবানে ভক্তিমান হওয়া। এজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বার বার বলিয়াছেন স্থিতপ্রজ্ঞের গুণাবলীযুক্ত যে ব্যক্তি মদভক্ত সে আমার প্রিয়, যে যোগী গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিয়া ভক্তিমান হইয়াছেন তিনি আমার প্রিয়, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগীকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন কারণ কর্মযোগ অল্প আয়াসে প্রযোজ্য।

॥ ১ - ৪ ॥ অর্জুন বলিলেন, এই প্রকার সততযুক্ত থাকিয়া যে ভক্তেরা তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহাদের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ। শ্রীভগবান বলিলেন, আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত থাকিয়া, পরমশ্রদ্ধাসহকারে যাঁহারা আমাকে উপাসনা করেন তাঁহারা আমার মতে যুক্ততম আর যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সর্বভূতহিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ সংযম করিয়া অনির্বচনীয় অব্যক্ত সর্বব্যাপী অচিন্ত্য, কূটস্থ অচল ধ্রুব অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১ - ৪ ॥

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

প্রথম বর্গের উপাসকগণ কোন পূজ্য বস্তু, ব্যক্তি বা দেবতার মধ্যে অথবা নিজ দেহরূপ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা ভগবানের উপলব্ধির চেষ্টা করেন এবং দ্বিতীয় বর্গের উপাসককে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক বলা যায় যদি তিনি বেদান্তপ্রতিপাদিত নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। শ্লোকে অব্যক্তের উপাসককে সমবুদ্ধি সর্বভূতহিতে রত ইত্যাদি বলায় বুঝা যায় যে পাতঞ্জল যোগী উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। এ সকল গুণ পাতঞ্জল যোগীর অর্জনীয় বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সকল পাতঞ্জল যোগী নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক নহেন। ১৩ হইতে ১৯ শ্লোকে যোগীদের কথা পুনরায় আসিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ বার বার বলিতেছেন ইহাদের মধ্যে যাঁহারা মদ্ভক্ত তাঁহারা আমার প্রিয়।

শ্লোকের সততযুক্ত ও নিত্যযুক্ত শব্দের অর্থ ১০।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। অক্ষর ও কূটস্থ শব্দের অর্থ ৬।৭-৯ এবং ৮।৩-৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। যোগী কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষরকে অর্থাৎ নিজ আত্মাকে জানিতে চাহেন, তিনি প্রকৃতির সহিত সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কেবলী হইতে চাহেন। পাতঞ্জল কেবলী আত্মা ও কাপিল মুক্ত পুরুষ একই প্রকার। কৃষ্ণ বলিতেছেন এই মুক্ত পুরুষই পরমাত্মা বা বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম এই ধারণা থাকিলে তবে মদ্ভক্ত হয় নচেৎ যোগী যোগীই থাকিয়া যান যদিও কৃষ্ণের মতে শেষ পর্যন্ত ইহারাও প্রাপ্নুবন্তি মামেব অর্থাৎ ইহাদেরও ব্রহ্মলাভ হয়। পাতঞ্জল যোগ ও কাপিল সাংখ্য প্রতিপাদিত আত্মা বেদান্ত-উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকথিত আত্মা নহে। বেদান্তমতে জীবাত্মা বহু হইলেও পরমাত্মার সহিত তাহারা মূলত অভিন্ন। পাতঞ্জল ও কাপিল মতে আত্মা মূলত বহুসংখ্যক। অনেকে ১ ও ৩ শ্লোকের অক্ষর ও কূটস্থ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম করিয়াছেন। পরবর্তী শ্লোকের সহিত সংগতি বিচার করিলে এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কূটস্থ শব্দে যোগশাস্ত্র-কথিত পুরুষ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বেদান্তের পরমাত্মা নহে।

॥ ৫ - ৭ ॥ যে সকল ব্যক্তি অব্যক্তের উপাসনা করেন তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট স্বীকার করিতে হয় কারণ দেহধারী মনুষ্যের পক্ষে অব্যক্তের উপলব্ধি ও অব্যক্ত

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

লাভ দুরূহ কিন্তু যাঁহারা সর্বকর্ম আমাতে সংন্যস্ত করিয়া আমাকেই চরম আশ্রয় মনে করিয়া অনন্য যোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করেন, পার্থ, আমি সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি ॥ ৫ - ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে সর্বত্র সমবুদ্ধি, সর্বভূতহিতেরত পাতঞ্জল যোগী অতি কষ্টে অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষর বা আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার অর্থাৎ পরমাত্মারও দর্শন পাইতে পারেন এ কথা সত্য কিন্তু যে যোগী সর্ব কর্ম ভগবানে সন্ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ ব্যাবহারিক জীবনে কর্মযোগ আশ্রয় করিয়া সেই পাতঞ্জল যোগের দ্বারাই (৬ শ্লোকের এব শব্দের ইহাই তাৎপর্য) সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট পরমাত্মার উপলব্ধির চেষ্টা করেন তাঁহার শীঘ্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। সর্বভূতে সমবুদ্ধি হওয়া ও সর্বভূতহিতে রত থাকা পাতঞ্জল যোগীর কর্তব্য, তদ্রূপ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে উক্ত মৈত্রী, করুণা, ক্ষমা, সুখদুঃখসহনশীলতা প্রভৃতিও পাতঞ্জল যোগীর সাধনা বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণের মত এই যে এ সকল সাধনা খুবই ভাল সন্দেহ নাই তবে পরমার্থ লাভের জন্য তাঁহার উপদিষ্ট কর্মযোগ কতু্ং সুসুখম্ অর্থাৎ অতি সহজে অবলম্বন করা যায় এবং তাহাতে শীঘ্র ফললাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাতঞ্জল যোগীকেও কর্মযোগী হইতে বলিলেন এবং কৌশলে আরও নির্দেশ করিলেন কেবল পাতঞ্জল যোগ ও সাংখ্যনির্দিষ্ট অব্যক্ত অক্ষর আত্মার সন্ধান করিলে ফললাভ দূরে থাকিবে অতএব পরমাত্মারই উপাসনা করিতে হইবে, ধ্যান দ্বারা তাঁহাকেই লাভ করিতে হইবে। যদি পাতঞ্জল যোগ আশ্রয় করিতেই হয় তবে তাহা পরমাত্মার সন্ধানেই করিতে হইবে কেবল সাংখ্যোক্ত ও পাতঞ্জল যোগোক্ত আত্মাকে আশ্রয় করিলে চলিবে না। ৬।৪৭ শ্লোকে বলিয়াছেন সকল যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন আমার মতে তিনি যুক্ততম।

॥ ৮ ॥ আমার দিকে মন দাও, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝ যে আমিই উপাসিতব্য এরূপ করিলে আমাকে পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

এই শ্লোকে কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিলেন যে অব্যক্ত অক্ষরে মন দেওয়া অপেক্ষা পরম অক্ষর বা পুরুষোত্তমে মন দেওয়া ভাল। ১৩।১৬-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই পরম অক্ষর বা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য ১২।৬ শ্লোকে ধ্যান ও অনন্যযোগের উপদেশ আছে, এই যোগ পাতঞ্জল যোগ, কেবল পার্থক্য এই সাধারণ পাতঞ্জল যোগী অক্ষরে ধ্যান ধারণা সমাধি, বা পারিভাষিক শব্দে বলিলে সংযম, প্রয়োগ করেন কিন্তু কৃষ্ণকথিত যোগে পরমাত্মাতেই সংযম প্রযোজ্য। যেখানেই প্রয়োগ করা হউক না কেন সংযম অতি দুরূহ ব্যাপার এজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন

॥ ৯ - ১১ ॥ আর যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পার তবে, ধনঞ্জয়, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইবার চেষ্টা কর, অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে মৎকর্মপরম হও। আমার জন্য কর্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে। যদি আমাতে যোগ প্রয়োগ করিতে যাইয়া ইহাও করিতে না পার তবে যত্নসহকারে সর্বকর্মের ফলত্যাগ কর **॥ ৯ - ১১ ॥**

চিত্তস্থৈর্যের যত্নের নাম অভ্যাস। অভ্যাসযোগ অর্থে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির জন্য বার বার চেষ্টা করা। মৎকর্মপরম শব্দের অর্থ আমার কর্মই যাহার পক্ষে পরম কর্ম এবং পরম আশ্রয়। আহার বিহার ইত্যাদি সকল সাধারণ কাজ করিবার সময়েও যাঁহার মনে এই ধারণা স্থির থাকে যে তাহা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য না হইয়া প্রকৃতির বশে ভগবানের জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে তাঁহাকে মৎকর্মপরম বলা যায়। মৎকমপরম ব্যক্তির চিত্ত যোগালম্বীর চিত্তের ন্যায় ভগবানে স্থির থাকে, এজন্য পাতঞ্জলযোগীর ন্যায় তিনিও যোগী। মদ্‌যোগমাশ্রিত কথার ইহাই তাৎপর্য। সর্বকর্মের ফলত্যাগ করিতে হইলে যোগাবলম্বনের মত কোনও কঠিন সাধনার আশ্রয় লইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পর পর ক্রমশ সহজ পন্থা নির্দেশ করিলেন।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

॥ ১২ ॥ কারণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান উৎকৃষ্টতর, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেয়। ত্যাগ হইতে অবিলম্বে শান্তিলাভ হয় **॥ ১২ ॥**

শ্রেয় অর্থে মঙ্গলকর। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য এই যে সাধারণে কঠিন যোগ-সাধনার বিফল চেষ্টা না করিয়া সুসাধ্য কর্মযোগ অবলম্বন করিলে সহজেই ফললাভ করিতে পারিবে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান বলিতেছেন যে পাতঞ্জল বা অন্য মার্গাবলম্বী যোগীও আমার প্রিয় হন যদি তাঁহারা আমার ভক্ত হন অর্থাৎ আমাতে বা পরমাত্মাতেই ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করেন। কোন বিশেষ সাধনপদ্ধতি আয়ত্তির জন্য বার বার তাহার অনুষ্ঠানের নাম অভ্যাস। অভ্যাস সফল হইলে পদ্ধতি আয়ত্ত হয়, ফললাভ তখনও দূরেই থাকে এজন্য কৃষ্ণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ধ্যান ও কর্মফলত্যাগ শ্রেয় বলিলেন। শ্লোকে জ্ঞান অর্থে সাংখ্যমার্গীর জ্ঞান। পরিশিষ্টে সাংখ্যমার্গের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ধ্যান শব্দে পাতঞ্জল যোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং কর্মফলত্যাগ শ্রীকৃষ্ণ উপদিষ্ট রাজবিদ্যার অন্তর্গত কর্মযোগ। বিদ্বান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে শ্রুত জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের দ্বারা নিজের যে অনুভূতি হয় তাহার মূল্য অধিক। ধ্যান পাতঞ্জলযোগমার্গের অঙ্গ। বায়ুপুরাণ ১৬।২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, বেদৈস্তুল্যাঃ সর্বযজ্ঞক্রিয়াস্তু যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহুরগ্র্যম্। জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগ-ব্যপেতং তস্মিন্ প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ॥ অর্থাৎ, সমস্ত যজ্ঞক্রিয়া বেদের তুল্য, যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞই জ্ঞানীদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত, জ্ঞান হইতে সঙ্গ ও রাগবর্জিত ধ্যান শ্রেষ্ঠ তাহা প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধি হয়। কর্মফলত্যাগ সর্বাপেক্ষা সুসাধ্য, ইহাতে কোন কঠিন অভ্যাসের দরকার হয় না এবং ইহার ফলও প্রত্যক্ষাবগম। কর্মফলত্যাগে মন সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয় ও প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি আশু প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ২।৬৫ ॥ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির ভগবান লাভ সহজ। ১৩।২৪ শ্লোকেও এই তিন সাধনা অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান ও কর্মযোগের কথা আছে। কৃষ্ণ বলিতেছেন কেহ বা ধ্যানের সাহায্যে নিজের মধ্যে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন, অন্যে সাংখ্য-যোগের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের সাহায্যে আত্মাকে দেখেন এবং অপরে কর্মযোগের

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

দ্বারা আত্মার দর্শন পান। কৃষ্ণের মতে এই তিন মার্গের মধ্যে কর্মযোগই সুসাধ্য এবং শীঘ্র ফলপ্রদ।

॥ ১৩ - ২০ ॥ সর্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্রীভাবাপন্ন, করুণাশীল, মমত্ববুদ্ধিত্যাগী, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সুখদুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্টচেতা, যোগাবলম্বী, সংযত-চিত্ত, দৃঢ়সংকল্পযুক্ত, আমাতে সমর্পিত মনোবুদ্ধি যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হন তিনি আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি আনন্দ অসহিষ্ণুতা ভয় উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমার প্রিয়। পরের উপর যিনি নির্ভর করেন না, পবিত্র স্বভাব, কর্মকুশল, উদাসীন, ব্যথাশূন্য সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়। যিনি আনন্দিত হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী এবং ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয়। শত্রু মিত্রে এবং মান অপমানে সমবুদ্ধি, শীত উষ্ণ

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪
যস্মান্নোদবিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

সুখদুঃখে সমবোধ, আসক্তিহীন, নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান, সংযতবাক্, যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট, বাসস্থানে অনাসক্ত, স্থিরবুদ্ধি, ভক্তিমান নর আমার প্রিয় এবং যাঁহারা এই ধর্মামৃত শ্রদ্ধাযুক্ত মৎপরম হইয়া যথোক্ত পালন করেন সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ **১৩ - ২০** ॥

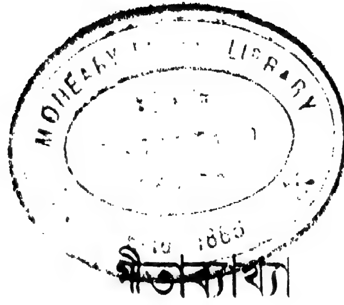
দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ হইতে ১৯ শ্লোকে যে সকল গুণাবলীর উল্লেখ আছে তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগী এবং ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ২।৫৫-৭২, ৬।৪-৯, ২০-২৩, ২৯, ৩২ এবং ১৪।২২-২৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। এই সকল শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগী ও ত্রিগুণাতীতকে মৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের উপদেশের সার মর্ম এই যে সকল প্রকার সাধকের পক্ষে রাজবিদ্যার অন্তর্গত কর্মযোগ আশ্রয় করা শ্রেয় এবং পরমাত্মার উপলব্ধি একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভক্তিযোগ নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



গীতাব্যাখ্যা

ত্রয়োদশ অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

রাজবিদ্যার কর্মপদ্ধতি ও তল্লভ্য জ্ঞানের কথা শেষ করিয়া ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ রাজবিদ্যার বিজ্ঞানভাগ বা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। নবম অধ্যায়ের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান সহিত গুহ্যতম রাজবিদ্যার আলোচনা করিবেন বলিয়াছিলেন। এই বিদ্যার অনুভূতিসিদ্ধ জ্ঞানভাগ নবম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ইহার বিজ্ঞানভাগ আলোচিত হইতেছে। পরিশিষ্টে 'বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিলেন মদ্ভক্ত হও। কৃষ্ণভক্তি এবং পরমাত্মায় রতি একই কথা। আত্মাই পরমাত্মারূপে দর্শনীয়। আত্মা দেহধারী এ জন্য দেহ এবং আত্মার পরস্পর সম্বন্ধ জানিলে আত্মার স্বরূপ জানা যায়। এই জ্ঞানকে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভেদজ্ঞান বলে। অধ্যাত্মবিদ্যা এই জ্ঞানেরই অনুশীলন করে। শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্মবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ইহাই আলোচ্য। এই অধ্যায় প্রকৃতি-পুরুষবিবেকযোগ নামেও পরিচিত।

॥ ১ ॥ কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত হয়, যিনি ইহাকে জানেন এ সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে অভিহিত করেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥ ১

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুই শব্দই পারিভাষিক। শ্লোকের ভাষা দেখিলেই বুঝা যায় এক বিশেষ শ্রেণীর জ্ঞানিগণ নিজেদের ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিৎ বলিতেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বাদের সহিত অধিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান।

॥ ২ ॥ এবং, ভারত, সর্বক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইয়ের যে জ্ঞান আমার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান **॥ ২ ॥**

অনুমান হয় ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ কাপিল সাংখ্যবাদীর ন্যায় বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ মানিতেন। অন্যান্য মার্গের দোষ পরিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এখানেও তাহাই করিলেন, বলিলেন প্রত্যেক শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন এ কথা সত্য কিন্তু মামপি অর্থাৎ আমাকেও সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ একই পরমাত্মা দেহধারী বহু আত্মারূপে প্রকাশিত হন ইহা বুঝিবে। কেবল আত্মাকে জানিলে চলিবে না আত্মাই যে পরমাত্মা তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

॥ ৩ - ৪ ॥ এবং সেই ক্ষেত্র যে বস্তু এবং যে প্রকার এবং তাহা যেরূপ বিকারশীল এবং যে কারণ হইতে যদ্রূপ হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা এবং যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। ঋষিগণ বহুপ্রকারে ছন্দজাতীয় বিবিধ বেদমন্ত্রে তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়ার্থক ব্রহ্মসূত্র পদেও তাহা কথিত হইয়াছে **॥ ৩ - ৪ ॥**

ক্ষেত্র কোন বস্তু, কি প্রকার উপাদানে গঠিত, ক্ষেত্রে কি কি বিকার বা পরিবর্তন হয় এবং কি কারণ হইতে কি বিকার হয় কৃষ্ণ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ শুনাইবেন বলিলেন। তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে এবং তিনি কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন তাহাও সংক্ষেপে বিবৃত করিবেন। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বেদসূক্তগুলিকে যুক্তিযুক্ত ভাবে সাজাইয়া নিশ্চয়ার্থক করিবার জন্য ব্যাস ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বা

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্‌।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্‌ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪

শারীরক সূত্র প্রণয়ন করেন। শারীরক অর্থে শরীরবাসী জীবাত্মা। শারীরক নামটি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে অর্থব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণ বহু বেদছন্দের এবং ব্রহ্মসূত্রপদের উক্তি সংক্ষেপ করিতেছেন।

॥ ৫ - ৬ ॥ মহাভূতসমূহ, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় এবং এক মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি, সংক্ষেপে এই সকলকে ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বলা হয় **॥ ৫ - ৬ ॥**

এখানে ৫ শ্লোকে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে। অব্যক্ত অর্থে মূলপ্রকৃতি এবং মহত্তের অপর নাম বুদ্ধি। শ্লোকে বুদ্ধি শব্দে মহৎকে বুঝাইতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি মন এই লইয়া দশ ও এক অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়। মহাভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। শ্রীধর মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থে পঞ্চ তন্মাত্র এবং মহাভূত শব্দে স্থূল মহাভূত। পরিশিষ্টে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে এবং ৭।৪-৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সাংখ্যসৃষ্টিক্রম বিচার করিয়াছি, সেই প্রসঙ্গে অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার প্রভৃতি শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ শ্লোকের সংঘাত অর্থে যে শক্তি প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে সংহত করিয়া জীবের বিশিষ্ট দেহ নির্মাণ করে ও শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে একত্র ধারণ করিয়া রাখে। বিভিন্ন সংঘাতের বশে একই প্রকার প্রাকৃতিক উপাদান, মহাভূত ইত্যাদি, হইতে বিভিন্ন প্রকারের জীবশরীর সৃষ্ট হয়। মনুষ্যশরীর ও ইতর প্রাণীর শরীরের প্রাকৃতিক উপাদানের কোন পার্থক্য নাই কেবল তাহাদের সংঘাত বিভিন্ন। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে যোগীরা ইচ্ছামত যে কোন জীবদেহ ধারণ করিতে পারেন। কি করিয়া যোগীর মনুষ্যশরীর বিভিন্ন প্রাণীর দেহে পরিবর্তিত হইতে পারে তাহার বিচার উপলক্ষে যোগসূত্র ক্ষেত্রিকবৎ এই উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষক যেমন ছোট ছোট বিভিন্ন ক্ষেত্রের জল আল বাঁধিয়া পৃথক রাখে ও ইচ্ছামত আল কাটিয়া বিনা আয়াসে উচ্চ ক্ষেত্র হইতে নিম্নতর ক্ষেত্রে জল প্রবাহিত করায় এবং তাহার ফলে

মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

যেমন উপরের ক্ষেত্রের জলের আকার নিম্নস্থিত ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে সেইরূপ যোগীও যে আল দ্বারা জীবদেহ বিশিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিদিষ্ট থাকিয়া বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রাকৃতিক আলকে অপসরণ করেন। ফলে এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত জলবৎ তাহার দেহ অপর প্রাণীর রূপ প্রাপ্ত হয়। চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের জল ত্রিকোণ ক্ষেত্রে আসিয়া যেমন ত্রিকোণ দেখায় সেইরূপ যোগীর দেহ এক সংঘাত হইতে অপর সংঘাতে যাইয়া ভিন্ন প্রাণীর দেহে পরিণত হয়। যে প্রাকৃতিক শক্তি বা বাধা বা আল থাকায় জীবদেহ নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় কোনও এক বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয় এবং বিশিষ্ট প্রকারে সংহত থাকে তাহাকেই সংঘাত বলে।

ষষ্ঠ শ্লোকে চেতনা শব্দে শুদ্ধচৈতন্য উদ্দিষ্ট হয় নাই। বদ্ধ জীব যে শক্তির দ্বারা নিজ শরীর, তাহার বিকার ও পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে তাহাই এখানে চেতনা শব্দের অভিধেয়।

ধৃতি শব্দের অর্থ যাহা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষে তাহাদের এক বিশিষ্ট রূপ দেয়। ধৃতি শব্দের অর্থবিচারে ১৮।২৬, ২৯, ৩৩-৩৫ শ্লোক-গুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সংঘাত যেমন শরীরকে বিশিষ্ট রূপ দান করে ধৃতি সেইরূপ মানসিক বৃত্তি ও কর্মচেষ্টাকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখে। ধৃতিই আমাদের জীবনের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করে। ১৮।৩৩-৩৫ শ্লোকে ধৃতির প্রকারভেদ আলোচিত হইয়াছে।

ক্ষেত্র কোন বস্তু ও কি প্রকার উপাদানে গঠিত এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন মহাভূতাদি উপাদানে গঠিত চেতনা ইচ্ছা দ্বেষ সমন্বিত যে দেহ তাহাই ক্ষেত্র। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিকার অর্থাৎ ইহাদের লইয়াই ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ ও চেতনা উল্লিখিত হওয়ায় ক্ষেত্র শব্দে মহাভূতাদি হইতে উৎপন্ন স্থাবর জড়সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিভূত ও অধিদৈববাদীর সহিত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিদের এখানেই পার্থক্য। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সকল প্রাণীতেই বর্তমান কিন্তু ক্ষেত্র শব্দে বিশিষ্ট সংঘাত ও ধৃতিবিশিষ্ট জীবদেহ উদ্দিষ্ট হওয়ায় কেবল মনুষ্যদেহকেই ক্ষেত্র নাম দেওয়া যায়। মনুষ্য ব্যতীত অন্য প্রাণীতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান সম্ভবপর নহে। অতএব এই মনুষ্যশরীরই ক্ষেত্র, মহাভূতাদি সাংখ্যীয় চতুর্বিংশতি পদার্থ তাহার উপাদান এবং ইচ্ছা দ্বেষাদি তাহার বিকার। কি কারণ হইতে কি বিকার উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ ১৯-২১ শ্লোকে আছে। প্রকৃতি হইতেই ক্ষেত্রের বিকার, গুণ এবং কার্যাদি উৎপন্ন হয় এবং বদ্ধ পুরুষ ক্ষেত্রস্থ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে এই শরীর ক্ষেত্র এবং ইহাকে যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রকে উপযুক্ত ভাবে জানিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। এই জ্ঞানার্জনের জন্য কি গুণাবলী আবশ্যক শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাহার উল্লেখ করিয়া পরে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ এবং প্রভাব বলিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে মদভক্ত সাধক সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে এখানে প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বের অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান সাধনার দ্বারা লভ্য হইলেও ইহার বিজ্ঞান বা দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার জন্য বুদ্ধিই যথেষ্ট। ক্ষেত্রের যেরূপ বিকার হইলে উপযুক্ত জ্ঞানোদয় হয় তাহা বলিতেছেন।

॥ ৭ - ১১ ॥ সম্মান অর্জনে অনাসক্তি, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আচার্যের সঙ্গ ও সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মবিনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, আমি কর্তা এই ধারণার অভাব, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জনিত দোষের পুনঃপুন আলোচন অর্থাৎ বিবিধপ্রকার সাংসারিক দুঃখ দেখিয়া আত্যন্তিক মুক্তি-লাভে চেষ্টা, অনাসক্তি, পুত্রদারগৃহাদিতে নির্লিপ্ততা, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্ততা, অনন্য-চিত্তে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, উপদ্রবহীন জনবিরল স্থানে থাকিবার ইচ্ছা, জনতায় মিশিতে অনিচ্ছা, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানে অনুরাগ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা এই সকল গুণাবলী জ্ঞান এই নামে উক্ত হয়। যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান **॥ ৭ - ১১ ॥**

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১১

এই শ্লোকগুলিতে যে সকল ক্ষেত্রবিকারজ গুণাবলী জ্ঞান শব্দে অভিহিত হইয়াছে তাহারা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সাধন মাত্র। জ্ঞানের সাধনকেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিদ্যার পারিভাষিক জ্ঞান শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। অদম্ভিত্ব শব্দের অর্থ ধর্ম-ধ্বজিত্বের অভাব অথবা শঠতার অভাব। দম্ভের এক অর্থ শঠতা। আত্মবিনিগ্রহ শব্দে তপ অথবা ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ বুঝায়। অধ্যাত্মজ্ঞান ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানের সমপর্যায় শব্দ। জ্ঞানার্জনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইবে বলিতেছেন।

॥ ১২ ॥ জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা জানিতে হইবে তাহা বলিতেছি। যাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় সেই উৎপত্তিধর্মবর্জিত পরমব্রহ্ম জ্ঞেয়। তাহা না সৎ না অসৎ বলিয়া কথিত হয় **॥ ১২ ॥**

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের আলোচনায় পরব্রহ্মকে জ্ঞাতব্য বলা হইল। উদ্দেশ্য এই যে ক্ষেত্রজ্ঞকে দেহাধিষ্ঠিত পুরুষ মাত্র মনে করিলে চলিবে না, ক্ষেত্রজ্ঞ যে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন তাহা বুঝিতে হইবে। পরমাত্মা হইতে তাবৎ চরাচর উৎপন্ন এ জন্য পরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বের বিবরণে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষের কথা আসিয়াছে এবং ২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম পদার্থ সৃষ্ট হয় তাহা সমস্তই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে। সৎ এবং অসৎ শব্দদ্বয়ের অর্থ ১১।৩৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। কি জ্ঞেয় এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন।

॥ ১৩ - ১৮ ॥ তাহা সর্বদিকে হস্তপদযুক্ত, সর্বদিকে চক্ষু মস্তক মুখবিশিষ্ট, সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, জগতের সকল বস্তুকে আবৃত করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক, সর্বইন্দ্রিয়বর্জিত, সংসর্গমুক্ত অথচ সর্ববস্তুর ধারক, নির্গুণ

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪

এবং গুণভোক্তা, তাহা ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে, চর অথচ অচর, সূক্ষ্মত্বহেতু অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ এবং নিকটস্থিত, ভূতগণে অবিভক্ত এবং বিভক্তের ন্যায় স্থিত। সেই জ্ঞেয় ভূতপালক সংহারক এবং উৎপত্তিকারক, তাহা জ্যোতিষ্কসমূহেরও জ্যোতি এবং তমের অতীত বলিয়া উক্ত হয়, তাহা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তাহা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। ক্ষেত্র এবং জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হন **॥ ১৩ - ১৮ ॥**

কৃষ্ণকে জানা আর ব্রহ্মকে জানা যে একই কথা এবং আমাকে জান অর্থে ব্রহ্মকে জান শ্লোকগুলিতে তাহা পরিস্ফুট হইল। কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই শ্লোকগুলির অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই উপনিষদ হইতে নিজ বক্তব্য উদ্ধার করিয়াছেন॥ ১৩।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ব্রহ্ম পরস্পর বিরোধী গুণবিশিষ্ট অথচ নির্গুণ, তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে অথচ তিনি সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মরূপী এই জ্ঞেয়ই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ। সূর্যালোকের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া ব্রহ্ম পরস্পর বিরোধী বহু গুণের প্রকাশক। তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা অথবা বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি বিশিষ্ট বস্তুজ্ঞান কি প্রকার আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু বিষয়নিরপেক্ষ বিশুদ্ধজ্ঞান বা শুদ্ধচৈতন্যসত্তা আমাদের ধারণার অতীত। এই সত্তাই ব্রহ্ম। কেনোপনিষৎ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে ব্রহ্মবিষয়ক কতিপয় শ্লোকের ভাবার্থ উদ্ধৃত করিতেছি। ঋষি বলিতেছেন, 'তথায় অর্থাৎ ব্রহ্মে চক্ষুর দৃষ্টি যায় না, বাক্ পৌঁছায় না, মন পৌঁছিতে পারে না, তাঁহাকে আমরা জানি না, তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সর্ববস্তুকে

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্‌ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮

অধিকার করিয়া আছেন এবং সে সকল বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন। পূর্বে যে সব আচার্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন আমরা তাঁহাদের নিকট এইরূপই শুনিয়াছি। যাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয় না কিন্তু যাহার শক্তিতে বাক্য উৎপন্ন হয় তাহাই ব্রহ্ম; তাঁহাকেই জান, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। যাহা মনের দ্বারা ধারণা করা যায় না কিন্তু যাহার দ্বারা মন মনন করে বলিয়া কথিত হয় তাঁহাকেই জান তাহাই ব্রহ্ম, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। চক্ষুর দ্বারা যাহাকে দেখা যায় না কিন্তু যাহার দ্বারা চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় সমূহ দেখা যায় তাহাই ব্রহ্ম তাঁহাকেই জান, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। যাহাকে কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করা যায় না কিন্তু যাহার দ্বারা কর্ণ শ্রবণ করে তাহাই ব্রহ্ম তাঁহাকে জান, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। যদি তুমি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে ভাল করিয়া জানিয়াছ তবে তুমি ব্রহ্মের রূপ অল্পই জান ইহা নিশ্চিত। দেবতাগণের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মের যতটুকু জানিয়াছ তাহাও অল্প ইহা নিশ্চিত অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসার বিষয়ই রহিল। আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে প্রকৃতরূপে জানিয়াছি, তাঁহাকে জানি না এমন নহে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে। তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি এমনও নহে, আমাদের মধ্যে ইহাই যিনি জানেন তিনিই তাঁহাকে জানেন। যাঁহার মনে হয় জানি নাই তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, যাঁহার মনে হয় ব্রহ্মকে জানিয়াছি তিনি জানেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত এবং অজ্ঞানীদের নিকট তিনি জ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হন। প্রত্যেক বোধ বা অনুভূতিতে উপলব্ধ হইলে তিনি জ্ঞাত হন, তাহাতেই অমৃতত্বলাভ হয়। আত্মার দ্বারা বীর্যলাভ হয় এবং বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫-১১ শ্লোকে ক্ষেত্রের বিকার এবং ১২-১৮ শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও প্রভাব কথিত হইয়াছে। এখন তাবৎ চরাচর রূপ যে বৃহত্তর ক্ষেত্র অধিবাদীরা বর্ণনা করেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন এবং এই প্রসঙ্গে কোন কারণ হইতে কোন বিকার উৎপন্ন হয় তাহাও উল্লেখ করিতেছেন।

॥ ১৯ - ২১ ॥ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে এবং বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন জানিবে। কার্যকারণ পরম্পরা বিষয়ে প্রকৃতি হেতু বলিয়া কথিত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই কার্যকারণ পরম্পরার উদ্ভব এবং জীবের সুখ দুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হয়। পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত

হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন। গুণের সহিত সঙ্গ পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ ॥ ১৯ - ২১ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যোক্ত সত্তাদ্বয়। ৭।৪-৫ শ্লোকে ইহাদের ভগবানের অপরা ও পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পুরুষকে পৃথক পৃথক শরীরে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। ফলে ভগবানই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহারই ক্ষেত্র। ২০ শ্লোকের কার্যকারণ এবং কার্যকরণ উভয় প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে। সর্ববিধ কার্য, কার্যবিধায়ক শক্তি বা কার্যের কারণ এবং কার্যের সাধনরূপ করণসমূহ সমস্তই প্রকৃতিজাত ইহাই বলা উদ্দেশ্য। জীবাত্মা বা পুরুষকে সুখদুঃখের হেতু বলা হয় কারণ বদ্ধ জীবাত্মার সৎ বা অসৎ কর্মের ফলে উত্তম বা অধম যোনিতে জন্মলাভ হইয়া তদনুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ হয়। পুরুষই যে পরমাত্মারূপে জ্ঞেয় তাহা বলিতেছেন।

॥ ২২ ॥ এই দেহে যে পরপুরুষ রহিয়াছেন তিনি সাক্ষী, অনুমোদনকর্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা নামেও উক্ত হন ॥ ২২ ॥

পরপুরুষ পদের পর শব্দের অর্থ দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে পর বা পৃথক অথবা পরম। পুরুষ বা জীবাত্মা দেহের সর্বকার্যে লিপ্ত আছেন মনে হইলেও জ্ঞানোদয়ে দেখা যায় যে তিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন এবং প্রকৃতিজাত দেহাদির কার্যে তিনি কেবল নির্লিপ্ত সাক্ষী বা উপদ্রষ্টা। তিনি ভালমন্দ কোন কার্যেই বাধা দেন না অর্থাৎ এক হিসাবে তিনি সকল কার্যই অনুমোদন করেন, সে জন্য তিনি অনুমন্তা বা

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১
উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২

অনুমোদনকারী নামেও কথিত হন। ভগবান নির্লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার প্রকাশক সত্তার অভাবে দেহাদিপালন ও সুখদুঃখাদি ভোগ অসম্ভব এজন্য তিনি ভর্তা ও ভোক্তা। বদ্ধ পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব পৃথক ব্যাপার, বদ্ধাবস্থায় ভোক্তা লিপ্ত কিন্তু পরমাত্মার সহিত ভেদজ্ঞান রহিত হইলে সেই ভোক্তাই নির্লিপ্ত হন। নির্লিপ্ত অবস্থায় বুঝা যায় যে প্রকৃতিই সর্বকার্যের হেতু। বদ্ধ জীব বা পুরুষের ক্ষমতা সীমারদ্ধ কিন্তু পুরুষের সহিত পরমাত্মার ঐক্য অনুভূত হইলে মহান্ ঐশ্বরত্ব উপলব্ধ হয় এজন্য তখন পুরুষ মহেশ্বর ও পরমাত্মা নামে কথিত হন।

॥ ২৩ ॥ যিনি পুরুষকে এবং গুণসমেত প্রকৃতিকে এইপ্রকার জানেন তিনি সর্বথা অর্থাৎ সর্বভাবে সকলপ্রকার অবস্থার মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না **॥ ২৩ ॥**

কি করিয়া পুরুষকে এবং গুণসমেত প্রকৃতিকে উপযুক্তভাবে জানা যায় তাহা বলিতেছেন

॥ ২৪ - ২৫ ॥ কেহ নিজ চেষ্টায় ধ্যানের দ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন অন্যে সাংখ্যযোগের সাহায্যে এবং অপরে কর্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন আবার অন্যে এই সকল উপায়ে জানিতে না পারিয়া অপরের নিকট শুনিয়া আত্মার উপাসনা করেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাও শ্রুত উপদেশ পালন করিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন **॥ ২৪ - ২৫ ॥**

শ্লোকোক্ত ধ্যান শব্দে পাতঞ্জলযোগের ধ্যান উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যযোগ জ্ঞানমার্গকে নির্দেশ করিতেছে এবং কর্মযোগ শ্রীকৃষ্ণকথিত রাজবিদ্যার সাধনপদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন সাংখ্যযোগ অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মযোগ ভাল। ১২।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

॥ ২৬ - ৩৪ ॥ ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল জানিও। সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল বস্তুতে অবিনাশী সত্তারূপে স্থিত পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই প্রকৃতরূপে দেখেন কারণ সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া তিনি নিজের দ্বারা নিজ আত্মার হানি করেন না এবং তৎফলে পরাগতি প্রাপ্ত হন এবং যিনি দেখেন যে প্রকৃতির দ্বারাই সর্বভাবে সকল কর্ম কৃত হইতেছে এবং আত্মা অকর্তারূপে অবস্থিত আছে তিনিই প্রকৃতরূপে দেখেন। যখন দ্রষ্টা ভূতসমূহের পৃথকত্ব একত্বে পরিণত হইয়াছে অনুভব করেন এবং তাহা হইতে তাহার বিস্তারও দেখেন অর্থাৎ সেই একই সত্তা বহু হইয়াছে দেখেন তখন তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কৌন্তেয়, এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি এবং

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

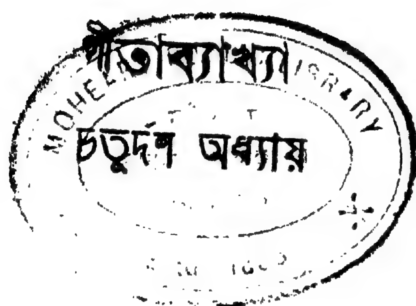
নির্গুণ বলিয়া শরীরস্থ হইয়াও কিছু করেন না এবং কিছুতে লিপ্ত হন না। আকাশ যেমন সূক্ষ্মত্ব হেতু সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা সর্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়াও লিপ্ত হন না। ভারত, যেমন এক সূর্য এই সমস্ত লোক প্রকাশিত করে ক্ষেত্রী সেইরূপ সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। যাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদ বুঝিতে পারেন এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ কি তাহা জানেন তাঁহারা পরমকে প্রাপ্ত হন **॥ ২৬ - ৩৪ ॥**

শংকর মতে ভূতপ্রকৃতি শব্দের অর্থ অবিদ্যালক্ষণা অব্যক্ত। এই শব্দের অর্থ সর্বভূতাত্মক অধিবাদীদের ক্ষেত্ররূপী প্রকৃতি এরূপও হইতে পারে অথবা ভূত এবং প্রকৃতি অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্র এবং জগৎপ্রসবিনী প্রকৃতি এরূপ অর্থও সংগত। কঠোপনিষদে ৫।১১-১৩ শ্লোকে আছে

সর্বলোক চক্ষু সূর্য হইয়াও যথা
চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্যদোষে নাহি লিপ্ত হন।
এক সেই সর্বভূত অন্তরাত্মা তথা
বাহ্য রহি লোকদুঃখে নিরলিপ্ত রন॥
এক বশী সর্বভূত অন্তরাত্মা যিনি
এক হয়ে বহুরূপ করেন বিধান।
আত্মস্থ যে দেখে তাঁরে ধীর জনা তিনি
তাঁহারই শাশ্বত সুখ অন্যে নাহি পান॥
অনিত্যেতে নিত্য যিনি চেতনে চেতনা
এক হয়ে বহু কাম্য করেন বিধান।
আত্মস্থ যে দেখে তাঁরে তিনি ধীর জনা
তাঁহারই শাশ্বতশান্তি অন্যে নাহি পান॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মবুদ্ধিতে নিজ অহংকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন দেখিয়াছেন এই অধ্যায়ে তাহা পরিস্ফুট।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



গীতাব্যাখ্যা

চতুর্দশ অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগ যোগ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান অর্জনের পথে যে বাধা আছে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিতেছেন। ১৩।২১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে গুণের সহিত সংযোগের ফলে পুরুষ বদ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। প্রকৃতির গুণই ব্রহ্মোপলব্ধির পথে বাধা। এই অধ্যায়ে ত্রিগুণতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'সত্ত্ব রজ তম' শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিগুণের তাৎপর্য বিচার করিয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্য।

॥ ১ - ৪ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরমজ্ঞানের কথা আবার বলিতেছি। ইহা জানিয়া মুনিগণ ইহলোক হইতেই পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ নির্লিপ্ততা ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টিকালেও জন্ম হয় না এবং প্রলয়েও কষ্ট পাইতে হয় না। মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২
মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

প্রকৃতি আমার যোনি, আমি তাহাতে গর্ভাধান করি। ভারত, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতবর্গের উৎপত্তি হয়। কৌন্তেয়, সর্বপ্রকার যোনিতে যাহা কিছু মূর্তিবিশিষ্ট জীব জন্মে মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি তাহাদের যোনি এবং আমি তাহাদের বীজপ্রদ পিতা **॥ ১ - ৪ ॥**

স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল এ কথা ১৩।২৬ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রে পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ।

॥ ৫ - ৯ ॥ মহাবাহো, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজ তম এই গুণসকল অব্যয় দেহী বা জীবাত্মাকে দেহে বন্ধন করে। অনঘ, তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব নির্মলত্ব হেতু প্রকাশ গুণযুক্ত এবং বিক্ষোভরহিত। সত্ত্ব সুখের আসক্তি ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। রজকে রাগাত্মক জানিবে, ইহা তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন। কৌন্তেয়, রজ দেহীকে কর্মাসক্তির দ্বারা বন্ধন করে। আর তমকে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং সর্বদেহীর পক্ষে মোহকারী বলিয়া জানিবে। ভারত, তম প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। ভারত, সত্ত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে, রজ কর্মে এবং তম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে **॥ ৫ - ৯ ॥**

যে মনোবৃত্তি দেহ ও মনকে রঞ্জিত করে অর্থাৎ সংক্ষুব্ধ করে তাহাকে রাগ বলে। সর্ববিধ emotion বা প্রক্ষোভকে রাগ বলা যায়। কোন বিষয়প্রাপ্তির

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

অভিলাষের নাম তৃষ্ণা এবং প্রাপ্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করিতে না চাওয়া সঙ্গ। মোহ অর্থে কোন কর্মে অযথা আগ্রহ এবং প্রমাদ অর্থে কর্তব্য কর্মে অনাগ্রহ।

॥ ১০ - ২০ ॥ ভারত, রজ এবং তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব দেখা দিতে পারে এবং সত্ত্ব এবং তমকে অভিভূত করিয়া রজ প্রবল হইতে পারে, সেইরূপ সত্ত্ব এবং রজকে অভিভূত করিয়া তম প্রবৃত্ত হইতে পারে। যখন এই দেহে সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞান দেখা দেয় তখন সত্ত্বই বৃদ্ধি পাইয়াছে জানিবে। ভরতর্ষভ, রজ বৃদ্ধি হইলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, নানা কর্মের উদ্যোগ, অশান্তি, বিষয় ভোগেচ্ছা এই সকল দেখা দেয়। কুরুনন্দন, তম বৃদ্ধি পাইলে ইন্দ্রিয়ে বিষয়সংযোগেও প্রকাশজ্ঞানের অভাব, কর্মে অপ্রবৃত্তি, কর্তব্য কর্মে অনিচ্ছা এবং অনুচিত কর্মে আগ্রহ এই সকল উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন দেহধারীর মৃত্যু হয় তখন তিনি উত্তম জ্ঞানিগণের অমল লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। রজবৃদ্ধিতে মৃত্যু হইলে কর্মাসক্তদিগের মধ্যে জন্ম হয়। সেইরূপ তমে মৃত্যু ঘটিলে মূঢ়যোনিতে অর্থাৎ ইতর প্রাণীর মধ্যে জন্মলাভ হয়। সুকৃত কর্মের ফল সাত্ত্বিক এবং নির্মল বলিয়া কথিত আর রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬

এবং তমের ফল অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে। সত্ত্বে স্থিতি হইলে উর্ধ্বগতি লাভ হয়, রাজসগণ মধ্যে অবস্থান করেন, জঘন্য গুণ ও প্রবৃত্তিযুক্ত তামসেরা নিম্নগতি পায়। যখন দ্রষ্টা দেখেন যে প্রকৃতির গুণ ব্যতীত অপর কোন কর্তা নাই এবং যখন তিনি গুণ হইতে যিনি পৃথক সেই পরমাত্মাকে জানেন তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমার সাধর্ম্য লাভ করেন। দেহী দেহ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরাদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করেন **॥ ১০ - ২০ ॥**

এখানে ১১ শ্লোকের প্রকাশজ্ঞান শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষজনিত কোন বিষয়ের কেবল অস্তিত্বজ্ঞান। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে যদি বিষয়ে রাগদ্বেষ জন্মে তবে সেই অনুভূতিকে মাত্র প্রকাশজ্ঞান বলা চলিবে না। সত্ত্বগুণ হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া কিছু নাই কিন্তু সুকৃত রাজসিক কর্মের ফল সাত্ত্বিক হইতে পারে ॥ ১৪।১৬ ॥ রজগুণ হইতেই সমস্ত কর্মের উৎপত্তি। ১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে সত্ত্ব বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু হইলে উত্তমলোকে গতি হয়। ইহার অর্থ এমন নহে যে সমস্ত জীবন রজে ও তমে কাটাইয়া মৃত্যুর মুহূর্তে যদি কোন কারণে সত্ত্ব দেখা দেয় তবে উর্ধ্বগতি হইবে। হয়ত কোনও শ্রেণীর সাধকের মধ্যে এ প্রকার বিশ্বাস প্রচলিত ছিল এজন্য কৃষ্ণ ১৮ শ্লোকে পুনরায় বলিলেন যাঁহারা সত্ত্বস্থ অর্থাৎ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদেরই উর্ধ্বগতি হয়।

॥ ২১ - ২৭ ॥ অর্জুন বলিলেন, প্রভো, কি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইবে যে সাধক এই তিন গুণের অতীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার কি প্রকার আচার হয়, কি উপায়ে

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

এই তিন গুণের অতীত হওয়া যায়। শ্রীভগবান বলিলেন, পাণ্ডব, প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি এবং এমন কি মোহও উপস্থিত হইলে যিনি তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের দূর করিতে চেষ্টা করেন না এবং তাহারা নিবৃত্ত হইলে পুনরায় তাহাদের প্রবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, গুণসকল থাকিবেই জানিয়া যিনি স্থির হইয়া অবস্থান করেন, যিনি সুখদুঃখে সমবোধ, নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয় অপ্রিয়ে তুল্যভাব, ধীর, নিন্দা আত্মপ্রশংসাতে তুল্যবোধ, মান অপমানে সমজ্ঞান, শত্রুমিত্রে সমভাব, সর্বারম্ভপরিত্যাগী তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন এবং যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করেন তিনিও এই তিন গুণ সম্যক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের উপযুক্ত হন কারণ আমি ব্রহ্মের, অমৃতের এবং অব্যয়ের, এবং শাশ্বত ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা ॥ **২১ - ২৭** ॥

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। ত্রিগুণাতীত হইলে ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপদেশের মর্ম এই যে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি যদি ঐকান্তিক সুখ অথবা শাশ্বত ধর্মলাভ অথবা অমৃতত্ব ও অব্যয় ভাব অথবা ব্রহ্মকে পাইতে কামনা করেন তবে তিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা পরমাত্মার সেবা করুন। পরমাত্মার ভক্ত হইলে এই সকলই লাভ হইতে পারে এজন্য পরমাত্মাকে ইহাদের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে। এই অর্থেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা, বস্তুত ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সমার্থবাচক। ব্রহ্মই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। অথবা, ২৭ শ্লোকের ব্রহ্মশব্দে ৩ ও ৪ শ্লোকোক্ত মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে বলিলেন মদ্ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম করেন। অর্জুন ২১ শ্লোকে প্রশ্ন করিয়াছেন কি প্রকারে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, কৃষ্ণ বলিলেন মদ্ভক্ত হইলে ত্রিগুণাতীত হয় এবং অধিকন্তু শাশ্বতধর্ম ইত্যাদি সবই লাভ হইতে পারে।

গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

পঞ্চদশ অধ্যায়



গীতাব্যাখ্যা

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের বিচারে ভগবান বলিলেন সর্বক্ষেত্রে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সমস্ত চরাচর তিনিই আবিষ্ট করিয়া আছেন। ১৩।৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন সাধক যখন ভূতবর্গের পৃথকত্ব একস্থ দেখেন ও সেই একই সত্তা হইতে কি করিয়া বহুর উৎপত্তি ও বিস্তার হয় বুঝিতে পারেন তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। ভগবৎসত্তাকে এক এবং অদ্বিতীয় সত্তারূপে দেখার বাধা ত্রিগুণ। চতুর্দশ অধ্যায়ে ত্রিগুণতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন কি ভাবে বিস্তার লাভ করিয়া এক নির্লিপ্ত ব্রহ্মসত্তা সংসার সৃষ্টি করিয়াছে। জীবের অন্ন, জীবদেহ ও জীবাত্মা সমস্তই পুরুষোত্তম বা পরমাত্মার আশ্রয়ে নিজ নিজ পরিণতি লাভ করিতেছে।

॥ ১ - ৫ ॥ উর্ধ্বমূল অধঃশাখা অশ্বত্থকে অবিনাশী কয়।
ছন্দ যার পত্ররাজি যে জানে সে বেদবিদ্ হয়॥
অধে আর উর্ধ্বে তার শাখা প্রসারিত
বিষয় অঙ্কুর যার গুণবিবর্ধিত।
অধোদেশে মূল তার আসিয়াছে নামি
মনুষ্যলোকেতে কর্ম যার অনুগামী॥
ইহার স্বরূপ কেহ না জানে সন্ধান
নাহি অন্ত নাহি আদি নাহি প্রতিষ্ঠান।
সুবিরূঢ় মূলযুত অশ্বত্থ এমন
দৃঢ় শস্ত্র অসঙ্গেতে করিয়া ছেদন॥

তৎপরে সেই পদ কর অন্বেষণ
যে পদ পাইলে পরে নাহি আবর্তন।
সেই আদি পুরুষের করহ সন্ধান
যাহা হ'তে জনমিল প্রবৃত্তি পুরাণ॥
নাহি মান মোহ যার জিতসঙ্গ চিত্ত
বিনিবৃত্ত কাম মন অধ্যাত্মবৃত্ত।
দ্বন্দ্ববিমুক্ত নাহি সুখদুঃখে মন
পায় সে অব্যয় পদ সে অমূঢ় জন ॥ ১-৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪

নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসঞ্জ্ঞৈর্
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫

এই শ্লোকগুলিতে অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত সংসারের তুলনা করা হইয়াছে। সংসারকে অশ্বত্থ এবং ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বট বৃক্ষের সহিত তুলনা অতি প্রাচীন ধারা। কঠের ২।৩।১ শ্লোকে উর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের সহিত ব্রহ্মের তুলনা আছে। এই অশ্বত্থে সব লোক আশ্রিত বলা হইয়াছে। অশ্বত্থ শব্দের মৌলিক অর্থ অশ্ব + ত্থ = অশ্ব + স্থ, অর্থাৎ যে বৃক্ষের নীচে অশ্ব বাঁধা হইত। উপনিষদে অশ্বমেধের অশ্বকে বিশ্বের প্রতীকরূপে কল্পনা দেখা যায়। গীতার সংসারবৃক্ষের উপমাটি সহজবোধ্য নহে। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি বলিতেছি। অশ্বত্থ এবং বট একজাতীয় বৃক্ষ। বহু প্রাচীন হইলে অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা হইতেও বটবৃক্ষের ঝুরির ন্যায় বায়বীয় শিকড় নামে। এই ঝুরিগুলি সংখ্যায় বহু এবং তাহারা মৃত্তিকামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় শ্লোকে বহুবচনান্ত মূলানি শব্দে এই সকল বায়বীয় শিকড় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ঝুরি বা বায়বীয় শিকড়যুক্ত প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের যদি মাত্র মূলশিকড় উৎপাটিত করিয়া বৃক্ষটিকে উল্টাইয়া ফেলা যায় তবে দেখা যাইবে যে বৃক্ষের মূলকাণ্ড উর্ধ্বে গিয়াছে এবং মূলশিকড় সর্বোর্ধ্বে রহিয়াছে। বায়বীয় শিকড়গুলি মাটিতে লাগিয়া থাকিলে তাহারা পূর্বের মতই উর্ধ্ব হইতে নিম্নগামী হইয়া মৃত্তিকাপ্রবিষ্ট থাকিবে। শাখা প্রশাখাগুলি কোনটা মূলকাণ্ড হইতে উপর দিকে ও কোনটা নীচের দিকে প্রসারিত রহিয়াছে দেখা যাইবে। গীতোক্ত উপমায় এই প্রকার উর্ধ্বমূল অধঃশাখা অশ্বত্থ কল্পনা করা হইয়াছে।

সংসারের মূল ভগবান। তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় হইতে সংসারের উৎপত্তি। পরমাত্মারূপ ভগবৎসত্তা সংসারের মূল এবং প্রতিষ্ঠা হইয়াও নির্লিপ্ত, তাহা প্রপঞ্চের অতীত বা উর্ধ্বে অবস্থিত এ জন্য অশ্বত্থরূপ সংসারবৃক্ষকে উর্ধ্বমূল বলা হইয়াছে। এই অশ্বত্থের প্রধান মূলের সহিত মৃত্তিকার কোন সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। প্রধান মূল সর্বোর্ধ্বে শূন্যে নির্লিপ্তের ন্যায় অবস্থিত। উল্টা বৃক্ষের শাখা কোনটি উপরে মূলশিকড়ের দিকে কোনটি বা মাটির দিকে প্রসারিত। এই সকল শাখা প্রশাখা এবং তাহাদের পত্ররাজি মৃত্তিকাসংলগ্ন বায়বীয় শিকড়ের সাহায্যে জীবিত থাকে এবং পুষ্টিলাভ করে বুঝিতে হইবে। উপমায় বলা হইয়াছে যে অধোদেশে যে সকল মূল নামিয়াছে তাহারই বশে, অর্থাৎ আমি যাহাকে বায়বীয় মূল বলিয়াছি তাহারই সাহায্যে, সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের যাবতীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে। প্রকৃতি মৃত্তিকার সহিত তুলিত হইয়াছে। মৃত্তিকা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তির মত প্রকৃতি

হইতে সংসারের বিস্তার। যেমন মৃত্তিকা হইতে লব্ধ রসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অঙ্কুর হইতে শাখা প্রশাখা এবং পত্রসমূহ জন্মে সেইরূপ বিষয়কে অঙ্কুররূপে আশ্রয় করিয়া গুণসংযোগে সংসার প্রবর্তিত হয়। উত্তম কর্ম ও অধম কর্ম ঊর্ধ্ব এবং অধ প্রসারিত শাখার ন্যায়। উল্টা বৃক্ষের যে শাখা যত ঊর্ধ্বে তাহা তত মূল শিকড়ের নিকটে।

উপমায় পত্রসমূহকে ছন্দ বা বেদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ছন্দ শব্দের এক অর্থ আচ্ছাদন। পত্র বৃক্ষের আচ্ছাদন স্বরূপ এজন্য পত্রকে বেদ বলা হইয়াছে। ইহা শংকর মত। আমার মতে জগতের প্রপঞ্চরূপে যে প্রকাশ এবং বিস্তার তাহাই এখানে ছন্দ বা বেদ শব্দে উদ্দিষ্ট। বেদকে বৃক্ষের চরম বিকাশ পত্ররাজির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বেদদ্রষ্টা ঋষিগণ জানিতেন মনুষ্যের যে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রথমত পিতামাতা, নরপতি, শূরবীরগণের প্রতি অর্পিত হয় তাহাই রূপান্তরিত হইয়া দেবতা এবং ব্রহ্মে আরোপিত হয়। সকলপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধার মূল একই। ইহার উৎস মানুষের মনে। মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলি সৎপথে চালিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কোনও মনোবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মশাস্ত্র রচনা করা চলে না। বেদসূক্তে সকলপ্রকার আদিম মনোভাব স্থানলাভ করিয়াছে। বেদের ঋষি কখন নরপতি ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন, কখন শত্রুবিনাশ প্রার্থনা করিতেছেন, কখন ধন ধান্য স্ত্রী ও পশু চাহিয়াছেন, কখন কুৎসিত কাম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দ্যূতক্রীড়া বর্ণনা করিয়াছেন, মারণ উচ্চাটন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হইয়া নদী ও অরণ্যানীর স্তব করিয়াছেন, ভেকের গানের মন্ত্র লিখিয়াছেন আবার ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে ঋষির মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে তিনি তাহা অকপটে সূক্তাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মানবের চিরন্তন কামনাসমূহ বেদে ধৃত হইয়াছে। এ জন্যই ঋষিকে মন্ত্রস্রষ্টা না বলিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হয়। এ জন্যই বেদ অপৌরুষেয় এবং বেদপ্রমাণ অখণ্ডনীয়। বেদ জানা আর মানবের সমুদায় আদিম প্রবৃত্তির সহিত পরিচিত হওয়া একই কথা। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে সংসারবৃক্ষ গঠিত হয় এজন্য পত্ররাজিকে বেদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ১৫।৪ শ্লোকে পুরাণপ্রবৃত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সংসারবৃক্ষের পত্ররাজির সহিত যিনি পরিচিত তিনি বেদবিৎ।

সংসারের আদি অন্ত বা আশ্রয় নাই বলা হইয়াছে। সংসারযোনি প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত এজন্য সংসারও অনাদি অনন্ত। জ্ঞানলাভে ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ হইলে মুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রকৃতি অন্তর্ধান করে সে জন্য অনাদি অনন্ত অশ্বত্থের প্রতিষ্ঠা বা স্থায়ী স্থিতি বা আশ্রয় নাই। উল্টা অশ্বত্থ বায়বীয় শিকড় দ্বারা মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত। পরমপদ লাভ করিতে হইলে উল্টা অশ্বত্থের মূলকাণ্ড কাটিয়া মৃত্তিকার সহিত সকল সংযোগ নষ্ট করিয়া মূল শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, ফলে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা প্রতিভাত হইবে এবং পত্ররাজি, প্রশাখা, শাখা, বায়বীয় শিকড়, মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্ত নীচে পড়িয়া থাকিবে। এই মূলশিকড়কে অর্থাৎ পরমাত্মাকে অব্যয় পদ বলা হইয়াছে।

॥ ৬ - ১১ ॥ তাহা অর্থাৎ সেই অব্যয় পদকে সূর্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি কোন জ্যোতিষ্মান বস্তুই উদ্ভাসিত বা প্রকাশ করিতে পারে না, এখানে পৌঁছিলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা আমার পরম ধাম। আমারই সনাতন অংশ জীবরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ জীবত্মারূপে প্রকৃতিস্থিত মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ এই ছয় সত্তাকে আকর্ষণ করিয়া জীবলোকে জন্মগ্রহণ করে। বায়ু যেমন গন্ধাশয় অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যের আশ্রয় বস্তু হইতে গন্ধকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় সেইরূপ এই ঈশ্বর বা শক্তিশালী জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয়কে লইয়া যান। ইনি কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে এবং মনে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সমূহ উপভোগ করেন। দেহত্যাগকালে অথবা দেহে অবস্থানকালে

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

এবং বিষয়ভোগকালে এই গুণান্বিত জীবাত্মাকে বিমূঢ় জনেরা দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুযুক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে পান অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার অস্তিত্ব বুঝা যায়। যত্নপর হইয়া যোগিগণও ইঁহাকে নিজের মধ্যে অবস্থিত দেখেন কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ যত্ন করিলেও ইঁহার দর্শন পান না ॥ ৬ - ১১ ॥

মৃত্যুর পর লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর থাকিয়া যায়। সাংখ্যমতে অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এই সপ্তদশ তত্ত্বের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষ লিঙ্গশরীর গঠন করে। এই লিঙ্গশরীর হইতেই পরজন্মের নূতন শরীরের উদ্ভব হয়। ১০ ও ১১ শ্লোকে জীবাত্মাকে জ্ঞানীদের অনুমানসিদ্ধ এবং যোগীদের অনুভবসিদ্ধ বলা হইয়াছে। ৬ শ্লোকে আছে সূর্য চন্দ্র অগ্নি সেই পরমপদ প্রকাশিত করিতে পারে না এখন বলিতেছেন পরমাত্মাই স্বীয় তেজে সূর্য প্রভৃতিকে উদ্ভাসিত করেন।

॥ ১২ - ১৫ ॥ আদিত্যের যে তেজ অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রে এবং অগ্নিতে বর্তমান সেই তেজ আমারই জানিবে। আমি ওজশক্তির দ্বারা পৃথিবীকে আবিষ্ট করিয়া ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধী অর্থাৎ ধান্য, ব্রীহি, যবাদি পোষণ করি। আমি বৈশ্বানর হইয়া

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপানবায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি। আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান ও সংশয়নিরাসক সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয়। সকল বেদে আমিই জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তপ্রবর্তক বেদবিৎ **॥ ১২ - ১৫ ॥**

চন্দ্রকিরণে ওষধিসকল পুষ্ট হয় ইহা প্রাচীন লৌকিক ধারণা। যে শক্তি প্রাণ অপান ইত্যাদি বায়ুকে প্রবর্তিত করিয়া পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাকে বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। ওঁকার সাধনায় ব্রহ্মের বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন রূপ কল্পিত হয় কিন্তু গীতার এই বৈশ্বানর সে বৈশ্বানর নহে। যে বৈশ্বানর বা অগ্নি মন্দীভূত হইলে অগ্নিমান্দ্য বা ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয় ইহা সেই বৈশ্বানর। প্রাণ ও অপান শব্দের অর্থ ৪।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। অপোহন অর্থে এক বিশেষ প্রকারের সন্দেহনিরাসক তর্কপদ্ধতি। অপোহনের আর এক অর্থ নাশ বা প্রলয়।

॥ ১৬ - ২০ ॥ লোকে দুইপ্রকার পুরুষ বর্তমান, ক্ষর এবং অক্ষর। ভূতসকলকে ক্ষরপুরুষ এবং কূটস্থকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। এই দুই পুরুষ ব্যতীত অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, ইহাকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। ইনি অব্যয় ঈশ্বর এবং লোকত্রয়কে আবিষ্ট করিয়া পালন করেন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম সে জন্য লোকসাধারণে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। ভারত, যে মোহশূন্য ব্যক্তি আমাকে এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

তিনি সর্ববিৎ হইয়া আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন। অনঘ ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র তোমাকে আমি বলিলাম, ইহা জানিয়া মনুষ্য বুদ্ধিযুক্ত ও কৃতকৃত্য হয় ॥ **১৬ - ২০** ॥

ক্ষরপুরুষ অর্থে ক্ষেত্র বা চেতন নরদেহ। ইহা প্রকৃতিজাত এবং বিনাশশীল এজন্য ইহাকে ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়শীল বলা হইয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবাত্মা অক্ষরপুরুষ। এই জীবাত্মার বিনাশ নাই। জীবাত্মাকে কূটস্থও বলা হয়। সকল ক্ষেত্রে যে এক অদ্বিতীয় পরমসত্তা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত আছেন তিনিই পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম। পরিশিষ্টে 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় 'ক্ষর-অক্ষরবাদ' দ্রষ্টব্য। কৃতকৃত্য অর্থে যাহার সকল করণীয় সম্পন্ন হইয়াছে।

রাজবিদ্যার বিজ্ঞান বা দার্শনিকতত্ত্ব বর্ণন এই অধ্যায়ে শেষ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার দ্বারা এই গুহ্যতম শাস্ত্র এইপ্রকারে কথিত হইল। পরবর্তী তিন অধ্যায়ে মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকৃতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি অধিকারীভেদে বর্গীকরণ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য পরমাত্মার দর্শন বা মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের কে কিরূপ অধিকারী তাহা তাহার প্রবৃত্তি, আচার, ব্যবহার, মনোভাব ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়।

পুরুষোত্তমযোগ নামক
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

ষোড়শ অধ্যায়

গীতাব্যাখ্যা

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাস্থরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

কে ভগবান লাভের অধিকারী তাহা কথিত হইতেছে। যিনি দৈবী প্রকৃতি-বিশিষ্ট তাঁহার পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভবপর অপর পক্ষে যিনি আস্থরীপ্রকৃতিসম্পন্ন তাঁহার বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। ৯।১২-১৩ শ্লোকে দৈবী, আস্থরী এবং রাক্ষসী এই তিন প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে। দৈবীপ্রকৃতিকে সত্ত্বপ্রধান, আস্থরীকে রজপ্রধান এবং রাক্ষসী প্রকৃতিকে তমপ্রধান বলা যাইতে পারে। রজ এবং তম উভয়ই বন্ধনের কারণ এজন্য ৯।১২ শ্লোকে আস্থরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে একত্রে মোহকরী বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে এই কারণেই দুই প্রকার সম্পদ বর্ণিত হইয়াছে, দৈবী সম্পদ মোক্ষহেতু এবং আস্থরী বন্ধনকারণ। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বুঝা যায় রাক্ষসী সম্পদকে আস্থরীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক উক্তির সহিত সামঞ্জস্য আসিয়াছে। প্রজাপতিগণ হইতে সৃষ্ট নরসমূহকে বেদে দৈব এবং আস্থর এই দুই বর্গে ফেলা হইয়াছে। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাস্থরাশ্চ॥ বৃহদারণ্যক।১।৩।১॥ বৃহদারণ্যকের অপর স্থলে তিন প্রকার প্রজাপতির সন্তানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ॥ ৫।২।১॥ এই তিন সন্তান দেবতা, অস্থর এবং মনুষ্য। পুরাকালে কেবল মনুর অধীনস্থ প্রজাবর্গকেই মনুষ্য বলা হইত। কৃষ্ণ ১৬।৬ শ্লোকে ভূতসৃষ্টিতে দুই বিভাগেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

॥ ১ - ৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, নির্ভয়তা, শুদ্ধসত্ত্বানুভূতি, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, দান এবং বহিরিন্দ্রিয় দমন এবং যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ বর্ণনে অনিচ্ছা, প্রাণিগণে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, লজ্জা,

স্থৈর্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শুচিতা, পরের অনিষ্ট চেষ্টার অভাব, অনতিমানিতা এই সকল গুণ, ভারত, দৈবী সম্পদে অধিকারী হইয়া যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। পার্থ, দম্ভ, দর্প, গর্ব, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অজ্ঞান আসুরী সম্পদে অধিকারী হইয়া যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভের এবং আসুরী বন্ধনের হেতু বলিয়া গণ্য হয়। পাণ্ডব, তোমার ভাবনা নাই, তুমি দৈবী সম্পদে অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছ **॥ ১ - ৫ ॥**

যোড়শ অধ্যায়ের ৩ এবং ৪ শ্লোকের অভিজাত শব্দের অর্থ অভিজাত বংশোৎপন্ন এরূপ করিলেও অসংগত হয় না। অধ্যায়ের শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

॥ ৬ - ৮ ॥ এই লোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি দেখা যায়। দৈব সম্বন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। পার্থ, এখন আমার নিকট আসুর বিষয়ের বিবরণ শুন। আসুর জনেরা প্রবৃত্তিও জানে না নিবৃত্তিও জানে না অর্থাৎ তাহারা কর্তব্য এবং অকর্তব্য উভয়ই বুঝে না। তাহাদের মধ্যে শুচিতা, আচার এবং সত্যের মর্যাদা নাই।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪
দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

তাহারা জগৎকে মিথ্যাব্যবহারপূর্ণ, আশ্রয়হীন, ঈশ্বরসত্তাশূন্য, কার্যকারণ পরম্পরাহীন এমন কি যদৃচ্ছা চালিত মনে করে **॥ ৬ - ৮ ॥**

শ্লোকে অপরস্পরসম্ভূত এবং কামহৈতুক এই দুই শব্দ আছে। কেহ কেহ অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং বাক্যের অর্থ করেন কামবশে স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে উদ্ভূত এবং ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই অর্থ সংগত বলিয়া মনে হয় না কারণ যৌনমিলনবশে প্রাণীসকল জন্মিয়াছে কল্পনা করা যায় সত্য কিন্তু জগতের অন্যান্য বস্তুও এই ভাবে উৎপন্ন হয় এ কথা কোন নিরীশ্বরবাদী মনে করিতে পারে না। শ্লোকে জগৎ সম্বন্ধে কথা আছে, কেবল জীবোৎপত্তি উদ্দিষ্ট হয় নাই। কার্য এবং তাহার কারণ সর্বদা পরস্পর সংযুক্ত এজন্য যাহা কার্যকারণ শৃঙ্খলার বাহিরে তাহা অপরস্পর-সম্ভূত। জগতের কার্যকারণশৃঙ্খলা নাই কেবল ইহা বলিয়াই আসুরজনেরা ক্ষান্ত হয় না, এমন কি তাহারা জগৎকে কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ বলে। কামহৈতুক অর্থে যদৃচ্ছা উৎপন্ন বা যদৃচ্ছা চালিত। ১৬।২৩ শ্লোকে কামহৈতুকের অনুরূপ কামচারতঃ কথা যদৃচ্ছাচারীদের নির্দেশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

জগৎ যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং তাহার কোনও সৃষ্টিকর্তা নাই এই মতের উল্লেখ উপনিষদেও পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর ১।১-৩ শ্লোকে আছে, ওঁ, ব্রহ্মবাদীরা বলিতেছেন, ব্রহ্মই কি (জগতের) কারণ, আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি, কোন শক্তির সাহায্যে বাঁচিয়া আছি, আমাদের আশ্রয় কি, হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, সুখে দুঃখে ব্যবস্থা করিয়া চলিবার জন্য আমরা কিসের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াছি। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসকল অথবা পুরুষ কি কারণরূপে চিন্তনীয়। ইহাদের সংযোগও কারণ হইতে পারে না কারণ সংযোগ আত্মভাব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ কাহারও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ ভোগ করেন বলিয়া আত্মাও ঐশ্বরগুণহীন অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিতে অক্ষম। সেই ঋষিরা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া নিজ-গুণাবলীর দ্বারা প্রচ্ছন্ন দেবাত্মশক্তির অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তির দর্শন পাইলেন, যে পরমাত্মা একাই কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া নিখিল অর্থাৎ পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার কারণ অধিকার করিয়া আছেন।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

গীতার বক্তব্য এই যাঁহারা পরমাত্মা ভিন্ন জগতের অপর কোন কারণ আছে মনে করেন তাঁহারা আসুরপ্রকৃতির অধিকারী, কারণ এরূপ জ্ঞানে মুক্তি হইতে পারে না।

॥ ৯ - ২৪ ॥ এই প্রকার দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা, অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্মা অমঙ্গলকারিগণ জগতের অনিষ্টের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়। দম্ভমানমদযুক্ত অশুচিকর্মীরা দুঃসাধ্য কামনার আশ্রয়ে মোহবশে অসৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা মরণকাল পর্যন্ত অন্তহীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া কামনার বস্তুসমূহ ভোগ করাই মানবের চরম উদ্দেশ্য মনে করিয়া এবং এই পথই ঠিক পথ ভাবিয়া, শত আশা রূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া, কামক্রোধযুক্ত হইয়া কাম্য বস্তু ভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে। অদ্য আমার এই লাভ হইয়াছে, আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে, আমার এই আছে আবার এই ধনও আমি পাইব, এই শত্রু আমি মারিয়াছি, আমি অন্য শত্রুদেরও মারিব, আমি ক্ষমতাবান, আমার অনেক ভোগ্যবস্তু আছে, আমি সফলকর্মা, বলবান, সুখী ও ধনী, আমি উচ্চবংশজাত, আমার সমান আর কে আছে,

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫

আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব এই প্রকার ধারণাযুক্ত অজ্ঞানবিমোহিত, নানাদিকে বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে আচ্ছন্ন কামভোগাসক্তগণ অশুচি নরকে পতিত হয়। আত্মশ্লাঘাকারী, অনম্র, ধনমানমদান্বিত সেই সকল ব্যক্তি যজ্ঞের নামে অবিধি-পূর্বক দম্ভের সহিত যজনা করে এবং সেই পরছিদ্রান্বেষীগণ অহংকার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধ আশ্রয় করিয়া নিজ এবং পরদেহে অধিষ্ঠিত আমাকে দ্বেষ করে। সেই দ্বেষী ক্রূর নরাধমগণকে আমি সংসারে আসুরী যোনিতেই অজস্র বার নিক্ষেপ করি। কৌন্তেয়, মূঢ় ব্যক্তিগণ আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতে অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ আত্মার হানিকর এই ত্রিবিধ নরকের দ্বার অতএব এই তিনকে ত্যাগ করিবে। কৌন্তেয়, এই তিন তমোদ্বার হইতে

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪

মুক্ত হইয়া মনুষ্য নিজের শ্রেয় আচরণ করে এবং তাহা হইতে পরাগতি প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে যথেচ্ছাচারে চলে সে কর্মের সফলতা বা সুখ বা পরাগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কি কর্তব্য কি অকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রকে প্রমাণ মানিবে। শাস্ত্রবিধানোক্ত বিধি নিষেধ জানিয়া সংসারে তোমার কর্ম করা উচিত ॥ ৯ - ২৪ ॥

শ্লোকগুলির বর্ণনাভঙ্গী দেখিলে ও বক্তব্য বিচার করিলে বুঝা যায় যে অধমযোনিতে জন্মগ্রহণকেই শ্রীকৃষ্ণ নরকভোগ বলিতেছেন। ১৬ শ্লোকে বলিলেন কামভোগাসক্তগণ অশুচি নরকে পতিত হয়, ১৯ শ্লোকে বলিলেন নরাধমগণকে তিনি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন। কাম ক্রোধ লোভ হইতে বন্ধন হয় এবং তাহারাই নরকের দ্বার বলিয়া ২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে, মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গঃ নরকস্তদ্‌বিপর্যয়ঃ, অর্থাৎ মনের যাহা প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ এবং নরক তাহার বিপরীত।

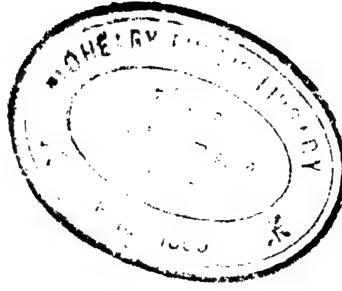
কৃষ্ণ আসুরস্বভাব ব্যক্তিদের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দুষ্ট রাজন্যবর্গ উদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি ধনবান, আমি অভিজাত বংশোৎপন্ন, আমি শক্তিশালী, আমি সফলকাম, আমি নাম অর্জনের জন্য যজ্ঞ করিব, আজ এ শত্রু মারিয়াছি কাল অপর শত্রু মারিব এ প্রকার মনোভাব আসুরস্বভাব সাধারণ লোকের মধ্যে সম্ভবপর নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর প্রকৃতির কথা না বলিয়া প্রধানতঃ দৈবাসুর সম্পদেরই বিশেষ দেখান হইয়াছে। সম্পদ অর্থে সম্পত্তি বৈভব ইত্যাদি। আসুরিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া যাহারা সংসারে বড় হইয়াছে, ধনী হইয়াছে, রাজ্যশাসন করিতেছে সেই সকল সম্পদযুক্ত ব্যক্তির কথাই ষোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে এই সকল উগ্রকর্মা অহিতকারী ব্যক্তিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়। আসুরী প্রকৃতির বশবর্তী হইলেও সাধারণ লোকে জগতের সামান্য অনিষ্টই করিতে পারে কিন্তু আসুরস্বভাব শাসক সম্প্রদায় যে জগতের কত ক্ষতি করিতে পারে তাহা গত মহাসমরে প্রকট হইয়াছে।

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ
নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাব্যাখ্যা

সপ্তদশ অধ্যায়

৩৯



গীতাব্যাখ্যা

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবিধি মানিয়া সকল কাজ করিতে উপদেশ দিলেন অর্থাৎ তিনি সামাজিক আদর্শমতে চলিতে বলিলেন। সমাজরক্ষার জন্যই স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ এই যে পরমার্থ বা ব্রহ্মলাভকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য মানিয়াই সমাজরক্ষার ব্যবস্থাকল্পে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে কাজ ব্রহ্মলাভের পরিপন্থী শাস্ত্র তাহা নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রবহির্ভূত কাজও অনেক সময় ভাল কাজ বলিয়া মনে হয় সে জন্য অর্জুন কৃষ্ণকে সে সম্বন্ধে কর্তব্য কি প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ অশাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, দান, আহার, যজ্ঞ ও তপের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক যজনা করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার, সত্ত্ব রজ অথবা তম ॥ ১ ॥

অর্জুন নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ উত্তরে শ্রদ্ধার কথা বলিলেন। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সমার্থবাচক। শংকর শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ করেন আস্তিক্যবুদ্ধি। কোন বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বা ফললাভের উদ্দেশ্যে যে মনোবৃত্তি আমাদিগকে কোনও এক উপদিষ্ট মার্গে যথোক্ত বিধি পালন করিয়া চলিতে প্রবর্তিত করে তাহার নাম শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা।

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

ভক্তি বা বিশ্বাস শ্রদ্ধার অপরিহার্য অঙ্গ নহে। কেহ হয় ত বলিলেন তুমি এই এই উপায় অবলম্বন করিলে লোহাকে সোনা করিতে পারিবে। আমি যদি সর্বান্তঃকরণে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস অবিশ্বাস ভক্তি অভক্তি প্রভৃতি মনোভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া কেবল সত্যানুসন্ধানের জন্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই তবে সেই উপায় সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা আছে বুঝিতে হইবে। যদি আমার বিশ্বাস থাকে যে লোহাকে সোনা করা যায় না তবে আমি হয় ত নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিব না বা কোন কারণে তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেও সর্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিব না। এরূপ ক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধার অভাব আছে বুঝিতে হইবে। যদি আমি বিশ্বাস করি নির্দিষ্ট উপায়ে নিশ্চয় সোনা তৈয়ারি হয় কিন্তু যদি তাহার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান না করি তবে সেই উপায় সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস বা ভক্তি থাকিলেও তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা নাই বুঝিতে হইবে। মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। যদি কাহাকেও বলা যায় যে যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ বা কর্মযোগ এই তিনের যে কোন উপায় সম্যক অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মলাভ হইতে পারে তবে সে ব্যক্তি তাহার নিজপ্রকৃতিজাত বিশিষ্ট শ্রদ্ধানুসারেই ইহাদের মধ্যে কোন একটি মার্গ আশ্রয় করিবে অথবা ব্রহ্মবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হইলে এই তিন মার্গই পরিত্যাগ করিবে। ইচ্ছা হইলে ব্রহ্মানুসন্ধান না করিয়া সে অর্থোপার্জনের কোন বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারে। ১৭।৩ শ্লোকে আছে সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় যে যে প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত সে তাহারই অনুরূপ হয়। মানুষের আহার বিহার রুচি ইত্যাদি তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী নির্দিষ্ট হয়। সত্ত্ব রজ তম হিসাবে শ্রদ্ধার ভেদ বিবৃত হইয়াছে এজন্য এই ভেদ অনুসারেই আহার ইত্যাদিও বর্ণিত হইয়াছে। অর্জুনের ১৭।১ শ্লোকের প্রশ্নের উত্তর ৯।২৩-২৫ শ্লোকেও আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

॥ ২ - ৬ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, দেহিগণের স্বভাব হইতে উৎপন্ন সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারেরই হয়। এই শ্রদ্ধার বিবরণ শুন। ভারত, সকলের শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপ অর্থাৎ স্বভাবজ চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হয়। এই পুরুষ

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

নিজ বিশিষ্ট শ্রদ্ধানুসারে গঠিত। যে যাহাতে শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই হয়। সাত্ত্বিকগণ দেবতার যজনা করেন, রাজসগণ যক্ষরক্ষদের এবং তামস জনেরা ভূতপ্রেতের যজনা করে। যে সকল দম্ভ অহংকার কাম রাগবলান্বিত মূঢ়চেতা ব্যক্তি নিজ শরীরস্থ ভূত-গ্রামকে এবং অন্তঃশরীরস্থিত আমাকেও কৃশ করিয়া অশাস্ত্রীয় ঘোর তপের অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে আসুরী বুদ্ধিযুক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২ - ৬ ॥

যে যাহার যজনা করে সে তাহাই হয়। শিবযাজী শিব হন, ভূতপ্রেতযাজী ভূতপ্রেতই হয়। এজন্য বলা হইয়াছে যে যে বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই হয়। ৭।২১-২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অন্তঃশরীরস্থিত আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে কৃশ করে এই বাক্যের অর্থ এই যে উৎকট তপে আত্মদর্শনের পথে বাধা উপস্থিত হয়। পুরাণে বহু ঋষির বহু উগ্র তপস্যার উল্লেখ আছে। দেখা যাইতেছে সে প্রকার তপ কৃষ্ণের অনুমোদিত নহে।

॥ ৭ - ১৩ ॥ শ্রদ্ধানুসারে সকল লোকের আহার তিনপ্রকার ভেদে প্রিয় হয়, যজ্ঞ তপ এবং দানও সেইরূপ। আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের প্রকারভেদ শুন। যে খাদ্যদ্রব্যসমূহ আয়ু মনোবল শারীরিক শক্তি স্বাস্থ্য সুখ এবং তৃপ্তিবর্ধনকর এবং যাহা রসাল, স্নেহযুক্ত, সারবান এবং রুচিকর তাহা সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। তিক্ত, অম্ল,

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ বা ঝাল, ঘৃতাদি স্নেহপদার্থবর্জিত, জ্বালাকর যেমন ওল ইত্যাদি, পরিণামে দুঃখ শোক রোগজনক আহার্যদ্রব্য সকল রাজসপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ ভালবাসেন। বাসী, শুষ্করস, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকারপ্রাপ্ত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্যসমূহ তামসজনপ্রিয়। যজ্ঞ কর্তব্য এই বুদ্ধিতে যে যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তির দ্বারা বিধি অনুসারে আচরিত হয় তাহা সাত্ত্বিক কিন্তু ফল আশা করিয়া এবং দম্ভ সহকারে যে যজন করা হয়, ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে। শাস্ত্রবিধিহীন, অন্ননিবেদন-হীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, এবং শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তামস বলিয়া কথিত ॥ ৭ - ১৩ ॥

সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশগুণযুক্ত এবং সর্বপ্রকার বিক্ষোভরহিত। সত্ত্ব হইতে কোন কর্মের উৎপত্তি হয় না। সত্ত্বের ফল জ্ঞান। রজ হইতেই কর্ম প্রবৃত্ত হয়। যজ্ঞাদি কর্মের ত্রিবিধ ভেদবিচারে যাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বগুণপ্রসূত এরূপ মনে করা ভুল হইবে। যে কর্মে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম। বিষয়ের আসক্তিবশে যে কর্ম নিষ্পন্ন হয় ও যাহার ফলে বিষয়াশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে ফলাকাঙ্ক্ষা আছে এরূপ কর্ম রাজসিক। যে কর্মের ফলে তম বর্ধিত হয় তাহাকে তামসিক কর্ম বলা হয়। তামসিক কর্মও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন তবে ইহার ফল তমোবৃদ্ধি। আহারভেদ বিচারে এমন কথা বলা হয় নাই যে এই প্রকার আহারে এই গুণ বৃদ্ধি পায়। যে আহার সাত্ত্বিকের প্রিয় তাহা সাত্ত্বিক আহার। তদ্রূপ রাজসিক আহার ও তামসিক আহার রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির প্রিয়।

কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

পূর্বে বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের কালে যজ্ঞ দান এবং তপের বাড়াবাড়ি দেখা যাইত এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বার বার সে সম্বন্ধে নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়েও যজ্ঞ দান তপের কথা আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ বলিয়াছেন মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির দ্বারা সাধুভাবে শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞ দান তপ সৎকর্ম বা সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কৃষ্ণ এখানে স্পষ্ট বলিলেন না যে শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত হইলেও যজ্ঞ দান তপ সৎকর্ম হইতে পারে। তামস যজ্ঞে ধর্মের অঙ্গ কিছু নাই। ইহা ধর্মের নামে খাওয়া দাওয়া মাত্র। ৯।২৩-২৫ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারাও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করে তবে তাহারা আমাকে প্রকৃতরূপে না জানায় পূজার সম্যক ফল পায় না। দেবপূজক দেবতাকে, পিতৃপূজক পিতৃগণকে, ভূতপূজক ভূতগণকে এবং আমার পূজক আমাকেই পায়।

॥ ১৪ - ১৯ ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও বিদ্বানের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাকে শারীর তপ বলা হয়। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য এবং শাস্ত্রাদি পঠনের অভ্যাসকে বাঙ্ময় তপ বলে। চিত্তের প্রসন্নতা ও উদ্বেগশূন্যতা, অধিক বাক্যব্যয়ে অনিচ্ছা, চিত্তসংযম, বিশুদ্ধ ভাবনা এই সকলকে মানস তপ বলা যায়। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে এই ত্রিবিধ তপ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। সুখ্যাতি, মান বা পূজা লাভের জন্য এবং

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

দম্ভ সহকারে যাহা কৃত হয় অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত ফলযুক্ত সেই তপ ইহলোকে রাজস বলিয়া কথিত হয়। মোহবশে নিজেকে কষ্ট দিয়া বা পরকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য যাহা করা যায় তাহা তামস তপ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪ - ১৯ ॥

ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ ৬।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। সনাতন ধর্মের নির্দেশ অনুসারে যে বাক্যে পরের উদ্বেগ বা মনঃকষ্ট হয় না এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় এবং হিতকর তাহাই সত্য বাক্য নামে অভিহিত। যে সত্য বাক্য অপ্রীতিকর ও অহিতকর তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নামের যোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ সনাতনধর্মনির্দিষ্ট সত্যবাক্য আচরণকে বাঙ্ময় তপ বলিতেছেন। কৃষ্ণের মতে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন বুদ্ধিতে এবং পরমার্থসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে তবে কর্মকে সাত্ত্বিক বলা যায়। ফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত সমাজানুমোদিত কর্ম রাজসিক। অযথা আগ্রহবশে অনুষ্ঠিত সমাজনিন্দিত কর্ম তামসিক।

॥ ২০ - ২২ ॥ অনুপকারী ব্যক্তিকে দেশ কাল এবং পাত্রত্ব বিবেচনা করিয়া, দেওয়া বিধি এই বুদ্ধিতে, যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উপদিষ্ট আর যাহা প্রত্যুপকারের জন্য বা কোন ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং কষ্টের সহিত দেওয়া হয় সেই দান রাজস বলিয়া উপদিষ্ট। অবিহিত দেশে কালে, অপাত্রে এবং বিহিত সৎকার না করিয়া অবজ্ঞার সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২০ - ২২ ॥

অনুপকারী শব্দের অর্থ যে উপকার করে নাই এবং যাহার কাছে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা নাই। দাতার মনোভাব ও দানপাত্রের পাত্রত্ব উভয় দিক বিচার করিয়া

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দানের প্রকারভেদ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ দান তপকে মনঃশুদ্ধির উপায়মাত্র বলিয়াছেন এ জন্য এ সকল কর্ম ফলাশা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন॥ ১৮।৫-৬॥ দারিদ্র্যপীড়িত দেশ, দুর্ভিক্ষাদি কাল এবং কর্মে অসমর্থ জরাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সামাজিক দৃষ্টিতে দানের উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারতে ভীষ্ম উপদেশ দিতেছেন দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্। দরিদ্রকে ভরণ করা কর্তব্য ধনীকে অর্থদান উচিত নহে। দরিদ্রকে ধনদান তাহার উপকাররূপ ফলের উদ্দেশ্যে করা হয়। এ প্রকার দানে মন বহির্মুখ থাকে অর্থাৎ রজ প্রবল হয় এ জন্য এ সকল সামাজিক সৎকর্ম রাজস নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে পুষ্করিণী খনন করাইলে যে পুণ্য হয় তাহা পরোপকারজনিত নহে কিন্তু তাহা অলৌকিক কারণে উৎপন্ন। সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মের মূলে পরোপকার নাই যদিও পরোপকারেরও পুণ্যফল আছে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পুণ্যকর্ম কর্তব্যবোধে আচরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়। পুষ্করিণী খননের ন্যায় দানও এক শাস্ত্রবিহিত কর্ম। পুষ্করিণী খনন বা দান পরোপকারের আশা ত্যাগ করিয়া যদি পরলোকে স্বর্গ কামনায় অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাও রাজসিক কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। তীর্থাদি স্থানে, সংক্রান্তি ও গ্রহণাদি কালে সদ্ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র ধনদান করিতে উপদেশ দেন। সদ্ব্রাহ্মণ ধনী হইলেও শাস্ত্রমতে দানের যোগ্য পাত্র। এরূপ দানে যদি স্বর্গাদি কোন ফলের আশা না করা যায়, কর্তব্য বলিয়াই যদি দান করা হয় তবেই তাহা সাত্ত্বিক দান হইবে। প্রত্যুপকার, পরোপকার, সম্মানলাভ, স্বর্গলাভ ইত্যাদি কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হইয়া কেহ যদি দুর্ভিক্ষ-তহবিলে বা তদনুরূপ কোন পাত্রে সামাজিক কর্তব্য এইমাত্র বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাসহকারে কিছু দান করেন তবে শাস্ত্রে এই প্রকার দানের বিধান না থাকিলেও তাহা সাত্ত্বিক দান বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

॥ ২৩ - ২৮ ॥ ওঁ, তৎ এবং সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা পূর্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসকল নিয়মিত হইয়াছিল। সেই কারণে

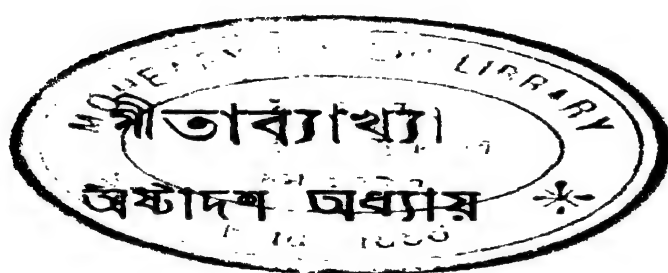
ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান তপ ওঁ এই উচ্চারণ করিয়া সতত আরম্ভ করা হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের জন্য মোক্ষকামিগণ কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞ তপ ও দানক্রিয়া তৎ এই কথা উচ্চারণের পর অনুষ্ঠিত হয়। পার্থ, অস্তিভাব এবং সাধুভাবের উদ্দেশ্যে সৎ এই শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং উত্তম কর্মের সহিত সৎ শব্দ যুক্ত হয় এবং যজ্ঞ তপ ও দানে যে নিত্যসত্তা অধিষ্ঠিত আছে তাহাও সৎ এই নামে কথিত এবং তাহার উদ্দেশ্যে যে কর্ম তাহাও সৎ নামে অভিহিত হয়। ভগবৎসত্তায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া যে হবন, দান, তপ বা অপর কোন কর্ম করা যায় তাহা অসৎ এই নামে কথিত হয়। পার্থ, এরূপ কর্ম পরলোক বা ইহলোক কোন লোকেরই জন্য করণীয় নহে **॥ ২৩ - ২৮ ॥**

ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মসত্তা সৎ বা অস্তি এই ভাবে তাবৎ পদার্থ ও কর্মে বর্তমান। অনিত্যেতে তাহা নিত্য। সকল ব্যাপারের তাহাই স্থিতি। ২৭ শ্লোকে স্থিতি কথার ইহাই তাৎপর্য। শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া নিত্য ভগবৎসত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে কোন কর্মই করা যাক না কেন তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম, এইরূপ কর্মে শাস্ত্রবিধি পরিত্যক্ত হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রেয় লাভ হয়। নিত্যসত্তার প্রতি মন না রাখিয়া যদি কেবল ব্যক্তি-বিশেষের বা সমাজের উপকারার্থ ভাল কাজ করা যায় তবে তাহাতেও বন্ধন আছে।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



গীতাব্যাখ্যা

অষ্টাদশ অধ্যায়

গীতাব্যাখ্যা

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধা, আহার, যজ্ঞ, দান ও তপের ত্রিবিধ ভেদ দেখান হইয়াছে। অনুষ্ঠানের প্রকারভেদে যজ্ঞাদি কর্ম বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েরই হেতু হইতে পারে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ প্রত্যেকের তিন প্রকার ভেদ আলোচিত হইয়াছে। চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বক্তব্য বিচার করিলে বুঝা যায় যে মোক্ষ ও বন্ধনের হেতু হিসাবেই ত্রিগুণ কল্পনা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্বকথিত বহু বিষয়ের যথা সন্ন্যাস, যজ্ঞ, স্বধর্ম ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি আছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের উপদেশে যাহা কিছু অস্পষ্ট ছিল এই অধ্যায়ে তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন, মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ নিজে যে মহাকর্মী অর্জুন তাহা মহাবাহো ও কেশিনিসূদন সম্বোধনে ইঙ্গিত করিতেছেন, আবার তিনি যে ইন্দ্রিয়বিজয়ী তাহা হৃষীকেশ সম্বোধনে সূচিত হইয়াছে। কৃষ্ণ উত্তরে অর্জুনকে ভরতসত্তম ও পুরুষব্যাঘ্র বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, জ্ঞানিগণ কাম্য কর্মের ন্যাসকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, বিচক্ষণগণ সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন **॥ ২ ॥**

ন্যাস অর্থে সমর্পণ অথবা ত্যাগ দুইই হইতে পারে। প্রথম অর্থে কাম্য কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করার নাম সন্ন্যাস ও দ্বিতীয় অর্থে কাম্য কর্ম ত্যাগই সন্ন্যাস। শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্থে সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগ করিতে চাহেন বলিয়া ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসের ধাতুগত ন্যাস শব্দই রাখিলেন। কর্মবর্জনকারী সন্ন্যাসমার্গী দ্বিতীয় অর্থ সমীচীন বলিবেন। শ্রীকৃষ্ণের কালে কর্মবর্জনরূপ সন্ন্যাসমার্গে যে বহু সাধক আস্থাবান ছিলেন তাহা তাঁহার কথার ভঙ্গীতে অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে।

॥ ৩ ॥ এক শ্রেণীর মনীষীরা এই বলেন যে কর্মমাত্রই দোষবৎ পরিত্যাজ্য অপরে যজ্ঞ দান তপ কর্ম ত্যাজ্য নহে ইহাই বলেন **॥ ৩ ॥**

শ্লোকে দোষশব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাতে বন্ধন হয় তাহাকে দোষ বা ক্লেশ বলা হয় ॥ যোগসূত্র ২।৫০ ॥

॥ ৪ - ৬ ॥ ভরতসত্তম, সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থিরসিদ্ধান্ত শুন। পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞ দান তপ বর্জনীয় নহে। যজ্ঞ দান এবং তপ হইতে মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু, পার্থ, এই সকল কর্মও আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া আচরণ করিতে হইবে ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম মত **॥ ৪ - ৬ ॥**

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

তৎকাল প্রচলিত অন্য সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কৃষ্ণ নিজ মতকে উত্তম বলিলেন।

॥ ৭ - ৯ ॥ নিয়ত বা নিত্যকর্মেরও সন্ন্যাস বা বর্জন যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশে যদি নিয়তকর্ম পরিত্যাগ করা যায় তবে সেই ত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হয়। শরীরের কষ্টের ভয়ে এবং দুঃখকর বলিয়া যদি কেহ কোন কর্ম ত্যাগ করে তবে সে ত্যাগ রাজস ত্যাগ বলিয়া জানিবে, এরূপ ত্যাগে ত্যাগফল লাভ হয় না। অর্জুন, ইহা কর্তব্য এই জ্ঞানে যদি নিয়ত বা নিত্যকর্ম আচরণ করা যায় এবং যদি আচরণকালে তাহাতে আসক্তি এবং তাহার ফল ত্যাগ করা হয় তবে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া বিবেচিত হয় **॥ ৭ - ৯ ॥**

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই যে পরলোক বা ইহলোকের জন্য অথবা শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য যে সকল কর্ম উপদিষ্ট আছে তাহার কোনটাই বর্জনীয় নহে তবে সকল ক্ষেত্রেই আসক্তি ও ফলত্যাগ করিতে হইবে। এই প্রকার সন্ন্যাস বা ত্যাগকে সাত্ত্বিক বলা যায়। ইহা মোক্ষলাভের সহায়ক। সমাজানুমোদিত কোন কর্ম শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, কেবল কর্মের আসক্তি ও ফলাশাই বর্জনীয়।

॥ ১০ - ১২ ॥ সত্ত্বগুণযুক্ত, বুদ্ধিমান, কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে সংশয়হীন ত্যাগী ব্যক্তি অমঙ্গলাশঙ্কাযুক্ত কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং মঙ্গলকর্মেও আসক্ত হন না। যেহেতু দেহযুক্ত জীবের দ্বারা সমস্ত কর্ম নিঃশেষ বর্জন করা সম্ভবপর নহে সে জন্য

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী চ্ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

যিনি কর্মফলত্যাগী তাঁহাকেই ত্যাগী এই নামে অভিহিত করা হয়। যাহাদের কর্মশক্তি ও ফলত্যাগ হয় নাই সেইরূপ অত্যাগীদের পরলোকে কর্মের ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র এই তিন প্রকার ফললাভ হয় কিন্তু আসক্তি ও ফলত্যাগী সন্ন্যাসীর কখনও তাহা হয় না ॥ ১০ - ১২ ॥

যোগদর্শন ৪।৭ সূত্রে কর্মের শ্বেত, কৃষ্ণ ও মিশ্র এই তিন প্রকার ফলের উল্লেখ আছে। যোগী ইহাদের অতীত হন। কৃষ্ণ বলিতেছেন আসক্তি ও ফলত্যাগী সন্ন্যাসীরও কর্মের বন্ধন নাই। তিনিও যোগীর ন্যায় ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র কর্মফলের অতীত।

সন্ন্যাসী বা যোগী না হইয়াও সাধারণ বুদ্ধিতেও যে ফলত্যাগ করা যায় ১৩ হইতে ১৬ শ্লোকে তাহা বুঝান হইতেছে। যতই চেষ্টা করা যাক না কেন কর্মের ফললাভ বা সিদ্ধি আমাদের পূর্ণায়ত্ত নহে। কোন কর্মচেষ্টা সিদ্ধ হইবে কি না পূর্ব হইতে কেহই তাহা সুনিশ্চিত বলিতে পারে না এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি ফল ও অফল উভয়ের সম্ভাবনা মনে রাখিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। এই মনোভাবই ফলাসক্তি ত্যাগের সোপান হইতে পারে। পরিশিষ্টে 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় 'বুদ্ধিযোগ' ও 'রাজবিদ্যা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের কালে কর্মের কর্তব্যতা অকর্তব্যতা সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত ছিল। কর্মতত্ত্বের নানা বিষয় যেমন কর্মের কারণ, প্রকারভেদ, ফলাফল, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদি বিষয় বিদ্বানগণ কর্তৃক আলোচিত হইত। কৃষ্ণ ৪।১৭ শ্লোকে বলিয়াছেন গহনা কর্মণো গতিঃ অর্থাৎ কর্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। এই অধ্যায়ের ১৩-৩৫ শ্লোকে কৃষ্ণ জ্ঞানিগণ কর্তৃক প্রতিপাদিত ও নিজ অনুমোদিত কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

॥ ১৩ - ১৪ ॥ মহাবাহো, সাংখ্যে কৃতান্তে সকলপ্রকার কর্মের সফলতার হেতু বলিয়া কথিত এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট বুঝ, যথা, অধিষ্ঠান এবং কর্তা

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২
পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

এবং পৃথগ্‌বিধ করণ এবং বিবিধ পৃথক চেষ্টা এবং এই বিষয়ে পঞ্চম কারণ দৈব ॥ ১৩ - ১৪ ॥

শংকর সাংখ্যকৃতান্ত শব্দের অর্থ করেন বেদান্তশাস্ত্র। বেদান্তে বা সাংখ্যে কোথাও কর্মের পঞ্চ কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সাংখ্যকৃতান্ত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত এই অর্থ সমীচীন। পরবর্তী ১৯ শ্লোকে গুণসংখ্যান শব্দের অর্থ শংকর মতে সাংখ্যশাস্ত্র। যে শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গুণসংখ্যার বিচার আছে তাহাই গুণসংখ্যান। হয় ত বা কৃষ্ণের কালে সাংখ্যকৃতান্ত এবং গুণসংখ্যান নামে দুই পৃথক শাস্ত্র বর্তমান ছিল। পরিশিষ্টে 'ব্রহ্মলাভের দুই উপায়' প্রবন্ধে সাংখ্য শব্দের অর্থবিচার দ্রষ্টব্য।

কর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত ১৩-১৯ শ্লোকগুলির শংকর ব্যাখ্যা উপাদেয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শংকরমতে ১৩-১৪ শ্লোকের ভাবার্থ যথা, কর্মের পরিসমাপ্তি উপদেশক সাংখ্যকৃতান্তে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে সমস্ত কর্মসিদ্ধির অর্থাৎ কর্মনিষ্পত্তির পাঁচটি কারণ কথিত হইয়াছে, ১। অধিষ্ঠান বা শরীর, ২। কর্তা বা ভোক্তারূপী বদ্ধ জীব, ৩। করণ বা দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, ৪। চেষ্টা বা প্রাণ অপানাদি বায়বীয় ক্রিয়া এবং ৫। দৈব অর্থাৎ চক্ষুপ্রভৃতির অনুগ্রহকারক আদিত্যাদি। শংকর যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে কারণগুলির মধ্যে শরীরাতিরিক্ত কোন বহির্বিষয়ের স্থান নাই। কর্মকে দুই দিক দিয়া বিচার করা যায় এক কর্মের বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়া কর্মকর্তার নিজস্ব ব্যাপার হিসাবে ও অপর বিষয়বস্তুর সহিত কর্মকর্তার সম্পর্ক মনে রাখিয়া। যে বস্তু বা বিষয় লইয়া কর্ম তাহাকে কর্মের বিষয়বস্তু বলিতেছি। অন্নভোজনরূপ কর্মের বিষয়বস্তু অন্ন। অন্নগ্রহণরূপ কর্মকে কেবল ভোক্তার দিক দিয়া বিচার করিলে শংকরব্যাখ্যা সন্তোষজনক মনে হইবে। শরীরই ভোজনরূপ কর্মের অধিষ্ঠান, ভোক্তারূপী বুভুক্ষু বদ্ধ জীব কর্তা, ভোক্তার চক্ষু জিহ্বা নাসিকা ত্বক হস্তেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ভোজনকর্মের করণ অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে ভোজন নিষ্পন্ন হয়, অন্নগ্রহণের জন্য যে সকল শারীরিক ক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয় তাহাই প্রাণ অপান বায়ুর চেষ্টা এবং আদিত্যাদি যে সকল দ্যোতনশীল সত্তার সাহায্যে চক্ষু দর্শন করে, জিহ্বা আস্বাদ গ্রহণ করে, ইত্যাদি, তাহাই দৈব।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

স্মরণ রাখিতে হইবে শংকর ১৩ শ্লোকে কর্মসিদ্ধির অর্থ করিয়াছেন কর্ম-নিষ্পত্তি অর্থাৎ কর্মসমাপ্তি। কর্ম সমাপ্ত হইলেও ফললাভ না হইতে পারে। কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলাম কিন্তু লক্ষ্যভেদ হইল না। শরীরের দিক দিয়া কর্ম নিষ্পন্ন হইল বটে কিন্তু ফলের দিক দিয়া সিদ্ধি হইল না। ফললাভ বুঝিতে হইলে কর্মের বিষয়বস্তুর সন্ধান লইতে হইবে। কর্মফলের আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চ কারণের অবতারণা। অব্যবহিত পূর্ববর্তী ১২ শ্লোকেও কর্মফলের উল্লেখ আছে এ জন্য সিদ্ধি কথার শংকরকৃত নিষ্পত্তি অর্থ সমীচীন নহে। শরীরাতিরিক্ত বিষয়বস্তুর সহিত কর্মের সম্বন্ধ বিচার করিলে শংকরব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখা যাইবে। শংকর-ব্যাখ্যাত পঞ্চ কারণ বর্তমান থাকিলেও অন্নের অভাবে ভোজন কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার ধনুঃশররূপ সাধনের অভাবেও লক্ষ্যবেধ হয় না অর্থাৎ কর্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব এই দুই উদাহরণে ভোজনরূপ কর্মসিদ্ধির জন্য অন্নরূপ বিষয়বস্তু আবশ্যক এবং লক্ষ্যবেধরূপ কর্মের সিদ্ধির জন্য শারীরিক চক্ষু হস্তাদি ইন্দ্রিয় ব্যতীত ধনুঃশররূপ সাধন বা করণও আবশ্যক। এ জন্য শ্লোকে পৃথগ্‌বিধ করণের কথা আছে।

আমার মতে অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ কর্মের বিষয়বস্তু অর্থাৎ যাহা লইয়া কর্ম। অন্নভোজন কর্মে অন্নই অধিষ্ঠান এবং লক্ষ্যবেধে লক্ষ্য বস্তুই অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া কর্ম নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম অধিষ্ঠান। শরীরও অধিষ্ঠান হইতে পারে। শরীরমার্জন কর্মে শরীরই অধিষ্ঠান। কর্তা অর্থে কর্ম করিতে ইচ্ছাসম্পন্ন বদ্ধ জীবাত্মা। ইচ্ছাকৃত কর্মে অহংভাব বা অহংকার বা আমিই করিতেছি এই বোধ পরিস্ফুট। ১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যাঁহার এই অহংকৃত ভাব নাই তাঁহার বন্ধন নাই। করণ অর্থে যাহার সাহায্যে কর্ম করা যায় অর্থাৎ কর্মের সাধন। চক্ষুহস্তাদি ইন্দ্রিয় যেমন করণ, লক্ষ্যবেধে ধনুঃশরও তদ্রূপ। ভোজনরূপ কর্ম সম্পাদনের জন্য আহার গ্রহণ, চর্বণ, গলাধঃকরণ প্রভৃতি পেশীয় ক্রিয়াকে চেষ্টা বলা যায়। মনোভাব প্রকাশের জন্য স্বরযন্ত্রের ক্রিয়া ও বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গীকে বাচনিক কর্মের চেষ্টা বলা যাইতে পারে। চিন্তা করা মানসিক কর্মের চেষ্টা। সকলপ্রকার চেষ্টাও যে কর্ম তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। উদাহরণ যথা, ভোজনরূপ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য চর্বণরূপ যে চেষ্টা তাহাও কর্ম। এ সকল চেষ্টাকর্মের জন্য যে সকল পেশীসঞ্চালনাদি ক্রিয়া আবশ্যক তাহা nerve নার্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নার্ভশক্তি আমাদের শাস্ত্রে বায়ু নামে

অভিহিত এ জন্য শংকর চেষ্টাকে বায়বীয় ক্রিয়া বলিয়াছেন। শংকর দৈব শব্দের অর্থ করেন ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহকারক আদিত্যাদি। এ অর্থ সমীচীন মনে করি না। অধিদৈব শব্দের দৈব এবং ১৪ শ্লোকের এই দৈব একই। অধিবাদে অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি শক্তিশালী প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতা বলা হয়। আধিদৈবিক দুঃখ বলিলে ঝড়, প্লাবন, অগ্নিদাহজনিত দুঃখ বুঝায়। পরিশিষ্টে 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় অধিবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। দৈবকে আমাদের আয়ত্তির বহির্ভূত প্রাকৃতিক শক্তি বলা যায়। দৈবের অপর নাম অদৃষ্ট কারণ ঘটনের পূর্বে দৈবোৎপন্ন ব্যাপার ও তাহার ফলাফল আমাদের অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট থাকে। দৈবকে কর্মসিদ্ধির এক হেতু বলা হইয়াছে কারণ 'দৈবানুকূলে বলহীন শক্ত, বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈবে'। আমি লক্ষ্যবেধে উদ্যত হইয়াছি। আমার লক্ষ্যের প্রতি শরনিক্ষেপের ইচ্ছা থাকায় আমি কর্তা, লক্ষ্যও সম্মুখে উপস্থিত ও সে সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হইল অর্থাৎ পরিজ্ঞাতারূপে আমি জ্ঞেয় বিষয়বস্তুর অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ লক্ষ্য বস্তুর জ্ঞানলাভ করিলাম, তাহাতে আমার লক্ষ্যবেধের চোদনা বা প্রেরণা আসিল ॥ ১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও ধনুঃশর প্রভৃতি এই দ্বিবিধ করণের সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করিলাম এবং শারীরিক চেষ্টার দ্বারা জ্যা আকর্ষণ করিয়া শরত্যাগ করিলাম। এমন সময় হঠাৎ দমকা হাওয়া আসিয়া আমার শরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিল। এই দমকা হাওয়াই আমার কর্মে প্রতিকূল দৈব হইয়া আমাকে ফললাভে বঞ্চিত করিল। দৈব অনুকূল না হইলে সহস্র চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধিলাভ হয় না। এ জন্য দৈব কর্মসিদ্ধির এক কারণ। আধুনিক বিজ্ঞানীও বলেন সকল ব্যাপারেই unknown factors বা অজ্ঞাত কারণের প্রভাব আছে। এই অজ্ঞাত কারণ সমষ্টিকে দৈব বা অদৃষ্ট বলা যায়।

॥ ১৫ - ১৭ ॥ শরীর, বাক্য কিংবা মন দ্বারা মানুষ যে সমস্ত কাজ আরম্ভ করে তাহা ভালই হউক কিংবা মন্দই হউক এই পাঁচটি তাহার হেতু। এ ক্ষেত্রে যে কেবল আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে কর্তা বলিয়া দেখে সেই দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি অসংস্কৃত বুদ্ধি হেতু কিছুই দেখে না। যাঁহার অহংকৃত ভাব অর্থাৎ আমি করিয়াছি এ ভাব নাই,

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

যাঁহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না তিনি এই সমস্ত লোক হত্যা করিলেও হত্যা করেন না এবং বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ **১৫ - ১৭** ॥

এখানে ১৫ শ্লোকে তিন প্রকার কর্মের উল্লেখ আছে, শারীরিক, বাচনিক এবং মানসিক। বাচনিক কর্মে আমরা আমাদের মনোভাব প্রকাশ করি এ জন্য বাচনিক কর্ম শারীরিক ও মানসিক কর্মের মিশ্রিত ফল। চিন্তা করার নাম মানসিক কর্ম। তাবৎ কর্ম এই তিন বিভাগে ফেলা যায়। শংকর অধিষ্ঠানকে শরীর বলায় ১৫ শ্লোকের শারীরিক কর্মের ব্যাখ্যায় একটু বিব্রত হইয়াছেন। প্রমথনাথ কৃত অনূদিত শংকরব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি, 'যদি বল অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটিই সকল প্রকার কর্মের কারণ বলিয়া যখন কথিত হইতেছে তখন শরীর বাক্ এবং মনের দ্বারা যাহা কিছু মানব করে এই প্রকার কথন আবার কি প্রকারে সংগত হইবে। ইহার উত্তর এই যে, এই প্রকার উক্তিতে, বাস্তবপক্ষে, কোন প্রকার দোষ দেখা যায় না ; কারণ, বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ যত কার্য আছে, সকল কার্যেরই প্রধান হেতু শরীর, বাক্ ও মনই হইয়া থাকে। দর্শন বা শ্রবণ প্রভৃতি কারণ হইলেও উহারা প্রধান ভাবে নহে ; কিন্তু অপ্রধান ভাবেই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং জীবনলক্ষণ দর্শন শ্রবণাদিকেই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ সকল দর্শন শ্রবণ প্রভৃতিও ত শরীরাদিরই কার্য। সুতরাং কর্মফলের ভোগসময়ে শরীরাদিরূপ প্রধান সাধন দ্বারাই ভোগ হইয়া থাকে, এই কারণে পাঁচটি পদার্থকে যে কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে পূর্বাপর কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই।' শংকরকে শরীররূপ প্রধান ও ইন্দ্রিয়রূপ গৌণ সাধন বা করণ মানিতে হইয়াছে। শরীররূপ অধিষ্ঠান বা প্রধান সাধনের ও ইন্দ্রিয়রূপ গৌণ সাধন বা করণের, কর্মের কারণ হিসাবে, ১৪ শ্লোকে একত্র সমাবেশ সমর্থনযোগ্য নহে। অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ কর্মের বিষয়বস্তু মানিলে এ প্রকার অসংগতি উৎপন্ন হয় না। ১৪-১৫ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক সকল প্রকার কার্যের সফলতা পঞ্চ কারণের সমবায়ের উপর নির্ভর করে। অধিষ্ঠান, কর্তা,

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

করণ, চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচটির যে কোন একটির দোষে কর্ম পণ্ড হইতে পারে। দৈব বর্তমান থাকিতে কোন কর্মেরই ফললাভে নিশ্চয়তা নাই। এ জন্যই ২।৪৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে কর্মফল আমাদের অধিকারের বা আয়ত্তির বহির্ভূত। এই দৈবের ব্যাপার যিনি বুঝেন ও যিনি কর্মসিদ্ধির অন্যান্য কারণ হিসাবে অধিষ্ঠান, করণ ও চেষ্টাকে জানেন তিনি কর্মের সফলতার জন্য কখনই কেবল নিজের কৃতিত্ব দেখেন না। এ জন্য ১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ থাকিতে যে দুর্মতি আত্মানম্ কেবলন্তু অর্থাৎ কেবল নিজেকেই কর্মসিদ্ধির কর্তা বলিয়া মনে করে সে বাস্তবিক কিছুই বুঝে না।

শংকর এই শ্লোকের আত্মানম্ কেবলম্ পদের অর্থ করেন কেবলাধর্মী আত্মাকে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্লোকের সহিত সংগতি বিচার করিলে কেবল নিজেকে এই অর্থই যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। পরের শ্লোকেই আছে যাহার অহংকৃত অর্থাৎ আমি করিয়াছি এ ভাব নাই সে বদ্ধ হয় না। সাধারণে কর্ম সফল হইলে বলে আমি নিজে করিয়াছি, আত্মা করিয়াছে বলে না। আত্মাকে বিদ্বানেই কর্তা বা অকর্তা মনে করিতে পারে। দুর্মতি বা অল্পবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির আত্মা লইয়া কোন প্রকার চিন্তা আসে না।

সপ্তদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে অহংকৃতভাবশূন্য নির্লিপ্ত ব্যক্তি সমস্ত লোক হত্যা করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না। কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রপ্রতর্দন সংবাদে ইন্দ্র বলিতেছেন, যে আমাকে জানে তাহার কোন কর্মের দ্বারাই লোক হিংসিত হয় না। না মাতৃবধ, না পিতৃবধ, না চৌর্য, না ভ্রূণ হত্যায় তাহার পাপ হয়, না এ সকল কর্মের উপক্রম কালে তাহার মুখজ্যোতি অপগত হয়।

॥ ১৮ - ১৯ ॥ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই ত্রিবিধ সত্তা হইতে কর্মচোদনা অর্থাৎ কর্মপ্রেরণা জাগে। করণ, কর্ম এবং কর্তা এই ত্রিবিধ সত্তা লইয়া কর্মসংগ্রহ। গুণসংখ্যান শাস্ত্রে জ্ঞান এবং কর্ম এবং কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার সাত্ত্বিক এবং রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ ভেদ আলোচিত হইয়াছে। তাহাও যথাযথ শ্রবণ কর ॥ **১৮ - ১৯** ॥

গুণসংখ্যান কথার অর্থ ১৮।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। কর্মের সহিত কর্তার দুই প্রকার সম্বন্ধ বর্তমান। এক বিষয়বস্তু বা অধিষ্ঠানের পরিজ্ঞাতা রূপে ও দ্বিতীয় কর্মসম্পাদক রূপে। কর্তা যখন কর্মসম্পাদক তখনই তিনি বাস্তবিক কর্তা। অন্নসন্নিধানে বুভুক্ষু জীবের অন্নের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে অন্নভোজনকর্মের প্রেরণা আসে। অন্নরূপ অধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে কেহ ভোজনের জন্য চর্বণাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কর্তার যখন এই জ্ঞান হয় তখন তাঁহাকে পরিজ্ঞাতা বলা যায়। পরিজ্ঞাতার যাহা জ্ঞেয় বিষয়বস্তু তাহাই অধিষ্ঠান। ১৮ শ্লোকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতাকে ত্রিবিধ কর্মচোদনা অর্থাৎ কর্মপ্রেরণার ত্রিবিধ অঙ্গ বলা হইয়াছে। পরিজ্ঞাতা, অধিষ্ঠান অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়বস্তু এবং সেই জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই তিনের সংযোগে কর্তার মনে কর্মপ্রেরণা জাগে ও তৎফলে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। কোন বিশেষ কর্মের অনুষ্ঠানকালে তদনুযায়ী যে বিশেষ শারীরিক, বাচনিক বা মানসিক ক্রিয়া দেখা যায় তাহা ১৪ শ্লোকে চেষ্টা নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্মসম্পাদন কালে যেমন একজন কর্মসম্পাদক কর্তার ও তাঁহার চেষ্টার আবশ্যক তদ্রূপ করণেরও আবশ্যক। লক্ষ্যবেধ উদাহরণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং ধনুঃশর প্রভৃতিকে পৃথগ্‌বিধ করণ বলা যায়। কর্মসম্পাদকরূপী কর্তা, কর্মচেষ্টা ও করণের সংযোগে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এ জন্য এই তিনকে ১৮ শ্লোকে কর্মসংগ্রহ বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে কর্মসংগ্রহের অঙ্গ হিসাবে কর্মসম্পাদককে কর্তা নামে এবং কর্মচেষ্টাকে কর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কর্মচেষ্টাও যে কর্ম তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শংকর ১৮ শ্লোকের এই কর্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন যাহা কর্তার অত্যন্ত অভিলষিত এবং যাহার জন্য ক্রিয়া। আবার পরবর্তী ১৯ শ্লোকে যেখানে কর্মের গুণভেদের উল্লেখ আছে সেখানে শংকর কর্মশব্দের ক্রিয়া অর্থই ধরিয়াছেন। আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে যে ১৮ ও ১৯ দুই শ্লোকেই ক্রিয়া অর্থেই কর্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। চেষ্টাজনিত কর্মেরই গুণভেদে মূল কর্মের ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হয়। কি প্রকার মনোভাব লইয়া চর্বণ, গলাধঃকরণ ইত্যাদি চেষ্টাকর্ম করি তাহারই উপর ভোজনরূপ মূল কর্মের সাত্ত্বিকাদি ভেদ নির্ভর করে। এ জন্য চেষ্টাকর্ম অনাসক্ত ভাবে আচরণীয় বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধ গুণভেদ বিচার করিয়াছেন। কর্মের পঞ্চ কারণ সমষ্টির মধ্যে অধিষ্ঠান, করণ ও দৈবের গুণভেদ আলোচিত হয় নাই। অধিষ্ঠান বা বিষয়বস্তু নিজে বন্ধন বা মোক্ষের কারণ নহে কিন্তু কর্তা যে ভাবে অধিষ্ঠানকে দেখেন তাহাতেই বন্ধন বা মুক্তি হয়। এ জন্য জ্ঞেয় বা অধিষ্ঠানের গুণ আলোচিত না হইয়া তাহার ও কর্তার সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহারই সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ দেখান হইয়াছে। কর্তারও গুণভেদ বিবৃত হইয়াছে কিন্তু করণের হয় নাই। করণেও নিজস্ব বন্ধনমুক্তি নাই। যে ভাবে করণের প্রয়োগ হয় অর্থাৎ যে ভাবে বা যে বুদ্ধিতে কর্মচেষ্টা হয় তাহাই বন্ধন বা মোক্ষের হেতু এ জন্য চেষ্টাকর্মের গুণভেদ বর্ণিত হইয়াছে। কর্মচেষ্টার গুণভেদ দ্বারাই মূল কর্মের গুণভেদ নিরূপিত হয়। অন্নভোজনরূপ মূলকর্ম অনুষ্ঠানের তারতম্য অনুযায়ী সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক হইতে পারে। যে মনোভাব লইয়া আমরা ভোজনচেষ্টা অর্থাৎ আহার্য সংগ্রহ, খাদ্য গ্রহণ, চর্বণ, আস্বাদন, গলাধঃকরণ ইত্যাদি করি তাহার দ্বারাই মূল ভোজনকর্মের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। নিম্নের নির্লেখে কৃষ্ণকর্তৃক উপদিষ্ট কর্মতত্ত্ব সুগম হইবে।

কর্মতত্ত্ব নির্লেখ

মূল কর্ম		কর্মসিদ্ধির কারণসমষ্টি				
	শারীরিক		অধিষ্ঠান	=	জ্ঞেয়	কর্মচোদনা
	বাচনিক				জ্ঞান*	কর্মচোদনা
	মানসিক		কর্তা	=	পরিজ্ঞাতা	কর্মচোদনা
					সম্পাদক কর্তা*	কর্মসংগ্রহ
			করণ	=	করণ	কর্মসংগ্রহ
			চেষ্টা	=	কর্ম*	কর্মসংগ্রহ
			দৈব			

* জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম এই তিনের গুণভেদ বর্ণিত হইয়াছে

জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক প্রকার ভেদ বলিতেছেন।

॥ ২০ - ২৮ ॥ যে জ্ঞানের দ্বারা পরস্পর ভিন্ন সর্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যয় ভাব দেখা যায় সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে কিন্তু যে জ্ঞান সর্বভূতের পৃথগ্‌বিধ নানাভাব পৃথক্ ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সত্তারূপে উপলব্ধি করায় সেই জ্ঞান রাজসিক জানিবে এবং যে জ্ঞান অহৈতুক আসক্তিবশত কোন এক বিষয়কে তাহাই সর্বস্ব এরূপ মনে করায় এবং যাহা বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ এবং অল্প অর্থাৎ যে জ্ঞান আংশিকমাত্র তাহা তামস জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। যে নিয়ত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম আসক্তিরহিত চিত্তে রাগদ্বেষবিবর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা যায় কিন্তু ফলকামনার সহিত অথবা আমি করিতেছি এই ভাবের সহিত বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্‌সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যত্তু কামেপ্‌সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্‌সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮

পরিণাম, ক্ষতির সম্ভাবনা, পরের কষ্ট ও নিজের ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া যে কম আচরিত হয় তাহা তামস বলিয়া উক্ত। আসক্তিরহিত, আমি কর্তা এই ভাবশূন্য, ধৃতি এবং উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্তা সাত্ত্বিক কর্তা। অনুরাগযুক্ত, ফললাভে আগ্রহান্বিত, লোভী, পরপীড়াকারী, অপবিত্রস্বভাব, হর্ষশোকযুক্ত কর্তা রাজস কথিত হয়। অস্থিরমতি, অসংস্কৃতস্বভাব, অনম্র, শঠ, পরদ্বেষী, অলস, উৎসাহহীন এবং দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস বলিয়া উক্ত **॥ ২০ - ২৮ ॥**

সাত্ত্বিক জ্ঞানের বিশেষ এই যে তাহা বিভিন্ন অনিত্য বস্তুতে এক অবিনাশী সত্তার সন্ধান দেয়। ধৃতি শব্দের অর্থ ১৩।৪-৬ ও ১৮।৩৩-৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

॥ ২৯ - ৩২ ॥ ধনঞ্জয়, বুদ্ধির এবং ধৃতিরও গুণানুসারে ত্রিবিধ ভেদ সম্যকভাবে পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি শুন। পার্থ, কর্তব্যে এবং অকর্তব্যে, ভয়ে এবং অভয়ে যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, অর্থাৎ কি কাজ করা উচিত ও কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত তাহা, স্থির করিতে পারে এবং যাহা কি কাজে বন্ধন ও কিসে মোক্ষ হয় তাহা জানে সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। পার্থ, যাহার দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এবং কর্তব্য এবং অকর্তব্য অনিশ্চিত ভাবে জানা যায় সেই বুদ্ধি রাজসী। পার্থ, যে বুদ্ধি তমের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ইহাই ধর্ম মনে করে এবং সর্ববিষয়ে বিপরীত দেখে সেই বুদ্ধি তামসী **॥ ২৯ - ৩২ ॥**

নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তির নাম বুদ্ধি। কোন বিষয়ে দুই বা ততোধিক সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে যে মনোবৃত্তির দ্বারা আমরা তাহাদের মধ্যে একটিকে বাছিয়া

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২

লই তাহার নাম বুদ্ধি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দদ্বয়ের অর্থ কর্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম হইতে বিরতি। কর্তব্য উপস্থিত হইলে যে কাজ করিতে হইবে এবং যে কাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে যে বুদ্ধি তাহা যথাযথ দেখাইয়া দেয় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নহে সে যদি যথাযথ নির্ণয় করিতে পারে তবে তাহার বুদ্ধিকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলা যাইবে। পিতা পুত্রকে বলিলেন, যাও, প্রতিবেশীর বাগান হইতে আম পাড়িয়া আন। এরূপ কর্ম অকর্তব্য জানিয়া পুত্র বিরত হইল। এ অবস্থায় পুত্রের কি কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ও কি কর্মে নিবৃত্ত থাকা উচিত তাহা যদি সে যথাযথ স্থির করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সেইরূপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কতটা বন্ধ বা মোক্ষের হেতু হইতে পারে তাহাও যদি সে জানে তবে তাহার বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কিরূপ ভাবে কর্তব্য কর্ম করিলে বন্ধন হয় এবং কিরূপ আচরণে বন্ধন হয় না, কিরূপ আচরণ মোক্ষের সহায়ক এ সমস্তই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি জানাইয়া দেয়। ভয়ে অভয়েও সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেয়। কাহারও কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল বা কোন আগন্তুক ভয় হইতে কেহ কাহাকেও অভয় দিল অথবা রাজা বলিলেন, তুমি গুপ্তচর হইয়া অমুকের গৃহে রাত্রে প্রবেশ কর, ধরা পড়িলেও তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, আমি অভয় দিতেছি, এ সকল ক্ষেত্রে কি করা উচিত ও কি বর্জনীয় ও সেইরূপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে বন্ধমোক্ষের সম্ভাবনা কিরূপ যে বুদ্ধি যথাযথ জানায় তাহা সাত্ত্বিকী। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি সর্বদা সমাজ ও মোক্ষাভিমুখী। অপর পক্ষে মোহ অর্থাৎ কোন কর্মে অযথা আগ্রহ সর্ববিধ তামসিক ব্যাপারের মূল হেতু। রাজসিক বুদ্ধি বন্ধমোক্ষের সম্ভাবনা দেখায় না এবং সকল ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তব্যা-কর্তব্যও স্থির করিতে পারে না।

॥ ৩৩ - ৩৫ ॥ পার্থ, যে ধৃতি অবিচলিত এবং যাহার দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সমত্ববুদ্ধি ও একাগ্রতার সহিত ধারণ করা যায় সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী কিন্তু,

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

অর্জুন, যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম, কাম এবং অর্থ ধারণ করা হয় এবং আসক্তিযুক্ত হইয়া পুরুষ ফলাকাঙ্ক্ষী হয় সেই ধৃতি রাজসী। দুর্মতিগণ যে ধৃতির বশে নিদ্রা ভয় শোক অবসাদ এবং মদভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, পার্থ, সেই ধৃতি তামসী ॥ **৩৩ - ৩৫** ॥

এখানে ৩৩ শ্লোকে ধৃতিকে যোগের দ্বারা ধারণ করার কথা আছে। এখানে যোগ অর্থে একাগ্রতা, সমত্ববুদ্ধি ও নির্লিপ্ত হইয়া কর্মের আচরণকৌশল। ধৃতি শব্দের অর্থ যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা আমরা মন, শরীরচেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গণকে কোন বিশিষ্ট আদর্শমতে চলিবার জন্য বিশেষভাবে সংহত করিয়া ধারণ করি। ১৩।৫-৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ধৃতির বশেই আমাদের জীবনের আদর্শ নিরূপিত হয়। রাজসিক ধৃতির সাহায্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম লাভ হয় অপর পক্ষে সাত্ত্বিকী ধৃতি মোক্ষলাভে প্রণোদিত করে। সাত্ত্বিকী ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষই জীবনের আদর্শ, তিনি এই উদ্দেশ্যেই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়সমুদায়কে একাগ্রচিত্তে নিয়োজিত করেন। তামসী ধৃতিযুক্ত মনুষ্যের আদর্শানুযায়ী চলিবার ফলে নিদ্রা, ভয়, শোক, অবসাদ ও মত্ততাই লাভ হয়।

॥ **৩৬ - ৩৯** ॥ ভরতর্ষভ, এখন আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিবরণ শ্রবণ কর। যাহাতে অভ্যাসবশে আনন্দ হয় এবং দুঃখনিবৃত্তি হয়, যাহা আরম্ভে বিষবৎ ও পরিণামে অমৃততুল্য সেই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। যাহা

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন হয় তাহা প্রথমে অমৃততুল্য এবং পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখ রাজস বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা আরম্ভে এবং পরিণামেও নিজের মোহজনক এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস বলিয়া কথিত **॥ ৩৬ - ৩৯ ॥**

১ সাত্ত্বিক সুখকে আরম্ভে বিষবৎ বলার অর্থ এই যে সাত্ত্বিক সুখলাভের চেষ্টা কষ্টকর, তাহাতে প্রথমাবস্থায় কোন সুখই নাই। অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে কষ্ট যাইয়া সুখ দেখা দেয়। সাত্ত্বিক সুখ সাধনসাপেক্ষ। এই সুখ রাজসিক সুখের ন্যায় বিষয়সংযোগে উৎপন্ন হয় না। ইহা বিষয়নিরপেক্ষ এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ অর্থাৎ বুদ্ধির নির্মলতা ও প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন এবং মন মধ্যে স্বতই স্ফুরিত হয়। তামস সুখ প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন। প্রমাদ অর্থে কতব্য কর্মে অনবধানতা।

॥ ৪০ - ৪৬ ॥ পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে এমন কোন সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণবন্ত বা প্রাণহীন পদার্থ নাই যাহা এই তিন প্রকৃতিজাত গুণ হইতে মুক্ত হইয়া বর্তমান থাকিতে পারে, আর দেবগণের মধ্যেও এমন কেহ নাই যিনি এই সকল গুণ হইতে মুক্ত। পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের এবং শূদ্রদিগের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত। মনোনিগ্রহ, বহিরিন্দ্রিয়দমন, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য স্বভাবজ ব্রাহ্মণকর্ম। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

পলায়ন না করা, দান এবং প্রভুত্বের ইচ্ছা স্বভাবজ ক্ষাত্রকর্ম। কৃষি পশুপালন ও রক্ষা, বাণিজ্য স্বভাবজ বৈশ্যকর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজ। মনুষ্য নিজ নিজ কর্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করে। স্বকর্মনিরত ব্যক্তি যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন। যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাঁহাকেই স্বকর্মের দ্বারা অর্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে ॥ **৪০ - ৪৬** ॥

স্বভাবজ গুণকর্মের হিসাবেই চাতুর্বর্ণ্য কল্পনা। ৪।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। নিজ স্বভাব ও সমাজানুমোদিত কর্মের নির্লিপ্ত অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হয়, অপর পূজা অর্চনা কিছু করিবার আবশ্যক নাই ইহাই বলা উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে।
স্বধর্মতৎপরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥ বিষ্ণু।৩।৮।১২ ॥

অর্থাৎ, হে ধরণীপতে, স্বধর্মে তৎপর হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তদ্দ্বারাই বিষ্ণুর আরাধনা করেন ইহা নিশ্চয়।

॥ **৪৭ - ৪৮** ॥ অল্প গুণ অথবা দোষযুক্ত স্বধর্মও সুসম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা মঙ্গলকর, আর স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করিয়া পাপ অর্জন হয় না। কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই। কারণ ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত থাকে সেরূপ সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত ॥ **৪৭ - ৪৮** ॥

যাহা হইতে কর্মবন্ধন উৎপন্ন হয় তাহাই দোষ। ১৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। স্বধর্ম কথার অর্থ স্বভাব ও সমাজ উভয়ের অনুমোদিত কর্ম বা ব্যবহার।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

২।৩১ ও ৩।৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের প্রকৃতিজাত স্বভাব এবং সামাজিক ব্যবস্থা দুইয়েরই উচ্চ আসন দিয়াছেন। ভগবান হইতেই সকল স্বভাবজ প্রকৃতির উৎপত্তি এ জন্য আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিজ প্রবৃত্তিবশে কাজ করিলে প্রবৃত্তির উৎপত্তিস্থল ভগবানে পৌঁছান যায়। স্বকর্মনিরত ব্যাধ, ধীবর, জল্লাদ প্রভৃতি ব্যক্তির প্রাণিহত্যায় পাপ হয় না এবং তাহারা স্বকর্মে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই মুক্তিলাভ করিতে পারে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত।

॥ ৪৯ - ৫০ ॥ সর্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, কামনাহীন ব্যক্তি সন্ন্যাসের দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন। কৌন্তেয়, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের যাহা পরা নিষ্ঠা সেই ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট বুঝিয়া লও **॥ ৪৯ - ৫০ ॥**

কর্মসিদ্ধির কথা ১৮।১৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির কথা বলা হইতেছে। কর্মের অনাচরণ নৈষ্কর্ম্য বা অকর্ম। ৪।১৮-২১ শ্লোকে অকর্মের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। ৩।৪ শ্লোকে আছে কর্মপরিত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্য হয় না এবং কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি হয় না। যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন তিনি মনুষ্যমধ্যে বিদ্বান। কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কোন বহির্বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হন না তিনি কর্মের মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই করেন না। এই অবস্থাই নৈষ্কর্ম্য ও ইহা আয়ত্ত হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিলাভ হয়। পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি মুক্তি নহে। মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ ইহার পরের অবস্থা। স্বধর্মের আসক্তিশূন্য আচরণে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিলাভ হয় ও তাহা হইতে ব্রহ্মলাভ হয়। কি প্রকারে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্মলাভই পরম উদ্দেশ্য ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাই পরা নিষ্ঠা। জিতাত্মা শব্দের অর্থ ৬।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

॥ ৫১ - ৫৫ ॥ শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধৃতির দ্বারা নিজেকে নিয়মিত করিয়া এবং রাগদ্বেষ বর্জন করিয়া, নির্জন দেশে অবস্থিত হইয়া, লঘুআহারসেবী সংযতবাক্-

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

কায়মানস নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া, মমত্বভাবশূন্য শান্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মত্বলাভের উপযুক্ত হন। ব্রহ্মের সহিত একীভাবে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করেন। ভক্তির দ্বারা আমার বিস্তার ও আমার স্বরূপ যথার্থ জানিতে পারেন এবং যথার্থভাবে জানিয়া সেই জ্ঞানের অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন ॥ **৫১ - ৫৫** ॥

জ্ঞানের অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন বাক্যের অর্থ এই যে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই তিনের লয়ের পর ব্রহ্মলাভ হয়। যতক্ষণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় থাকেন ততক্ষণ তিনি লভ্য নন।

শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্তচিত্তে স্বধর্ম পালন করিতে উপদেশ দিতেছেন। ফলাফলে সমজ্ঞান করিয়া, রাগদ্বেষ ও অহংকৃত ভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বধর্মসেবায় নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিলাভ হয়। সাধক তখন যদি পরমাত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া যোগাবলম্বনপূর্বক তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন তবে তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হয় ও সেই ভক্তি হইতে জ্ঞান ও তদনন্তর মুক্তি হয়।

ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ এই যে স্বধর্মনিরত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন ও তৎপরে পরিব্রাজক হইবেন। বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্যাকালে যোগ অভ্যাস করার বিধি আছে। ৫১-৫৫ শ্লোকগুলিতে ইহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

১৫ঙ ৫৬-৫৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করার পূর্বেও গৃহস্থাশ্রমে সর্বপ্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও বুদ্ধিযোগ সাহায্যে মুক্ত হওয়া যায়।

॥ ৫৬ - ৬৩ ॥ আমার আশ্রয় লইলে সর্বদা সকলপ্রকার কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তদ্বারা সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত মৎ-চিত্ত হও। মৎ-চিত্ত হইলে মৎপ্রসাদে সর্বপ্রকার দুর্গতি উত্তীর্ণ হইবে আর যদি তুমি আমি কর্তা এই ভাবের বশবর্তী হইয়া আমার কথা না শুন তবে বিনষ্ট হইবে। অহংকার আশ্রয় করিয়া যদি যুদ্ধ করিব না এই ভাব অর্থাৎ যদি মনে কর যুদ্ধ করিতে তোমার আগ্রহ নাই এবং যুদ্ধ না করা তোমার ইচ্ছাধীন তবে তোমার কর্তব্যবুদ্ধি মিথ্যাই হইবে কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে। কৌন্তেয়, মোহবশে যাহা করিবে না মনে করিতেছ নিজ স্বভাবজ কর্মের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া অবশ হইয়াই তাহা করিবে। অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে মায়ার দ্বারা যন্ত্রার্পিতের ন্যায় ঘুরাইয়া থাকেন। ভারত, সর্বভাবে তাঁহারই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি ও শ্বাশত স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে বলিলাম, তাহা নিঃশেষ বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর **॥ ৫৬ - ৬৩ ॥**

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥ ৬১

স্বধর্মনিরত ব্যক্তি ধ্যানযোগের সাহায্য না লইয়াও বুদ্ধিযোগের দ্বারা মুক্ত হইতে পারেন তাহা ৫৬-৫৮ শ্লোকে বলা হইল। অর্জুনের যুদ্ধই স্বধর্ম এবং যুদ্ধে যোগদান তাঁহার কর্তব্য। যুদ্ধকার্যরূপ স্বধর্ম পালনের দ্বারা অর্জুনও মুক্তিলাভ করিতে পারেন এ কথা ৫৯-৬২ শ্লোকে বলা হইল। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে উপদেশ শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ বুদ্ধিমতে চলিতে বলিলেন। কৃষ্ণের উপদেশের এক প্রধান কথা বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ অর্থাৎ বুদ্ধির শরণ লও। পরিশিষ্টে 'গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় 'রাজবিদ্যা' দ্রষ্টব্য।

৫॥ ৬৪ ॥ সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনর্বার শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয় জানিবে সে জন্য তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ প্রিয় বলিলেন। ১৮।৬৯ শ্লোকেও তাঁহার প্রিয় ব্যক্তিদের কথা বলিয়াছেন। আবার ৯।২৯ শ্লোকে বলিয়াছেন আমি সর্বভূতে সম-ভাবাপন্ন, আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই কেহ প্রিয়ও নাই। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ পরস্পর বিরোধী উক্তিতে বাস্তবিক কোন অসংগতি নাই। যখন তিনি ব্রহ্মাত্মবোধে কথা বলিয়াছেন তখন তাঁহার প্রিয় দ্বেষ্য নাই বলিয়াছেন। যখন তিনি অর্জুনের সখা ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হিসাবে কথা বলিয়াছেন তখন তাঁহার উক্তিতে পরপ্রীতির কথা আসিয়াছে। উপনিষদে আছে

নহে এই আত্মা কভু লভ্য প্রবচনে,
নহে বা মেধায় বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে।
বরণ করেন যাঁরে তিনি শুধু পান,
তাঁহাকেই আত্মা নিজ মূরতি দেখান॥ মুণ্ডক।৩।২।৩॥

আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ যিনি আত্মদর্শনলাভের যোগ্য তাঁহাকে ভগবানের

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

প্রিয় বলা যায়। পরবর্তী দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গীতার সার মর্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

॥ ৬৫ - ৬৬ ॥ আমাতে মন নিবদ্ধ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যজনা কর, আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার প্রিয় তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমাকেই পাইবে। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, কোনপ্রকার দুঃখ করিও না আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব **॥ ৬৫ - ৬৬ ॥**

শ্রীকৃষ্ণ সামাজিক ধর্মকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এ কথা তাঁহার উক্তিতেই বার বার দেখা গিয়াছে কিন্তু সমাজধর্ম নিত্যবস্তু নহে। সমাজ পরিবর্তনশীল এ জন্য আজ যাহা ধর্ম বলিয়া পরিচিত কাল তাহা ধর্ম বিবেচিত না হইতে পারে। ব্রহ্মবিৎ পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হন। এজন্যই কৃষ্ণ বলিলেন সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও। কোন প্রকার সমাজধর্ম মানিও না কেবল ভগবানের শরণ লও বলিলে সাধারণ ব্যক্তির সমূহ অনিষ্ট হয়। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশকে গুহ্যতম বলিলেন এবং পরবর্তী শ্লোকে অনধিকারীকে তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন।

॥ ৬৭ - ৭২ ॥ তুমি কদাচ ইহা তপস্যাহীন ব্যক্তিকে, অভক্তকে, অশ্রবণেচ্ছুকে এবং আমার ছিদ্রান্বেষককে বলিবে না। যিনি আমার প্রতি পরাভক্তি করিয়া এই পরম গুহ্য কথা আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন তিনি নিশ্চয় আমাকেই পাইবেন এবং তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার প্রিয়কার্যকারী কেহই হইবেন না এবং পৃথিবীতে

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯

তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তরও কেহ হইবেন না। যিনি আমাদের এই ধর্মপ্রদ সংবাদ অধ্যয়ন করেন তাঁহার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে তৃপ্ত হই ইহা আমার মত এবং যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত অসূয়াহীন হইয়া ইহা শ্রবণ করেন তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মীদের উপযুক্ত শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হন। পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে কি। ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ সম্যক নষ্ট হইল কি **॥ ৬৭ - ৭২ ॥**

এই শ্লোকগুলি পাঠে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ হইবে। কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনকালে সঞ্জয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই পরে লিপিকর হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ৭৪-৭৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

॥ ৭৩ ॥ অর্জুন বলিলেন, অচ্যুত, আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতিলাভ হইয়াছে। আমি স্থির ও সন্দেহমুক্ত হইয়াছি। তোমার কথামত কাজ করিব **॥ ৭৩ ॥**

স্মৃতি অর্থে সমাজ ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যজ্ঞান। অর্জুনের মোহ যে পূর্বেই নষ্ট হইয়াছিল তাহা অর্জুন নিজেই ১১।১ শ্লোকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপদেশ শেষ করিয়া বলিলেন, কেমন আর কোন মোহ অবশিষ্ট নাই ত। উত্তরে অর্জুন বলিলেন, না, সব মোহ গিয়াছে, নিজ কর্তব্যও বুঝিয়াছি। ৭২-৭৩ শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ।

॥ ৭৪ - ৭৮ ॥ সঞ্জয় বলিলেন, আমি এই প্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শুনিয়াছিলাম। আমি এই পরম গুহ্য যোগ ব্যাস-

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকর্মণাম্॥ ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

প্রসাদে সাক্ষাৎ স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণকর্তৃক কথিত হইতে শুনিয়াছি এবং রাজন, কেশব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্যসংবাদ বার বার মনে পড়িতেছে এবং আমি মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি। রাজন, হরির সেই অতি অদ্ভুত রূপও পুনঃপুন স্মরণ করিয়া আমার মহাবিস্ময় হইতেছে এবং আমার বার বার পুলক সঞ্চার হইতেছে। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ সেখানে শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য এবং ধ্রুবনীতি, ইহাই আমার মত **॥ ৭৪ - ৭৮ ॥**

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮

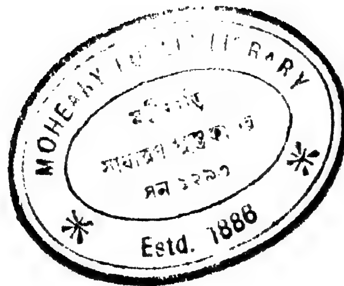
মোক্ষযোগ নামক
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট



পরিশিষ্টের প্রবন্ধসূচী

পত্রসংখ্যার পরিবর্তে অনুচ্ছেদসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে



১। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য

।১। গীতোক্ত প্রত্যেক মার্গের পৃথক আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের অধিকাংশই অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর। উভয়ের কথোপকথনে পর পর অর্জুনের মনে যে সব প্রশ্ন উঠিতেছে তাহাতে অস্বাভাবিকতা এবং অসংলগ্নতা কিছুই নাই। একাগ্রমনে গীতা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকের মনেও এই সব প্রশ্নই যথাক্রমে উঠিবে। আমি বিভিন্ন অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এই সকল প্রশ্নের পারম্পর্যের ধারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গীতাকার এত নিপুণভাবে এই প্রশ্নোত্তরমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে হঠাৎ মনেই হয় না যে অর্জুনের সমস্যাপূরণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে প্রশ্নোত্তর ছলে গীতাকার তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গগুলির আলোচনা করিতেছেন। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের মনের বিষাদ বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হইলেও ক্রূর কর্ম। অর্জুনের মনে সন্দেহ উঠিতেছে এরূপ ঘোর কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত কি না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে জ্ঞানীদের উপদেশ, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ও সমাজধর্মের আলোচনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বুদ্ধিযোগও এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞকথা ও স্বধর্মের বিবরণ আছে। সমাজধর্মের আচরণে ক্রূর কর্ম করিতে হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি ভাল কাজই কেন না করি এই প্রশ্নের উত্তরে যজ্ঞকথা ও স্বধর্মের বিচার স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। স্বধর্মপালনে ক্রূর কর্ম করিতে হইলে দোষ হয় কি না ইহার আলোচনায় কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্ম কি ইত্যাদি প্রশ্ন চতুর্থ অধ্যায়ে আসিয়াছে। দুষ্কর্ম হইতে ধর্ম কিরূপে রক্ষা পায় তাহার ব্যাখ্যায় অবতারবাদ আসিয়াছে, এবং পূর্বাধ্যায়ের যজ্ঞকথারও বিশদ আলোচনা আছে। কৃষ্ণ দেখাইলেন স্বধর্মানুমোদিত হইলে ক্রূর কর্মেও দোষ হয় না, অপর পক্ষে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত না

হইলে যজ্ঞরূপ ভাল কাজেও দোষ হয়। কি করিয়া এই দোষ কাটাইতে হয় কৃষ্ণ তাহা নির্দেশ করিলেন। ভাল, মন্দ ইত্যাদি সকল রকম কর্মেই যখন বন্ধন আসিতে পারে তখন কর্মের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই না কেন এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চম অধ্যায়ের অবতারণা। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস মার্গ আলোচিত হইয়াছে ও সেই সূত্রে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের কথা উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীদের কথা হইতে যতিদের কথা ও যতিদের কথা হইতে যোগীদের কথা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সহজভাবে উঠিয়াই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বক্তব্যের সূচনা করিয়াছে। কৃষ্ণ দেখাইলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী যোগীই হন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের (ইহাকে কর্মযোগান্তর্গত পাতঞ্জল মার্গ বলা যাইতে পারে) আলোচনায় আসন ইত্যাদি শারীরিক যোগ ও ধ্যান, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ এবং মানসিক যোগের বিবরণ আসিয়াছে। যোগীর তাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় ও আত্মদর্শন হয় ও তখন তিনি সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সম্পর্কেই সপ্তম অধ্যায়ের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা। কাপিল সাংখ্যোক্ত সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যেমন যজ্ঞ, সন্ন্যাস, যোগ ইত্যাদি প্রচলিত মার্গ ঈষৎ পরিবর্তিত পরিবর্জিত আকারে অনুমোদন করিয়াছেন, কাপিল সাংখ্যও সেইরূপ ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাপিল সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, জীব ও তৎসহ কৃষ্ণের যোজিত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ আসিয়াছে। তখনকার দিনে অধিভূতবাদ ইত্যাদি যে এক বিশেষ সাধনমার্গের অঙ্গ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭।৩০ ও ৮।২ শ্লোক দেখিয়া মনে হয় মৃত্যুকালে ব্রহ্মস্মরণ এই মার্গেরই এক অঙ্গ। মনে যে চিন্তা লইয়া মানুষের মৃত্যু হয় পরজন্মের গতি সেই অনুসারে হইয়া থাকে, এই বিশ্বাসও এই মার্গান্তর্গত। অন্তকালে যোগাসন আশ্রয় করিয়া ওঁকারের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগের উল্লেখ ইহার পরেই আসিয়াছে। এই উপায়ে দেহত্যাগের চেষ্টা এখনও যোগীদের মধ্যে দেখা যায়। অধিযজ্ঞবাদের বিচার ও ওঁকারের ধ্যান অষ্টম অধ্যায়ভুক্ত। ওঁকারের ধ্যানে পুনর্জন্ম হয় না ও সমস্ত জগৎ পুনরাবর্তনশীল এই কথায় (৮।১৫-১৬) পরবর্তী শ্লোকের অহোরাত্রবিদ্যার উল্লেখের সুবিধা হইল। শুক্লকৃষ্ণগতি, দেবযান পিতৃযান পথ ইত্যাদির কথা এই মার্গের পরেই উল্লিখিত হইয়াছে।

।২। অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়া নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোনীত মার্গের উপদেশ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে

শ্রীকৃষ্ণের নিজের মত পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি কোন বিশেষ মার্গকে একমাত্র মার্গ বলিয়া মনে করেন না। যে যে-মার্গের সাধক হউক শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত চলিলে তাহার তাহাতেই মুক্তি হইবে। কোন মার্গই পরিত্যাজ্য নহে। এই জন্যই নবম অধ্যায়ে সমস্ত মার্গের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমাতেই সমস্ত আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ নিজ নির্দিষ্ট উপায়কে রাজগুহ্য রাজবিদ্যা বলিয়াছেন। ইহা পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষবোধগম্য, ধর্মপ্রদ, সুখে প্রযোজ্য, অব্যয়, এবং স্ত্রী, শূদ্র, পাপী, পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে সকলের উপযোগী। শ্রীকৃষ্ণ যে নবম অধ্যায়ে তৎকাল প্রচলিত সমস্ত সাধনমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হঠাৎ বুঝা যায় না। ৯।৭ শ্লোকে অহোরাত্র-বাদের কথা আছে, ৯।৮-১০ শ্লোকে কাপিল সাংখ্যবাদ, ৯।১১ শ্লোকে অবতারবাদ, ৯।১২ শ্লোকে অধ্যাত্ম, অধিভূতবাদ, ৯।১৫-১৬ শ্লোকে বিবিধ যজ্ঞ, মন্ত্র, ঔষধ, ৯।১৭ শ্লোকে ওঁকারবাদ, ৯।১৯-২১ শ্লোকে বেদোক্ত দেবতাগণ, যজ্ঞ, স্বর্গ ইত্যাদি, ৯।২২ শ্লোকে ধ্যান, ৯।২৩-২৫ শ্লোকে অন্য দেবতা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা ইত্যাদি, ৯।২৬ শ্লোকে ফল পুষ্পাদি উপচারের দ্বারা পূজা, ৯।২৭-২৮ শ্লোকে সন্ন্যাস মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে।

।৩। নবম অধ্যায়ে সমস্ত মার্গগুলির আলোচনা শেষ না হওয়ায় ১০ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাকে আরও বলিতেছি শোন। ১০।৪-৮ শ্লোকে বিবিধ মানসিক সাধনা, যথা ক্ষমা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে এবং ১০।৯-১০ শ্লোকে ভক্তিবাদের কথা আছে। যে যে ভাবে বা যে যে বস্তুতে মানুষের ভগবদুপাসনার ভাব উদ্দীপিত হয় ১০।২০ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তাহার বিবরণ আছে। উপনিষদুক্ত আত্মা, বেদোক্ত রুদ্রাদিত্য প্রভৃতি এবং উপনিষদুক্ত ইন্দ্রিয়াদি দেবতা, বৃহস্পতি, স্কন্দ, ভৃগু প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিগণ, হিমালয়, গঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু, নানাবিধ গুণাবলী এই অধ্যায়ে উপাস্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে, তাবৎ উপাস্য পদার্থ সহিত সমগ্র বিশ্ব আত্মাতে অবস্থিত। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন এই সমস্তই কৃষ্ণের দেহে অবস্থিত দেখিতেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন আত্মাই যখন বিশ্বজগতের আধার তখন আত্মাতেই মনোনিবেশ কর। বিশ্বে আত্মদর্শন বা আত্মায় বিশ্বদর্শন উভয় উপায়েই মুক্তি সম্ভব। আত্মপ্রীতি বা আত্মরতিই প্রকৃত ভক্তি। কৃষ্ণভক্তি ও আত্মরতি একই কথা। কোথায় এই আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আত্মা শরীরবাসী, এ জন্য আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিলে আত্মদর্শন হয়।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত, এই জন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ, তমের আলোচনা।

। ৪ । পঞ্চদশ অধ্যায়ে কি করিয়া এক নির্লিপ্ত ব্রহ্মসত্তা বিস্তার লাভ করিয়া সংসার সৃষ্টি করিয়াছে, কি করিয়া নির্গুণ আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করে এবং কি করিয়া আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাহার বন্ধন মোচন হইতে পারে, তাহা আলোচিত হইয়াছে। কোনও ব্যক্তির কার্যাকার্য বিচার করিলে তাহার মোক্ষের সম্ভাবনা কতটা বলা যায়। এই সম্পর্কেই ১৬ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের আলোচনা। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণভেদে মানুষের একই কর্মের অনুষ্ঠানের বিশিষ্টতায় বিভিন্ন ফল হইতে পারে তাহা ১৭ অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠানের প্রকারভেদে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েরই হেতু হইতে পারে। ১৮ অধ্যায়েও ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদ দেখানো হইয়াছে এবং মানুষের পক্ষে কি প্রকার আচার কর্তব্য তাহা স্বধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। গীতার সার ধর্মোপদেশ ১৮ অধ্যায়ের ৬৫-৬৬ শ্লোকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুমোদিত নবম অধ্যায়ে আরব্ধ রাজগুহ্য রাজবিদ্যার ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন। এইখানেই গীতার উপদেশের সমাপ্তি।

২। গীতায় বিভিন্ন মার্গ

। ৫ । গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই অবতারবাদের কথা আসিয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গ আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়-সমূহে অন্যান্য বিবিধ মার্গ ও নানা প্রকারের ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই সকল বিভিন্ন নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত স্মরণ রাখিলে গীতার উপদেশের তাৎপর্য সুগম হইবে।

। ৬ । শিক্ষা দীক্ষা ও প্রবৃত্তিভেদে মনুষ্যের নানারূপ ধর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মে। সকল ব্যক্তির পক্ষে একই মার্গের ব্যবস্থা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অধিকারভেদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। হিন্দুধর্মের উদার উপদেশ এই যে তুমি যে কোন মার্গই অবলম্বন কর না কেন উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল মার্গেই কিছু না কিছু দোষ থাকিতে পারে কিন্তু অধিকারভেদ বিচার করিলে কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না।

গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন একটি বিশেষ মার্গ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। গীতাকারের মতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে সকল মার্গই অন্তিমে পরব্রহ্মে পৌঁছাইয়া দিবে। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদারতা অতুলনীয়। আধুনিক সমাজসংস্কারকগণ কোথাও কিছু দূষণীয় দেখিলে সেই প্রথার সমূল উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, মানুষ যে ভ্রান্ত আচরণ করে তাহার মূলে কোন না কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রেরণা আছে। এই জন্যই কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে উপদেশের দ্বারা বা বলপূর্বক নিরোধের দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস, তাহা অন্ধবিশ্বাসই হউক বা যুক্তিযুক্তই হউক, মানিয়া লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক মার্গের আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ এমনই সুনিপুণভাবে করিয়াছেন যে, সেই মার্গের দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাই সাধকের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিয়াছে; তন্মার্গাবলম্বীর আপত্তি করিবারও কিছুই রাখেন নাই। এই জন্যই গীতা সকল মার্গের উপাসকদিগের পক্ষেই আদরণীয়। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বাসের যে মূল্য আছে এবং তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে তাহার দ্বারাই মানুষ উন্নত হইতে পারে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম। কোন ধর্মমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আত্যন্তিক বিরোধ নাই। এ ভাবে সমাজসংস্কারের চেষ্টা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত উদারচেতা সংস্কারকও আর কেহই জন্মেন নাই।

। ৭। গীতাকার তৎকাল প্রচলিত প্রায় সকল মার্গেরই অল্পস্বল্প আলোচনা করিয়াছেন। এই জন্য গীতার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তৎকালে যে সকল মার্গ প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ও পরে প্রত্যেক মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামতের উল্লেখ করিব। ইহা পাঠ করিলে, পূর্বে যাহা বলিলাম, তাহার মর্ম পরিস্ফুট হইবে। আধুনিক যুগে জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিতেন। এমন কি সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম তাঁহার আলোচনায় বাদ যাইত না। কেন এ কথা বলিতেছি পরে তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুমান করা যায় যে তৎকাল প্রচলিত কোন বিশিষ্ট মার্গই গীতায় বাদ পড়ে নাই।

। ৮। গীতায় নিম্নলিখিত মার্গ ও ধর্মবিশ্বাসগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সাংখ্য-যোগ, সন্ন্যাস, কর্মযোগ, যোগ, যজ্ঞ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়সংযম, ইন্দ্রিয়নিরোধ, ব্রহ্মচর্য, কর্মসংযম, তপ, বেদপাঠ, প্রাণায়াম, উপবাস, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, দান, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, অবতারবাদ, পুনর্জন্মবাদ, ওঙ্কারের ধ্যান, অহোরাত্রবিদ্যা, অধ্যাত্ম-অধিভূত-

অধিদৈব-অধিযজ্ঞবাদ, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা, যক্ষপূজা, পত্র পুষ্প ফল জল ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ এবং রাজবিদ্যা।

। ৯। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহ বিচার করিলে অনুমান হয় যে তখনকার দিনে যজ্ঞেরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল এবং যজ্ঞকার্যে নানা রাজসিকতা ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। এই জন্যই কি করিয়া নিষ্কামচিত্তে যজ্ঞ আচরণ করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ বার বার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। দান ও তপস্যারও অপব্যবহার লক্ষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ, দান, তপকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন ও তাহাদের দোষ পরিহারের জন্য সাত্ত্বিকভাবে আচরণের উপদেশ দিয়াছেন। যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানের আচরণ প্রধান সাধনা হিসাবে তখন হইতে এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এই জন্য এই কয়টি কথার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। পূজা অর্চনা সমধিক প্রচলিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র এক শ্লোকে তাহার কথা শেষ করিয়াছেন। হঠযোগ প্রাণায়াম ইত্যাদির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনকার মত তখনও কেহ কেহ ধর্মানুষ্ঠান না করিয়া পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। তখনকার দিনে এমন কতকগুলি মার্গের প্রচলন ছিল যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, যথা অহোরাত্রবিদ্যা। তখনও লোকে ভূতপ্রেতের পূজা করিত। আশ্চর্যের বিষয়, অহিংসা পরম ধর্ম এই কথা গীতায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে গীতাকার ভূতপ্রেত পূজাও বাদ দেন নাই তিনি যে লোকপ্রচলিত থাকিলে এত বড় একটা কথা বাদ দিবেন তাহা মনে হয় না। ১৬।২ শ্লোকে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে শান্তি, পরনিন্দা বর্জন ইত্যাদি গুণের সহিত দৈবী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ উপদেশের মধ্যেও অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ দেখা যায়। গীতাকারের মনে এই সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মের কথা উঠিয়াছিল কি না বলা যায় না। তিলক বলেন, বৌদ্ধগ্রন্থের এই সব কথা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভজন নামগান ইত্যাদির বহুল প্রচার হইয়াছে। গীতায় এ সকলের উল্লেখ নাই।

২ক। ব্রহ্মলাভের দুই উপায়। সাংখ্যমার্গ ও যোগমার্গ

। ১০। ব্রহ্মলাভের দুই প্রকার উপায় প্রচলিত আছে। এক সাংখ্য ও অপরটি যোগ। সাংখ্যযোগ বা সংক্ষেপে সাংখ্য, কর্মযোগ বা সংক্ষেপে যোগ এই দুই

শব্দের উল্লেখ গীতার বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদিতে যে যোগ শব্দ আছে তাহার অর্থ উপায় বা প্রয়োগ, যথা, ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তি যেখানে সাধনের উপায়, ইত্যাদি। এই হিসাবে হঠযোগ ইত্যাদি যোগরূপ বিশেষ মার্গকে যোগ-যোগ বলা যাইতে পারে, যদিও এ কথার প্রচলন নাই। গীতাকার সাংখ্য এবং যোগ শব্দে ঠিক কোন কোন মার্গ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিচার্য। অধুনা সাংখ্য বলিলে লোকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমন্বিত কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রই বুঝেন, এবং যোগ বলিলে পাতঞ্জল যোগ বা হঠযোগ বুঝায়। গীতায় ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে কপিলের নাম করিয়াছেন এবং ১৩।৫ শ্লোকে কাপিল সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে; কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব ত্রিগুণবাদ শ্রীকৃষ্ণ মানিয়া লইয়াছেন। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সাংখ্য কাপিল সাংখ্য এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্য কথার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখা যায়, যথা, জ্ঞাতব্য পদার্থের যে শাস্ত্রে সংখ্যা বিচার হয় তাহাই সাংখ্য, এই অর্থে কাপিল সাংখ্যের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। আর এক ব্যুৎপত্তি, যাহাতে বস্তুতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব সম্যক্ খ্যায়তে অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, সেই শাস্ত্রই সাংখ্য। এই ব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা গণনার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। যে কোন দার্শনিক আলোচনাই এই হিসাবে সাংখ্যশাস্ত্র। এই ব্যুৎপত্তি মানিলে সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগের একই অর্থ হয়। কাপিল শাস্ত্রও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে কিন্তু তাহাই একমাত্র সাংখ্যশাস্ত্র নহে। শংকরাচার্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ সুবিধামত কোথাও প্রথম অর্থ কোথাও দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়াছেন। শংকরাচার্য সাংখ্যযোগ জ্ঞানযোগ ও সন্ন্যাসযোগের একই অর্থ করিয়াছেন।

।১১। শংকরাচার্যের সন্ন্যাস সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে শংকরাচার্য লিখিতেছেন, সাংখ্যানাং অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং, যাঁহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রাদির দ্বারা পরমার্থ তত্ত্বের সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকদিগকে সাংখ্য বলা হয়। ২।৩৯ শ্লোকের

ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে সাধারণ জ্ঞানিগণের উপদেশকেও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। গীতায় যে যে শ্লোকে সাংখ্য কথার উল্লেখ ও আলোচনা আছে সংক্ষেপে তাহার বিচার করিতেছি। ২।৩৯ শ্লোকে আছে, এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্য-শাস্ত্রানুযায়ী বুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম এইবার যোগানুযায়ী বুদ্ধির কথা শুন। পূর্বেই বলিয়াছি শংকরাচার্যের অর্থ না মানিয়া সাংখ্য শব্দে সাধারণ জ্ঞানী বুঝিলে তবে পূর্ব-শ্লোকগুলির সহিত সংগতি থাকে কারণ পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে সাধারণ জ্ঞানীদের উপদিষ্ট স্বর্গাদিলাভ ও ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতির কথা আছে। ৩।৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে সাংখ্য ও যোগ নামক দুই প্রকার নিষ্ঠা লোকে প্রচলিত আছে। তিনি মাত্র দুই প্রকার নিষ্ঠার কথাই বলিলেন অতএব বুঝিতে হইবে যে তাবৎ মার্গই এই দুইয়ের মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্গত। সাংখ্যকে কেবল কাপিল সাংখ্য বলিয়া ধরিলে অন্যান্য জ্ঞানমার্গের স্থান কোথায়। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানই সাধনা, যোগীদিগের কর্মই সাধনা। এখানে জ্ঞান কথায় সর্বপ্রকার জ্ঞান সূচিত হইতেছে কেবল সংখ্যাসূচক কাপিল শাস্ত্রই বুঝাইতেছে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা পরে করিতেছি। ৫।৪, ৫।৫ শ্লোকে বলিতেছেন যে দুই মার্গের একই ফল। এখানেও কাপিল সাংখ্য মাত্রই সূচিত হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। পরবর্তী শ্লোকেই সন্ন্যাসের সহিত যোগের তুলনা আছে কিন্তু এখানে সন্ন্যাসকে সাংখ্যান্তর্গত একটি বিশেষ মার্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়।

। **১২** । ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে আছে, কেহ ধ্যানের দ্বারা, কেহ সাংখ্যের দ্বারা ও কেহ কর্মযোগের দ্বারা আত্মার দর্শনলাভ করে। সাংখ্যকে কাপিল সাংখ্য বলিলে বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্র বাদ যায়। অতএব সর্বপ্রকার জ্ঞানশাস্ত্রই সাংখ্যের অন্তর্গত। এই শ্লোকে ধ্যানকে জ্ঞান বা কর্মমার্গের অন্তর্গত করা হয় নাই, তাহার পৃথক উল্লেখ আছে। কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন জ্ঞান ও কর্ম উভয় বিভাগেই ফেলা যায় সেইরূপ ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শনও উভয় মার্গেরই অন্তর্ভুক্ত। ধ্যানকে ক্রিয়া বলিয়া ধরিলে ধ্যান কর্মমার্গেরই একটি বিশিষ্ট পন্থা কিন্তু আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া আত্মদর্শন করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানেই আসিয়া পৌঁছিতে হয়। গীতাতে বহু স্থলে আছে যে বুদ্ধিযোগসমন্বিত কর্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন, জ্ঞান ও কর্ম উভয় মার্গের চরম

অবস্থা। এ কথা স্বীকার্য যে তাবৎ নিষ্ঠাকে জ্ঞান ও কর্ম এই দুই মার্গের মধ্যে ফেলিলে যুক্তিবাদীর কাছে ধ্যানকে স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

। **১৩**। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে আছে যে সাংখ্যকৃতান্তে কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮।১৯ শ্লোকে আছে, গুণসংখ্যানে গুণভেদ হিসাবে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার তিন তিন বিভাগ করা হয়। এই দুই শ্লোকের সাংখ্যকৃতান্ত ও গুণসংখ্যান কথার অর্থ অধিকাংশ ভাষ্যকার কাপিল সাংখ্য বলিয়া মনে করেন। কাপিল সাংখ্যে যে কোথাও কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণের উল্লেখ আছে বা ত্রিবিধ কর্তা ইত্যাদির বর্ণনা আছে আমার তাহা জানা নাই। এই সকল কথা যদি কাপিল শাস্ত্রে না থাকে তবে সাংখ্য অর্থে সাধারণ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কোন্ কার্যের কতগুলি কারণ আছে বা কোন্ বিশেষ পদার্থকে কয় ভাগে বিভাগ করা যায় তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, ইহার জন্য কাপিল সাংখ্যের সাহায্যের আবশ্যক নাই। অথবা ইহাও সম্ভবপর যে শ্রীকৃষ্ণের কালে সাংখ্যকৃতান্ত এবং গুণসংখ্যান নামে দুই পৃথক শাস্ত্র ছিল। কর্মসিদ্ধির যে পাঁচটি কারণ আছে তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধিতেই বুঝা যাইবে। ২।৪৭ এবং ১৩।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'সাংখ্য ও যোগ' প্রবন্ধে যে কয়টি শ্লোক আলোচিত হইল তাহা ব্যতীত গীতায় আর কোথাও সাংখ্য শব্দের উল্লেখ নাই।

। **১৪**। উপরি উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে সাংখ্যমার্গকে জ্ঞানমার্গ বলাই যুক্তিসংগত। কাপিল সাংখ্য এই জ্ঞানমার্গেরই অন্তর্গত। সাংখ্য ও যোগ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মরূপ সাধন গীতারও বহু পূর্ববর্তী কাল হইতে ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬।১৩ শ্লোকে আছে,

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

অর্থাৎ, যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনাশীলদের মধ্যে চেতনা, এক হইয়াও যিনি অনেকের কাম্য বস্তুসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগাধিগম্য সেই কারণরূপ দেবকে জানিলে সর্বপাপের মোচন হয়। কারণরূপ দেব ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার সাংখ্য ও যোগ এই দুই প্রকার সাধনের কথা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মলাভের সাধন কেন দুই প্রকার বলা হইল তাহা বিচার্য। জীব যতক্ষণ বহির্জগতের মায়ায় আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় না। বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে তাহা জীবকে আকৃষ্ট করে না ও তখনই ব্রহ্মদর্শনের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বহির্জগতের সহিত মনুষ্যের দুই প্রকার সম্বন্ধ বর্তমান, এক আদান ও অপরটি প্রদান। একটির দ্বার জ্ঞানেন্দ্রিয়, অপরটির দ্বার কর্মেন্দ্রিয়। বহির্জগৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং আমরা কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বহির্জগৎকে নিজ আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্রিয় যদি আমাদের বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করাইতে পারে তবে মন অন্তর্মুখ হইয়া ব্রহ্মদর্শন করায়। এই জন্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন সম্ভবপর। অপর পক্ষে যদি আমরা কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের স্বরূপ জানিতে পারি তাহা হইলেও বহির্জগতের সহিত সম্পর্কের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ও তখন ব্রহ্মদর্শন সম্ভবপর হয়। যে সমস্ত মার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য আছে সে সমস্তই সাংখ্যের অন্তর্গত। আর যাহাতে কর্মের প্রাধান্য আছে তাহাই যোগের অন্তর্গত। কর্মের দ্বারা আমাদের বহির্জগতের সহিত বস্তুগত সংযোগ হয় বলিয়াই এই মার্গকে যোগ বলা হয়। কাপিল সাংখ্য যেমন সাংখ্যমার্গের অন্তর্গত, সেইরূপ পাতঞ্জল যোগও যোগমার্গের অন্তর্গত। গীতায় পাতঞ্জলযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদি সমস্ত কর্মপ্রধান ব্রহ্মলাভের উপায়কে যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বহির্জগতের সহিত আদান প্রদানের যেমন দুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই, তেমনি ব্রহ্মলাভেরও দুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই। এই জন্য শ্বেতাশ্বতরে ব্রহ্মকে সাংখ্যযোগাধিগম্য বলা হইয়াছে।

। ১৫ । গীতায় যে সকল সাধনার উল্লেখ আছে তাহা জ্ঞান বা কর্মের প্রাধান্য হিসাবে এই দুই বিভাগে ফেলা যায়।

সাংখ্যমার্গ : সন্ন্যাস, কাপিল সাংখ্য, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, ওঁকারের ধ্যান, ধ্যান বা আত্মার স্বরূপ চিন্তন, অবতারবাদ, অহোরাত্রবিদ্যা, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবাদ।

যোগমার্গ : পাতঞ্জল যোগ, প্রাণায়াম, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য, তপ, বেদপাঠ, উপবাস, দান, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপ্রেত পূজা, পত্র পুষ্প ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ, রাজবিদ্যা।

সাংখ্য ও যোগমার্গান্তর্গত সাধনপদ্ধতিগুলির যে বিভাগ উপরে দেখান হইল তাহা নির্দোষ নহে। এমন অনেক মার্গ আছে, যথা, ইন্দ্রিয়সংযম বা ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার

যাহা দুই মার্গের মধ্যেই পড়িতে পারে। ধ্যান সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। সাংখ্য এবং যোগমার্গকে সাধারণ ভাবেই পৃথক বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন, অর্বাচীনগণই এই দুই মার্গের পার্থক্য দেখে, জ্ঞানিগণের নিকট এই দুই মার্গই এক ॥ ৫।৪-৫ ॥ কৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে কর্মানুষ্ঠানে যে জ্ঞান জন্মে তাহাতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞানেই মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি সাংখ্যলভ্য কিন্তু জ্ঞান কর্মলভ্য, অতএব এই দুই মার্গকে পৃথক করা যায় না। কর্ম নিঃশেষে বর্জন করিয়া কেবল জ্ঞানের চর্চা সম্ভবপর নহে ; জ্ঞানমার্গেও কর্মত্যাগ হয় না।

। ১৬। গীতায় যে সকল সাধনমার্গ বা ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে সেগুলি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

২খ। যজ্ঞ

। ১৭। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যজ্ঞই সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠান ছিল এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। যজ্ঞকার্যে নানারূপ তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ-পুন যজ্ঞকার্যে দোষ ও তাহা নিবারণের উপায় বলিয়াছেন। ৩, ৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৩ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় যজ্ঞের বিশদ বিবরণ দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তখনকার লোকে যজ্ঞকে সৃষ্টিচক্রের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত ও যজ্ঞ অবশ্যকর্তব্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্ঞের বিশেষ ভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ১৮।৫ শ্লোকে বলিতেছেন, যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহার অধিক যজ্ঞফল শ্রীকৃষ্ণ মানেন নাই। যজ্ঞের উপর তৎকালপ্রচলিত আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের একটা ব্যাপক অর্থ দিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩-৩৩ শ্লোকে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার কার্যকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেছেন। যজ্ঞের এই লক্ষণ মানিলে সাধারণে যজ্ঞকে অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়াও নিঃসংকোচে বৈদিক যজ্ঞ পরিহার করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞের প্রাধান্য দিয়াছেন। তামসিকতা নিবারণের জন্য ১৭ অধ্যায়ে যজ্ঞের শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্যই বার বার মুক্তসঙ্গ হইয়া যজ্ঞের আচরণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত মত পূর্ণভাবে মানেন নাই, পরিবর্তিত আকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

২গ। সন্ন্যাস

। ১৮। গীতায় বহু স্থলে সন্ন্যাসমার্গের বা কর্মত্যাগের উল্লেখ আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসমার্গের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বলিলে সাধারণত বুঝায় যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ও যিনি সর্বপ্রকার সামাজিক কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম বন্ধনমূলক ও তাহা মোক্ষ-লাভের অন্তরায় এই ধারণার বশেই সাধক সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করেন। শরীর-ধারণের জন্য যেটুকু কর্ম নিতান্ত আবশ্যক সন্ন্যাসী কেবল তাহারই আচরণ করেন। জ্ঞানচর্চাই তাঁহার একমাত্র সাধনা। শ্রুতি, মনুস্মৃতি, শ্রীভাগবত ও পুরাণাদি নানা হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানোদয়ে সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে সত্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন পূর্ণ কর্মসন্ন্যাস অসম্ভব। ইচ্ছা করি আর না করি শরীরযাত্রা সম্পর্কে নানাবিধ কর্ম আমাদের করিতেই হয়, অতএব কর্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া কর্মে আসক্তি ও কর্মের ফলত্যাগই শ্রেয়। শ্রীকৃষ্ণের মতে আসক্তি ও ফলত্যাগে কর্মের বন্ধন হয় না। এই অবস্থায় শরীরই প্রকৃতির বশে কর্ম করিতেছে এবং আত্মা নির্লিপ্তই আছে এই ধারণা জন্মে। জনকাদি কর্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও স্বধর্মত্যাগের আবশ্যক নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্মসন্ন্যাসকে স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, কারণ তিনি কোন মার্গের প্রতিই দ্বেষযুক্ত নহেন কিন্তু তিনি কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসের এক অভিনব সংজ্ঞার্থ দিয়া তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। যে কর্মের আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম করে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এইরূপ সন্ন্যাসই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত।

২ঘ। বুদ্ধিযোগ

। ১৯। বুদ্ধিযোগ কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। কর্মপ্রধান সকল মার্গেই বুদ্ধিযোগ প্রযোজ্য। যে বুদ্ধিতে কর্ম করিলে বন্ধন হয় না তাহাই বুদ্ধিযোগ। কর্মের ফল যখন আমাদের আয়ত্ত নহে তখন ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গচিত্তে কর্ম করার নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যাত রাজবিদ্যার অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের মতে যে কাজই কর না কেন বুদ্ধিযুক্ত হইয়া করা উচিত। মানুষ সাধারণত যে কাজ করে তাহা ফললাভের আশায় করিয়া থাকে। ফললাভের অনিশ্চয়তা তাহার মনে উঠে না। যে কাজে ফললাভ হইতেও পারে নাও পারে এরূপ মনে হয় সেখানে

কর্মে অনেকটা নির্লিপ্ত ভাব আসে। মানুষ কর্তব্যবোধেই এরূপ কাজে সাধারণতঃ প্রবৃত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে নিরাশাজনিত কষ্ট ইত্যাদি মানুষকে পীড়িত করে না। কোন ব্যবসায়ীর বিল-সরকার টাকা আদায়ের জন্য তাগিদ করিয়া বিফলমনোরথ হইলে নিরাশ হয় না, তাহার কর্তব্য সে করিয়াছে, ফললাভ হয় নাই তাহাতে তাহার কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। বিল-সরকার কষ্ট না পাইলেও টাকা আদায় না হইলে তাহার ব্যবসায়ী মনিব কষ্ট পাইয়া থাকে, কারণ টাকা তাহার পাওয়া উচিত এবং সে তাহা পাইবেই এই ধারণার বশে সে তাহার কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। টাকার উপর আসক্তিই তাহার মনে এই প্রকার ধারণা জন্মাইয়াছে। আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা বিল-সরকারের মত প্রকৃতির দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছি এই বুদ্ধিতে ও কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম করিতে পারি তবে আমাদের কর্মের বন্ধন হয় না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিযোগ। আধুনিক theory of probability বা সম্ভাব্যগণিতের সূত্র এই উপদেশই দেয়। কোন কার্যেই পূর্ণ নিশ্চয়তা নাই। কাল সূর্য উঠিবে ইহাও স্থিরনিশ্চয় বলিতে পারা যায় না, কেন না কোন ব্যাপারেরই সমস্ত কারণগুলি আমরা জানিতে পারি না। কতকগুলি কারণ unknown বা অদৃষ্ট থাকিয়াই যায়। গীতায় ১৮।১৪ শ্লোকে এইরূপ কারণসমষ্টিকে দৈব বলা হইয়াছে। সম্ভাব্যগণিত বলিতে পারে কোন্ কার্যের ফললাভের সম্ভাবনা বেশী, কোন্ কার্যের কম। ফলাফলের নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভবপর নহে, কারণ কার্যের সকল কারণ আমাদের আয়ত্ত নহে। যে বিদ্বান্ সম্ভাব্যগণিতের সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তিনি বুদ্ধিযোগই অবলম্বন করেন। এরূপ ব্যক্তির কর্মে নির্লিপ্তি বা অসঙ্গ জন্মে ও ফলাফল সম্বন্ধে তিনি ক্রমে উদাসীন হন। পরিশিষ্টে রাজবিদ্যা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৬। প্রাণায়াম ও অন্যান্য যৌগিক সাধনা

।২০। মহাভারতের যুগে যোগসাধনা বহু অনুষ্ঠিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সাধনার বিচার করিয়াছেন। পাতঞ্জলযোগ এই মার্গের অন্তর্গত। গীতায় দুই প্রকার যোগের উল্লেখ আছে, এক শারীরিক ও অপরটি মানসিক। শ্রীকৃষ্ণের মতে এই দুই যোগের ফল একই প্রকার। তিনি আরও বলেন যে যাহা সন্ন্যাস বস্তুত তাহাই যোগ। শারীরিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যোগী নির্মল স্থানে স্থির অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ পশুচর্ম ও বস্ত্র উপরি উপরি

বিছাইয়া আপনার আসন স্থাপন করিবেন। সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ মস্তক গ্রীবা ঋজু ও স্থির রাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হইবেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগসাধনার অনুরূপ পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে। গীতায় কোন কষ্টকর যোগাসনের উল্লেখ নাই। অনেক যোগী বহু আয়াসলব্ধ কষ্টকর আসনে যোগ অভ্যাস করেন ও নানাপ্রকার কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার কঠোরতার বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন অতিভোজী এবং একান্ত অনাহারীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অতিনিদ্রাশীল ও অতিজাগ্রতেরও নয়। উপযুক্ত আহারবিহারশীল, কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাসম্পন্ন ও উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণশীল পুরুষের যোগ দুঃখনাশক হয়। শ্রীকৃষ্ণ যোগের যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সকলেরই আয়ত্ত। মানসিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধৃতিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিবে। যে যে বিষয়ে মন ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আপনার বশে আনিবে। এই উপায়ে সিদ্ধি হইবে। মানসিক যোগই ধ্যান। মানসিক যোগে কোন আসনের উল্লেখ নাই। এখনকার মত পুরাকালেও সাধারণের ধারণা ছিল যে একবার যোগ-সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে বিচলিত হইলে বা সাধনায় ত্রুটি থাকিলে সাধকের নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তাঁহার নির্দিষ্ট যোগপদ্ধতিতে এরূপ কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য সাধন মার্গের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ যোগের দোষ বর্জন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ববিধ কঠোরতা পরিত্যক্ত হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়াছে।

।২১। আশ্চর্যের কথা এই যে ৬ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যৌগিক মার্গের আলোচনা করিলেও প্রাণায়ামের কোন উল্লেখ করেন নাই। ৪ অধ্যায়ে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ সাধনাকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেইখানে প্রাণায়ামের প্রথমোল্লেখ দেখা যায়। ৫ অধ্যায়ের শেষে যেখানে সন্ন্যাসীদের কথা হইতে যতিদের কথা আসিয়াছে সেইখানে তাঁহাদের সাধনা হিসাবে প্রাণায়ামের পুনরুল্লেখ হইয়াছে। ৪ অধ্যায়েও যতিদের কথার পরেই প্রাণায়ামের উল্লেখ আছে। যতিদের পরেই ৬ অধ্যায়ে যোগীদের কথা আসিয়াছে। সে জন্য মনে হয় যে, প্রাণায়াম যতি নামক সাধকদিগের বিশেষ সাধনাপদ্ধতি। যতি ও যোগী এক বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের

পার্থক্য কি আমি তাহা জানি না। প্রাচীনতর কালে বৈদিক সময়ে যতি নামক এক পৃথক সম্প্রদায় ছিল। বেদে তাহার উল্লেখ আছে। যতিগণকে স্থানে স্থানে ব্রাত্য ও অসংস্কৃত বলা হইয়াছে। যতিগণের সাধনা সকলে অনুমোদন করিতেন বলিয়া মনে হয় না কিন্তু তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। প্রাণায়াম যতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলে পরবর্তী কালে তাহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদাভিজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা সঠিক সংবাদ বলিতে পারিবেন।

২চ। তপ বা তপস্যা

।২২। কোন বস্তু বা বরপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃচ্ছ্র সাধনের নাম তপ বা তপস্যা। ভারতবর্ষে বহু পুরাকাল হইতে এখন পর্যন্ত তপস্যার প্রচলন আছে। এখনও জৈন সাধুগণ নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধনকে তপস্যা বলিয়াই অভিহিত করেন। গীতায় যজ্ঞ তপ ও দানের একত্র উল্লেখ বহু স্থানে আছে। যে যে কর্মে অনাচার ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ ১৭ অধ্যায়ে তাহাদের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যজ্ঞ তপ ও দান এই তিনেরই শ্রেণীবিভাগ দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শরীরকে কষ্ট দিয়া উৎকট তপের পক্ষপাতী নহেন। শরীর উৎপীড়নপূর্বক যে তপ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অসৎ বলিয়াছেন।

।২৩। গীতায় যেখানে যেখানে তপের উল্লেখ আছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই অন্য মার্গের তুলনায় তপকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ তপ দান এই তিন কর্মকে একই চক্ষে দেখিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যজ্ঞ দান তপ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই সত্য কিন্তু এই তিনেরই ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়া আচরণের দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এই তিন কর্মই চিত্তশুদ্ধির হেতু। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের ন্যায় তপেরও নূতন সংজ্ঞার্থ দিয়াছেন এবং ইহার শারীরিক বাচনিক ও মানসিক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই তিন বিভাগের কোনটিতেই শরীর ও মনের কষ্টদায়ক কোন পদ্ধতির কোন উল্লেখ করেন নাই। দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুভক্তি, শরীরের শুদ্ধি, সারল্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, শ্রুতিমধুর বাক্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, অন্তঃকরণের পবিত্রতা ইত্যাদিকে শ্রীকৃষ্ণ তপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২ছ। দান

। ২৪। গীতায় যজ্ঞ, তপ ও দানের একত্র উল্লেখ বার বার পাওয়া যায় এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। দানের একটা বিশেষ পুণ্যফল মানা হইত এবং এখনও হয়। পুণ্যকর্ম হিসাবে এখনও বহু লোক দান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই যে দান সৎপাত্রে পড়ে তাহা নহে। অসৎপাত্রে দানে সামাজিক অনিষ্টের সম্ভাবনা এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ ও তপের ন্যায় দানেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছেন। সাত্ত্বিক দানে চিত্তশুদ্ধি হয়।

২জ। অবতারবাদ

। ২৫। সময় সময় স্বয়ং ভগবান জীবমূর্তি ধারণ করিয়া ধর্মরক্ষাকল্পে জন্মগ্রহণ করেন এই বিশ্বাস বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যে জীবরূপে ভগবান আবির্ভূত হন তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলা হয়। ভগবানের অবতার সাধারণের পূজা পাইয়া থাকেন। রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার মানিয়া সাধারণে এখন পর্যন্ত তাঁহার পূজা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়। তিনি স্বয়ং অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভগবান নিজে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তিনি কি করিয়া বদ্ধ জীবের আকার ধরিয়া নিজেকে বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য শংকর বলিতেছেন, তিনি মায়াপ্রভাবে যেন দেহবান হন, যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যেন তিনি লোকনিবহের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন এইরূপে লোকে তাঁহাকে বুঝিয়া থাকে ॥ প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক অনূদিত ॥। শংকরব্যাখ্যাই অবতারবাদের সাধারণ প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা মানিলে বলিতে হয় তুমি আমি যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবে জন্মেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার জন্মই হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহই ছিলেন না। ভগবানের বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবে মহাভারতের যুগের ব্যক্তিগণের মনে হইত যেন বা শ্রীকৃষ্ণ আছেন যেন বা তিনি অর্জুনের রথ চালাইতেছেন যেন বা তিনি গীতার উপদেশ দিতেছেন, ইত্যাদি। এরূপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি সন্দেহ মনে উঠিবে। অদ্বৈতবাদীর মতে পরব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, তাঁহারই মায়াপ্রভাবে জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হয়। যখন জীবের মায়ানিবৃত্তি হয় তখন এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে চরাচর লীন হইয়া যায়। জীবের জন্মগ্রহণ মায়িক ব্যাপার মাত্র।

সাধারণ জীবের জন্মগ্রহণে ও অবতারের জন্মগ্রহণে মায়িক পার্থক্য কোথায় শংকরের ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার যে অন্য জীবের জন্মব্যাপার হইতে ভিন্ন এমন বলেন নাই। ৪।৬ শ্লোকে বলিতেছেন, আমি অজ শাশ্বত ও ভূতসমূহের ঈশ্বর হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ মায়া অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করি। ১৩।২ শ্লোকে বলিয়াছেন, আমাকেই সমুদয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। অতএব সকল ক্ষেত্রে ভগবানই জন্মগ্রহণ করেন। ১৩।২১, ২২, ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলিয়া পুরুষ পদার্থনিচয় ভোগ করেন ও জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু এই দেহে থাকিলেও তিনি দেহ হইতে ভিন্ন। তিনি অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ৪।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যিনি আমার দিব্য জন্মকর্মের তত্ত্ব অবগত হন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই পান। ৪ ও ১৩ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলির আলোচনায় বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার ও অন্য জীবের জন্মব্যাপার একই ভাবে দেখিয়াছেন। ৪।৫ শ্লোকে বলিতেছেন, অর্জুন, তোমার ও আমার অনেক বার জন্ম হইয়াছে কেবল পার্থক্য এই যে তোমার তাহা মনে নাই আমার আছে। অবতার না হইলেও জাতিস্মরতা সম্ভবপর, কাজেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অর্জুনের জন্মের অনুরূপ নহে প্রমাণিত হয় না বরং উভয়ের জন্মই একই প্রকারের ইহাই মনে হয়। এই শ্লোক মতে দশ বা নির্দিষ্টসংখ্যক অবতার কল্পনাও সমর্থিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিলেন তিনি অর্জুনের মতই বহু বার জন্মিয়াছেন। গীতা আলোচনায় মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ অবতারতত্ত্ব মানিতেন না। যিনি সমাজধর্ম রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই অবতার বলিয়াছেন। ৪ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে ইহা পরিস্ফুট করিয়াছি। অবতারতত্ত্বও তপ, যজ্ঞ ইত্যাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

২ঝ। কাপিল সাংখ্য

।২৬। কাপিল সাংখ্যবাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। অধুনা দার্শনিক তত্ত্ব বলিলে আমরা যাহা বুঝি গীতার বিজ্ঞান শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বিজ্ঞান মূলত কাপিল সাংখ্যবাদ, কেবল প্রভেদ এই যে কৃষ্ণ পুরুষ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মের অন্তর্গত স্বীকার

করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম উপনিষদের ব্রহ্ম। প্রকৃতি ও পুরুষ সমুদায় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়াশক্তি এবং প্রতি দেহস্থিত পুরুষ মূলত পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০

অর্থাৎ, মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ী অর্থাৎ যাঁহা হইতে মায়ার উৎপত্তি, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহার অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কাপিল সাংখ্যবাদকে এই প্রকার পরিবর্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের সহিত তাহার সমন্বয় করিয়াছেন।

।২৭। সপ্তম অধ্যায়ে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের আলোচনা আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহংকার ব্রহ্মোৎপন্ন প্রকৃতির এই অষ্ট বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি। জীবাত্মা বা কাপিল সাংখ্যের পুরুষ সমষ্টি ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতিই পরম ব্রহ্মের মায়াসম্ভূত। প্রকৃতির যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে সমস্ত বহির্জগৎ ও মানসিক ব্যাপারসমূহ তাহাদের অন্তর্গত। এই সমুদয় জড় পদার্থ। মন সূক্ষ্ম জড় বস্তুমাত্র। পুরুষই কেবল চেতনাশীল এবং তাঁহারই চেতনায় এই সমস্ত উদ্ভাসিত হয়। সাংখ্যোক্ত বর্গীকরণের কথা ১৩।৫ শ্লোকে আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বর্গীকরণ মানিয়া লইয়াছেন। গুণত্রয় বিভাগ কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব। সত্ত্ব, রজ ও তমের বিস্তারিত আলোচনা গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে। এই গুণত্রয়কে ভিত্তি করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপারের ভাল মন্দ বিচার করিয়াছেন। ত্রিগুণতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের কষ্টিপাথর। শ্রীকৃষ্ণ কাপিল সাংখ্যের দ্বারা যে সমধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

২এঃ। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ ও ওঁকারোপাসনা

।২৮। গীতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব ৩১৪ অধ্যায়, অশ্বমেধপর্ব ৪২ অধ্যায়, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় ১ম, ২য় খণ্ড ও তৃতীয় অধ্যায় ১৮ খণ্ড, তৈত্তিরীয় প্রথম বল্লী, কৌষীতকি চতুর্থ অধ্যায়, তত্ত্বসমাস সপ্তম সূত্র ইত্যাদি বহু স্থানে অধিভূত, অধিদৈবাদির আলোচনা আছে। অধিভূতাদি সাধনমার্গকে আমি সংক্ষেপে অধিবাদ বলিব। ওঁকারোপাসনা এই সাধনমার্গের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক মহৎ বস্তুসমুদয়কে পূজা করার প্রবৃত্তি আদিম

মনুষ্যের স্বভাবজ। অনুমান করা যায় সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, আকাশ ইত্যাদির পূজা এই প্রবৃত্তি হইতেই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যখন ঋষিদের মনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিল তখন কেহ বায়ু কেহ আকাশ কেহ আদিত্য কেহ কালকে ব্রহ্ম বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ বৃহৎ। যে বস্তু অন্য সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান বা যাহাতে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত তাহাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় অষ্টম খণ্ডে ঋষিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার অনুসন্ধানের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। সামের প্রতিষ্ঠা কি, এই লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ হইল। সামের প্রতিষ্ঠা স্বর, স্বরের গতি প্রাণ, প্রাণের গতি অন্ন, অন্নের জল, জলের স্বর্গলোক (পর্বত)।· অতএব স্বর্গই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্তা, স্বর্গকেই পূজা করিবে। প্রথম ঋষি এই পর্যন্তই জানিতেন। দ্বিতীয় ঋষি বলিলেন, পৃথিবীই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা, অতএব পৃথিবীকেই পূজা কর। তৃতীয় বলিলেন, পৃথিবী আকাশে অবস্থিত অতএব আকাশই পরমা গতি। ঋষিরা ক্রমে বুঝিলেন যে আকাশ, বায়ু, কাল ইত্যাদি বহির্বস্তুর কোনটাই বৃহত্তম সত্তা নহে। মানুষের আত্মাই এই সমুদায় ধারণ করিয়া আছে। তখন আত্মার সন্ধান চলিল। কেহ বলিলেন দেহই আত্মা, কেহ বলিলেন প্রাণ, কেহ মন, কেহ বুদ্ধি, অপরে বলিলেন ইহার কোনটাই আত্মা নহে। এই সকলের আশ্রয় যে সত্তা তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই সমস্ত চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ ইত্যাদি দেবতায় অবস্থিত অথচ এই সমূহ হইতে পৃথক, এই সমুদায় যাঁহাকে জানে না কিন্তু এই সমুদায় যাঁহার শরীর এবং যিনি ইহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইহাদের সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনিই মনুষ্যের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইত। দেবতা কথার অর্থ যাহা জ্যোতিষ্মান অর্থাৎ যাহা প্রকাশবান। যে গুণের জন্য পৃথিবী বা সূর্যের প্রকাশ আমরা বুঝিতে পারি সেই গুণই পৃথিবী বা সূর্যের অভিমানী দেবতা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশগুণ আছে বলিয়া তাহাদিগকেও উপনিষদের স্থানে স্থানে দেবতা বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য যাহার কথা বলিলেন তাহাকে অধিদৈবত বলা হইয়াছে। অনন্তর অধিভূত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি সর্বভূতে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা।

তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত। সমস্ত জড়পদার্থ অধিভূত কথার দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীকে সমষ্টিরূপে তাহার প্রকাশকত্ব গুণের জন্য দেবতা বলা হইলেও পৃথিবীর অন্তর্গত মৃত্তিকাদি সমস্ত জড়পদার্থ ভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। সমস্ত জীবশরীরও ভূতবর্গের অন্তর্গত। অনন্তর অধ্যাত্ম বিষয়ে বলিতেছেন, যিনি প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, শ্রোত্রে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, জীববীজে বা শুক্রে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন অথচ যিনি এই সকল হইতে পৃথক তিনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। তাঁহাকে কেহ জানে না কিন্তু তিনি সকলকে জানেন। সংস্কৃতে বিভিন্ন অর্থে আত্মা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা, (১) নিজ এই অর্থে, যেমন আত্মানং সততং রক্ষেৎ, নিজেকে সর্বদা রক্ষা করিবে ; (২) জীবাত্মা এই অর্থে, আত্মা, জীবাত্মা, কূটস্থ, অক্ষর সমার্থবাচক ; (৩) পরমাত্মা এই অর্থে, কখন কখন পরম বিশেষণ বাদ দিয়া আত্মা শব্দ প্রযুক্ত হয়, পরমাত্মা পরম অক্ষর সমার্থবাচক ; (৪) শরীর এই অর্থে এবং (৫) সমাসের অন্তে তদ্‌গুণান্বিত এই অর্থে যেমন পাপাত্মা। অধ্যাত্ম পদের অন্তর্গত আত্মা শব্দের অর্থ শরীর। উপনিষদে ও বেদে অনেক স্থলে শরীরকে আত্মা বলা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ প্রাণযুক্ত শরীর সম্বন্ধীয়। গীতায় সর্বত্রই এই অর্থে অধ্যাত্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক শব্দ আত্মা-সম্বন্ধীয় বা spiritual এই অর্থে প্রয়োগ হয়। গীতায় বা উপনিষদসমূহে এই অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। শাস্ত্রকারেরা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। অগ্নি, বায়ু, জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি জনিত কষ্ট আধিদৈবিক, জড়বস্তু ও অপরাপর জীব-শরীর হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা আধিভৌতিক এবং শারীরিক ও মানসিক রোগের কষ্ট আধ্যাত্মিক। যাজ্ঞবল্ক্য দেখাইলেন প্রাকৃতিক তাবৎ পদার্থের মধ্যেই আত্মার বা ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অধিবাদের বিশেষ এই যে দেবতা, ভূতগ্রাম, দেহাদির উপাসনা আদিম মনুষ্যের মনোবৃত্তির অনুকূল হইলেও জ্ঞানী তাহারই মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিতে পারেন।

।২৯। অধিবাদের 'অধি' কথার অর্থ বিচার্য। অধিরাজ বলিলে যেমন আমরা বুঝি যাহার অধীন অন্যান্য রাজারা আছেন সেইরূপ অধিদৈব বলিলে বুঝিতে হইবে যাহার অধীন দেবতারা আছেন। গীতায় ৮।৪,৫ শ্লোকে অধ্যাত্মকে স্বভাব বলা হইয়াছে। আত্মা অর্থাৎ প্রাণবান শরীর যাহার অধীন বা যাহার বশে চলে তাঁহাই

অধ্যাত্ম। প্রকৃতিজাত স্বভাবই শরীরকে চালায় এ কথা গীতার বহু স্থানে আছে। এ জন্য স্বভাবই অধ্যাত্ম। ভূতগ্রাম সমস্ত বিনাশশীল, এ জন্য তাহারা ক্ষর ভাবের অধীন। ক্ষর ভাবই অধিভূত। আদিত্য, পৃথিবী ইত্যাদি দেবতার প্রকাশগুণ শেষ পর্যন্ত মানুষের মনের সত্ত্বগুণের উপর নির্ভর করে। অন্তঃকরণের চিৎশক্তি তদাকারাকারিত হইয়া তাবৎ বস্তু প্রকাশিত করে। এ জন্য পুরুষই অধিদৈবত। ৮।৩ শ্লোকে কর্ম কথা আছে এবং তাহারই অধিষ্ঠান হিসাবে অধিযজ্ঞ কথা আসিয়াছে। এখানে সকল প্রকার কর্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারের যাহা হইতে উৎপত্তি তিনিই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞই যাজ্ঞবল্ক্যের অধিবাদের আত্মা। বাস্তবিক অধিদেবতাদিকে ইনিই নিয়মিত করিতেছেন।

। ৩০ । তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১ম বল্লী ৭ অনুবাকে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। ৮ম অনুবাকে এই সমস্ত উপাসনার বিষয়ীভূত ওঁকার উপাসনার বিধান আছে এবং ৯ম অনুবাকে নানাবিধ কর্তব্য কর্ম ও যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতাতেও ওঁকার উপাসনা ও কর্মরূপ যজ্ঞের কথা অধিবাদের সহিত জড়িত আছে (৮।৩,৪,১৩)। উপনিষদে উল্লেখ না থাকিলেও গীতাপাঠে বুঝা যায় যে তৎকালীন অধিবাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে মরণকালে ওঁকারের স্মরণ করিলেই মুক্তি হয়। মৃত্যুকালে যে চিন্তা লইয়া মনুষ্য ইহলোক পরিত্যাগ করে পরলোকে তাহার তদনুযায়ী গতি হয়। অর্থাৎ সারাজীবন পাপ করিয়া মরণকালে ওঁকার ধ্যান করিলেই মুক্তি কিংবা সারাজীবন ধর্মানুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুকালে যদি কোন পাপচিন্তা মনে উদিত হয় তবে জীব অধমগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের এই অদ্ভুত মত সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি ৮।৫,৬ শ্লোকে অধিবাদের এই মত উদ্ধৃত করিয়াই ৭ম শ্লোকে বলিলেন, অতএব সর্বেষু কালেষু অর্থাৎ সব সময়েই আমার প্রতি মন নিবিষ্ট কর, মন যাহাতে অন্য দিকে না যায় তাহার অভ্যাস কর ॥ ৮।৮ ॥ এখনও মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইবার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা এই অধিবাদ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

। ৩১ । সাধকের পক্ষে সমস্ত চরাচর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁহার নিজ শরীর তাঁহার নিকট অতি বিশিষ্ট সত্তা। তাঁহার নিজের মন, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রত্যেকটিতে আমার নিজস্ব এই ভাব জড়িত থাকায় তিনি নিজেকে জগতের অন্য সমুদায় বস্তু হইতে পৃথক ভাবেন। অপরাপর

জীবশরীর, বৃক্ষ লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি সাধারণ বস্তু সমুদায় তাঁহার মনে কোন বিশেষ ভাবের উদ্রেক করে না কিন্তু আকাশ, বায়ু, বিদ্যুৎ, পর্বত, সাগর, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত করে। হিমালয়, সমুদ্র বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ ইহাদিগকে এক এক মহৎ সত্তা বলিয়া অনুভব করে ও তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য দেখে। উপরি উক্ত এই তিন বর্গের পদার্থ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের অন্তর্গত। ইহাদের লইয়াই সাধকের সমস্ত কর্ম। সাধকের নিকট ব্যক্ত চরাচর যে ভাবে প্রকটিত হয় অধিবাদ তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্ত চরাচরকে কাপিল সাংখ্যবাদীরা আর একভাবে দেখিয়াছেন। অধিবাদ ও সাংখ্যবাদে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গীতায় কাপিল সাংখ্যবাদের পরই শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের আলোচনা করিয়াছেন। অধিবাদে যজ্ঞ বা কর্মের কথা কেন আসিয়াছে তাহা উপরের আলোচনায় বুঝা যাইবে। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ইত্যাদি সমস্তই অধিযজ্ঞ বা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাকে ওঁকাররূপে ধ্যানের উপদেশ আছে। এত অক্ষর থাকিতে পরমাত্মাকে কেন ওঁকাররূপে ধ্যান করিতে বলা হইল তাহা বিচার্য।

। ৩২। গীতার ৮।১১ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শংকর বলিতেছেন, ওঁকার পরব্রহ্মের বাচক এবং প্রতিমাদির ন্যায় ওঁকার পরব্রহ্মের ধ্যেয় মূর্তি। যাহারা মন্দবুদ্ধি অথবা মধ্যমবুদ্ধি তাহাদের পক্ষে এই ভাবে ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। উত্তম অধিকারীর পক্ষে ওঁকারের ধ্যান শংকর অনুমোদন করেন না। প্রশ্নোপনিষদে আছে, যিনি এক মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দুই মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকেও পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যিনি তিন মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি প্রথমে সূর্যলোক প্রাপ্ত হন ও পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ও পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন। প্রশ্নোপনিষদের উপদেশের মর্ম এই যে সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তবে ওঁকারের উপসনায় ব্রহ্মদর্শন হয় নচেৎ নহে। ওঁকার দ্বারা পর ও অপর ব্রহ্ম উভয়কেই পাওয়া যায়। শংকর মতে পরব্রহ্মকে ওঁকার দ্বারা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাত্র।

। ৩৩। কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লী ১৫, ১৬ এবং ১৭ শ্লোকে আছে, সকল বেদ যে পদের কীর্তন করে, সকল প্রকার তপ যাঁহার কথা বলে, যাঁহাকে পাইবার জন্য

লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা এই ওঁ। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম পদার্থ, এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা কামনা করে সে তাহাই পায়। এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম। এই অবলম্বনকে জানিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়। প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে বলা হইয়াছে, যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও পরম ওঁকাররূপ সাধনের দ্বারা বিদ্বান তাহাই প্রাপ্ত হন। সমগ্র মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঁকারের মহিমাই কীর্তন করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি উপনিষদসমূহেও ওঁকার সম্বন্ধে অনুরূপ বাক্য আছে, বাহুল্য বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

। ৩৪। অনুমান করা যায়, বেদে ও উপনিষদে ওঁকারকে শ্রেষ্ঠ সাধন হিসাবে ধরা হইলেও পরবর্তী কালে সেই সকল উপদেশের মর্ম সম্যক উপলব্ধি না হওয়ায় ওঁকার সাধন মধ্যম ও নিম্ন অধিকারীর উপযুক্ত মনে করা হইয়াছিল। আজকাল আমরা 'হাঁ' বলিলে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে 'ওঁ' বলিলে তাহাই বুঝাইত। ওঁ শব্দ হইতেই হাঁ শব্দের উৎপত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে ওঁএর এই অর্থ পাওয়া যাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ॥ ১।১।৮ ॥ বলা হইয়াছে ওঁ এই অক্ষর অনুমতিজ্ঞাপক। যখন কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয় তখনই বলা হয় ওঁ। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহার উপাসনা করেন তিনি কাম্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন।

। ৩৫। ওঁকারের ধ্যান বলিলে কেবলমাত্র ওঁকাররূপ অক্ষরের মূর্তি ধ্যান বা প্রতিমারূপে ওঁকারের ধ্যান উদ্দিষ্ট হয় নাই। এই প্রকার ধ্যানে চিত্তশুদ্ধি হইবে সত্য কিন্তু যে কোন অক্ষরের ধ্যানেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে ওঁকার ধ্যান নিম্নাধিকারীর উপযুক্ত বলিতে পারা যায়। ওঁকারের দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহারই ধ্যান কর্তব্য। বাংলা হাঁ কথার ধ্যান বা কার্লাইলের everlasting yea এর ধ্যান ঋষিদের ওঁকার উপাসনার তুল্য। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার 'বেদপ্রবেশিকা' গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "আহাব সংজ্ঞক বেদমন্ত্র অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই; নিবিদ অপেক্ষাও প্রাচীন। যেমন বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনি স্তুতি পাঠকালে সমুদায় বেদমন্ত্রের মধ্যে আহাবের প্রাধান্য। কেন না, এই আহাবের মধ্যে 'ওঁ' এই শব্দ বিদ্যমান। এই শব্দটি স্বয়ং একটি মন্ত্র। একটি একাক্ষর মন্ত্র, ইহার পারিভাষিক নাম 'প্রণব'। ওঁ শব্দের আদিম অর্থ—হাঁ বা বটে। ইহাতে 'ভাব' এই অস্তিত্বের ধ্বনি পাওয়া যায়, অভাব

নিরাকৃত হয়। আস্তিক ব্রহ্মবাদিগণ আপনাদের মৌলিক বিশ্বাস সকল এই একাক্ষর প্রণবের দ্বারা প্রকাশিত করিতেন। পরমেশ্বর আছেন কি নাই? নাস্তিক বলিবেন 'ন'—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলিবেন 'ওঁ'। মানুষের মৃত্যু দেখিয়া লোকে যে তর্কবিতর্ক করে, জিজ্ঞাসা করে পরলোক আছে কি নাই? তদুত্তরে নাস্তিক বলেন 'ন'—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলেন 'ওঁ'। এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বুঝিবেন 'ওঁ' এই শব্দটি বেদের সার কি না। অবশেষে 'ওঁ' এই শব্দ রূপনামবিবর্জিত সত্তামাত্রজ্ঞেয় পরমাত্মার উৎকৃষ্ট নাম বলিয়া ঋষিসমাজে পরিগৃহীত হয়। 'ওঁ অর্থাৎ হাঁ আছেন বটে।' পরমাত্মা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে?"

ওঁকারের ধ্যান সচ্চিদানন্দের সৎরূপের ধ্যান। ঋষিবাদিগণ জগতের সর্ব পদার্থের সত্তার মধ্যে এই অবিনাশী ওঁকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন ও তাহারই ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন। ওঁকারকে কেবল পবিত্র অক্ষর বা ব্রহ্মের প্রতীক না ভাবিয়া তন্নিহিত অস্তিত্ব বা অনুমতি বা স্বীকৃতি এই ভাবগুলির ধ্যানে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি হইবে, ইহাই ঋষিদের উপদেশ। কঠ ঋষি ওঁকার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্ অর্থাৎ এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম।

২ট। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদ

। ৩৬ । গীতার ১৩ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদের বিবরণ আছে। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জীবাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ রাখিলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার বুঝা যাইবে। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মা জীবদেহেই অবস্থিত। জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হয় এবং এই জীবদেহই ক্ষেত্র, অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানেই মুক্তি। প্রাণবান শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে অধ্যাত্মজ্ঞান বলা হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান একই। ক্ষেত্র বা শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা, শারীরবৃত্ত (physiology), স্বাস্থ্যতত্ত্ব (hygiene), চিকিৎসাবিজ্ঞান (medicine) ইত্যাদি কিন্তু এই সকল জ্ঞান অপেক্ষা যে জ্ঞানের দ্বারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ বুঝা যায় সেই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

২ঠ। ক্ষর-অক্ষর বাদ

।৩৭। গীতায় গুণত্রয় বিচারের পর ১৫ অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর বাদ আসিয়াছে। গুণত্রয় হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুঝা চাই যে প্রকৃতিজ সমস্ত পদার্থই বিনাশশীল অর্থাৎ ক্ষরভাবাপন্ন। অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ ॥ ৮।৪ ॥, ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি ॥ ১৫।১৬ ॥, ক্ষরম্ প্রধানম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ১।১০ ॥ অর্থাৎ, প্রকৃতিজাত সর্ববস্তুকে ক্ষর বলা হয়। পুংলিঙ্গ ক্ষর শব্দ বা ক্ষর পুরুষ বলিলে জীবদেহ বুঝায়। জড়বস্তুর অভিমানী দেবতারাও ক্ষর পুরুষ। ব্রহ্মাও ক্ষর পুরুষ। ক্লীবলিঙ্গ ক্ষর শব্দে সমস্ত জড়বস্তু বুঝায়। জড়জীবদেহকে অনেক স্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম কথার আত্মা শব্দেরও এই অর্থ। মনুও শরীরকে ভূতাত্মা বলিয়াছেন ॥ ১২।১২ ॥ এ জন্য গীতাতে ত্রিবিধ পুরুষ উক্ত হইয়াছে, যথা, (১) ক্ষর পুরুষ বা জড়দেহ যাহাকে সাধারণে আমি বা আত্মা বলিয়া মনে করে। এই পুরুষ বিনাশশীল। (২) জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ। ইনি মায়ার দ্বারা দেহেতে আবদ্ধ এবং (৩) পরম অক্ষর বা পুরুষোত্তম যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন ও সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই তিন সত্তার কথা ঈষৎ ভিন্ন ভাবে শ্বেতাশ্বতরে ১।৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

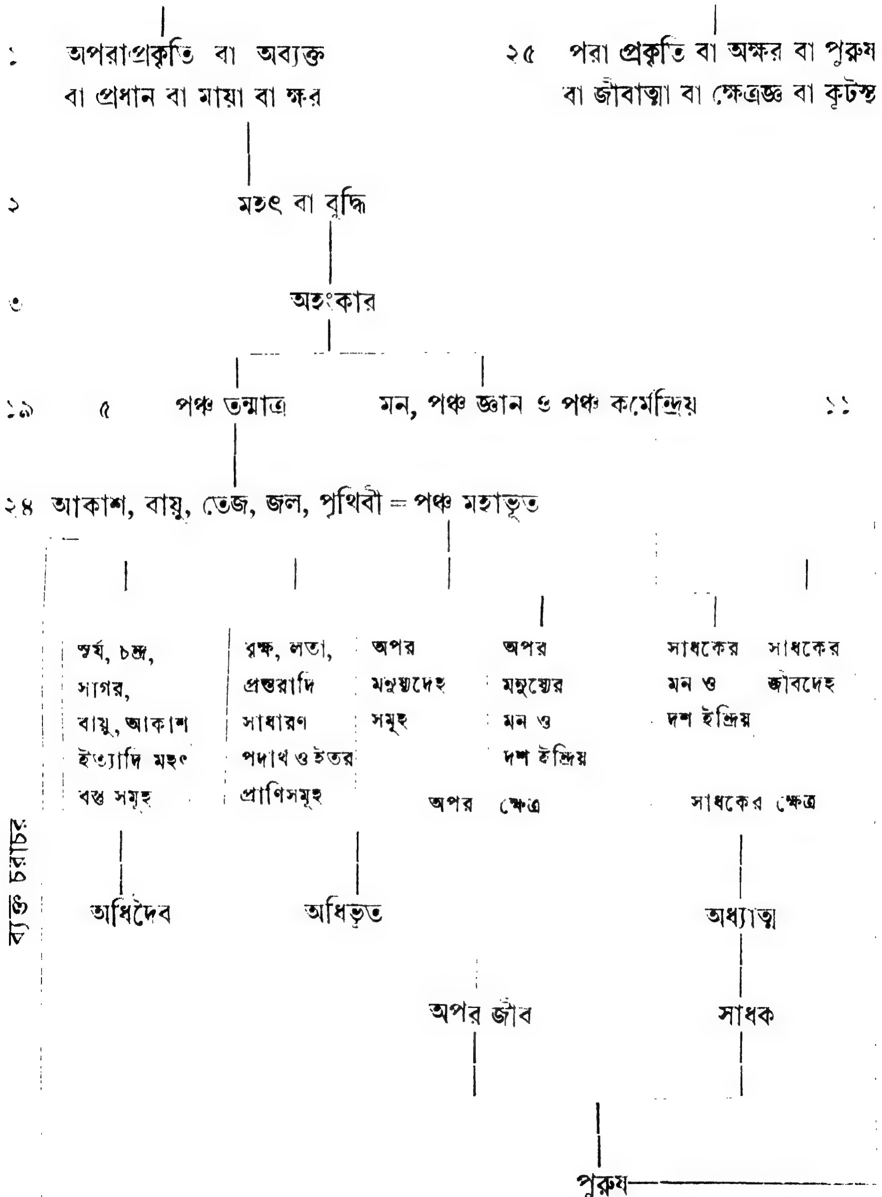
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥

অর্থাৎ, দুই অজ বা জন্মরহিত সত্তা আছেন। ইহাদের জ্ঞ ও অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এবং ঈশ ও অনীশ অর্থাৎ শক্তিশালী পরমেশ্বর ও শক্তিহীন মায়াবদ্ধ জীব বলা হয়। আর এক অজা বা জন্মরহিতা সত্তা আছেন ইনি ভোক্তার অর্থাৎ জীবের ভোগ্য বিষয় প্রদায়িনী (প্রকৃতি)। অনন্ত আত্মা (ঈশ) বিশ্বরূপ হইয়াও অকর্তা। এই তিনের (জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজা) উপলব্ধিতে ব্রহ্মলাভ হয়। পুনশ্চ, ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ। অর্থাৎ, ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা বা নিয়ন্তা এই তিনকে জানিলে ব্রহ্মলাভ হয় ॥ শ্বেতাশ্বতর ১।১২ ॥

২ড। গীতানুযায়ী সৃষ্টি ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান ক্রমণী

।৩৮। গীতোক্ত বিভিন্ন পারিভাষিক তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ-প্রকাশক একটি নির্লেখ (chart) দিলাম। পরিশিষ্ট ৭৫-৮৪ দ্রষ্টব্য।

গীতানুমোদিত সৃষ্টি ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নির্লেখ



২৮। অহোরাত্রবিদ্যা

। ৩৯। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে পর পর অহোরাত্রবিদ্যা ও শুক্লকৃষ্ণগতির আলোচনা আছে। এই দুই বিষয় একই মার্গের অন্তর্গত অথবা এই দুইটি বিভিন্ন মার্গ তাহা সঠিক বুঝা যায় না। বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় এই দুই মার্গ পৃথক। অধুনা এই দুই সাধনপদ্ধতি লোপ পাইয়াছে। অহোরাত্রবিদ্যা বলিলে ঠিক কি বুঝাইত আমার তাহা জানা নাই। অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই অহোরাত্রবিদ্যার বিবরণ লিখিতেছি। মহাভারতের শান্তিপর্বের ২৩১ অধ্যায়ে অহোরাত্র বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ৩০ অহোরাত্র বা দিবারাত্রিতে ১ মাস হয়, ১২ মাসে ১ সংবৎসর। ১ সংবৎসরে ১ দৈব অহোরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণের ৬ মাস দৈব দিন ও দক্ষিণায়নের ৬ মাস দৈব রাত্রি। ২০০০ দৈব বৎসরে (অর্থাৎ ৭২০০০০ মানব বৎসরে) ব্রহ্মার ১ দিনরাত্রি। ১০০০ দৈব বৎসরে ব্রহ্মার দিন ও ১০০০ দৈব বৎসরে ব্রাহ্ম রাত্রি। ইহাই সাধারণ জ্ঞানিগণের কালের পরিমাপক হিসাব ধরা হইত। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানী ছিলেন তাঁহাদের মতে ব্রাহ্ম দিন বা রাত্রির পরিমাণ ১০০০ দৈব বৎসর নহে পরন্তু আরও অধিক। ১২০০০ দৈব বৎসরে এক যুগ এবং এইরূপ ১০০০ যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা এক দিন অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ২০০০ যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র। এই শেষোক্ত জ্ঞানিগণকে অহোরাত্রবিৎ বলা হইত। গীতায় ইঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার দিনে জগৎ প্রকটিত হয় এবং ব্রাহ্ম রাত্রিতে সৃষ্টি লুপ্ত হয় এই ধারণা খুব সম্ভবত অহোরাত্রবিদ্যা হইতে আসিয়াছে। অনুমান করা যায় অহোরাত্রবিদেরা কালকেই ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ সত্তা বলিয়া মনে করিতেন। মহাভারতে অহোরাত্রবিবরণ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে 'কালকে ব্রহ্মস্বরূপে বিদিত হওয়া উচিত,' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ এই কালকেই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন।' উপনিষদের কোন কোন ঋষি কালকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরের ১।২ শ্লোকে দেখা যায় কেহ কালকেই জগতের চরম কারণ বলিতেন, কাহারও মতে পদার্থসমূহের স্বভাব দ্বারাই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অন্য কোন ব্রহ্ম-সত্তা নাই, কেহ বা নিয়তিকে চরম মনে করিতেন, অপরে মনে করিতেন জগতের পরম কারণ বলিয়া কিছু নাই, ঘটনাবলী সমস্তই আকস্মিক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে অহোরাত্রবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহার ধারা অন্যান্য সাধনমার্গের আলোচনার ধারার সহিত তুলনা করিলে মনে হইবে যে অহোরাত্রবিদেরা কালকেই চরম সত্তা মনে

করিতেন। ৮।১৯ শ্লোকে আছে যে ভূতগ্রাম অবশ হইয়াই জন্মায় ও লয় পায়। অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবা রাত্রি বা কালই নিয়ন্তা। অহোরাত্রবিদের মতে ব্রাহ্ম রাত্রিতে সমস্তই লয় পায়, কাল ব্যতীত কোন সত্তাই অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন অহোরাত্রবিদের অব্যক্তের পরবর্তী অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব বা সত্তা আছে তাহা সর্বভূত লয় পাইলেও বিনষ্ট হয় না। এই সত্তাই ব্রহ্ম। অব্যক্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অহোরাত্রবিদ্যার দোষ খণ্ডন করিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও ১।৩ শ্লোকে আছে, ধ্যানযোগের দ্বারা ঋষিরা দেখিলেন যে এক অদ্বিতীয় দেবতা কাল ইত্যাদি অন্য সমস্ত কারণকে নিয়মিত করিতেছেন।

২৭। শুক্লকৃষ্ণগতি

। ৪০। উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয় এবং তথা হইতে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় এই বিশ্বাস মহাভারতেরও বহু কাল পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি বহু স্থানে এই দুই গতির বর্ণনা আছে। জীবাত্মা কোন্ কোন্ পথ দিয়া চন্দ্রলোকে বা ব্রহ্মলোকে যায় তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। সকল গ্রন্থে এই পথের বিবরণ ঠিক এক প্রকার নহে। গীতায় ৮ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ ২৮ শ্লোক পর্যন্ত এই বিশ্বাসের আলোচনা আছে। শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিকে দেবযান ও পিতৃযান পথও বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা শুক্লকৃষ্ণগতিতে বিশ্বাসী দক্ষিণায়নে মৃত্যুর সম্ভাবনা তাঁহাদের মানসিক অশান্তির হেতু। কথিত আছে ভীষ্ম উত্তরায়ণের অপেক্ষায় অনেক দিন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যিনি যোগী, অর্থাৎ যিনি কর্মের কৌশল জানেন ও নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম করেন তিনি এই উভয় গতি জানিয়া মোহমান হন না, এ জন্য তিনি অর্জুনকে সর্বকালে যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। এই মার্গের আলোচনার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দান ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানে যত প্রকার লাভালাভ এবং পাপপুণ্যের ফলাফল কথিত হইয়াছে যোগী তৎসমুদয়কে অতিক্রম করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই যে শুক্লকৃষ্ণগতি ইত্যাদি বেদোক্ত নির্দেশে উদ্বিগ্ন হইও না, সর্বসময়ে নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম করিলে তোমার কোন চিন্তাই নাই, কোন্ সময় মরিব এই ভাবনায় বৃথা মোহমান হইও না।

। ৪১। শ্রীকৃষ্ণ শুক্লকৃষ্ণ গতিদ্বয় স্পষ্ট অবিশ্বাস না করিলেও তাহাদের বিশেষ কোন মূল্য দেন নাই। উত্তরায়ণেই যাহাতে মৃত্যু হয় তাহার চেষ্টা কর, এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। শুক্লকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন। এই বিশ্বাস যে বহু প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ এই মতকে শাশ্বত বলিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদও তাহাই বলিতেছেন। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শুক্লকৃষ্ণ গতির বর্ণনায় স্থান ও কাল উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয় মাস ইহারা শুক্লগতির পরম্পরা। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও চন্দ্রজ্যোতি কৃষ্ণগতির পরম্পরা। ছান্দোগ্যে এই দুই মার্গের আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। অর্চি পথ বা দেবযান পথ বা শুক্লগতির পরম্পরা, যথা, অর্চি হইতে দিন, দিন হইতে শুক্লপক্ষ, তৎপর উত্তরায়ণের ছয় মাস, তৎপরে সংবৎসর, তৎপরে আদিত্য, তৎপরে চন্দ্রমা, তৎপরে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ হইতে এক অমানব পুরুষ আত্মাকে লইয়া ব্রহ্মদর্শন করায়। পিতৃযান বা ধূমমার্গ বা কৃষ্ণগতির পরম্পরা, যথা, ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্রমা। এই চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া আত্মার কর্মক্ষয় হইলে তথা হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, তৎপরে অভ্র, তৎপরে মেঘ হইতে বারিপাতের সহিত পৃথিবীতে আসিয়া ব্রীহি, যবাদির সহিত পুরুষের মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হয় ও সেই পুরুষের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্যের বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে চন্দ্রলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি স্থানের সহিত মাস, বৎসর ইত্যাদি কালের কথাও বলা হইয়াছে। দেশ ও কাল ব্যতীত দেবযান ও পিতৃযান পথে অগ্নি ধূম প্রভৃতি বস্তু উল্লিখিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ব্যাখ্যাকারেরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য বলেন যে এখানে দেশ কাল পাত্র উদ্দিষ্ট না হইয়া তত্তৎ-অভিমানী দেবতাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ এই দেবতাগণই জীবাত্মাকে পর পর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যান। কোন কোন ব্যাখ্যাকার রূপক হিসাবেই এই বিবরণের অর্থ করেন। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার একটিও সন্তোষজনক নহে। তিলক বলেন, যে সময় আর্যদের পিতৃপুরুষেরা মেরুপ্রদেশে বাস করিতেন শুক্লকৃষ্ণ মার্গের বিশ্বাস সেই সময়কার। কারণ একমাত্র মেরুপ্রদেশেই উত্তরায়ণের ছয় মাস দিন বা শুক্লজ্যোতিসম্পন্ন ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস ধূম বা অন্ধকারময়। সেই যুগেই উত্তরায়ণে মৃত্যু প্রশস্ত বলিয়া মনে করা হইত। এই ব্যাখ্যাতেও দেবযান পিতৃযানের সমস্ত

সমস্যার উত্তর পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুমান মানিলে দেবযান পিতৃযানের ব্যাখ্যা সুগম হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের পিতৃভূমি নহে। আধুনিক মঙ্গলিয়াই আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল ও তাহাই স্বর্গ নামে অভিহিত হইত। উত্তর সাইবেরিয়ার নাম ছিল ব্রহ্মলোক ও তথাকার অধিপতির নাম ব্রহ্মা। সেইরূপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম ছিল ও ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি মানুষই ছিলেন। ভারতবর্ষ ও পিতৃভূমি মঙ্গলিয়া হইতে ব্রহ্মার নিকট অনেক লোক যাইতেন। তাঁহারা যে সকল পথে যাতায়াত করিতেন তাহাই দেবযান পথ। আর পিতৃগণ যে পথে ভারতবর্ষে আসিতেন তাহাই পিতৃযান পথ। ভারতবর্ষে আসিবার পর আর্যদের পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়। তখন দেবযান ও পিতৃযান পথের স্মৃতি মাত্র থাকিয়া যায়। এই স্মৃতি কোথাও অবিকৃত কোথাও বা বিকৃত অবস্থায় বেদের নানা স্থানে রহিয়া গিয়াছে। বৈদিক কালেই দেবযান ও পিতৃযানের যথার্থ তত্ত্ব লুপ্ত হইয়াছিল।

। ৪২। বিদ্যারত্ন মহাশয় 'মানবের আদি জন্মভূমি' গ্রন্থে বেদ হইতে যে সব সূক্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে বণিকেরা পিতৃযান পথে ইন্দ্রের নিকট বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে যাইতেছেন। এক ঋষি অন্য ঋষিদের বলিতেছেন, আমি ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলাম, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমাদের সত্য বলিতেছি তথায় ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়। কালক্রমে যখন দেবযান ও পিতৃযান পথের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইল তখন ঋষিরা নানাপ্রকার কাল্পনিক 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। দেবযান ও পিতৃযান মার্গে মূলত যে সকল কালবাচক শব্দ ছিল তাহা দ্বারা কত দিনে ঐ সকল পথ অতিক্রম করা যাইত তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে এই কালনির্দেশের অনেক কাল্পনিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্রহ্মলোকে যাওয়া ক্রমে পরব্রহ্মলাভের সমবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠককে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মূল গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

। ৪৩। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারীদের পিতৃযান পথে ও ব্রহ্মবিদের দেবযান পথে গতি কেন হয় তাহা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্যে বর্ণিত বিবরণ পাঠে আমার মনে যে ব্যাখ্যার কথা উদিত হইতেছে তাহা বলিতেছি। ঋষিরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। পুণ্যাত্মার স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্তন হয় ও ব্রহ্মবিদের আত্মার পুনর্জন্ম হয় না ইহাই তাঁহাদের মত। মায়াবদ্ধ জীবাত্মা দেহাদি আশ্রয়েই

অধিষ্ঠান করে। দেহের বিনাশ হইলে সেই আত্মা অন্য অধিষ্ঠানে উৎক্রমণ করে। মানুষের মৃত্যুর পর পুরাকালেও দেহের অগ্নিসৎকার করা হইত। ঋষিরা দেখিলেন অগ্নিসৎকারের সময় অগ্নির ধূম ও জ্যোতি রূপেই দেহ নিঃশেষ হয়। অতএব দেহস্থিত আত্মা হয় ধূম, নয় জ্যোতির আশ্রয়েই দেহত্যাগ করে। ধূম আকাশে উঠিয়া মেঘ হয় ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে ব্রীহি যবাদি জন্মে। অতএব ধূম ঊর্ধ্বে উঠিয়া পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসে। যাঁহাদের আত্মার পুনর্জন্ম হয় দেহ ভস্মীভূত হইবার পর তাঁহারা ধূমমার্গেই গমন করিয়া থাকেন। অন্য পক্ষে চিতাগ্নির জ্যোতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায়। সেই জ্যোতির আর পুনরাবর্তন নাই। অতএব যে আত্মার পুনর্জন্ম নাই তাহা দেহ ধ্বংসের পর জ্যোতিপথই অবলম্বন করে। ধূমপথ ও অর্চিপথ উভয়েই পুণ্যাত্মাদিগের পথ। যাহারা পাপী তাহাদের আত্মা এই উভয়ের কোন পথই আশ্রয় করে না। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। চিতা-ভস্মেই খুব সম্ভবত এই সকল আত্মার আশ্রয় কল্পিত হইত। যে স্থানে ভৌম ব্রহ্মলোক ছিল তথায় একাদিক্রমে ছয় মাস দিন বা জ্যোতি ও ছয় মাস রাত্রি বা অন্ধকার থাকিত। উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে অগ্নিসৎকারের পর তথায় ছয় মাস জ্যোতির আশ্রয়ে আত্মা যাইতে পারে। দক্ষিণায়নে এই আশ্রয় নাই। সে জন্য উত্তরায়ণে মৃত্যুই প্রশস্ত। পুনশ্চ, যখন ব্রহ্মলোকে ও স্বর্গলোকে ভারতবর্ষ হইতে আর্যেরা গমনাগমন করিতেন তখন দূরত্বের ও দুর্গম পথের জন্য হয় ত অনেকেই ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন না কিন্তু স্বর্গলোক অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হওয়ায় তথায় সুখভোগের পর আমরা এখন যেমন দার্জিলিং প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসি সেইরূপ অনেকেই ফিরিয়া আসিতেন। পরলোকেও মৃত্যু হয় এ কথা শতপথব্রাহ্মণে আছে। এই সকল ঘটনার আশ্রয়েই সম্ভবত পরবর্তী কালে আত্মার দেবযান ও পিতৃযান পথ কল্পিত হইয়াছিল।

২ত। ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয়নিরোধ, ইন্দ্রিয়সংহরণ, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি

।৪৪। অধুনা ব্রহ্মচর্য বা ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে আমরা কামেন্দ্রিয়েরই সংযম বুঝিয়া থাকি কিন্তু গীতায় কুত্রাপি এই দুই শব্দ এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সমগ্র গীতায় কোথাও বিশেষ করিয়া কামেন্দ্রিয় সংযমের কথা নাই। শংকর ব্রহ্মচর্যের অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন, গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা, ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ ও

অধ্যয়নাদি কার্য। ৬।১৪ শ্লোকের শংকরভাষ্য এবং মৎপ্রণীত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রে পঠদ্দশায় কামেন্দ্রিয়সংযম উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা ব্রহ্মচর্যের একটি অঙ্গমাত্র। কামেন্দ্রিয়ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে কেবল কামেন্দ্রিয়সংযম বুঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ ৬।১৪ শ্লোকে বলিতেছেন ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হইয়া যোগ অভ্যাস করিবে। পুনরায় ৮।১১ শ্লোকে বলিলেন অক্ষর ব্রহ্মকে জানিবার জন্য কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন। ১৭।১৪ শ্লোকে ব্রহ্মচর্যকে শারীরিক তপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্যকে অক্ষর ব্রহ্মলাভের জন্য যোগের সাধন এবং চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন।

।৪৫। গীতায় ৪।২৬ ও ২৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আহুতি দেন, অন্য কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়-সকল আহুতি দেন, অপর কেহ জ্ঞান দ্বারা উদ্বোধিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্ম আহুতি দেন। এখানে ইন্দ্রিয়ব্যাপার লইয়া তিন প্রকার সাধকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে অর্থাৎ শব্দাদি বহির্বস্তু হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখ করিবার নাম ইন্দ্রিয়সংহরণ বা ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার। স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ পাতঞ্জলদর্শন ২।৫৪ ॥ অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার, এই অবস্থা চিত্তের স্বরূপ অনুকরণের ন্যায়। চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চ অবস্থা। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারি অবস্থায় চিত্ত বহির্মুখ অর্থাৎ কোন না কোন বিষয়াসক্ত। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের কোন বহির্বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং এই অবস্থায় চিত্ত নিজ স্বরূপে অবস্থান করে এবং চৈতন্য মাত্র অনুভূত হয় ॥ পাতঞ্জল ১।৩ ॥ এই অবস্থার অনুকরণে যখন ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়। গীতায় ইহাকেই ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়ের আহুতি দেওয়া বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ইন্দ্রিয়সংহরণ বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহারের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

।৪৬। সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেওয়ার অর্থ ৬।২৪-২৬ শ্লোকগুলিতে পাওয়া যাইবে। আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মের আহুতি দেওয়ার অর্থ ৮।১২ শ্লোকে আছে। প্রথমে মনকে সর্ব জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়

হইতে নিবৃত্ত করিয়া হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রাণবায়ুকে মূর্ধায় স্থাপিত করিয়া অক্ষর ব্রহ্ম ধ্যান করিতে হইবে। এই উপায় অধিবাদের অন্তর্গত ওঁকার সাধনার অঙ্গ বলিয়া বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাকে মনঃসংযম বা আত্মসংযম বলা হইয়াছে। সংযম কাহাকে বলে বিশদ করিতেছি। কোন বিশেষ আলম্বনে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করার নাম সংযম। ধারণা শব্দ যোগশাস্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেশ-বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ পাতঞ্জল ৩.১ ॥ অর্থাৎ, কোন দেশ অর্থাৎ স্থানবিশেষে মনকে বন্ধন করার নাম ধারণা। যোগ অভ্যাসকালে কোন বহির্বস্তু বা নিজ শরীরের কোন অংশ ধারণার স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ দেবমূর্তির চরণকমলে মনোনিবেশ করেন, কেহ বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে যে কোন স্থান ধারণার অবলম্বন হইতে পারে। ধনুর্বিদ্যায় লক্ষ্য স্থানই ধারণাস্থান। কোন বস্তুর স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সেই বস্তুতেই ধারণার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহার ধ্যান করিতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যক্ত জগতের স্বরূপের উপলব্ধি আবশ্যক। বহির্বস্তু ও মানসিক ব্যাপার লইয়াই ব্যক্ত জগৎ। বহির্বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা প্রতিভাত হয়, আবার ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনের বৃত্তিমাত্র। মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন অন্তঃকরণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা বহির্জগতের সহিত কারবার করে। অতএব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বহির্বস্তু, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অন্তঃকরণ এই তিনের প্রত্যেকটির স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞারূপ আলোক বা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই তিনের যুগপৎ প্রয়োগের পারিভাষিক নাম সংযম। সংযম দ্বারা পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অতএব আত্মজ্ঞানলাভের জন্য বহির্বস্তু বা ইন্দ্রিয়বিষয়, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই তিনেরই সংযম আবশ্যক। ধারণা সংযমের অঙ্গ। বহির্বস্তু সংযমকালে বহির্বস্তুকেই ধারণার স্থান করিতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইলে ইন্দ্রিয়স্থানকে ধারণাস্থান করা উচিত। ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযমে যে স্থানে স্পর্শ অনুভূত হইতেছে সেই স্থানেই মনোনিবেশ কর্তব্য। শরীরের যে স্থানে যে ইন্দ্রিয়ের কার্য অনুভূত হয় সেই স্থানই সেই ইন্দ্রিয়সংযমের উপযুক্ত ধারণাস্থান। ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারে শরীরে অনুভূতির স্থাননির্দেশ সহজ। রসনেন্দ্রিয়ের স্থান জিহ্বা এবং ঘ্রাণের নাসিকাভ্যন্তর। কর্ণাভ্যন্তর শব্দের ইন্দ্রিয়স্থান অর্থাৎ যখন শব্দ হয় তখন কর্ণমধ্যেই তাহার অনুভূতি হয়। সাধারণের পক্ষে ইহা বুঝা একটু চেষ্টাসাপেক্ষ, কারণ আমাদের মন শব্দানুভূতির দিকে না গিয়া শব্দায়মান বস্তুর

প্রতি ধাবিত হয়। মন অন্তর্মুখ না করিলে ইন্দ্রিয়স্থানের জ্ঞান জন্মে না। অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে শব্দ শুনা যায় না, ইহা হইতেই সাধারণে বুঝে যে শব্দের ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণ। শব্দ শ্রবণকালে কর্ণের মধ্যেই অনুভূতি হইতেছে এই জ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ। দর্শন ইন্দ্রিয়ের স্থাননির্দেশ আরও কঠিন, কারণ শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি অপেক্ষা দৃষ্টি অধিক বহির্মুখী। অবশ্য চক্ষু বন্ধ করিলে দেখা যায় না অতএব চক্ষুই দর্শনেন্দ্রিয়ের স্থান এই যুক্তিলভ্য জ্ঞান সকলেরই আছে কিন্তু কোন বস্তু দেখিবার সময় চক্ষুগোলকের মধ্যে দর্শনক্রিয়া চলিতেছে এই অনুভূতি বিশেষ আয়াসলভ্য। এই অনুভূতি না জন্মিলে চক্ষুগোলককে ধারণার স্থান করা সম্ভবপর নহে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযমও অসম্ভব।

। ৪৭। ইন্দ্রিয়স্থান লইয়া কোন মতভেদ নাই কিন্তু মনের স্থান নির্দেশ কঠিন। শোকদুঃখাদির দ্বারা যখন মন উদ্বেল হয় তখন বক্ষ বা হৃদয়ে কষ্টাদি অনুভূত হয়। দুঃখে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, শোকে বুক শূন্য বোধ হইতেছে, ভয়ে বুক দুর দুর করিতেছে ইত্যাদি ভাষা সাধারণে প্রয়োগ করে, অতএব হৃদয়ই মনের স্থান। হৃদয় হৃদ্‌পিণ্ড নহে। হৃদয়ের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই। বক্ষোদেশের এক অনির্দিষ্ট অংশই হৃদয়। মনকে শাস্ত্রে সংকল্পবিকল্পাত্মক বলা হয়। কোন বিষয়ের সংকল্প বিকল্পের সময় আমরা অস্ফুট বাক্যের সাহায্যে মনে মনে তাহার আলোচনা করি, এ জন্য গলান্তকেও মনস্থান বলা হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি চালনার সময় বদনে বা মস্তকে বিশেষ অনুভূতি উপলব্ধ হয়, এ জন্য বদন বা মস্তক বুদ্ধিস্থান। শারীরবৃত্তে মস্তিষ্ককে বুদ্ধি, মন ইত্যাদির আধার বলা হয়। যোগশাস্ত্রে বুদ্ধিস্থান বলিলে মস্তিষ্ক বুঝায় না কিন্তু যে স্থানে বুদ্ধি চালনাকালে কোন বিশিষ্ট সংবেদন (sensation) অনুভূত হয় তাহাই বুদ্ধিস্থান। আধুনিক মনোবিদও কেবল মনোবিদ্যার দিক হইতে দেখিলে বলিবেন বদন বা মস্তকই বুদ্ধিস্থান। মস্তিষ্কের কোন অনুভূতি আমাদের নাই। ইন্দ্রিয়সংযমকালে যেরূপ ইন্দ্রিয়স্থানে ধারণা করিতে হয় মনঃসংযম করিতে হইলে সেইরূপ মনঃস্থান অর্থাৎ হৃদয়ে বা বক্ষোদেশে মনোনিবেশ করিতে হয়। শংকরের আত্মানাত্মবিবেকে আছে, অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহংকারশ্চেতি। মনঃস্থানং গলান্তং বুদ্ধের্বদনম্ চিত্তস্য নাভিঃ। অহংকারস্য হৃদয়ম্। অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়া সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই কয়টির নাম অন্তঃকরণ। মনের স্থান গলান্তপ্রদেশ, বুদ্ধির স্থান বদন, চিত্তের নাভি ও অহংকারের

হৃদয়। মনের কার্য সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়করণ, চিত্তের ধারণা ও অহংকারের অভিমান। কোনও মতে অন্তঃকরণ তিনটি, যথা, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। কখনও কখনও মন শব্দে সমগ্র অন্তঃকরণ বুঝায়। কাহারও কাহারও মতে মনঃস্থান নাভিতে, কেহ বলেন ভ্রূমধ্যে চ মনঃস্থানং, কেহ বলেন হৃদয়াভ্যন্তরে এবং কাহারও মতে মনঃস্থান মস্তকে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে আত্মা হৃদয়ে বা হৃদয়গুহায় অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে বা হৃদয়-আকাশে অবস্থান করেন। এই সকল বাক্যের অর্থ এই যে, হৃদয়কে ধারণার স্থান করিলে আত্মার উপলব্ধি হয়। গীতায় ১৮।৬১ শ্লোকে আছে ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন।

। ৪৮। বিষয় সংযম করিলে বিষয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানে পর্যবসিত হয়, ইন্দ্রিয়-সংযমে ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনে লয় পায় এবং মনঃসংযমে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মনঃসংযমকে অনেক সময় আত্মসংযম বলা হয়। বিষয়সংযম ও ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার একই কথা। সেইরূপ ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃপ্রত্যাহার এবং মনঃসংযম ও আত্মার প্রত্যাহার সমার্থ-বাচক। সংযম কি, উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হইবে। চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি, হাতে একটা ভিজা, কঠিন ও শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। বুঝিলাম বরফ স্পর্শ করিয়াছি। মন এই বরফের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া (ধারণা) বরফের শৈত্যগুণ একমনে চিন্তা করিতে লাগিলাম (ধ্যান), ক্রমে এই চিন্তায় তন্ময় হইলাম, তখন বরফ ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব মন হইতে লোপ পাইল। এমন কি, আমি আছি বা ধ্যান করিতেছি এই জ্ঞানও রহিল না (সমাধি)। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে বরফরূপ বহির্বস্তুর সংযম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সংযমের ফলে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক প্রজ্ঞা নামক আলোক বা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ পাতঞ্জল ৩।৫ ॥ তখন ধ্যাতা বুঝিতে পারেন যে, বরফরূপ বহির্বস্তু কেবল শৈত্যাদি কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র। এই বুঝিতে পারা কেবল তর্ক বিচার দ্বারা বুঝা নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। ইহাই বিষয়সংযম বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়ের আহুতি দেওয়া।

। ৪৯। বিষয়সংযমের পর ইন্দ্রিয়সংযম সফল হয়। ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইলে হস্তের যে স্থানে বরফের স্পর্শ অনুভূত হইতেছে (ইন্দ্রিয়স্থান) তথায় মনোনিবেশ করিয়া (ধারণা) শৈত্যগুণের একতান চিন্তন (ধ্যান) করিতে করিতে তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, অপর কোন অনুভূতি থাকিবে না (সমাধি)।

ইহাই স্পর্শেন্দ্রিয়সংযম। এই সংযমের দ্বারা সাধক বুঝিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব নাই তাহা মনেরই বিকার মাত্র। ইন্দ্রিয়সংযমে ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনে লয় পায়। ইহাই সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কে আহুতি দেওয়া। ইন্দ্রিয়সংযম অতি কঠিন ব্যাপার। থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে জোর করিয়া তাহা দেখিলাম না, সাধারণে মনে করেন ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়সংযম। শাস্ত্রমতে ইহা ইন্দ্রিয়সংযম নহে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মাত্র। গীতা বলেন নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি অর্থাৎ নিগ্রহ বিফল। মনঃসংযম বা আত্মসংযম করিতে হইলে মনঃস্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে (ধারণা) মনকে নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং মনের প্রকৃতি কিরূপ তাহার একতান চিন্তন (ধ্যান) করিতে হইবে। মন নিজ স্বরূপে তন্ময় হইলে (সমাধি) আত্মায় লয় পাইবে ও আত্মদর্শন হইবে। ইহাই আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ববিধ ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মের অর্থাৎ তাবৎ মানসিক ব্যাপারের আহুতিদান। প্রাণসংযম অষ্টম অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণ মনুষ্যের মানসিক বৃত্তিসমূহ বহির্মুখ এবং বিষয়ের আকর্ষণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা বহির্বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। সংযম অভ্যস্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তিসমূহ নিজ বশে আসে ও তখন তাহাদিগকে ইচ্ছামত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যায়। এই সংহরণ নিগ্রহ নহে। ২।৬১ শ্লোকে আছে, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন।

। ৫০ । শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে এই যে যোগসাধনা ও চিত্তশুদ্ধির সহায়ক বলিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করিবে, স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংহরণ আয়ত্ত করিবে এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃসংযম অভ্যাস করিবে। বিভিন্ন সাধকেরা এই সকল বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সাধনাই চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে কর্মজ বলা হইয়াছে ॥ ৪।৩২ ॥, অতএব এই সকল সাধনাও নিঃসঙ্গচিত্তে অনুষ্ঠেয় নচেৎ ইহাদের দ্বারাও কর্মবন্ধন জন্মিবে।

২থ। স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ

। ৫১ । সর্বপ্রকার দ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ঃ ॥ ৪।৩৩ ॥ জ্ঞানার্জনের চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের উপায়

এ জন্য ৪।২৮ শ্লোকে স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞের একত্র উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন কেবল বেদপাঠকেই স্বাধ্যায় নামে অভিহিত করা হইয়াছে কিন্তু এই অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে। জ্ঞানলাভের জন্য সর্বপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলা যায়। ১৬।১ শ্লোকে দৈবী সম্পদের মধ্যে স্বাধ্যায় ধরা হইয়াছে এবং ১৭।১৫ শ্লোকে স্বাধ্যায়কে বাঙ্ময় তপ বলা হইয়াছে ; এই দুই স্থলেও কেবল বেদপাঠ স্বাধ্যায় শব্দের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় না। ১১।৪৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, না বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন দ্বারা, না দান দ্বারা, না ক্রিয়ার দ্বারা, না উগ্র তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ বা মূর্তি নৃলোকে দর্শনসাধ্য। এখানে বেদ ও অধ্যয়নকে পৃথক মার্গ বলিয়াই ধরা হইয়াছে। এখনকার মত মহাভারতের কালেও অনেকে জ্ঞানার্জনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। স্বাধ্যায়ই ইহাদের সাধনা। কোন কোন যতি এই শ্রেণীভুক্ত ॥ ৪।২৮ ॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমা বল্লীর নবম অনুবাকে আছে, স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদগল্যঃ তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ অর্থাৎ নাকমৌদগল্য ঋষি বলেন কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অনুষ্ঠান করিবে কারণ তাহাই তপ তাহাই তপ। শ্রীকৃষ্ণের মতে সর্বপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

২দ। মন্ত্র ও ঔষধ

। ৫২। গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র অতি প্রাচীন। এই সকল মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র জপ এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে মন্ত্রজপকে প্রধান সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ৯।১৬ শ্লোকে বলিলেন, আমাকেই মন্ত্র বলিয়া জানিবে অর্থাৎ যিনি মন্ত্রকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন তাঁহার মুক্তি হয়। এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমিই ঔষধ। ঔষধ শব্দের ব্যাখ্যায় শংকর বলিতেছেন, সকল প্রাণী যাহা ভক্ষণ করে তাহাই ঔষধশব্দবাচ্য অথবা ব্যাধির শান্তির জন্য যে ভেষজ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ঔষধ শব্দের অর্থ। এখানে কোন্ অর্থে ঔষধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে শংকর সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। আমার মনে হয় এখানে ঔষধ শব্দে যজ্ঞীয় ব্রীহি যবাদি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ৯।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ভেষজ ও পারদাদি ঔষধ দ্বারাও একপ্রকার সাধনার কথা প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা যায়। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, অপরে মাহেশ্বরাঃ পরমেশ্বরতাদাত্ম্যবাদিনোঽপি পিণ্ডস্থৈর্যৈঃ সর্বাভিমতা জীবন্মুক্তিঃ সেৎস্যতীত্যাস্থায়

পিণ্ডস্থৈর্যোপায়ং পারদাদিপদবেদনীয়ং রসমেব সংগিরন্তে রসস্য পারদত্বং সংসার-পরপারপ্রাপণত্বেন তদুক্তং সংসারস্য পরং পারং দত্তেঽসৌ পারদঃ স্মৃতঃ। ষড়্-দর্শনেঽপি মুক্তিস্তু দর্শিতা পিণ্ডপাতনে করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষা নোপলভ্যতে। তস্মাৎ তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ। অর্থাৎ, অপর মাহেশ্বর সম্প্রদায় আত্মাকেই পরমাত্মারূপে স্বীকার করিলেও বলেন সর্বদর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদিত জীবন্মুক্তি শরীরের স্থৈর্যের উপর নির্ভর করে অতএব তাঁহারা এই স্থৈর্যের উপায় স্বরূপ পারদের গুণ কীর্তন করেন। সংসারের পরপার প্রাপ্তি করায় বলিয়াই ইহাকে পার-দ বলে। দেহপাতের পর ষড়দর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ নহে সে জন্য পারদ ও অন্যান্য রসায়নের দ্বারা শরীররক্ষার চেষ্টা করিবে। তন্ত্রশাস্ত্রের মূল অতি প্রাচীন এবং খুব সম্ভবত এই বিশ্বাস মহাভারতের কালেও প্রচলিত ছিল এবং হয় ত শ্রীকৃষ্ণ রসায়নকেই ঔষধ শব্দে লক্ষ্য করিয়াছেন। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ৫।১২৮ সূত্রে ঔষধ দ্বারা সিদ্ধিলাভের কথা আছে। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও ৪।১ সূত্রে মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা অণিমাদি অষ্টপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে। কথিত আছে কেবল মন্ত্রজপ দ্বারা গালব প্রভৃতি ঋষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং মাণ্ডব্য প্রভৃতি কতিপয় ঋষি কেবল ঔষধ সেবন করিয়াই সিদ্ধিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২ধ। পূজা

।**৫৩**। এখন যেরূপ নানা দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে পুরাকালে মহাভারতের যুগেও সেইরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। দেবদেবীর কোন মৃত্তিকা প্রস্তরাদিনির্মিত মূর্তিপূজা হইত কি না গীতায় তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। পূজায় পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি দেবতাকে অর্পিত হইত কিন্তু এ বিষয়ে এখনকার মত বাহুল্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এক শ্লোকেই এই প্রকার পূজার কথা শেষ করিয়াছেন। ভূত প্রেতাদির পূজা কেহ কেহ করিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক এই সকল পূজা করে বিধিবহির্ভূত হইলেও তাহারা আমারই পূজা করে, কেন না, সর্বযজ্ঞের আমিই ভোক্তা ও প্রভু কিন্তু এরূপ পূজার ফল শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না কারণ উপাসক উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হন এই ন্যায়ে দেবপূজক দেবতাকে এবং ভূতপ্রেতপূজক ভূতপ্রেতকে প্রাপ্ত হন।

২ন। নানা উপাস্য পদার্থ

।৫৪। দেবতা, ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা ব্যতীতও কোন কোন বৃক্ষ, পর্বত, নদী, মনুষ্য বা অন্যান্য বস্তু সমাজে পূজার্হ বলিয়া পরিগণিত হয়। দশম অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন কোন্ কোন্ বস্তুতে বা কোন্ কোন্ ভাবে ভগবানের ধ্যান করা যাইতে পারে। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য বস্তুর উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি নামোল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা আমার শক্তিসম্ভূত বলিয়াই জানিবে। এই তালিকা দেখিলে মহাভারতের যুগে কোন্ কোন্ পদার্থ উপাস্য বলিয়া লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা পাইত তাহা বুঝা যাইবে। চন্দ্র, অগ্নি, সাগর, মেরুপর্বত, হিমালয়, অশ্বত্থবৃক্ষ, কুবের, বাসুকী, প্রহ্লাদ, রাম, গরুড় প্রভৃতির নাম এই তালিকার মধ্যে আছে। মকর ও জাহ্নবীর পর পর উল্লেখ থাকায় মনে হয় তখনও লোকে মকরবাহিনী গঙ্গার পূজা করিত।

২প। রাজবিদ্যা

।৫৫। শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুমোদিত ধর্মের নাম দিয়াছেন রাজবিদ্যা। রাজন্যবর্গের মধ্যে এই বিদ্যা প্রচলিত থাকায় ইহাকে রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। রাজবিদ্যা কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। যে কোনও মার্গের সাধকই এই বিদ্যার প্রয়োগ করিতে পারেন। নবম অধ্যায়ে এই বিদ্যার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। সংক্ষেপে রাজবিদ্যার মূল সূত্র এই যে, প্রকৃতির বশে মানুষ কর্ম করিবেই অতএব কর্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া নিজ স্বভাব ও সমাজ অনুযায়ী কর্ম করা উচিত। নিশ্বাসপ্রশ্বাস আহারবিহার হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান সমস্তই ব্রহ্মবুদ্ধিতে ও অসঙ্গচিত্তে করা উচিত। যে কোন ধর্মমার্গই অবলম্বন করা যাক না কেন ব্রহ্মবুদ্ধিতেই তাহা করিতে হইবে, কোন একটি বিশেষ মার্গই গ্রহণ করিতে হইবে এমন কথা নাই। অধ্যাত্মবিদ্যা বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সম্বন্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা উচিত। এই জ্ঞান লাভ হইলে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয়। নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম করিলে এই জ্ঞান লাভ হয়। অসমর্থ ব্যক্তি কর্মফলত্যাগের অভ্যাস করিবেন।

।৫৬। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নানাপ্রকার সাধনমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কোন মার্গের সাধককেই নিজ ইষ্টমার্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই তবে সর্বপ্রকার

সাধনায় বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার নিজস্ব কোন বিশেষ সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দিয়াছেন কি না তাহা বিচার্য। তিনি লুপ্ত রাজবিদ্যার পুনরুদ্ধারকর্তা এবং পুনঃপ্রবর্তক। রাজবিদ্যা, কর্মযোগ ও বুদ্ধি-যোগ এই তিন শব্দের দ্বারা কৃষ্ণ তাঁহার নিজ মত নির্দিষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান সমেত কৃষ্ণের সমগ্র উপদেশের নাম রাজবিদ্যা, ব্যাবহারিক জীবনে সেই বিদ্যার প্রয়োগ পদ্ধতির নাম কর্মযোগ এবং যে বুদ্ধির দ্বারা রাজবিদ্যাশ্রয়ী চালিত হন তাহার নাম বুদ্ধিযোগ। অষ্টাদশ অধ্যায়ের বক্তব্য বিশেষভাবে আলোচনা করিলে কৃষ্ণের অভিপ্রেত সাধনপদ্ধতির সন্ধান মিলিবে। কৃষ্ণ সকলকে স্বধর্মে থাকিয়া চলিতে বলিয়াছেন। উপযুক্ত ভাবে আচরিত হইলে স্বধর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। কৃষ্ণের নিজস্ব উপদেশের সার মর্ম ধারাবাহিক ভাবে বিশদ করিতেছি।

১। নিজ প্রকৃতিজাত স্বভাবের অনুকূল কোন সমাজানুমোদিত জীবিকা বা বৃত্তি গ্রহণ করিবে। আলস্য ত্যাগ করিয়া উৎসাহ, দক্ষতা ও শুচিতা সহকারে সেই বৃত্তির অনুযায়ী কর্মসমূহ আচরণ করিবে। স্বভাব ও সমাজসম্মত বৃত্তির উপযুক্ত আচরণের নাম স্বধর্ম পালন। অধিক উপার্জন বা অপর কোন লাভের আশায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া অপরবৃত্তি আশ্রয় করিবে না। দোষযুক্ত স্বধর্মও পরিত্যাজ্য নহে। স্বধর্মনিরত ব্যক্তির প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ায় ধাতু প্রসন্ন হয় ও ক্রমে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বধর্ম দোষযুক্ত হইলেও তদনুষ্ঠানে কোনও পাপ হয় না। স্বধর্মপালন দ্বারাই মুক্তি সম্ভবপর।

২। স্বধর্ম আচরণকালে দুই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমত, স্বধর্ম-নির্দিষ্ট কর্মে নির্লিপ্ততা অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে ও সেই সঙ্গে শরীরযাত্রা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সর্ববিধ কর্মেও অনাসক্ত ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, স্বধর্ম-মাত্র পালনকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করিবে না, উপযুক্ত ধৃতি অর্থাৎ জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। যে আদর্শবশে মনুষ্য ভগবান লাভের জন্য অনুপ্রাণিত হয় তাহাই উপযুক্ত ধৃতি। জানিয়া রাখিবে যে ভগবৎসত্তা জগতের সকল বস্তুতে, সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনায় ও মনুষ্যাদি প্রাণিগণের সকল কর্মে এবং ভাল মন্দ সমস্ত ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এই সত্তা অব্যয় এবং অবিনাশী এবং সকল অনিত্য বস্তুতে নিত্য পদার্থ। ইহাই মনুষ্যের চরম আশ্রয়। অনিত্য ইন্দ্রিয়বিষয়-সমূহে আসক্তি বর্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই পরম বস্তুর সন্ধান লইতে হইবে।

৩। কর্মে আসক্তিত্যাগ ও নির্লিপ্ততা অর্জনকে সন্ন্যাস, ত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি নামে অভিহিত করা যায়। কর্মবর্জন কর্তব্য নহে, আবশ্যকও নহে, সম্ভবপরও নহে। নিঃশেষ কর্মবর্জনে প্রাণযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। সমাজনির্দিষ্ট কোন কর্ম ত্যাজ্য নহে। কর্ম করিতে থাকিয়াই নিম্নলিখিত ভাবে ক্রমশ অনাসক্তি আয়ত্ত করা যায়।

(ক) কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। কর্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ। অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব এই পাঁচটির উপর কর্মের ফললাভ হইবে কি না তাহা নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে দৈব আমাদের আয়ত্তির বাহিরে। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যাইবে যে দৈব বর্তমান থাকিতে কর্মসিদ্ধি সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব যে কোন কর্মই আরম্ভ করা যাক না কেন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা সফল না হইতে পারে। যদি সর্বদাই স্মরণ করা যায় যে কর্ম সিদ্ধ হইতেও পারে না হইতেও পারে তবে ক্রমে ফলাসক্তি যাইয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিবার ক্ষমতা আসে, তখন সহজে ভগবানে কর্মের ফল অর্পণ করা যায়।

(খ) ভগবানে ফল অর্পণ করার অর্থ এই যে সাধক নিজেকে ভগবানের নিয়োজিত ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। ফললাভ হইলে সেই ফল ভগবানই পাইলেন এবং কর্ম বিফল হইলে ভগবানেরই ফললাভ হইল না মনে করেন। এরূপ বুদ্ধিতে সতত কর্ম করিলে আমি কর্তা এই ভাব কমিয়া আসে।

(গ) ভগবানে কর্মের ফল অর্পণ করায় ক্রমে অহংভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বুঝা যায় যে প্রকৃতির বশেই সর্বকর্ম সম্পাদিত হইতেছে এবং কর্তা নির্লিপ্ত জ্ঞাতা বা সাক্ষীমাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অবস্থা প্রকৃত নির্লিপ্ততা এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি।

৪। কর্তা সর্বদা অকর্তাই আছেন, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে এই জ্ঞান হইলে পর ক্রমে ব্রহ্মবুদ্ধি জাগরিত হয়। সাধক প্রথমে উপলব্ধি করেন যে এক চেতনসত্তার আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃতির কোন কর্ম চলিতে পারে না। উপযুক্ত ধৃতি ও বুদ্ধিযোগের সাহায্যে তখন তিনি ভাবিতে পারেন যে তাঁহার নিজ আত্মাই সেই চেতনসত্তা এবং তাহাই ব্রহ্মসত্তা। তখন এই প্রকার ভাবনা আসে যে কর্তা ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, সর্ববিধ সাধনদ্রব্য ব্রহ্ম এবং জাগতিক যাবৎ বস্তু ব্রহ্ম। এই ভাবনার নাম ব্রহ্মবুদ্ধি।

৫। ব্রহ্মবুদ্ধি হইতে ভগবদ্ভক্তি জন্মে অর্থাৎ সাধক ব্রহ্মকেই নিজ চেতন সত্তার চরম জ্ঞাতব্য মনে করেন।

৬। পরে ক্রমে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা প্রভৃতি সকল ভেদ লোপ পাইয়া ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধ হয় অর্থাৎ সাধকের আত্মা ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া যায়। ইহাই মুক্তি এবং ইহাই সকল জীবের কাম্য।

।৫৭। শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট কর্মযোগ অবলম্বনে কোন্ কোন্ সোপান আরোহণ করিয়া অর্থাৎ সাধনার কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে পৌঁছান যায় তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। দেখা যাইতেছে এই উপায়ে মুক্তিলাভের জন্য পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞ জপতপ সন্ধ্যা আহ্নিক শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই। সামাজিক আচার ব্যবহার বর্জনেরও প্রয়োজন নাই। কেহ যদি নিজ প্রবৃত্তির বশে বা নিজ রুচি বা সামাজিক প্রথামত কোন বিশেষ দেবতার পূজা অর্চনা কীর্তন করেন, সন্ধ্যা আহ্নিক ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তীর্থদর্শন দান ব্রাহ্মণভোজন দরিদ্রসেবা ইত্যাদিতে মন দেন অথবা যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন তবে তাহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের পরিপন্থী হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের মতে সাধক স্বচ্ছন্দে এই সব ধর্মাচরণ করিতে পারেন কেবল সকল ক্ষেত্রেই তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মই চরমগতি। সকল দেবতাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করিতে হইবে। যদি যোগ আশ্রয় করিতে হয় তবে তাহা মাত্র আত্মোপলব্ধির জন্য না করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধির জন্যই করিতে হইবে। বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া অনাসক্ত-চিত্তে ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়া যে পথেই যাওয়া যাক না কেন তাহাতেই মুক্তি হইবে।

৩। কাম ও ক্রোধ

।৫৮। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, ক্রোধ একটি সহজ প্রবৃত্তি। সহজ প্রবৃত্তিগুলি আদি প্রবৃত্তি। তাহাদের মূলে কি আছে আমরা তাহা জানি না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ক্রোধকে দ্বিতীয় রিপু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় ৩।৩৭ শ্লোকে কাম ও ক্রোধকে একই বলা হইয়াছে অতএব এখানে ক্রোধকে পৃথক মূল প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইল না। আমি নিজে ক্রোধকে সহজ সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিলেও মূল প্রবৃত্তি বলিয়া মানিতে রাজি নহি। কেন, তাহার বিচার করিব। ক্রোধের মূলে অন্য কোন প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকিলে ক্রোধ কেন হয় বা কি হইতে তাহার উৎপত্তি, এরূপ প্রশ্ন অসংগত নহে। অন্যথা ক্রোধকে মূল প্রবৃত্তি বলিয়া মানিলে এরূপ প্রশ্ন চলে না।

সচরাচর যে সকল কারণে আমাদের রাগ হয় প্রথমে তাহার উল্লেখ করিতেছি, (১) কেহ আমার অনিষ্ট করিলে আমি তাহার উপর রাগিয়া থাকি। শ্রীচৈতন্যদেব বা মহাত্মা গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। এরূপ মহাপুরুষদের কথা এখানে কিছু বলিব না, সাধারণ লোকের যাহা হয়, তাহাই বলিতেছি। (২) কেহ অপমান করিলে। (৩) অনিচ্ছায় কোন কাজ করিতে হইলে। (৪) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পাইলে। (৫) কেহ আমার কথা না শুনিলে। (৬) প্রাপ্য সম্মান না পাইলে। (৭) বিনা অনুমতিতে কেহ আমার দ্রব্যাদি লইলে বা আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিলে। (৮) কেহ আমাকে বোকা বলিলে আমার বুদ্ধিতে বড় হইবার অভিমানে আঘাত লাগে এবং আমার রাগ হয়। (৯) আমার কোন মিথ্যা কথা ধরা পড়িলে বা কেহ আমার নামে কলঙ্ক রটনা করিলে রাগ হয়, কারণ ইহাতে আমার ধর্মের অভিমান খর্ব হইয়া পড়ে ও লোকসমাজে আমি হেয় হই।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের মনের মধ্যে বড় হইবার যে ইচ্ছা নিহিত আছে, হয় সেই ইচ্ছানুরূপ কাজে বাহিরের অন্তরায় ঘটিয়াছে, নতুবা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ আমার আর্থিক ক্ষতি করিল ফলে আমার বড়লোক হইবার ইচ্ছার পূর্ণতালাভের ব্যাঘাত হইল। কেহ অপমান করিল বা পরের বশে কাজ করিতে হইল, ইহাতে নিজেকে ছোট মনে হইল। কেহ কথামত কাজ করিল না বা না বলিয়া আমার দ্রব্যে হাত দিল, ইহাতে কর্তৃত্বের অভিমান ক্ষুণ্ণ হইল। (১০) কেহ আমার আরামের ব্যাঘাত ঘটাইলে অথবা ক্ষুধার সময় খাইতে বাধা দিলে রাগের সঞ্চার হয়। (১১) আমার ভালবাসার জিনিসে ভাগীদার জুটিলে অথবা স্ত্রী অন্য কাহাকেও বা অন্য কেহ আমার স্ত্রীকে ভালবাসিলে আমি ক্রোধান্বিত হই।

আমার সুখের অথবা ভালবাসার অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতেই শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রে রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। নিজেকে ভালবাসি বলিয়াই সুখান্বেষণে ধাবিত হই ; সেই কারণে সুখের ব্যাঘাত এবং নিজের উপর ভালবাসার ব্যাঘাত, এই উভয়ের মধ্যে কোনই তফাৎ নাই।

আরও কতকগুলি অবস্থায় রাগ হইতে পারে, যথা, (১২) উচিত কথা শুনিলে। (১৩) কেহ কাজের ব্যাঘাত ঘটাইলে। (১৪) কেহ আমার সমালোচনা করিলে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাদের মূলেও পূর্বোক্ত কারণগুলির কোন না কোনটির প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে। এ পর্যন্ত আলোচিত সমস্ত কারণই প্রথম পুরুষকে লইয়া। নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলেও পরের কোন কোন কাজে আমার রাগ হইতে পারে, যেমন, (১৫) পরের ভাল দেখিলে। (১৬) নিজের ঘুম হইতেছে না অথচ পরকে আরামে নাক ডাকাইতে দেখিলে। (১৭) পরে মিথ্যা বলিলে বা কোন দোষ করিলে। (১৮) পরের বোকামি দেখিলে। এই শ্রেণীর কারণগুলি বড়ই বিচিত্র। এই সকল ব্যাপারে আমার নিজের কোন অনিষ্ট নাই। অন্যের বোকামি দেখিলে আমার কেন রাগ হয় ভাবিবার কথা। পরে ইহার বিচার করিতেছি। (১৯) কখন কখন সামান্য কারণে, এমন কি অকারণেও আমরা রাগিয়া থাকি। ১৭ বলিলে রাগ করে এমন লোকও আছে। এই শ্রেণীর লোককে ক্রোধান্বিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও হয় ত কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে, রাগের আসল কারণটি তাহার মনের কোথাও লুক্কায়িত আছে এবং তাহার কোন খবরই সে রাখে না।

। **৫৯** । দেখা গেল, আমরা সময়বিশেষে (ক) নিজ সম্পর্কিত ব্যাপারে রাগ করি। (খ) পরের ব্যাপারে রাগ করি। (গ) অজ্ঞাত কারণে রাগ করি।

নিজ সম্পর্কিত যে সকল ব্যাপারে আমাদের রাগ হয়, সে রাগের মূল কারণ যে আমাদের কোন না কোন ইচ্ছার তৃপ্তির পথে ব্যাঘাত তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। এরূপ ইচ্ছা হয় আত্মসম্মান নয় ভালবাসা সম্পর্কীয়। সুতরাং এরূপ স্থলে রাগকে মূল প্রবৃত্তি না বলিয়া ইচ্ছাকেই যদি মূল প্রবৃত্তি বলি তবে বিশেষ অন্যায় হয় না। ইচ্ছা প্রতিহত হইলেই রাগের সৃষ্টি হয় অতএব রাগ ইচ্ছারই রূপান্তর মাত্র। রাগের পৃথক অস্তিত্ব নাই।

পরের বোকামি দেখিলে যখন আমার রাগ হয় তখন ইচ্ছার ব্যাঘাতেই যে রাগের উৎপত্তি এ কথা কেমন করিয়া বলা চলে। আমি অবশ্য বলিতে পারি যে পরকে বুদ্ধিমান্ দেখিবার ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে, সেই ইচ্ছার ব্যাঘাতেই রাগের উৎপত্তি হইল কিন্তু পরের অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখিলেও যে আমার রাগ হয়। কাজেই উত্তর ঠিক হইল না।

। **৬০** । যে নিজে কালা তাহার কথা লোকে শুনিতে না পাইলে সে রাগিয়া উঠে কিন্তু খোঁড়া কাহাকেও খোঁড়াইতে দেখিলে রাগে না, ইহারই বা কারণ কি ?

খোঁড়ার খোঁড়ান লুকান যায় না কিন্তু কালা জানাইতে চাহে না যে সে কালা। এই জন্যই অপর কাহারও বধিরতা দেখিলে তাহার বধিরতা ধরা পড়িবার আশঙ্কা অজ্ঞাতে মনে আসে তাই তাহার রাগ হয়। যে দোষ আমি ঢাকিতে চাই সে দোষ পরের মধ্যে দেখিলে আমার রাগ হয়। অবশ্য কালা জানে যে সে কালা কিন্তু তাহার বধিরতাকে সে একটা দোষ বলিয়া মনে করে তাই ইচ্ছা করিয়া সে ইহা ঢাকিতে চায়। আমাদের মনের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে যাহার অস্তিত্ব আমাদের জানা নাই। সহজে এই সকল দোষের অস্তিত্ব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আবার কেহ তাহা দেখাইয়া দিলেও মানিতে চাহি না, আর মানিতে চাহি না বলিয়াই রাগিয়া উঠি। আমার নিজের ভিতর আমার অজ্ঞাতসারে বোকামি আছে তাই পরের বোকামি দেখিলে আমি রাগি। আমার নিজের মধ্যে চুরি করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই আমি চোর দেখিলে বা কেহ আমাকে চোর বলিলে রাগ করি। পূর্বেই বলিয়াছি চোর বলিলে আমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় অর্থাৎ বড় হইবার ইচ্ছায় বাধা পড়ে সেই জন্য রাগ হয় কিন্তু এখন বলিতে চাই চোর হইবার অজ্ঞাত ইচ্ছা মনের কোণে লুক্কায়িত আছে বলিয়াই লোকে চোর অপবাদ দিলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। যে বাস্তবিকই চোর এবং নিজেকে চোর বলিয়া জানে তাহাকে কেহ চোর বলিলে সে লোক-দেখান রাগের অভিনয় করিতে পারে, আসলে তাহার রাগ হয় না। আমি চোর, এ কথা পরের কাছে লুকাইতে চাহিলে রাগের ভান হয়, আর নিজের কাছে লুকাইতে চাহিলে বাস্তবিক রাগ হয়। এখানে আপত্তি উঠিতে পারে চোর বলিলে আমরা প্রায় সকলেই রাগ করি, আর আমাদের মধ্যে যে চুরির ইচ্ছা আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে এ সব কথার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে অবস্থাবিশেষে আমরা সকলেই চোর হইতে পারিতাম। শৈশবাবধি চোরের মধ্যে মানুষ হইলে চুরির ইচ্ছা যে আমাদের মনে জাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হয় আমাদের সকলেরই মনে অব্যক্তভাবে চুরির ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে, সুযোগ সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। আবার মনে করুন, আমি কোন আপিসের খাতাঞ্চি। আমাকে কেহ যদি বলে যে তুমি ব্যাঙ্ক অভ ইংলণ্ডের টাকা ভাঙিয়াছ তাহা হইলে আমার রাগ হইবে না কিন্তু কেহ যদি বলে যে তুমি তোমার আপিসের টাকা চুরি করিয়াছ তাহা হইলেই সর্বনাশ। ব্যাঙ্ক অভ ইংলণ্ডের টাকা চুরির তুলনায় আপিসের টাকা চুরি করিবার

সম্ভাবনা অধিক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যেখানে আমার পক্ষে চুরি করিবার সম্ভাবনা আছে কেবল সেইখানেই আমার রাগ হয়, অন্যত্র নহে। এই সম্ভাবনার কথা অপরেই মনে করুক বা আমি নিজেই মনে করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেখানে চুরি করিবার সম্ভাবনা আছে, বুঝিতে হইবে সেই সম্ভাবনার পশ্চাতে চুরি করিবার ইচ্ছাও আছে। যেখানে ইচ্ছা অসম্ভব সেখানে সম্ভাবনাও অসম্ভব। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে আমার মধ্যে চুরি করার ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হইল।

। ৬১ । এই দুই প্রকার প্রমাণে পাঠক হয় ত সন্তুষ্ট হইবেন না। আমার 'স্বপ্ন' পুস্তকে আমাদের অজ্ঞাত ইচ্ছার অস্তিত্ব কি করিয়া ধরা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাল্যকালে জানিয়া শুনিয়া অথবা বয়সকালে অজ্ঞাতসারে আমরা অনেকেই পরের দ্রব্য না বলিয়া লইয়া থাকি। মনের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা মানিয়া লইলে সহজেই এরূপ আচরণের কারণ বুঝান যায়।

। ৬২ । আমাদের অজ্ঞাতে মনের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছা আছে, এ কথা মানিলে, সর্ববিধ অন্যায় ইচ্ছাও যে আছে তাহাও মানিতে হয়। সকল সমাজেই অন্যায় কার্যে নিষেধ আছে, যেমন, চুরি করিও না, কাহাকেও মারিও না, পরস্ত্রী হরণ করিও না ইত্যাদি। নিষেধের অর্থই ইচ্ছার নিষেধ। এই সকল অবৈধ কার্যের সম্ভাবনা অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলে নিষেধবাক্যের কোনই সার্থকতা থাকিত না। চুরি করিও না বলিলে বুঝিতে হইবে চুরি করিবার ইচ্ছা আছে। এইরূপ নানা প্রমাণের সাহায্যে মনের মধ্যে সকল রকম অবৈধ ইচ্ছারই অস্তিত্ব দেখান যাইতে পারে। অবশ্য এই সকল ইচ্ছা আমাদের অজ্ঞাতসারেই মনে উঠে। নানা কারণে এইরূপ অবৈধ ইচ্ছাগুলি আমাদের মনে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ফুটিতে পায় না, সে জন্য তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের নিকট অজানা থাকে। রুদ্ধ ইচ্ছা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা 'স্বপ্ন' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

। ৬৩ । যেখানে অকারণে অথবা সামান্য কারণে রাগ হয় সেখানেও বুঝিতে হইবে মনের মধ্যে কোন রুদ্ধ ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে। ১৭ বলিলে রাগ করাও এইরূপ কোন রুদ্ধ ইচ্ছার ফল। নিজের মধ্যে কোন ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে অপরের মনে যে অনুরূপ ইচ্ছা ঘটনাচক্রে পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ জন্য তাহার সহিত সহানুভূতিও থাকে না। আমার মধ্যে

চুরির ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে কিরূপ অবস্থায় পড়িলে অপরে চুরি করিতে পারে তাহা হৃদয়ংগম হয় না সে জন্য কাহাকেও চুরি করিতে দেখিলে রাগ হয়। গুরু মহাশয় নিজের বোকামি ঢাকিতে এতই ব্যস্ত যে মূর্খ ছাত্রের পক্ষে কোন একটি বিষয় না বুঝা যে স্বাভাবিক, সে কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাই ছাত্রের বুদ্ধিহীনতায় তিনি রাগিয়া উঠেন। যে নিজে বোকা অথচ জানে না যে সে বোকা সেই অপরের বোকামি দেখিলে রাগ করে। যিনি নিজের সমস্ত দোষ দেখিতে পান তিনি অপরের উপর কিছুতেই রাগ করেন না। এরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। পাপী কেন পাপ কাজ করে বুঝিতে পারিলে, অর্থাৎ পাপ ইচ্ছা মনে উঠা সম্ভবপর এ কথা বুঝিলে পাপীর উপর ঘৃণা থাকে না। নিজের অনিষ্ট হইলে আমরা যে রাগি তাহার কারণ আমাদের সকলেরই মনে নিজেকে পীড়া দিবার, এমন কি নিজের মৃত্যু হউক, এরূপ ইচ্ছাও রুদ্ধ এবং অজ্ঞাত অবস্থায় রহিয়াছে। এ কথা 'স্বপ্ন' পুস্তকে ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইচ্ছা এবং ক্রোধ মূলত একই। ভাষাতত্ত্বও ইহার সাক্ষ্য দেয়। রাগ কথাটা ভালবাসা এবং ক্রোধ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। গীতাকার কাম ও ক্রোধকে যে এক বলিয়াছেন তাহাতে কোন দোষ হয় নাই।

৪। পুনর্জন্মবাদ

। **৬৪**। হিন্দুশাস্ত্রে পুনর্জন্মবাদ প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। গীতাতেও বহু স্থানে পুনর্জন্মবিষয়ক শ্লোক আছে, যথা, ২।২২, ২৭, ৫১ ; ৪।৫, ৪০ ; ৬।৪০-৪৫ ; ৭।১৯ ; ৮।১৫-১৬ ; ৯।৩, ২০-২১ ; ১৩।২১ ; ১৪।১৪-১৬ ; ১৫।৮ ; ১৬।২০। এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য এই যে মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহে জন্মলাভ করে। জন্মিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, মরিলেও সেইরূপ জন্ম ধ্রুব। আত্মদর্শন হইলে এই জন্মবন্ধন হইতে আত্যন্তিক মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। সাধারণ মনুষ্যের এই বিভিন্ন জন্মের কথা মনে থাকে না। এক জন্মের বিকর্মের বা দুষ্কর্মের ফলে পরজন্মে কষ্টভোগ বা হীনযোনিতে জন্ম হয় কিন্তু সৎকর্মের পুণ্যফলে উত্তরোত্তর পর পর জন্মে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়। পূর্বজন্মলব্ধ উন্নতি পরজন্মে বিনা আয়াসেই স্বত স্ফুরিত হয় এবং ক্রমশ অনেক জন্মান্তরে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি

কিন্তু নিতান্তই বিরল। ব্রহ্মলোক ও অপরলোকবাসী সকলেই পুনরাবর্তনশীল কিন্তু যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে তাহার পুনর্জন্ম নাই। যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদিতে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বটে কিন্তু স্বর্গভোগ শেষ হইলে জীবকে পুনর্জন্ম লাভ করিতেই হয়। প্রকৃতিজ গুণসঙ্গই আত্মার যোনিভ্রমণের কারণ। সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিতে যখন দেহধারীর মৃত্যু হয় তখন সে জ্ঞানীদের পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়। রজোগুণের প্রাবল্য থাকিলে কর্মাসক্তগণের মধ্যে জন্মায় এবং তমোগুণ প্রবল হইলে মূঢ়যোনিতে বা ইতর প্রাণিগর্ভে জন্ম হয়। জীবাত্মা মন সমেত ইন্দ্রিয়গণকে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই শরীর ত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়গণ চক্ষু ইত্যাদি স্থূল বস্তু নহে কিন্তু চক্ষুরাদিস্থানস্থিত সূক্ষ্ম শক্তিবিশেষ। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত জীবাত্মাকে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়। সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর জীবাত্মা ও সপ্তদশ উপদানে গঠিত। সপ্তদশ উপাদান যথা, অহংকার, মন, ১০ ইন্দ্রিয় এবং ৫ তন্মাত্র। কোন মতে অহংকারের পরিবর্তে বুদ্ধিকে ধরা হয় এবং অপর মতে ৫ তন্মাত্রের পরিবর্তে ৫ প্রাণ ধরা হয়। এই লিঙ্গশরীরই এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে অন্য দেহ ধারণ করে। মোক্ষ ব্যতীত এই লিঙ্গশরীরের বিনাশ নাই কিন্তু স্থূল দেহের কর্মফলের বশে ইহার উন্নতি বা অধোগতি হইয়া থাকে।

।৬৫। গীতায় পুনর্জন্মের কোন প্রমাণ বিচারিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ নাই কিন্তু আমার আছে। পুনশ্চ ১৫।১০ শ্লোকে বলিলেন, জ্ঞানচক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণই কেবল উৎক্রমণশীল জীবাত্মাকে দেখিতে পান, অন্যে পান না। যিনি আপ্তবাক্যকে গ্রাহ্য করিবেন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রই পুনর্জন্মের যথেষ্ট প্রমাণ। গীতা ব্যতীত উপনিষদাদিতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে আছে,

নানা যোনিতে জনম লাভ করে শরীরার্থ দেহী যত।
কেহ পায় স্থাণু রূপ নিজ নিজ কর্মশ্রুতিফল মত ॥ ৫।৭

যাঁহার আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নাই তাঁহার পক্ষে পুনর্জন্মের প্রমাণ আলোচ্য। পুনর্জন্মবাদ দুই ভাবে বিচারিত হইতে পারে। এক ঘটনা বা fact হিসাবে আর এক বাদ বা theory হিসাবে। যদি আমরা কোন আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তবে তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারি আর না পারি তাহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কেন পৃথিবীতে অভিকর্ষণী শক্তি আছে তাহা না বলিতে পারিলেও দ্রব্যাদির

পতনরূপ ঘটনা আমাদিগকে মানিতে হয়। ঘটনা বলিলে যাহা বুঝি তাহা সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি। ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান। গরুর গাড়ি চলিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিছু দিন পূর্বে বিলাতে উড়োজাহাজ দেখিয়াছি তাহা স্মরণ আছে, ছেলেবেলায় কি ঘটিয়াছিল তাহারও কিছু কিছু মনে আছে ; এই সমস্ত জ্ঞানই অনুভবসিদ্ধ। অনুভবের মূলে বাস্তব ঘটনা আছে। পুনর্জন্ম যদি এইরূপ বাস্তব ঘটনা হয় তবে তাহাও অনুভবসিদ্ধ হইবে।

। ৬৬। এই অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর এক প্রকার জ্ঞান আছে তাহা অনুমানসিদ্ধ। সূর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে এই যে জ্ঞান তাহা অনুমানসিদ্ধ। অনুভব এই অনুমানের বিপরীত সাক্ষ্যই দেয় কারণ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে সূর্যই পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। তথাপি এ ক্ষেত্রে অনুমানকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবার কারণ এই যে সূর্য স্থির আছে মানিলে জ্যোতিষিক অনেক ঘটনার সহজ ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পৃথিবী ঘুরিতেছে এই কল্পনা বাদ বা theory হিসাবেই গ্রাহ্য। যদি কোন দিন অপর কোন গ্রহ হইতে কেহ বাস্তবিকই পৃথিবীকে সূর্যের চারি দিকে ঘুরিতে দেখে তবে তখন এই ধারণাকে আর বাদ বলা চলিবে না। ইহা তখন অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানেই পরিণত হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগকে সর্বদাই এইরূপ নানাপ্রকারের বাদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যদি পৃথিবীতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের সুখদুঃখভোগ বা বিভিন্ন মনুষ্যচরিত্র পুনর্জন্মবাদ দ্বারা সহজে ও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ও যদি তাহার অপর কোন সঙ্গত কারণ না পাওয়া যায় তবে বিজ্ঞানবিদ্‌ও পুনর্জন্মবাদ অবশ্য স্বীকার করিবেন। এই জন্য পূর্বে বলিয়াছি পুনর্জন্মবাদের বিচার দুই দিক দিয়া হইতে পারে।

। ৬৭। প্রথমে ঘটনা হিসাবে পুনর্জন্মবাদের বিচার করিব। পুনর্জন্ম এমনই একটা ব্যাপার যে তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞান দ্রষ্টার কোন কালেই হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে জাতিস্মরতা অর্থাৎ পূর্বজন্মের স্মৃতি প্রমাণিত হইলে পুনর্জন্মকে অনুভবসিদ্ধ বলিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে তাহার পূর্বজন্মের কথা মনে আছে ও যদি এরূপ ব্যক্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় বা তাহার কথার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেই হইবে। জাতিস্মরতা নিঃসংশয় প্রমাণিত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। আমরা প্রত্যেকেই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। কাজেই মৃত্যুই আমাদের শেষ নয়, মৃত্যুর পরেও

আমরা থাকিব ও পুনরায় সংসার ভোগ করিব এরূপ ধারণা আমাদের ইচ্ছার অনুকূল বলিয়া বিনা প্রমাণেই তাহা মানিয়া লই। বিশেষত যে এ জন্মে কষ্টভোগ করিতেছে তাহার পক্ষে সুখময় পরজন্মের কল্পনা পরম শান্তিপ্রদ। আমি যদি পূর্বজন্মে কি ছিলাম সাধারণকে তাহা হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারি তবে বিনা বিচারেই আমার কথা অনেকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে লোককে প্রতারিত করিবার প্রবৃত্তি অনেক সময় সাধু ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায়। কখনও এই প্রতারণা বক্তার অজ্ঞাতসারেই অনুষ্ঠিত হয় কখনও বা মানসিক ব্যাধির বশে এই ইচ্ছা মনে জাগে তখন রোগী নিজেও স্বকল্পিত কথাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। পরাস্মার বা paramnesia নামে এক প্রকার স্মৃতিবিকার আছে যাহার বশে রোগীর মনে কোন নূতন দৃশ্যকে পূর্বজন্মদৃষ্ট বলিয়া সংস্কার জন্মে। এরূপ স্মৃতিবিকারগ্রস্ত রোগী নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে এবং সাধারণেও তাহার মানসিক বিকার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না। অতিশয় সম্মানিত এক সাধুকে আমি এই রোগাক্রান্ত দেখিয়াছি। আমার অনেক বার জাতিস্মরতা অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটিয়াছে কিন্তু কোন বারেই যথার্থ জাতিস্মরতা দেখি নাই। জাতিস্মরতার যে সমস্ত লিখিত বিবরণ বা প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমি বলিতে বাধ্য যে জাতিস্মরতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য যে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক স্থলে জাতিস্মর ব্যক্তির উল্লেখ আছে। শাস্ত্রকারেরা কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল বর্ণনা করিয়াছেন এরূপ কথা বলা দুঃসাহসিকতার কার্য। কি প্রমাণ বিচার করিয়া শাস্ত্রকারেরা জাতিস্মরতা স্বীকার করিয়াছিলেন আমি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। আধুনিক যুক্তিবাদী বিনা বিচারে শাস্ত্রপ্রমাণ না মানিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

। **৬৮** । এখন বাদ বা theory হিসাবে পুনর্জন্মবাদ বিচার করিব। বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর কারণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্যই বাদ কল্পনা। পৃথিবীতে একজন সুখী অপরে দুঃখী এই যে প্রত্যক্ষ ঘটনা ইহার কারণ কি। কেন এই অসামঞ্জস্য। যদি মানিয়া লইতে পারিতাম যে ইহাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম তবে গোল মিটিয়া যাইত। পৃথিবীতে কোন দুই বস্তুরই অবস্থা একপ্রকারের নহে তবে মানুষের অবস্থাই বা একপ্রকার হইবে কেন। সোনা কেন সোনা, লোহা কেন লোহা, চন্দন ও পঙ্ক কেন এক নয় এ সব প্রশ্ন কেহ করে না। তবে মানুষের বেলাই এ প্রশ্ন হয় কেন। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত মানুষ কষ্টে পড়িলেই

তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে ও পরের সুখ দেখিয়া তাহার মনে মাৎসর্যভাবের উদয় হয় এ জন্যই সে পরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করে। যে বিজ্ঞানবিৎ সাম্যবুদ্ধিযুক্ত তাঁহার মনেও এই প্রশ্ন উঠিবে সত্য কিন্তু তাঁহার কাছে পঙ্ক ও চন্দন এক নহে কেন, আর দুই ব্যক্তির অবস্থা একপ্রকারের নয় কেন, এই দুই প্রশ্নই সমান। এই সমস্যাই ঋষির মনে পৃথিবীতে নানাত্ব কেন প্রশ্ন তুলিয়াছিল। ঋষিরা তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য। তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিলেন নেহ নানাস্তি কিঞ্চন অর্থাৎ পৃথিবীতে নানাত্ব নাই। এক ও অদ্বিতীয় সত্তা মাত্র আছে। মায়াবশে আমরা নানাত্ব দেখি। সাধারণ বুদ্ধিতে এ উত্তর প্রহেলিকাবৎ ও অবিশ্বাস্য। সাধারণ মানুষ নানাত্ব উড়াইয়া দিতে পারে না। ইট কাঠ পাথরে নানাত্ব থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু সুখী ও দুঃখীর ভিতর যে পার্থক্য তাহা অবহেলা করা যায় না। এ জন্যই অন্য সব বিষয়ে নানাত্ব স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া মানুষের বেলাই তাহার কারণ অনুসন্ধানের দরকার হয়। ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইলে জীবন দুর্বহ হয়। অতএব প্রশ্ন উঠে কেন এই অবিচার। পঙ্ক ও চন্দনের প্রভেদ যেমন এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন, বিভিন্ন মানুষের অবস্থাভেদও সেইরূপ অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন মানিতে পারিলে কথঞ্চিৎ শান্তি হইত। কোন কোন সাধকের মনে এই ভাব জাগে সত্য কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই অজ্ঞেয় শক্তি সর্বশক্তিমানের শক্তিরই এক অংশ। সে ভগবানকে একেবারে অজ্ঞেয় বলে না। ভগবানের অন্তত দুইটি গুণ সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চয় ধারণা পোষণ করে। একটি তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা ও দ্বিতীয়টি তাঁহার পরমকারুণিকতা। পরম কারুণিক ভগবানের রাজত্বে এক ব্যক্তি সুখী ও এক ব্যক্তি দুঃখী কিরূপে হইতে পারে। ভগবান যখন করুণাময় তখন এ জন্মের দুঃখ পরজন্মে ঘুচিবে। এ জন্মেই বা দুঃখ কেন। তাহার উত্তর গত জন্মের পাপের ফলে। ভগবান করুণাময়ও বটেন ন্যায়বানও বটেন এ জন্মে দুষ্কার্য করিয়া যে আপাতত সুখ ভোগ করিতেছে পরজন্মে সে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। ইহাই অনেকের সাধু পথে থাকিয়া কষ্টভোগ করিবার সান্ত্বনা। জন্মান্তরবাদ মানিলে ভগবানের কারুণিকতা ও ন্যায়বত্তা বজায় রহিল ও অবস্থাভেদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সাধারণের কাছে পুনর্জন্মবাদের এই বিচার গ্রাহ্য হইলেও বিজ্ঞানীর কাছে তাহা যুক্তিসহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞানী বলিবেন নানাত্ব মানিলে ভগবানকে

একাধারে পরমকারুণিক, ন্যায়বান ও সর্বশক্তিমান বলা যায় না। পরমকারুণিক মানে যিনি সামান্য কষ্টও নিবারণ করেন। একজন পোলাও কালিয়া খাইতেছে ও আর এক জনের সামান্য শাকান্ন জুটিতেছে না এতটা প্রভেদ দূরে থাক, তোমার রোলস রইস মোটরকার আর আমার মিনার্ভা গাড়ি ও সে জন্য আমার যে ঈর্ষার কষ্ট ভগবান পরমকারুণিক ও ন্যায়বান হইলে তাহাও নিবারণ করিতে বাধ্য। পৃথিবীতে যত দিন তিলমাত্র কষ্টও কাহারও মনে থাকিবে তত দিন ভগবানকে পরমকারুণিক বলা চলিবে না। পরমকারুণিক ব্যক্তি যদি অক্ষম হন তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু ভগবান সর্বশক্তিমান। তাঁহার দোষক্ষালনের উপায় নাই। পিতা পুত্রকে তাহার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন বা কষ্ট দেন। ভগবানও সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের কষ্ট দেন। এ যুক্তিও নিতান্ত অসার। ছেলেকে মিষ্ট কথা বলিয়া সৎপথে আনিতে পারিলে তাহাকে পিতা কখনই তাড়না করেন না। অবশ্য মিষ্ট কথায় সৎপথে আনা অসম্ভব হইলে বা অন্য উপায় না জানা থাকিলে তাড়নায় দোষ নাই। সর্বশক্তিমান ভগবান তাড়না ভিন্ন পাপীকে অন্য উপায়ে সংশোধন করিতে পারেন না বলা নিতান্ত হাস্যকর। সাধারণ মনুষ্য যদি কাহাকেও পাপ কাজ করিবার উপক্রম করিতে দেখে তবে সেও তাহা সাধ্যমত নিবারণের চেষ্টা করে। আমরা সকলেই স্বীকার করি prevention is better than cure আরোগ্যচেষ্টা অপেক্ষা রোগ নিবারণের চেষ্টা শ্রেয়স্কর কিন্তু ভগবান ক্ষমতাসত্ত্বেও পাপীকে পাপ হইতে নিরস্ত না করিয়া তাহাকে পাপ করিতে দিতেছেন ও পরে তাহার শাস্তি বিধান করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা ক্রূর কর্ম কি হইতে পারে। অপর পক্ষে পুনর্জন্মবাদ মানিলেও ভগবানকে ন্যায়বান বলা যায় না। সাধারণ মনুষ্য জাতিস্মর নহে। পূর্বজন্মে কি ছিলাম এ জন্মে তাহা আমার মনে নাই। অতএব আমার নিকট এ জন্মের আমি ও পরজন্মের আমি রাম ও শ্যামের ন্যায় দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। একের পাপে অন্যের শাস্তি নিতান্তই অশোভন। আমি যদি নাই জানিলাম আমি কি পাপের শাস্তি পাইতেছি তবে সে শাস্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই সমস্ত বিচার করিলে বিজ্ঞানী বলিবেন, ভগবানকে সর্বশক্তিমান মানিলে ন্যায়বান ও পরমকারুণিক বলা চলিবে না। ভগবদ্ভক্ত বলিবেন, এ সব তর্ক ছাড়িয়া দাও। ভগবান লীলাময়, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তাঁহার লীলার কি বুঝিব। বিজ্ঞানী উত্তরে বলিতে পারেন, তবে সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহাকে কারুণিক বলা কি করিয়া। তাঁহাকে কারুণিক ও শক্তিমান ইত্যাদি পরস্পর-

বিরোধী বিশেষণে অভিহিত না করিয়া আমরা তাঁহাকে কিছুই জানি না এ কথা বল। পৃথিবীতে বর্তমান অবস্থা যত দিন থাকিবে তত দিন তাঁহাকে কারুণিক বলিও না। করুণাময় ভগবানের উপর ভক্তের বিশ্বাস তর্কে অপনীত হইবার নহে কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে এ বিশ্বাসের মূল্য নাই। দেখা গেল, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জন্মান্তরবাদের ভিত্তি করা গিয়াছিল যুক্তিতে তাহা টিকিল না।

। ৬৯। ভগবানকে টানিয়া না আনিলেও জন্মান্তরবাদের বিচার হইতে পারে। পূর্বজন্মকর্মফল মানিলে এ জন্মের ব্যক্তিগত বিভিন্নতার ব্যাখ্যা হয় সত্য কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে পূর্বজন্মেই বা ভেদ হইল কেন। অতএব কর্মকে অনাদি ও তদুৎপন্ন ভেদও অনাদি মানিতে হইল। ভেদকে অনাদি বলিলে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইল না। এই জন্মেই ভেদের কারণ আছে বলায় যে দোষ সেই দোষই রহিল। বাদ হিসাবেও জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পুনর্জন্ম প্রমাণ করিবার জন্য আরও কয়েক প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মৃত্যুকে আমরা সকলেই ভয় করিয়া থাকি, এমন কি সদ্যোজাত শিশুতেও মৃত্যুভয় লক্ষিত হয়। পূর্বজন্মে মৃত্যুযাতনার অনুভূতির সংস্কার মৃত্যুভয়ের কারণ বলিয়া মানিতে হয়, নচেৎ অজ্ঞাত ব্যাপারে ভয় কেন হইবে। সদ্যোজাত প্রাণীর স্তন্যপান প্রভৃতির চেষ্টা দেখিলে পূর্বজন্ম অনুমিত হয়। জননীর স্তনে দুগ্ধ আছে শিশু তাহার পূর্বসংস্কারবলে জানিতে পারে। কাহারও কাহারও কোনও বিষয়ে সহজাত জ্ঞান দেখা যায়, যথা, অতি সামান্য চেষ্টায় কেহ অসামান্য গণিতজ্ঞ হইল; পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান বর্তমান জন্মে প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই অনুমান করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিলে নিজ বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না, বালকও নিজের বালকত্ব অনুভব করে না। আত্মা অবিকারী বলিয়াই দেহের পরিবর্তন সত্ত্বেও নিজের পরিবর্তন অনুভব করে না। আত্মার অমরত্ব ও দেহের ক্ষরত্ব জন্মান্তরবাদের পরোক্ষ প্রমাণ। হিন্দুশাস্ত্রকথিত এই সমস্ত যুক্তি অবিসংবাদী নহে। আধুনিক প্রাণিবিৎ পূর্বজন্মের অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া বংশগত সংস্কার বা heredity মানেন। শিশু যে মরণভয়ে ভীত হয়, জন্মিবামাত্র মাতৃস্তনের সন্ধান করে, কেহ কেহ অল্পায়াসে অধিক জ্ঞানার্জন করে এ সমস্ত বংশগত সংস্কার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। জন্মান্তর মানিবার কোন আবশ্যক থাকে না। বানর-শিশুর সংস্কার বানর জাতিরই উপযুক্ত। সে কোনও জন্মে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার মনুষ্যশিশুর ন্যায় সংস্কার লক্ষিত হইত। বলা যাইতে পারে

তাহার মনুষ্যযোনির সংস্কার অভিভূত অবস্থায় বর্তমান থাকে কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে বানর-যোনিতে জন্মিবামাত্র তাহার শাখাগ্রহণাদির ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল। অগত্যা প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া বংশগত সংস্কার মানাই যুক্তিযুক্ত। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার প্রাণীর উপযোগী সংস্কার অব্যক্ত অবস্থায় আছে। যে জীবযোনিতে জন্ম হয় কেবল তদুপযোগী সংস্কার প্রকট হয় অপর সংস্কারসমস্ত অব্যক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়।

। ৭০। আর এক দিক দিয়া জন্মান্তরবাদের বিচার করা যাইতে পারে। জন্মান্তর স্বীকার করিতে হইলে আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না তাহার সম্পূর্ণ বিচার অল্প কথায় সম্ভবপর নহে। আমরা আমি বলিলে যাহা বুঝি তাহাকেই আত্মা বলা হয়। 'আমি'টা কি বস্তু সাধারণের সে সম্বন্ধে ধারণা বড়ই অস্পষ্ট। বিদ্বান ব্যক্তিরাও এ সম্বন্ধে একমত নহেন। আধুনিক শারীরবিৎ, মনোবিৎ ও দার্শনিকদের মধ্যে এই 'আমি' লইয়া নানা বিচার ও বিতণ্ডা চলিতেছে। কেহ বলেন, এই দেহটাই 'আমি'। দেহাতিরিক্ত আমি বা আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। যকৃৎ হইতে যেরূপ পিত্ত নিঃসৃত হয় সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে আমিত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের বিকারে আমিত্বের জ্ঞানও নষ্ট হয়। ইহা চিকিৎসকদিকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আত্মাই যখন নাই তখন পুনর্জন্মবাদ কিরূপে মানিব। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। অপরে বলেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণই আমিভাব, অতএব প্রাণই আমিভাবের মূল। কোন মনোবিৎ বলিবেন, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের সমষ্টি হইতেই আমিভাব উৎপন্ন হয়, পৃথক আমি বলিয়া কিছু নাই। অপর মনোবিৎ বলেন, ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে আমি জ্ঞান জন্মে না কিন্তু কাম ক্রোধাদি emotion বা প্রক্ষোভগুলিই আমিভাবের জনক। কেহ বলেন মনই আমি। আশ্চর্যের কথা এই যে পুরাকালে আমাদের দেশে এই সমস্ত মতই প্রচলিত ছিল, এবং তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইত। হিন্দুশাস্ত্রের স্থির মত এই যে এ সমস্তের একটিও আমি নহে। এই জন্যই শংকরাচার্য বলিয়াছেন,

মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত আমি নই
নহি ব্যোম ভূমি না বা তেজ বায়ু হই।
নহি শ্রোত্র জিহ্বা আমি নহি নেত্র ঘ্রাণ
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান॥

নহি সপ্তধাতু আমি নহি পঞ্চবায়ু
নহি বাক পাণি পাদ না উপস্থ পায়ু।
নহি পঞ্চকোষ আমি নহি আমি প্রাণ
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান॥

আমি যে এগুলির একটিও নহি ভাষাতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা বলি আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়, আমার প্রাণ, আমার মন ইত্যাদি। আমি শরীর, আমি মন, এরূপ বলি না। দেহাশ্রিত কিন্তু দেহ-মন-প্রাণাতিরিক্ত এক আমি বা আত্মা হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, প্রাণ, মন প্রভৃতি আত্মার আবরণ। প্রথম দৃষ্টিতে এই আবরক কোষগুলির এক একটিকে আমি বা আত্মা বলিয়া মনে হয়। কঠোর সাধনার ফলে এই আবরণগুলি ছিন্ন হয় ও তখন আমি বা আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবল্লীতে এই সাধনার কথা উল্লিখিত আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিরোচনসংবাদে কথিত হইয়াছে যে ১০১ বৎসর তপস্যার পর ইন্দ্র এই কোষগুলি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাকালে অনেক ঋষিও যে আত্মতত্ত্ব নির্ধারণে পারগ হইয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ উপনিষদে রহিয়াছে।

।৭১। আধুনিক যুক্তিবাদীর পক্ষেও এই সকল বিবরণ অগ্রাহ্য করা সমীচীন হইবে না। বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ পরীক্ষা আমরা নিজেরা না করিতে পারিলেও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানবিদের কথাই প্রমাণ বলিয়া মনে করি। অবশ্য বিজ্ঞানবিদের উপর অশ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহার কথা নাও মানিতে পারি। যিনি মনে করিবেন ঋষিরা ভুল করিয়া বা মিথ্যা করিয়া তাঁহাদের আত্মোপলব্ধির কথা লিখিয়া গিয়াছেন তিনি আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিবেন না। হিন্দু কিন্তু এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসবান সে জন্য তিনি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মানেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে যুক্তিতর্কের দ্বারাও আত্মার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। ঋষিরা আত্মা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, যথা,—আত্মা জড়ধর্মী নহে, যাহা আত্মা তাহা চেতন, যাহা অনাত্মা তাহা অচেতন বা জড়। মনও সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। আত্মার সান্নিধ্যেই মনে চেতনার স্ফুরণ হয়। সর্বপ্রাণীতেই আত্মা আছে, তবে ইতর প্রাণীতে আত্মার প্রকাশ বা চেতনা তত পরিস্ফুট নহে। জড়েও আত্মা অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান। আত্মার প্রকাশ যতই অপরিস্ফুট হইবে মনুষ্য বা প্রাণী ততই নিম্নস্তরের হইবে। হিন্দুধর্মের চরম উদ্দেশ্য আত্মার স্বরূপ

উপলব্ধি। এই আত্মার যখন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও বাসনার আবরণ থাকে তখনই তাহা জীবাত্মা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই আবরণ খসিয়া গেলে জীবাত্মার মুক্তি হয়, তাহা পরমাত্মাতে লীন হয়। বাসনার আবরণের বশে জীবাত্মা দেহ ধারণ করে। মনুষ্য যেমন ইচ্ছামত বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে সেইরূপ জীবাত্মা নিজ বাসনামত শরীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় ভোগ করে। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

উর্দ্ধে প্রাণ আর অধে অপানকে যিনি করেন চালনা।
মধ্যাসীন সে বামনে সকল দেবতা করে উপাসনা॥
ভ্রংশ্যমান এই দেহে অধিষ্ঠাতা দেহী যারে বলা হয়।
দেহ হ'তে মুক্ত হ'লে তিনি অবশিষ্ট কিবা তাতে রয়॥
না বা প্রাণে না অপানে জীব করে কভু জীবনধারণ।
উভয়ে আশ্রিত অন্যে যেই হয় সেই জীবন কারণ॥ ।৫।৩-৫

অর্থাৎ, বামন বা পূজনীয় আত্মাই দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় (দেবতা) ইত্যাদির অধিপতি। তাঁহারই বশে প্রাণ ইত্যাদি চলিতেছে। তিনি দেহত্যাগ করিলে দেহে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

। ৭২। এই সমস্ত কথা মানিয়া লইয়া পুনর্জন্মবাদের বিচার করা যাক। জীবাত্মা স্বীয় বাসনা ভোগের জন্যই দেহ সৃষ্টি করে। অতএব যত দিন বাসনার বিনাশ না হইবে তত দিন জীবাত্মা সুযোগ পাইলেই দেহ সৃষ্টি করিবে। এক দেহ নষ্ট হইলে জীবাত্মা অপর দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইবে। কথাটা উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট হইবে। কোন বৃক্ষে দেখিলাম যে পক্ষীর নীড় রহিয়াছে কিন্তু পক্ষীকে দেখিতে পাইলাম না। এই নীড় ভাঙিয়া দিলাম। পক্ষিতত্ত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, পক্ষীর এই সময়ে শাবক হইবে সে জন্য তুমি যত বারই বাসা ভাঙ্গিয়া দাও না কেন সে পুনরায় উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাসা বাঁধিবে। যত দিন তাহার শাবক-পালনের ইচ্ছা থাকিবে তত দিন সে নীড় রচনা করিবেই। একটি বাসা ভাঙিয়া দিবার পর পুনরায় কোন্ বাসাটি পাখী তৈয়ার করিল তাহা বলা যাইবে না কারণ পাখীকে আমরা দেখিতে পাই নাই। জীবাত্মার পুনর্জন্ম এই প্রকারের ব্যাপার। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বলেন কামনানুযায়ী আত্মা শরীর ধারণ করে। ভাল বাসনা থাকিলে উচ্চ স্তরে জন্ম হয়। নিকৃষ্ট বাসনার বশে ইতর যোনিতে জন্ম হয়।

বাসনা ক্ষয় হইলে পুনর্জন্ম হয় না। ইহাই পুনর্জন্মবাদ। শ্রীকৃষ্ণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

। ৭৩। এই জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী কতকগুলি কূট প্রশ্ন তুলিতে পারেন। আত্মাই যখন প্রাণের অধিষ্ঠাতা ও প্রাণ যখন আত্মার বশে চলে তখন মানিতে হয় আত্মার দেহত্যাগে প্রাণত্যাগ হয়। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কাটিয়া ফেলি তবে তাঁহার আত্মা কি করেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রকৃতি হইতেই আত্মা প্রাণ ইত্যাদি দেহের সমস্ত জড় উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রকৃতি বিপর্যয়ে দেহ ছিন্ন হইলে প্রাণ নষ্ট হয় ও দেহ তখন বিষয়ভোগের উপযোগী থাকে না বলিয়াই আত্মা তাহা ত্যাগ করে ও পরে সুযোগমত অন্য শরীর গ্রহণ করে। প্রকৃতির নিয়মের বশেই সুযোগ খুঁজিয়া জীবাত্মাকে চলিতে হয়। আবার প্রশ্ন উঠিবে, সকল প্রাণীতেই আত্মা আছে। এমিবা (amoeba) নামক প্রাণীতেও আত্মা আছে। একটি এমিবাকে শস্ত্রদ্বারা বিভক্ত করিলে দুইটি এমিবার উৎপত্তি হয়। কোন কোন বৃক্ষের ডাল কাটিয়া পুঁতিলে আর একটি বৃক্ষ জন্মে। এই পরীক্ষায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও কি বিভক্ত হইয়া দুইটি আত্মায় পরিণত হইল। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, শস্ত্র আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না। তবে এ দ্বিতীয় আত্মা কোথা হইতে আসিল। কবে, কোথায় অণুপ্রমাণ এমিবার শরীর ছিন্ন হইবে ও সেই শরীরেরই যোগ্য বাসনা-যুক্ত আত্মা তাহাতে প্রবেশ করিবে এই আশায় কি সে আত্মা অপেক্ষা করিতেছিল। উত্তরে বলিতে হয় জীবাত্মাও পরমাত্মার ন্যায় সর্বব্যাপী, সে জন্য উপযুক্ত সুযোগ পাইবা মাত্র নিজ কামনানুযায়ী শরীরে প্রবেশ করে। কখনও আবশ্যকানুযায়ী শরীর একেবারেই লাভ করে, কখনও বা তাহাকে বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর গঠন করিয়া লইতে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ, অর্থাৎ, অণু হইতেও অণু ও মহৎ হইতেও মহৎ আত্মা প্রাণীদের গুহামধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে নিহিত আছেন।

। ৭৪। অতএব দেখা যাইতেছে ঋষির আত্মোপলব্ধির বিবরণ মানিয়া লইলে বাদ হিসাবে পুনর্জন্ম মানিতে হয়। জাতিস্মরতা মানিলে ঘটনা হিসাবেই পুনর্জন্ম মানিতে হয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে মৃত্যুর পর আত্মার পুনর্জন্মবাদ কেবল যে আমাদের মত আধুনিক যুক্তিবাদীর পক্ষেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব তাহা নহে। কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতা যখন যমকে প্রশ্ন করিলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না, তখন

যম বলিলেন, ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ, অর্থাৎ এই ব্যাপার সহজে বুঝিতে পারা যায় না, অতএব হে নচিকেতা মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।

৫। সৃষ্টিতত্ত্ব

।৭৫। সৃষ্টি অর্থে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সমন্বিত পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা প্রভৃতি বিশ্বজগতের তাবৎ পদার্থ বুঝায়। যাহা কিছুর অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি তাহাই সৃষ্টির অন্তর্গত। সৃষ্টিতত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট সৃষ্টির পূর্বোক্ত প্রকটিত বা ব্যক্ত অবস্থাই প্রতিভাত হয়। অতএব সৃষ্টির তত্ত্ব জানিতে হইলে এই দৃশ্য জগতের স্থূল পদার্থসমূহ হইতেই অন্বেষণ আরম্ভ করিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ, যুক্তিবিচার ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করেন যে এই পৃথিবীর পূর্বে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাহা জ্বলন্ত সূর্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই সূর্য নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে অণুসমষ্টির দ্বারা নীহারিকা গঠিত তাহা আবার সূক্ষ্মতর ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন এবং ফোটন নামক পরমাণুর সমষ্টি। এই ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ও ফোটন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ এখনও কিছু জানা যায় নাই। এই পরমাণুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল এবং কি করিয়াই বা ইহাদের সংযোগে নীহারিকার জন্ম হইল এখনও সে সকল তত্ত্ব জানা যায় নাই। নীহারিকা হইতেই জ্বলন্ত সূর্য তারকার উৎপত্তি। এই সকল সূর্য তারকা কেহই স্থির নহে, তাহারা সকলেই ভীমবেগে আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালক্রমে সূর্য হইতে কিয়দংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইল ও পৃথিবী বায়বীয় ও জ্বলন্ত অবস্থায় সূর্যের চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। বহু যুগ অতীত হইলে ক্রমে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইল ও তাহার বহিরাবরণ প্রথমে তরল ও পরে কঠিন হইয়া মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির উৎপত্তি হইল। আরও শীতল হইলে বাষ্প জমিয়া পৃথিবীতে বারিপাত হইতে লাগিল ও নদী, নদ ও সমুদ্রের উৎপত্তি হইল। এত দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণবস্তু কিছুই ছিল না। সমুদ্রমধ্যেই প্রথমে প্রোটোপ্লাস্‌ম্ নামক জৈবিক পদার্থ জন্মিল এবং ইহা হইতে অতি ক্ষুদ্র আদি জীব উৎপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে বহু যুগে এই আদি জীব হইতে এক দিকে বৃক্ষলতাদি ও অপর দিকে প্রাণিবর্গ জন্মিল। প্রাণিবর্গের মধ্যেই প্রথম চেতনা দেখা দিল। আদিম প্রাণী হইতে বহু সহস্র যুগে ক্রমোন্নতির ফলে

মনুষ্যের উৎপত্তি হইল এবং মনুষ্যেই চেতনার সম্যক স্ফুরণ হইল। আধুনিক বিজ্ঞানমতে ইহাই সৃষ্টিপ্রকরণ। এই মতে জড় পদার্থ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া পরে প্রাণিবর্গ ও সর্বশেষে চেতনার উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু দর্শনের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু শাস্ত্রমতে চেতনাই সর্বপ্রথম এবং তাহা হইতেই সমস্ত জড়বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের শরীর ও এমন কি মনও এই জড়বর্গের অন্তর্গত। প্রাচ্য দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্বে এই গুরুতর ভেদের কারণ বিচার্য।

। ৭৬ । হিন্দু দার্শনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবাদীকে বলিবেন, তুমি যে উপায়ে সৃষ্টিরহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাতে কখনই চরম তত্ত্বে পৌঁছিতে পারিবে না। ইলেক্‌ট্রন ইত্যাদির উৎপত্তি খুঁজিতে গিয়া হয় ত আরও সূক্ষ্ম জড়ের সন্ধান পাইতে পার কিন্তু জড়ের মূল কোথায় কোন কালেই তাহার ইয়ত্তা পাইবে না। তোমার সূক্ষ্ম জড় যে আকাশে রহিয়াছে সেই আকাশের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল ? তুমি সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব না বুঝিয়া প্রথমেই ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছ অথবা সৃষ্টির মূল তত্ত্বে পৌঁছান তোমার বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট নহে। যেমন ভোক্তার অভাবে ভোজ্য দ্রব্যের স্বাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না সেইরূপ জ্ঞাতার অভাবে সৃষ্টির কল্পনা অসম্ভব। আমরা চিনিতে মিষ্টত্ব গুণ আরোপ করি সত্য কিন্তু এই মিষ্টত্ব আস্বাদন দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় এবং আস্বাদনকালেই ইহার উৎপত্তি। চিনি ও রসনেন্দ্রিয় এই দুইয়ের সংযোগেই মিষ্টত্বের সৃষ্টি। ইহার যে কোনটির অভাবে মিষ্টত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরা চিনিকে যে মিষ্ট বলি তাহার কারণ এই যে চিনির সহিত সর্বদাই কোন আস্বাদনকারীর অবিচ্ছিন্ন সংযোগ কল্পনা করি। যিনি চিনির মিষ্টতার উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহার পক্ষে আস্বাদনকারীকে বাদ দেওয়া চলিবে না। চিনির মিষ্টতা ব্যতীত আরও কতকগুলি গুণ আছে, যথা, চিনির বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট স্পর্শ ইত্যাদি। আস্বাদনকারী ব্যতীত যেমন চিনির মিষ্টতা উৎপন্ন হয় না সেইরূপ দ্রষ্টা ব্যতীত চিনির কোন রূপও কল্পনা করা যায় না এবং স্পর্শকারিনিরপেক্ষ চিনির কোন স্পর্শগুণ থাকাও সম্ভবপর হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই চিনি প্রভৃতি সর্বপ্রকার বহির্বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করি। যদি আমাদের কাহারও ইন্দ্রিয়জ্ঞান না থাকিত তবে জগতের কোন পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারিতাম না অর্থাৎ কোন পদার্থই থাকিত না। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না। বিষয়ী ভিন্ন বিষয় থাকে না। বিষয় ও বিষয়ী, দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ, চেতন ও জড় পরস্পরের সংযোগে উভয়ে

সার্থক হয়। একেকে বাদ দিয়া অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না। সৃষ্টি, অস্তি ইত্যাদি ভাবের পশ্চাতে সর্বদাই এক অপরিহার্য চেতনসত্তা মানিতে হয়। এই জন্যই কাপিল সাংখ্য প্রকৃতিরূপ জড় ও পুরুষরূপ চেতন পদার্থের সংযোগে সমস্ত সৃষ্টি হয় বলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর প্রতিপাদ্য চেতনানিরপেক্ষ জড়োৎপত্তি গ্রাহ্য নহে। আমরা দৃশ্য হউক, অদৃশ্য হউক, অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যখনই কোনও জড়ের স্থিতি মানিয়া লই তখনই অজ্ঞাতসারে তাহার এক কাল্পনিক জ্ঞাতার অস্তিত্বও মানিয়া লই। পদার্থবিজ্ঞানের চেষ্টা বিষয়িনিরপেক্ষ বিষয়ের অনুসন্ধান। এই চেষ্টা একদেশদর্শী সে জন্য ইহার দ্বারা দার্শনিক চরম তত্ত্বে পৌঁছান যাইবে না। পদার্থবিজ্ঞান ইচ্ছা করিয়াই নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন দোষ স্পর্শে নাই।

। ৭৭। সাংখ্য, জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই সত্তা মানিয়া লইয়া সৃষ্টিপ্রকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই দুইয়ের কোন একটিকে বাদ দেওয়া চলে না কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এই দুই তত্ত্বের গুরুত্ব সমান নহে। ইন্দ্রিয়দ্বার ব্যতিরেকে জড় প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়েই জড় সিদ্ধ হয় কিন্তু চেতনা স্বয়ংসিদ্ধ। আমরা জড়জগতের সমস্ত ব্যাপার ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ দোভাষীর সাহায্যে জানিতে পারি। মধ্যে এই দোভাষী থাকায় মনে স্বতই সন্দেহ জন্মে যে জড়ের প্রকৃত তত্ত্ব আমরা জানিতে পারিতেছি কি না। যখন দেখি যকৃতের দোষে চক্ষুরিন্দ্রিয় বিকৃত হইলে শ্বেতবর্ণকে হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তখন এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাবজাত কোন দোষ থাকিলে বহির্বস্তু বিকৃত হইয়াই প্রতিভাত হইবে এবং সেই ভ্রম কোন কালেই আমরা ধরিতে পারিব না। এরূপ ক্ষেত্রে বহির্বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব আমরা জানি বলা চলে না। দূরবীক্ষণের কাচের দোষে আমরা যেরূপ দূরস্থ বর্ণহীন পদার্থকেও বর্ণসংযুক্ত দেখি হয় ত সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠনের দোষে বাস্তবিক বর্ণহীন পৃথিবীকে বিচিত্র বর্ণময় দেখিতেছি। এই সন্দেহ নিরাকরণের কোন উপায় নাই। আরও গুরুতর সন্দেহের কথা আছে। স্বপ্নকালে আমরা এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করি। স্বপ্নদৃষ্ট নদী, পর্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির কোন বাস্তব সত্তা নাই। স্বপ্নকালীন চেতনায় যে সকল জড় বস্তু প্রতিভাত হয় তাহাদের বাস্তব অস্তিত্বে প্রতীতি জন্মিলেও তাহারা বস্তুনিরপেক্ষ ও মনঃকল্পিত। স্বপ্নকালে স্বপ্নজগতের

মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও তদ্দ্বারা প্রকাশিত জড়জগৎ বাস্তব সত্তা নাও হইতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় যে জগৎ সত্য বলিয়া অনুভূত হয় মোক্ষাবস্থায় হয় ত তাহার মিথ্যাত্ব ধরা পড়ে। এই সকল বিচার হইতে বুঝা যাইবে যে চেতন ও জড় এই দুই আদিতত্ত্বের মধ্যে চেতনারই গুরুত্ব অধিক। বেদান্তমতে চেতনা হইতেই জড়ের উৎপত্তি। ব্রহ্মরূপ চেতনার আশ্রয়েই জড়জগৎ প্রতিভাসিত হয়। জড়ের নিজস্ব পৃথক সত্তা নাই। মোক্ষকালে জগতের সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মে লীন হইয়া নানাত্ব জ্ঞান লোপ পায়। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তাই থাকিয়া যায়। কাপিল মতে জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় সত্তাই সত্য এবং উভয়ের সংযোগেই জগৎ সৃষ্ট হয়। পুরুষ বহুসংখ্যক কিন্তু প্রকৃতি এক এবং সেই জন্যই প্রত্যেক পুরুষের নিকট সৃষ্টি একই প্রকার বলিয়া অনুভূত হয়। সৃষ্টির অভিব্যক্তিকালে পুরুষের চেতনার আশ্রয়েই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়। সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ স্থূল জগতের অনুভূতি জন্মে। ইহাই সৃষ্টি।

। **৭৮**। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কোনও না কোন ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা পুরুষের চেতনায় প্রবেশ করে। অধিকাংশ পদার্থের অস্তিত্ব একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জানিতে পারি। বহির্বস্তুর প্রকাশক ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি, যথা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। স্থূল চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান মাত্র। যে শক্তির দ্বারা আমরা দেখি তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। চক্ষু দুইটি কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় একটি। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদি। বহির্বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতেই তাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে ক্রিয়াশীল করে। বহির্বস্তুর যে গুণে চক্ষুরিন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয় তাহার নাম রূপ কিন্তু রূপবোধ মনের অনুভূতি। রূপের অনুভূতিকেও রূপ বলা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বলিলে বাহিরের রূপ, রস ইত্যাদি ও মনের রূপ রস ইত্যাদির অনুভূতি উভয়ই বুঝাইতে পারে। এই দুইয়ের পার্থক্য পরে আরও বিশদ হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতির উত্তেজক বহির্বস্তুতে পাঁচটি পৃথক গুণ কল্পিত হইয়াছে, যথা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ। সকল পদার্থেই এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান নাই। গুণের সংখ্যাধিক্যে জড় পদার্থ স্থূল বিবেচিত হয় এবং সংখ্যালাঘবে তাহা সূক্ষ্ম হয়। মৃত্তিকাতে পাঁচটি গুণই বর্তমান, কারণ আমরা চক্ষুদ্বারা মৃত্তিকা দেখিতে পাই, জিহ্বাদ্বারা তাহার স্বাদ পাই, নাসিকা দ্বারা তাহার গন্ধ পাই, ত্বকের দ্বারা তাহার

স্পর্শ অনুভব করি এবং কর্ণের দ্বারা মৃত্তিকায় আঘাতজনিত শব্দ শুনিতে পাই। বিশুদ্ধ জলে কোন গন্ধ নাই কিন্তু তাহার এক বিশিষ্ট স্বাদ অনুভূত হয় অর্থাৎ জল পান করিলে বুঝিতে পারি জল পান করিতেছি, জল দেখিতে পাই, জলোত্থিত শব্দ শুনিতে পাই এবং স্পর্শদ্বারাও জলের অস্তিত্ব জানিতে পারি। জলে গন্ধ ব্যতীত আর চারিটি গুণই বর্তমান। জল পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্ম জড়। অগ্নি জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কারণ তাহাতে মাত্র তিন গুণ বর্তমান, যথা, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। জিহ্বার স্পর্শগুণ দ্বারা অগ্নির অস্তিত্ব জানিতে পারি সত্য কিন্তু অগ্নির কোন স্বাদ নাই অর্থাৎ অগ্নির রসেন্দ্রিয়-উত্তেজক কোন গুণ নাই। ধূমে গন্ধ অনুভূত হইলেও অগ্নিতে গন্ধ নাই। বায়ু অগ্নি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কারণ মাত্র স্পর্শ ও শব্দ দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। আকাশ সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম জড়পদার্থ। আকাশে মাত্র শব্দগুণ বর্তমান।

।৭৯। আকাশ বলিলে হিন্দুশাস্ত্রকাররা কি বুঝিতেন তাহা বিচার্য। প্রথমত, আকাশ শূন্য নহে। যাহা শূন্য তাহা নাই। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এবং চন্দ্র সূর্য তারকা ইত্যাদি সমস্তই আকাশে অবস্থিত। জড় পদার্থের মধ্যে আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মতম সেইরূপ বৃহত্তমও বটে। এ জন্য অনেক ঋষি আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অনেকে আকাশকে ইংরেজীতে space বলেন। তাঁহাদের মতে বিস্তার, দূরত্ব, ব্যবধান ইত্যাদির অনুভূতি আকাশেরই অনুভূতি। আধুনিক মনোবিদ বলেন, আমরা প্রধানত দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দের দ্বারা দূরত্ব বা ব্যবধান বুঝিতে পারি। অতএব এই সকল অনুভূতিতে যদি আকাশ পদার্থ নির্দিষ্ট হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশের অন্তত তিনটি গুণ আছে, যথা, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। অতএব আকাশকে বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা চলিবে না। কেহ বলিতে পারেন যে আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না বা স্পর্শ করিতেও পারি না অতএব দূরত্ব ব্যবধান প্রভৃতি যাহা দৃষ্টি বা ত্বক দ্বারা অনুভব করি তাহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমান মাত্র। অতএব আকাশে রূপ বা স্পর্শগুণ নাই। এই যুক্তিতে আকাশে শব্দগুণও আরোপ করা চলে না। কারণ শব্দদ্বারা যে দূরত্বের অনুভূতি হয় তাহাও অনুমানসাপেক্ষ। এই বিচারে আকাশের কোন গুণই রহিল না এবং আকাশ বলিয়া কোনও মৌলিক পদার্থ বা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল না। বৌদ্ধমতে শব্দগুণ বায়ুর, আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। উপরি উক্ত বিচার হইতে বুঝা যাইবে যে দূরত্ব, ব্যবধান, বিস্তার ইত্যাদিকে কাপিল শাস্ত্রে আকাশ বলা হয় নাই। আকাশ ভিন্ন পদার্থ। সাংখ্যে

দূরত্বাদি দিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচন ২।১২ সূত্রে আছে দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ অর্থাৎ দিক ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন ; আদি শব্দে আকাশ ব্যতীত অন্যান্য মহাভূতও বুঝাইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যমতে দিক ও কাল মহাভূতদিগের গুণ হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ রূপ, স্পর্শ, শব্দ, রস ও গন্ধাদি গুণ হইতেই দিক ও কালের অনুভূতি আসিয়াছে। দিক ও কালের অনুভূতি মূল অনুভূতি নহে। আমরা যাহা কিছু দেখি বা শুনি বা স্পর্শ করি তাহাতেই দিক জ্ঞান আছে। অনুভূতির ক্রমিক পরিবর্তন হইতে কালজ্ঞানের উৎপত্তি। আধুনিক মনোবিদও বলেন যে কালজ্ঞান ও দিকজ্ঞান পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতেই ক্রমে ক্রমে শিশুর মনে বিকশিত হয়। সাংখ্যের সহিত আধুনিক মনোবিদ্যার এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। আকাশ দিক শব্দের অন্তর্গত দূরত্বাদি নহে। আকাশাদি হইতেই দিকের উৎপত্তি। তবে আকাশ কিরূপ পদার্থ।

।৮০। কেহ কেহ মনে করেন পদার্থবিজ্ঞানের 'ইথর' (ether) আকাশ কিন্তু ইথর অনুমানসিদ্ধ পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, অপর পক্ষে আকাশকে মহাভূত বলায় তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বুঝিতে হইবে। বায়ু বলিলে আমরা কি বুঝি প্রথমে তাহার আলোচনা করিব। স্পর্শ ও শব্দের দ্বারাই আমরা বায়ুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বায়ুর অস্তিত্ব জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। একটি বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্দ অনুভূত হইলে আমরা বলি বায়ু আছে। এই দুই অনুভূতি মানসিক ব্যাপার মাত্র কিন্তু ইহাদের সাহায্যেই আমরা বায়ুরূপ বহির্বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। বায়ুর 'রূপ' একটি বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্দ মাত্র, তদ্ভিন্ন বায়ুর অন্য কোন মূর্তি নাই। অতএব বায়ুর গুণই বায়ুর মূর্তি। এই প্রকার বিচার দ্বারাই কপিল কি পদার্থকে আকাশ বলিয়াছেন বুঝা যাইবে। কাপিল মতে আকাশের একটি মাত্র গুণ স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহা শব্দ, অতএব শব্দের রূপই আকাশের রূপ। শব্দায়মান বস্তুকে বাদ দিয়া শব্দের অনুভূতি মাত্র ধ্যান করিলে শব্দগুণের স্বরূপ বুঝা যাইবে এবং এই অনুভূতির অনুযায়ী যে সূক্ষ্ম বহির্বস্তু তাহাই আকাশ। এই আকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ এ জন্য তাহা সহজে সাধারণের অনুভূতিগ্রাহ্য নহে। যে কখনও লাল রঙ দেখে নাই তাহাকে যেমন লাল রঙের স্বরূপ বুঝান যায় না সেইরূপ আকাশকে যে প্রত্যক্ষ করে নাই তাহাকে আকাশের স্বরূপ বুঝান যাইবে না। যোগী এই আকাশকে শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। এই শব্দজ্ঞানের সহিত

দিকজ্ঞানও জড়িত আছে এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই হিসাবে আমরা যাহাকে আজকাল আকাশ বলি এবং সাংখ্যে যাহাকে দিক বলা হয় তাহার সহিত কাপিল আকাশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক বিজ্ঞানী বলেন বায়ুতরঙ্গবিশেষই শব্দরূপে প্রতিভাত হয়। কোন কোন সাংখ্যবাদীও এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন আকাশেই শব্দের উৎপত্তি কিন্তু সেই শব্দ বায়ুই শ্রবণেন্দ্রিয়ে বহন করিয়া আনে। কাষ্ঠাদির ন্যায় কঠিন পদার্থ এবং জলও শব্দ বহন করিতে পারে। পত্রবাহক যেমন পত্র নহে সেইরূপ শব্দবাহক শব্দ নহে। অনুভূতিবিশেষই শব্দ এবং এই অনুভূতি যে জড় বস্তুকে (শব্দায়মান পদার্থ নহে) প্রকাশ করে সেই সূক্ষ্ম জড়ই আকাশ।

। ৮১। সাংখ্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ নাই কিন্তু উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন। আধুনিক রসায়নবিদ বলিবেন elements বা মূল পদার্থ মাত্র বিরানব্বইটি। আধুনিক পদার্থবিদ মূলপদার্থ বলিতে ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতি বুঝিবেন। তাঁহাদের মতে ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। সাংখ্য বলিবেন, তোমাদের কাহারও সহিত আমার বিরোধ নাই তবে তোমাদের মূল পদার্থগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বার ভিন্ন অন্য রাস্তা নাই, অতএব তোমাদের মূল পদার্থে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে এক বা ততোধিক গুণ স্বীকার করিতে হইতেছে। রাসায়নিকের চক্ষে স্বর্ণ মূলপদার্থ হইলেও তাহা চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকের দ্বারা গ্রাহ্য, সুতরাং তাহাতে অন্তত তিনটি গুণ আছে, অতএব আমার নির্বচনমতে স্বর্ণ মূলপদার্থ নহে, তাহাতে তিন গুণের সমবায় দেখা যায়। যদি চক্ষুগ্রাহ্য পরীক্ষাদ্বারা ইলেক্‌ট্রনের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাক, তবে ইলেক্‌ট্রনে রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি।

। ৮২। সাংখ্যমতে জড়বর্গের মধ্যে সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি বা তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আকাশের শব্দগুণ অন্য চারি ভূতেও আসিয়াছে। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে, অগ্নি বা তেজের রূপ জল ও পৃথিবীতে, এবং জলের রস পৃথিবীতে আসিয়াছে। যে গুণ যে পদার্থে প্রথম দেখা দিয়াছে সেই পদার্থই সেই গুণের বিশেষ আধার বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই জন্য আকাশকে শব্দগুণের, বায়ুকে স্পর্শের, তেজকে রূপের, জলকে রসের এবং পৃথিবীকে গন্ধগুণের আধার বলা হয় এবং প্রত্যক্ষ স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীকে পঞ্চ

মহাভূতের প্রতীক বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাহাদের নাম অনুযায়ী পঞ্চ ভূতের নামকরণ হইয়াছে।

। **৮৩**। এইবার স্থূল জগত হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ বিচার করিব। গীতার মতে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীরই লভ্য। বিচারবুদ্ধির দ্বারা সাধারণে এই সৃষ্টিতত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। একজন চেতন দ্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টির কল্পনা করা যায় না এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। যাহা কিছু ঘটুক না কেন সর্বদাই তাহার একজন দ্রষ্টা আছে। সাংখ্যে এই দ্রষ্টা পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে। পুরুষের চেতনাই সৃষ্টির পর পর সমস্ত অবস্থাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। দৃশ্যমান পৃথিবী এই চেতনার দ্বারাই উদ্ভাসিত। ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই এই জগতের সত্তা উপলব্ধ হয়। অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুযায়ী মাত্র পঞ্চ মহাভূতের সত্তা প্রমাণিত হইতেছে। এই মহাভূতগুলিকে পুরুষ বহির্বস্তুরূপে উপলব্ধি করে কিন্তু এই উপলব্ধির মূলে পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান পুরুষের অন্তরের অনুভূতি। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অনুরূপ ভিতরের রূপ, রস ইত্যাদির মানসিক অনুভূতি রহিয়াছে। এই পঞ্চ অনুভূতিকে পঞ্চ তন্মাত্র বলা যায়। পুরুষের চেতনায় এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতেই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হয় ও মন এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত সংযুক্ত থাকাতেই তাহারা ক্রিয়াক্ষম হয়। পুরুষের দেহও এই পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন এবং মনই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই দেহকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অতএব এ পর্যন্ত বিচারের দ্বারা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই একুশটি তত্ত্ব পাওয়া গেল। এই একুশটি তত্ত্বের মধ্যেই জগতের যাবতীয় ব্যাপার রহিয়াছে। অবশ্য ইহার প্রত্যেকটি পুরুষের চেতনার দ্বারা উদ্ভাসিত। সাংখ্যমতে এই সমস্ত তত্ত্ব অহংকার হইতে উৎপন্ন। অহংকার অর্থে আমিত্ব ভাব। পুরুষ যে মুহূর্তে নিজেকে জড় জগতের জ্ঞাতা বলিয়া জানিলেন, অর্থাৎ কতকগুলি বস্তুকে নিজ হইতে পৃথক দেখিলেন, অর্থাৎ অহং ও ইদং এই ভেদ করিলেন তখনই জগত তাঁহার নিকট প্রকটিত হইল। ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মন ও তন্মাত্রের মূলে এই অহং ইদং ভাব আছে। মানসিক অনুভূতি অর্থেই তাহার একজন জ্ঞাতা আছে, অর্থাৎ অহং ইদং ভেদ না থাকিলে মনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই জন্যই অহংকার হইতে মন ও তন্মাত্রার উৎপত্তি বলা হইয়াছে। অহংকারের মূলে অহং ইদংরূপ দুইটি বিভাগ। বিভাগের পূর্বাবস্থা এক অখণ্ড সত্তা।

এই সত্তাই মূল প্রকৃতি। অখণ্ড মূল প্রকৃতি যখন বিভাগের জন্য উন্মুখ হইল তখন তাহার নাম মহৎ। প্রকৃতি পুরুষের চেতনার সহিত মিলিত আছে অনুমান করিলে মহৎ অবস্থাকে দ্বিভাগ হইব এইরূপ সংকল্পাত্মক অবস্থা বলা যায়, এই জন্যই মহতের অপর নাম বুদ্ধি। আমরা যে শক্তির দ্বারা সংকল্প করি তাহাকেও বুদ্ধি বলা হয়। পূর্বোক্ত একুশটি তত্ত্বের সহিত অহংকার, মহৎ ও প্রকৃতিকে যোগ করিলে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পাওয়া গেল। ইহাদের সহিত পুরুষরূপ চেতন তত্ত্ব সংযুক্ত থাকায় সৃষ্টিকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসমন্বিত বলা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানবাদীর সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রকরণের বিরোধ নাই। কেবল সৃষ্টির প্রত্যেক অবস্থায় হিন্দু শাস্ত্র এক জন করিয়া চেতন সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত-অনুমোদিত সৃষ্টিপ্রকরণে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলা হইয়াছে এবং পুরুষবর্গ ব্রহ্মেরই অংশ স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্তমতে মূল সত্তা এক ব্রহ্ম মাত্র। গীতারও এই মত।

। ৮৪ । চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত 'সৃষ্টি' গ্রন্থ হইতে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সৃষ্টিপ্রকরণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। বাহুল্যভয়ে নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকগুলি দিলাম না। মূল গ্রন্থে তাহা পাওয়া যাইবে।

'উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্মভূতগণ পঞ্চীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রা সকল উহারদের সহিত মিলিত হইয়া রহিল। এই সকল কালক্রমে একটা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। প্রথমে উহার অন্তর্গত মৃত্তিকা, জল, জ্যোতি, বায়ু ও আকাশ (পঞ্চ ভূত) একাকাররূপে মিশ্রিত থাকাতে উহা অতি তরল ছিল। ক্রমে উহা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় স্ফীত হইয়া হিরণ্য ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভং। পৃথিবীই মূল অণ্ড। অন্য চারি ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি তাহারই সহিত মিশ্রিত থাকায় সর্বশুদ্ধ অণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালক্রমে পৃথিবীরই গাত্রে জল, জ্যোতিঃ, বায়ু এবং আকাশ অল্পে অল্পে এবং পৃথক পৃথক জমিতে লাগিল।…জল পৃথিবীকে বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। জ্যোতিঃ জলকে ব্যাপিয়া থাকিল। বায়ু জ্যোতিকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিল। আকাশ বায়ুকে বেষ্টন করিল।…এই পৃথিবী বহু দিন ধরিয়া জলমগ্ন ছিল পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে ভগবান তাহাকে উদ্ধার করিলেন।…তাহার পৃষ্ঠে এক দিকে পর্বতসকল সৃষ্টি করিলেন অন্য দিকে স্বতন্ত্র স্থানে সমুদ্র স্থাপন করিলেন। এইরূপে আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জলসমন্বিত হইয়া ধরণী সৃষ্টি হইল।

ঐ সমস্ত ভূতমণ্ডলসমন্বিত এই ধরণীই অণ্ড শব্দের বাচ্য।···পরমেশ্বর কেবল একটি মাত্র পৃথিবীর স্রষ্টা নহেন। তিনি কোটি কোটি অণ্ড সৃজন করিয়াছেন। সেই কোটি কোটি অণ্ড কালক্রমে কোটি কোটি পৃথিবী সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। হয় ত এখনও তেমন অসংখ্য অসংখ্য অণ্ড জন্ম বৃদ্ধি ও পরিণতি লাভ করিতেছে।··· শাস্ত্র বলিয়াছেন যে ভগবানের সৃষ্টিশক্তি যখন অব্যক্ত ছিল তখনও তিনি তাহাতে, আর ক্রমপরিণতির দ্বারা তাহা যখন ব্যক্ত হইতে লাগিল তখনও তিনি সেই প্রত্যেক পরিণতিতে, বিরাজমান ছিলেন। এখনও তিনি এই সৃষ্টির সর্বাংশে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব অব্যক্ত হইতে অণ্ড পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই তিনি পুরুষরূপে বর্তমান।···অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিনি পুরুষ, ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মা; পৃথিবীর কারণজলে তিনি নারায়ণ; অণ্ডেতে তিনি হিরণ্যগর্ভ ও পিতামহ ব্রহ্মা; সর্বভূতে তিনি ভূতাত্মা; সূক্ষ্মদেহে হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর বা বিরাট; স্থূল দেহে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, বিশ্ব বা বিরাট; জীবাত্মাতে তিনি পরমাত্মা বা অন্তরাত্মা; এবং সমগ্র জগতে এবং কোটি কোটি অণ্ডে প্রবেশ করায় তিনি বিরাট নামে উক্ত হয়েন। ব্রহ্মের একপাদ মাত্র সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে অবশিষ্ট তিন পাদ নিষ্ক্রিয়, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, নির্গুণ, শান্ত, বাক্য মনের অগোচর এবং সৃষ্টিসংসারের অতীত ও অব্যক্ত।···

জল হইতে পৃথিবী উন্নত হইয়া বহুসহস্র বৎসর নিস্তব্ধ শূন্যক্ষেত্রবৎ পতিত ছিল।···তখন জলগর্ভবিনির্গত নবীন ভূমি, ঊর্ধ্বমুখী পর্বতমালা এবং দূরপ্রসারিত অমিত জলধি, এই ত্রিবিধ দৃশ্য ব্যতীত প্রকৃতির অন্য কোন প্রভাব ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই। তখন ঐ তিন পদার্থমাত্রই স্বর্গস্থ সূর্য, চন্দ্র, তারাগণের জ্যোতিঃ এবং অন্তরীক্ষস্থ মেঘ ও বায়ুর ফলভোগ করিত। কোন দ্রষ্টা বা ভোক্তা ছিল না। কেবল বিধাতা স্বয়ং নির্মাতা, নিয়ন্তা ও প্রহরীরূপে বর্তমান ছিলেন।···প্রজাপতি পঞ্চভূতময়ী উপকরণবতী পৃথিবী হইতে অচেতন, অজ্ঞানান্ধ, পঞ্চপ্রকার উদ্ভিদ্ পদার্থ প্রকাশ করিলেন যথা বৃক্ষগুল্মলতাবিরুৎ সমস্তাস্তৃণজাতয়ঃ। এই সৃষ্টির নাম মুখ্য স্বর্গ অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্টি। যেহেতু ইহা পশ্বাদি ও মানবের পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপে পৃথিবী প্রথমেই বৃক্ষ গুল্ম, লতাদিঘটিত ঘোরারণ্যে আবৃত হইল।···উদ্ভিদ সৃষ্টির পর ব্রহ্মা যখন জীবকে সর্বাবয়বসম্পন্নপূর্বক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ঐ অন্ন হইতে তিনি বিবিধ জীব উৎপন্ন করিলেন।···মাতা পিতার সংযোগে প্রত্যেক জীবের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে যে জীবের যে স্বভাব ও ব্যবহার তাহাই তাহার

বংশে আবহমান হইল। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণই ব্রহ্মার দ্বিতীয় সৃষ্টি। জরায়ুজ, এবং অণ্ডজ ও স্বেদজ জীবগণের মধ্যে কোন জাতি প্রথমোৎপন্ন হইয়াছিল শাস্ত্রে সে বিষয়ে কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র যদি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে বোধ হয়, যেমন ভূতের বিকার হইতে ভূতান্তরের ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং অন্নের বিকার হইতে অব্যবহিতরূপে জীবের প্রকাশ নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ সম্ভবতঃ অন্নের বিকার হইতে প্রথমে কীট (যাহাদিগকে স্বেদজ কহেন) ও কীটের বিকার হইতে অণ্ডজ জন্তুগণ, অণ্ডজ জন্তুগণের বিকার হইতে পশ্বাদি, পশ্বাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদে বানর এবং বানরের বিকার হইতে নরের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতেন। যদি তাহা বলিতেন, তবে শাস্ত্র যেরূপ ক্রমপূর্বক সৃষ্টির বিবরণদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা উত্তমরূপে সমাধা হইত। যাঁহারা নরকে বানরের সন্তান বলেন তাঁহারাও তাহা হইলে শাস্ত্র হইতে স্ব স্ব মতের বিস্তর পোষকতা পাইতেন। ফলে শাস্ত্র সেরূপ অভিপ্রায় দিলেও ঈশ্বরকে প্রত্যেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তারূপে রাখায় এবং নরের জীবাত্মাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করায়, তাহাতে উক্ত বাদিগণের অন্ধ প্রকৃতিবাদের কোন পোষকতা হইত না। সে যাহা হউক শাস্ত্রের এত দূর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেখা যাইতেছে যে, ইতর প্রাণীদিগের পশ্চাৎ পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বিদ্যাধর, কিন্নর, সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ, দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর মানবের উৎপত্তি হইয়াছে।"

৬। জ্ঞানেন্দ্রিয়

।৮৫। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মনুষ্যের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। ইন্দ্রিয়গণকে শরীরের দ্বারস্বরূপ বলা হয়, অর্থাৎ বহির্জগতের সমস্ত ব্যাপারের সংবাদ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মনে আসিয়া প্রবেশ করে এবং মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে। এই সকল কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া লই। সাধারণ লোকে সকলেই বলিবে পাঁচটি মাত্রই কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি মাত্রই জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে।

পাঁচটির অধিক সংখ্যা কেন গণনা করা হয় না তাহা সাধারণত কেহই ভাবিয়া দেখেন না। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিনা বিচারে কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন। সমস্ত প্রাচীন মহর্ষিরা একবাক্যে কোন কথা বলিলেও তাহা যুক্তি ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিজ্ঞান স্বীকার করিবে না। ইহাই বিজ্ঞানের বিশেষ।

। ৮৬ । শাস্ত্রকারদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা গণনা ও ইন্দ্রিয়ের বিভাগ কত দূর বিজ্ঞানসম্মত তাহা দেখা যাক। আধুনিক মনোবিদ্যা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি লইয়া গবেষণা করে কাজেই এখনকার মনোবিদগণ এ বিষয়ে কি বলেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদিকে আধুনিক বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়স্থান বা sense organs বলা হয়। ইন্দ্রিয়স্থান বিশেষ বিশেষ stimulus বা উদ্দীপক দ্বারা উত্তেজিত বা excited হইলে বিশেষ বিশেষ সংবেদন বা sensation উৎপন্ন হয়। এই সকল সংবেদন হইতেই বহির্জগতের perception বা প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। উদাহরণ যথা, চক্ষুতে বহির্জগত হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া উদ্দীপকের কাজ করিল, ফলে চক্ষুগোলকের অন্তঃস্থিত অপ্‌টিক্ নার্ভ (optic nerve) উত্তেজিত হইল। এই উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া আলোকের সংবেদন উৎপন্ন করিল। এই সংবেদন হইতে বাহিরে আলোক রহিয়াছে এই প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিল। মনে রাখিতে হইবে বাহিরের আলোক ও আলোকের সংবেদন এক বস্তু নহে। আলোক জড় বস্তু মাত্র। পদার্থবিৎ তাহার গুণাগুণ বিচার করেন। অপর পক্ষে আলোকের সংবেদনে সাধারণ জড় পদার্থের কোন গুণ নাই, তাহা মানসিক অনুভূতি মাত্র। মনোবিদের ইহা গবেষণার বিষয়। সেইরূপ পদার্থবিদের কাছে শব্দ বিশেষ প্রকারের কম্পন মাত্র, মনোবিদের কাছে তাহা একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। যে অন্ধ বা বধির, সে আলোক বা শব্দের অস্তিত্ব বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে কিন্তু আলোক বা শব্দের সংবেদন বুঝিবার তাহার কোনই উপায় নাই। আমরা অনেক সময় এই দুই বিভিন্ন অর্থে আলোক কথাটা ব্যবহার করি। কখন আলোক কথায় পদার্থবিদের আলোক, কখনও বা মনোবিদের আলোকসংবেদন বুঝি। এই পার্থক্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য নচেৎ মানসিক ব্যাপারের আলোচনায় বিশেষ গোলমালে পড়িবার সম্ভাবনা। পদার্থবিদের কাছে অন্ধকার বা শৈত্যের অস্তিত্ব নাই, এই দুইটি আলোক ও তাপের অভাব মাত্র কিন্তু মনোবিদের কাছে অন্ধকার ও শৈত্য উভয়ই বাস্তব পদার্থ, তাহাদের বিশেষ অনুভূতি আছে। পদার্থবিদের তাপমান যন্ত্রে কোন

বস্তুর তাপ মাপা যাইতে পারে ও তাহা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহাও বলা যায়। একটি গ্লাসে গরম জল রাখিয়া তাহাতে হাত ডুবাইলে গরম লাগিবে কিন্তু তদপেক্ষা গরম জলে পূর্বে হাত ডুবাইয়া পরে গ্লাসের জলে হাত ডুবাইলে তাহা ঠাণ্ডা লাগিবে। একই জল অবস্থাবিশেষে ঠাণ্ডা বা গরম লাগিতে পারে যদিও তাপমান যন্ত্র বলিবে তাপ একই রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে পদার্থবিদ হয় ত বলিবেন তোমার প্রত্যক্ষ ভুল। মনোবিদের মতে অনুভূতির ব্যাপারে পদার্থবিদের মতামত অনধিকার চর্চা। গরম বা শৈত্য অনুভূতিতে কোন ভুল নাই। যখনই এই অনুভূতির সাহায্যে বাহিরের বস্তুর তাপ নির্ণয় করিতে যাই তখনই ভুলের সম্ভাবনা, অর্থাৎ যখন মনোরাজ্যের ব্যাপারকে বাহিরের ব্যাপারে মাপকাঠি করি, অর্থাৎ পদার্থবিদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করি, তখনই ভুলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সর্বদা এরূপ ভুল পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে হইলে আমাদেরও এই ভুল এড়াইয়া চলিতে হইবে।

। **৮৭** । প্রথমত আধুনিক মনোবিদ্যার দিক হইতে বিভিন্ন sensation বা সংবেদনগুলির বিচার করা যাক। চক্ষুর সাহায্যে আমাদের আলোকের সংবেদন জন্মে ও কর্ণের সাহায্যে শব্দের সংবেদন হয়। এই দুই সংবেদনের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। তাহারা বিভিন্ন বর্গের। চক্ষুর দ্বারা শব্দ শোনা অসম্ভব। সাধারণত এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অপর ইন্দ্রিয় করিতে পারে না। এই জন্য আলোক ও শব্দকে পৃথক সংবেদন বলিয়া ধরা হয় এবং চক্ষু ও কর্ণকে দুইটি পৃথক ইন্দ্রিয়স্থান বলা হয়। চক্ষুর দ্বারা যে সকল সংবেদনের অনুভূতি হয় তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। লাল আলো ও সবুজ আলো এক নহে। বিভিন্ন রঙের প্রভেদ চক্ষুর সাহায্যে ধরা পড়ে। এই প্রভেদ সত্ত্বেও চক্ষুগ্রাহ্য সমস্ত সংবেদনের মধ্যে একটা জাতিগত ঐক্য আছে। লাল ও সবুজ আলোর যে পার্থক্য, শব্দ ও আলোর মধ্যে পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক গুরুতর। বিভিন্ন রঙের আলোক একই বর্গের কিন্তু আলোক ও শব্দ বিভিন্ন বর্গের। একই ইন্দ্রিয়স্থান হইলে এক বর্গের বিভিন্ন সংবেদন সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি মান্য হইবে না।

। **৮৮** । পাশ্চাত্ত্য মনোবিদগণ চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়স্থান বা sense organ ব্যতীত আরও কতকগুলি ইন্দ্রিয়স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়স্থানের এক একটি বিভিন্ন সংবেদন আছে। দার্শন, শ্রাবণ, স্পার্শন, রাসন ও

ঘ্রাণজ সংবেদনের সহিত সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। ইহাদের মধ্যে স্পার্শন সংবেদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অনেকে ত্বগিন্দ্রিয়কে একটি ইন্দ্রিয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। ত্বকের সাহায্যে আমরা যে সকল সংবেদন জানিতে পারি তাহাদের এক বর্গের বলা চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গাত্র স্পর্শ করিলে যে ছোঁয়া বা প্রেষবেদন জন্মে আর উষ্ণ দ্রব্য স্পর্শে যে উষ্মাবেদন হয় এ দুইকে একজাতীয় বলা শক্ত। তদ্রূপ শৈত্য ও উষ্ণতাকে বিভিন্নজাতীয় মনে হওয়া সম্ভবপর কিন্তু মনঃসংযোগের সহিত অন্তর্দর্শনের দ্বারা এই সকল সংবেদনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে প্রেষবোধের সহিত উষ্ণতার যে পার্থক্য, প্রেষবোধের সহিত শব্দের পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। শৈত্য ও উষ্ণতাকেও এক বর্গে ফেলা নিতান্ত অন্যায় হয় না। ব্যাবহারিক জীবনেও ত্বগিন্দ্রিয়জাত সকল সংবেদনকেই আমরা একই বর্গে ফেলি ও অনেক সময় একসঙ্গেই তাহাদের অনুভব করি। কোন জিনিস ছুঁইলে তাহার স্পর্শবোধের মধ্যেই তাহার উষ্ণতা ইত্যাদি অনুভূত হয়। ছুঁচ ফুটাইলে যে ব্যথা হয় তাহাও এই বর্গের। ত্বকের সহিত চারি প্রকারের সংবেদন জড়িত রহিয়াছে, যথা, প্রেষ, উষ্ণতা, শৈত্য ও ব্যথা। ত্বকের মধ্যেই ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন বোধযন্ত্র পাওয়া যায়। এই সকল ইন্দ্রিয়স্থান অতি ক্ষুদ্র ও ত্বকমধ্যেই অবস্থিত। কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের দেখা যায়। চুলকানি, সুড়সুড়ি, ইত্যাদি নানাপ্রকার বোধ উপরি উক্ত বিভিন্ন সংবেদনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তাহাদের পৃথক ইন্দ্রিয়স্থান নাই।

। ৮৯। ত্বকসংক্রান্ত সমস্ত সংবেদনকে এক বর্গের মানিয়া লইয়া এ পর্যন্ত পাঁচ প্রকারের সংবেদন পাওয়া গেল। এখন আরও কতকগুলি সংবেদনের কথা বলিব যাহাদের অস্তিত্ব সাধারণে অবগত নহেন। কাহারও হাতে সন্দেশ দিয়া যদি তাহাকে বলা যায় চোখ বন্ধ করিয়া তুমি ইহা মুখে দাও তবে সে বিনা আয়াসেই ইহা পারিবে। চোখে না দেখিয়াও কি উপায়ে হাত ঠিক মুখে পৌঁছায় তাহা ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। হাত বাড়াইয়া অল্প দূরের কোন জিনিস ছুঁইয়া পরে চোখ বুজিয়া আবার তাহা সহজেই ছোঁয়া যায়। কতখানি হাত বাড়াইতে হইবে, কোন্ দিকে বাড়াইতে হইবে, ইহা আমরা একপ্রকার বিশেষ অনুভূতির দ্বারা স্থির করি। অবশ্য হাত বাড়াইবার একটা চাক্ষুষ প্রতিরূপও মনে ভাসিয়া ওঠে কিন্তু এই প্রতিরূপ মানস প্রতিরূপ বলিয়া দ্রব্যটি কোথায় আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। হস্তের

অনুভূতির দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি উপযুক্ত পরিমাণ হাত বাড়ানো হইতেছে কি না। পরীক্ষা করিলে পাঠক দেখিবেন এই অনুভূতি হাতের বাহিরের ত্বকের অনুভূতি নহে, হাতের ভিতরকার পেশী, কব্জি, কনুই ও স্কন্ধের সন্ধিস্থল হইতে এই অনুভূতি আসিতেছে। ইহা একপ্রকার বিশেষ সংবেদন। চক্ষু বন্ধ থাকিলে কণ্ডরা, পেশী ও সন্ধিস্থলজাত সংবেদন হইতে আমরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান অনুভব করি। হাত উঁচু বা নীচু হইয়া আছে, পা বাঁকিয়া আছে বা সোজাভাবে আছে, সমস্তই এই প্রকারের সংবেদন হইতে বুঝিতে পারা যায়। কোন জিনিস ঠেলিলে বা টানিলে, হাত পা টিপিলে এই সকল সংবেদন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কোন কোন রোগে পেশীয় বা muscular, কণ্ডরজ বা tendinous ও সান্ধিক বা articular সংবেদনের বৈলক্ষণ্য ঘটে। তখন রোগীকে চোখ বন্ধ করিয়া সন্দেশ খাইতে দিলে সে তাহা ঠিক মুখে দিতে পারে না। চোখ বন্ধ অবস্থায় তাহার হাত পা নাড়িয়া দিলে তাহাদের সংস্থানও সে বুঝিতে পারে না।

। ৯০। কাহাকেও যদি পিঁড়ির উপর বসাইয়া শূন্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, পরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিয়া ঘুরাইয়া দিলে সে বলিতে পারে কোন দিকে ঘুরিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাহার শরীরের কোন অঙ্গই নড়িতেছে না অথচ সে যে ঘুরিতেছে তাহা বুঝিতে পারে। একপ্রকার বিশেষ সংবেদনের উপর এই জ্ঞান নির্ভর করে। এই সংবেদনের ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণের মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে ampullar sensation বা দিগ্‌বেদন বলা হয়। দিগ্‌বেদন সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়স্থান বিকল হইলে মনে হয় চারি দিক ঘুরিতেছে। কর্ণের মধ্যে আরও একটি যন্ত্র আছে, তাহার নাম কর্ণদর্ভট বা vestibule। এই কর্ণদর্ভট হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি আমাদের মাথা উপরে আছে কি নীচে আছে, গাড়ীতে চড়িয়া আমরা সামনে যাইতেছি কি পিছনে যাইতেছি। ইহাকে কায়স্থিতিবেদন বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার দ্বারা সমস্ত শরীরের অবস্থান বোঝা যায়। কোন কোন মূক-বধিরের কর্ণদর্ভট বিকল থাকে। তাহারা জলে ডুব দিলে বুঝিতে পারে না কোন দিক উপর কোন দিক নীচু, এই জন্য সহজেই ডুবিয়া যায়। এই যন্ত্রের সামান্যমাত্রও দোষ থাকিলে বিমান চালনা অসম্ভব। কারণ কুয়াসায় বা অন্ধকারে চালক বুঝিতে পারে না, উপরে উঠিতেছে কি নীচে নামিতেছে, এরোপ্লেন উল্টাইয়া চলিতেছে কি সোজা চলিতেছে, তাহার মাথা নীচের দিকে আছে কি সোজা আছে।

। ৯১ । দার্শন, শ্রাবণ ইত্যাদি পাঁচ প্রকার সংবেদন ব্যতীত যে সকল সংবেদনের কথা বলা হইল, তাহাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা ও গতির বোধ নির্দেশ করে। এই জন্য এই সমস্ত সংবেদনের সাধারণ নাম দেওয়া হয় চেষ্টাবেদন বা kinaesthesis। ইহা ছাড়া শরীরাভ্যন্তরস্থ পাকাশয়, অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রাদি হইতেও একপ্রকার সংবেদন পাওয়া যায় যাহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই। অতিমাত্রায় এই সংবেদন হইলে পেট কামড়ানি ইত্যাদি বোঝা যায়। এই সকল সংবেদনের উপর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি সংবেদন মিশ্রসংবেদন। এই জন্য তাহাদের পৃথক আলোচনা অনাবশ্যক।

। ৯২ । দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যা পাঁচটির অধিক ইন্দ্রিয়স্থান বা sense organ স্বীকার করিতেছেন। কোন কোন মনোবিৎ পেশীয়, কণ্ডরজ ও সন্ধিগত সংবেদনকে ত্বকজাত সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। তাঁহারা বলেন ইহাদের সহিত প্রেষসংবেদনের সাদৃশ্য আছে ও ইহাদের ইন্দ্রিয়স্থানগুলিও ত্বকের নীচেই অবস্থিত। এই মত স্বীকার করিলেও পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ইন্দ্রিয়সংখ্যাগণনা মিলে না। কারণ দিক্‌বেদন ও কায়স্থিতিবেদনকে ত্বকজাত বলা যায় না। মনোবিদগণের ইন্দ্রিয়সংখ্যাগণনা সমীক্ষা বা observation ও experiment বা পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ ইহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন। বলা যাইতে পারে শাস্ত্রকারগণ এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ সংবেদনগুলির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না সে জন্য তাহাদের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের যে সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় না যে এই সংবেদনগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে চেষ্টাজাত সংবেদন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কেন যে তাঁহারা পাঁচটির অধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় মানেন নাই তাহার আলোচনা করিতেছি।

। ৯৩ । আধুনিক মনোবিদ্যায় sense organ বলিতে যাহা বোঝায়, 'ইন্দ্রিয়' ঠিক তাহা নহে। Sense organকে ইন্দ্রিয়স্থান বলা উচিত। চক্ষু ও চক্ষুরিন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে। যে সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে চক্ষুর দ্বারা দর্শন সম্ভবপর হয় তাহার আশ্রয় চক্ষুরিন্দ্রিয়। এই আশ্রয়স্থান কাল্পনিক বা hypothetical এবং তাহা চক্ষুর মধ্যেই স্থিত ধরা হয়। এই শক্তির অধিষ্ঠান বা ইন্দ্রিয় দর্শনগ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, এই ন্যায়ে দর্শনশক্তিকে দর্শনেন্দ্রিয় বলিলে বিশেষ

দোষ হইবে না। যে কয়টি বিশেষ শক্তি থাকার জন্য মন বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ সংবাদ অবগত হইতে পারে সেইগুলিকেই জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। এক শক্তি এক জাতীয় সংবাদই জানিতে পারে। বিভিন্ন শক্তি না থাকিলে বিভিন্ন সংবাদ জানা যাইত না। শাস্ত্রকারেরা দেখিলেন মাত্র পাঁচটি শক্তির সাহায্যেই মানুষ বহির্জগতের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। এই কথা পরে আরও বিশদ করিতেছি।

।৯৪। 'আত্মানাত্মবিবেকে' ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে তাহার বিচার আছে, কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি। শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তকর্ণসঙ্কুল্যবচ্ছিন্ননভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি। ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাপি শীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। অর্থাৎ, 'জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল কি। শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম। ত্বক্ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণযন্ত্র-মধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়। ত্বক্ ভিন্ন অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্যন্ত ব্যাপনশীল শীতগ্রীষ্মাদিস্পর্শগ্রহণ-শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়। গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্তী রূপগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। জিহ্বা ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার অগ্রবর্তী মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম জিহ্বেন্দ্রিয়। নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্তী গন্ধগ্রহণশক্তিশালী যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়।' রামমোহন রায়কৃত অনুবাদ।

।৯৫। এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শাস্ত্রকারেরা ইন্দ্রিয় বলিতে সূক্ষ্ম পদার্থ বুঝিতেন। ত্বগিন্দ্রিয় সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও ও শীতগ্রীষ্মাদি বিভিন্ন বোধসমন্বিত হইলেও তাহা একই ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। চক্ষু কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দুইটি দুইটি হইলেও দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটি করিয়াই ধরা হয়। যদি চক্ষু ব্যতিরেকেও অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা দেখা সম্ভবপর হইত তাহা হইলেও দর্শনশক্তি একই বলিয়া দর্শনেন্দ্রিয় একটিই গণনা করা হইত। অতএব বোঝা যাইতেছে, শক্তির

পার্থক্য না থাকিলে ইন্দ্রিয়স্থান বহু হইলেও ইন্দ্রিয় একই ধরা হয়। পূর্বে বলিয়াছি, চেষ্টাবেদনগুলির সাধারণ গুণ এই যে তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টা ও গতিবোধ হইয়া থাকে। এই গতিবোধ কেবল চেষ্টাবেদনের নিজস্ব নহে, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেও আমাদের গতিজ্ঞান জন্মে। অতএব গতিজ্ঞাপক সংবেদনগুলির জন্য পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়কল্পনা নিরর্থক, যদিও ইন্দ্রিয়স্থানের গণনাকালে এই সকলগুলিরই সংখ্যা নির্দেশ কর্তব্য। দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রকারগণ ও পাশ্চাত্ত্য মনোবিৎ উভয়ের কথাই ঠিক। পাঁচটির বেশী ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু ইন্দ্রিয়স্থান অনেকগুলি।

। ৯৬ । কোন নূতন প্রকার সংবেদনের সাহায্যে যদি অপর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আবার নূতন করিয়া পাওয়া যায় তবে ইন্দ্রিয়সংখ্যা বেশি ধরা হইবে না। বর্তমান কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি কোন নূতন জ্ঞানও জন্মে তত্রাচ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সমানই থাকিবে। উদাহরণ যথা, চেষ্টাবেদন দ্বারা গতিজ্ঞান হয় কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা বাড়ে না কারণ দর্শনের দ্বারাও গতি জানা যায়। ত্বক কিংবা চক্ষুর সাহায্যে বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানিলেও ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সমানই রহিল। যদি কখনও কোন নূতন রকমের সংবেদনের সাহায্যে কোন নূতন বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় তবে ইন্দ্রিয়-সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইলে পৃথক ইন্দ্রিয়স্থান, পৃথক সংবেদন ও তদনুরূপ পৃথক বস্তু থাকা চাই।

৭। সত্ত্ব রজ তম

কাচং মণিং কাঞ্চনমেকসূত্রে
গ্রথন্তি মূঢ়াঃ কিমু তত্র চিত্রম্।
অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে
শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ॥

। ৯৭ । অর্থাৎ, মূঢ় ব্যক্তি কাচ, মণি ও কাঞ্চন একই সূত্রে গাঁথে, ইহা বিচিত্র কি। অশেষবিৎ পাণিনি একসূত্রে কুক্কুর যুবা ও ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

। ৯৮ । শ্বন্ (কুকুর), যুবন্ (যুবা) ও মঘবন্ (ইন্দ্র) শব্দকে পাণিনি যে একবর্গে ফেলিয়াছেন তাহার কারণ অবশ্য এই যে ইহাদের শব্দরূপ একই নিয়মে নিষ্পন্ন হয়। কি উদ্দেশ্য লইয়া পদার্থের জাতি নির্ণীত হইয়াছে জানা না থাকিলে

অনেক সময়েই শ্রেণীভুক্তি বিসদৃশ মনে হইতে পারে। শ্রেণী বিভাগ বা জাতি নির্ণয়ের কতকগুলি লক্ষণ আছে। এই সকল লক্ষণ পাওয়া না গেলে বুঝিতে হইবে যে জাতি-নির্ণয় ঠিক হয় নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া একই পদার্থসমষ্টির বিভিন্ন প্রকারের জাতিবিভাগ হইতে পারে। গহনা তৈয়ারি করা উদ্দেশ্য হইলে ধাতুর জাতিবিভাগ একপ্রকার হইবে, আবার অস্ত্র নির্মাণ হিসাবে ধাতুর উপযোগিতা নির্ণয় করিতে হইলে বিভাগ অন্যরূপ হইবে। অমরকোষে যে সমস্ত শব্দ এক পর্যায়ে আছে, পাণিনিতে তাহারা ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। অতএব জাতিনির্ণয় ঠিক হইল কি না বিচার করিতে হইলে জাতিবিভাগের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। যে পদার্থসমষ্টির জাতি বিভাগ করা হইতেছে তাহার অন্তর্ভুক্ত একটি পদার্থও বাদ দেওয়া চলিবে না। অপর পক্ষে জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের ব্যাপ্তির সীমা পরস্পর হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। যেমন ধাতুর জাতি বিভাগ করিতে বসিলে লৌহ বা অন্য কোন ধাতুকে বাদ দিলেও চলিবে না অথবা ধাতুকে বহুমূল্য অল্পমূল্য ও সুদৃশ্য, এইরূপ তিন পর্যায়ে ফেলাও চলিবে না। কারণ যে ধাতু বহুমূল্য বা অল্পমূল্য তাহা সুদৃশ্যও হইতে পারে। মূল্য ও সুদৃশ্যতার ব্যাপ্তি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। এরূপ বিভাগে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপ্তি মনে না রাখিলে জাতি-বিভাগ দুষ্ট হইবে।

। ৯৯। জাতি বা শ্রেণী বিভাগের উপরি উক্ত সূত্রগুলি মনে রাখিয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিচার করা যাইতে পারে। সত্ত্ব রজ তম কথা কয়টি সাধারণের মধ্যে এতই প্রচলিত যে অনেক সময়ে তাহাদের অর্থসংগতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা সেগুলির প্রয়োগ করি। প্রকৃতির গুণের এই তিন বিভাগ কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহা বিচার্য। এই বিভাগ দুষ্ট কি না তাহাও আলোচ্য। প্রকৃতির সমস্ত গুণই কি এই তিন বিভাগে পড়ে, এবং সত্ত্ব রজ ও তমের ব্যাপ্তি কি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রকৃতির গুণরাজির এই ত্রিবর্গের বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল তাহা কি আমরা জানি। সত্ত্ব রজ ও তমের যে ব্যাখ্যাগুলি সাধারণত প্রচলিত দেখা যায় তাহাদের লক্ষণ বিচার করিলে মনে সন্দেহ হয় যে শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধিকাংশ ব্যাখ্যার মতে সত্ত্ব প্রকৃতির প্রকাশগুণ রজ ক্রিয়াগুণ এবং তম জড়তা মোহ বা অজ্ঞান। সত্ত্বের দ্বারা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় ইহা নির্মল লঘু ও অনাময়। রজ আমাদিগকে লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত করে এবং

তম গুরু গুণবিশিষ্ট ও অত্যধিক নিদ্রা বা আলস্যের কারণ। এখানে লঘু ও গুরু শব্দের অর্থ কি তাহা ঠিক বোঝা যায় না। পদার্থবিৎ, রসায়নবিৎ, মনোবিৎ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য গুণের বিচার করেন। এই সমস্ত গুণই কি সত্ত্ব রজ ও তমের অন্তর্গত। প্রকৃতির কোন্ গুণে জল বরফে পরিণত হয়। কুইনিনের গুণ সত্ত্ব, রজ না তম। সত্ত্ব যদি জ্ঞানের প্রকাশক হয় ও তম যদি জ্ঞানের আবরক হয়, তবে গুণের জাতিবিভাগে রজের স্থান কোথা। কারণ প্রকাশত্ব ও অপ্রকাশত্ব এই দুই বিভাগের মধ্যেই প্রকৃতির যাবতীয় গুণকে ফেলা যাইতে পারে। তদ্রূপ, রজকে কর্মশীলতা ও তমকে জড়তা বলিলে শ্রেণীবিভাগে সত্ত্বের স্থান থাকে না। আবার সত্ত্ব ও রজ, অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াকে একই বর্গে ফেলিবার উদ্দেশ্য কি। শ্বন্ ও মঘবন্এর ন্যায় এই দুই গুণের একত্র সমাবেশ বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক। সত্ত্ব রজ ও তমের সাধারণ প্রচলিত অর্থ ধরিলে শ্রেণীবিভাগে ব্যাপ্তিদোষ ঘটে।

। ১০০। শাস্ত্রকারগণের শ্রেণীবিভাগ যে দুষ্ট তাহা মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে। শ্রেণীবিভাগের মূল সূত্র তাঁহারা ভালরূপই জানিতেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়াই আমরা গোলে পড়িতেছি। এই প্রশ্নের সদুত্তর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না, অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াও সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পারি নাই। ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, I have tried to explain the meaning of the three Gunas before, but I am bound to confess that their nature is by no means clear to me, while, unfortunately, to Indian Philosophers they seem to be so clear as to require no explanation at all. Collected Works of Max Muller, The Six Systems of Indian Philosophy, (1903), p. 357. অর্থাৎ, 'আমি এই তিন গুণের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ইহাদের প্রকৃতি আমার নিকট মোটেই সুস্পষ্ট নহে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদের কাছে ইহাদের অর্থ এতই স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে তাঁহারা কোন ব্যাখ্যা দেওয়াই আবশ্যক বিবেচনা করেন না।' আমার নিজের মনে যে ব্যাখ্যা জাগিয়াছে এখানে তাহাই বিবৃত করিব। শাস্ত্র অনন্ত এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিসরও নিতান্ত অল্প। হয় ত কোথাও এই প্রশ্নের সদ্‌ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমার তাহা জানা নাই।

। ১০১। প্রথমেই সত্ত্ব রজ তম এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য বিচার করিব। প্রকৃতির গুণাবলীর বিশ্লেষণের চেষ্টার ফলে সত্ত্ব রজ তমের কল্পনা। শাস্ত্রকারগণ পদার্থবিৎ বা রসায়নবিৎ হিসাবে প্রকৃতিকে দেখেন নাই। প্রকৃতির লীলা তাঁহাদের কাছে দার্শনিক সমস্যা। কি করিয়া প্রকৃতির উদ্ভব হয় ও কি গুণে তাহা পুরুষকে অভিভূত করে তাহাই তাঁহাদের প্রশ্ন। মনে রাখিতে হইবে সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রকৃতির সমস্যা মনোরাজ্যের দিক দিয়াই বিচার করা হইয়াছে। বাহিরের প্রকৃতির অস্তিত্বের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অন্তঃকরণের সাহায্যেই বুঝিতে পারি।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ গীতা ১৩।২৬

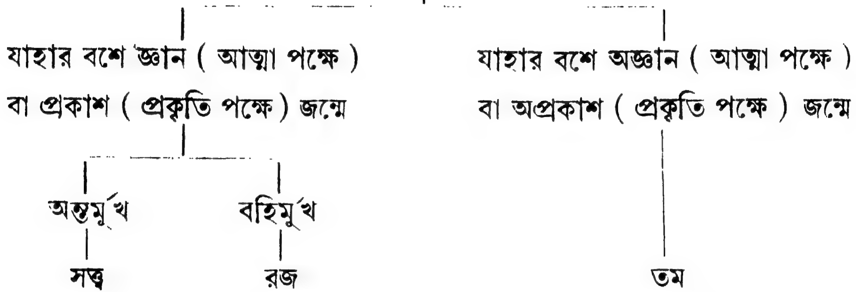
অর্থাৎ, ভরতর্ষভ, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সঞ্জাত হয়, তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে, ইহা জানিবে। আত্মাই ভূমা। তাহাই সমগ্র প্রকৃতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। প্রকৃতির ব্যাপ্তি সে তুলনায় সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শাস্ত্রকারদের আলোচ্য। এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ গীতা ১৩।২৩

অর্থাৎ, যিনি এই প্রকারে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও, অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়াও পুনরায় জন্মান না। আত্মার স্বরূপের সাক্ষাৎকারই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। আত্মজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মাকেই জানিতে হইবে। আত্মানং বিদ্ধি। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া সত্ত্ব রজ তমের বিচার করিতে হইবে।

। ১০২। মানুষের মন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। আত্মা ভিন্ন পৃথিবীর সকল বস্তুই জড়পদার্থ। মনও সূক্ষ্ম জড় মাত্র। আত্মা বা চৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া মন উদ্ভাসিত হয় ইহাই শাস্ত্রমত। প্রকৃতিজাত এই মনের সাহায্যেই বদ্ধ জীব আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। আত্মা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। বিশুদ্ধ না হইলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই মানুষকে আত্মদর্শনের পথে লইয়া যায়। প্রকৃতির গুণেই যেমন জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয়, তেমনি আবার প্রকৃতিরই অন্য গুণ জ্ঞানলাভে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞান

ও অজ্ঞান পরস্পরবিরোধী। অতএব প্রকৃতির দুই গুণ আছে। এক গুণ হইতে জ্ঞান ও অপর গুণ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অজ্ঞানই তম। মানুষের জ্ঞান দুই প্রকার। এক বহির্মুখ ও অপর অন্তর্মুখ। তম এই দুই প্রকার জ্ঞানের বিরোধী। আমার মতে প্রকৃতির যে গুণের বশে মানুষের জ্ঞান বহির্মুখ হয় তাহাই রজোগুণ এবং যে গুণের বশে জ্ঞান অন্তর্মুখ হয় তাহাই সত্ত্বগুণ। গুণের শ্রেণী-বিভাগ এখন নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইল,



ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা উভয়ের সংযোগেই যখন সমস্ত ব্যাপার প্রতিভাত হয়, তখন প্রকৃতির গুণ আত্মাপক্ষ বা প্রকৃতিপক্ষ যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। অজ্ঞান হইতে তমের উৎপত্তি বা তম হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি দুই বলা চলে।

। ১০৩। অন্তর্মুখ জ্ঞান ও বহির্মুখ জ্ঞান কাহাকে বলে এখন তাহা বিচার করিব। অন্তর্মুখ জ্ঞান আমাদের নিজের শুদ্ধ অনুভূতির জ্ঞান, এবং বহির্মুখ জ্ঞান বস্তুজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যখন আমরা ঘণ্টার শব্দ ও বাঁশীর শব্দের পার্থক্য বিচার করি, অর্থাৎ যখন শব্দের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি, তখন মাত্র শব্দের শুদ্ধ অনুভূতি হয় ও তখন শব্দজ্ঞান অন্তর্মুখ হইয়াছে বলা যায়। যখন বহির্বস্তু হিসাবে ঘণ্টা ও বাঁশীর প্রভেদ বিচার করি তখন শব্দায়মান বস্তুর দিকেই মন যায় অর্থাৎ জ্ঞান বহির্মুখ হয়। বহির্বিষয় হইতে মনকে অন্তরের অনুভূতির দিকে লইয়া যাওয়াকে গীতাকার ইন্দ্রিয়সংহরণ বলিয়াছেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৫৮

অর্থাৎ, কচ্ছপ যেমন সর্বদিক হইতে নিজ অঙ্গ স্বীয় অভ্যন্তরে গুটাইয়া লয় সেইরূপ যিনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহরণ করিয়া লইতে পারেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে হইবে। শাস্ত্রমতে মন অন্তর্মুখ না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অন্তর্মুখ মনের দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের শুদ্ধ অনুভূতির জ্ঞান লাভ করি। এই অনুভূতিতে কোন বহির্বস্তুর বোধ নাই। শুদ্ধ অনুভূতি হইতে ক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। অনুভূতির জ্ঞান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের জ্ঞান শুদ্ধ হইলেও তাহাতে নানা গুণ আছে। রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিতে পৃথক পৃথক গুণ বর্তমান কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে কোন নানাত্ব নাই। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই আত্মার স্বরূপ। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মন অন্তর্মুখ করিতে হইবে। অন্তর্মুখ হইলে মন প্রথমে বহির্বস্তু হইতে সরিয়া আসিবে ও ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের শুদ্ধ অনুভূতি জাগিবে। ক্রমে ইন্দ্রিয়জ শুদ্ধ অনুভূতির নানাত্ব লোপ পাইয়া কেবল জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে। ইহাই ব্রহ্মদর্শন।

।**১০৪**। কঠোপনিষদে আছে, স্বয়ম্ভূবিধানে মানুষের ইন্দ্রিয়দ্বার বহির্মুখ হইযাছে সে জন্য বহির্বিষয়ে আমাদের মন ধাবিত হয়। কদাচিৎ কোন ধীর ব্যক্তি অমৃত সন্ধানে চক্ষু আবৃত করিয়া প্রত্যক্ আত্মার দর্শন পান। বহির্বিষয়ে আসক্তি অন্তর্দর্শনের এক প্রধান বাধা। এক হিসাবে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অনুভূতিও বিষয়ানুভূতি। মনের সমস্ত ব্যাপার শাস্ত্রমতে সূক্ষ্ম জড়ের ক্রিয়া। এই সূক্ষ্ম বিষয়ানুভূতিতে আবদ্ধ থাকিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না। এই জন্যই সত্ত্বগুণকে অতিক্রম না করিতে পারিলে আত্মদর্শন সম্ভবপর হয় না। কৌষিতকী উপনিষদ বলিতেছেন, ‘বাক্‌কে জানিতে চেষ্টা করিবে না, বক্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; গন্ধকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আঘ্রাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; রূপকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, রূপবিৎকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; শব্দকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, শ্রোতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; অন্নরসকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; কর্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, কর্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; সুখদুঃখকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, সুখদুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; আনন্দ রতি বা প্রজাতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আনন্দ রতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; গতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, গন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; মনকে জানিতে চেষ্টা

করিবে না, মন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে।' ৩।৮। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ।

। ১০৫ । প্রকৃতির যে গুণের বশে জ্ঞান অন্তর্মুখ হইয়া জীবকে কৈবল্যের বা আত্মদর্শনের পথে লইয়া যায় তাহাই সত্ত্ব গুণ। বহির্মুখ জ্ঞান রজ হইতে উৎপন্ন। এই জ্ঞান বিষয়বস্তু উপলব্ধি করায়। যদিও বস্তুজ্ঞান জীবের মনেই প্রতিভাত হয় তথাপি এই জ্ঞানের বশে জীব নিজ হইতে ভিন্ন এক বহির্জগতের অস্তিত্ব জানিতে পারে। অন্তর্মুখ জ্ঞানে বস্তুবোধনিরপেক্ষ জ্ঞানমাত্র উপলব্ধ হয়, আর বহির্মুখ জ্ঞানে জ্ঞানের দিকটা প্রকাশ না পাইয়া জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুবোধ জন্মে। প্রত্যেক বস্তুর উপলব্ধির সহিত তাহার বিশেষ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি জড়িত থাকে। চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি, হাতে ভিজা কঠিন ও ঠাণ্ডা স্পর্শ বোধ হইল। মনে ভাব আসিল বরফ ছুঁইয়াছি। বহির্বস্তুতেই মন গেল। বরফ-রূপ বস্তু আছে এই বোধ মনের বহির্মুখিতার ফলেই উৎপন্ন হইল, অতএব ইহা রজের ক্রিয়া। মনে হইল ঠাণ্ডা লাগিতেছে ; নিজের অনুভূতির দিকেই মন ছুটিল। মনের এই অন্তর্মুখিতা সত্ত্বগুণ-জাত। রোগে হাত অসাড় হওয়ায় বরফ ঠেকিলেও বরফ ছুঁইয়াছি বা ঠাণ্ডা লাগিতেছে কিছুই মনে হইল না। এ ক্ষেত্রে উভয় প্রকার জ্ঞানই বাধা প্রাপ্ত হইল। অতএব তমের গুণ প্রবল হইল।

। ১০৬ । বিষয়জ্ঞান বা বস্তুবোধ হইতেই আমাদের যাবতীয় কার্যের চেষ্টা জন্মে, এই জন্যই কর্মচেষ্টার মূলে রজ আছে বুঝিতে হইবে। তম অজ্ঞানজ বলিয়া জ্ঞানগুণযুক্ত সত্ত্ব ও রজ উভয়েরই বিপরীত। এ জন্য তমের ক্রিয়া দুই প্রকার। অনুভূতির উপলব্ধিতে বাধা দিয়া তম অপ্রকাশ জন্মায় এবং বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান নষ্ট করায় কর্মে অপ্রবৃত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তি আনয়ন করে। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১৪।১১

অর্থাৎ, যখন এই দেহে সর্বদ্বারে অর্থাৎ সর্ব ইন্দ্রিয়ে যাথার্থ্যনিরূপক জ্ঞান উপস্থিত হয় তখন সত্ত্বই প্রবল এই জানিবে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১৪।১২

অর্থাৎ, ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্মপ্রবণতা নানা কর্মের উদ্যোগ, অশান্তি অর্থাৎ অভাব বোধ, স্পৃহা অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণা রজোগুণ প্রবল হইলে এই সকল জন্মায়।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৪।১৩

অর্থাৎ, হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশ বা জ্ঞান-আবরণ, অপ্রবৃত্তি বা আলস্য, প্রমাদ বা অনবধানতা ও কর্তব্যে অকর্তব্য বিভ্রম এবং মোহ বা অকর্তব্যে আগ্রহ, তমোগুণ প্রবল হইলে এই সকল জন্মায়।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৪।১৭

অর্থাৎ, সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, এবং রজোগুণ হইতে লোভ, তমোগুণ হইতে প্রমাদ ও মোহ এবং অজ্ঞান হয়।

।১০৭। রজোগুণ হইতে বস্তুজ্ঞান এবং বস্তুজ্ঞান হইতে কর্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। অতএব সমস্ত কর্মের মূলে রজোগুণ স্বীকার করা যায়। সমস্ত কর্মই যদি রজ-উদ্ভূত হইল, তবে তামসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া কি কিছু নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে তম বিষয়জ্ঞানে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দুষ্প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে পারে। দুষ্প্রবৃত্তিজাত রজোমূল সমস্ত কর্মকেই তামসিক বলা যাইতে পারে। কর্ম ভিন্ন কেহ মুহূর্তমাত্রও বাঁচিতে পারে না কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম আত্মজ্ঞানলাভে সহায়ক হয় এই জন্যই এইরূপ কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা যায়। সত্ত্ব রজ তম শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য মনে রাখিলে কোন্ কর্ম সাত্ত্বিক, কোন্ কর্ম রাজসিক, কোন্ কর্মই বা তামসিক তাহা বিনা শাস্ত্রবিচারে সহজে বোঝা যাইবে।

।১০৮। আধুনিক যে সকল বিদ্যার আলোচনা হয় তাহার মধ্যে যন্ত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, শিল্পকলা সমস্তই রাজসিক বলা যাইতে পারে। সকল ব্যাবহারিক বিজ্ঞান রাজসিক। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি শুদ্ধ বিজ্ঞান বহির্বস্তু লইয়া কারবার করে, এ জন্য ইহারা মূলত রাজসিক কিন্তু পদার্থবিৎ বা রসায়নবিৎ পক্ষপাত ও ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া কার্য করেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য সাত্ত্বিক; জ্ঞানবৃদ্ধি তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। মনোবিৎ অন্তর্দর্শনের চেষ্টা করেন। মনোরাজ্যের ব্যাপারই তাঁহার আলোচ্য। এ জন্য মনোবিদ্যা সাত্ত্বিক, মনোবিদের কার্যও সাত্ত্বিক। মন-চিকিৎসকের কর্ম রাজসিক কর্ম।

। ১০৯ । শুদ্ধ সত্ত্ব রজ তম দেখা যায় না। সমস্ত ব্যাপারেই এই তিন গুণ অল্পবিস্তর সংমিশ্রিত হইয়া আছে। বিভিন্ন মানুষের স্বভাবে এই তিন গুণের প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে স্বভাবকে সাত্ত্বিক বলা হয়, সেইরূপ রাজসিক ও তামসিক স্বভাবও আছে। গীতায় এই বিভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তির কার্যাবলীর আলোচনা আছে। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক স্বভাবের ব্যক্তিদের কি কি খাদ্য প্রিয় গীতাকার তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। গীতায় উল্লেখ না থাকিলেও যোগীদের মতে বিশেষ বিশেষ খাদ্যে এই তিন গুণের পৃথকভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে। কোন বিশেষ খাদ্য সাত্ত্বিক বা তামসিক নির্ণয় করিবার উপায় আমাদের অজ্ঞাত। এ বিষয়ে শাস্ত্রের ও যোগীদের কথাই বিনা বিচারে মানিতে হয় কিন্তু সত্ত্ব রজ তমের আমি যে মূলতত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছি তাহাতে খাদ্যের সাত্ত্বিক ইত্যাদি গুণ মনোবিদের পরীক্ষাগারে নির্ণীত হইতে পারিবে। পরীক্ষ্যমাণ ব্যক্তিকে যদি বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়া দেখা যায় যে তাহার introspection বা অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তবে সেই সেই খাদ্য সাত্ত্বিক প্রমাণিত হইবে। তদ্রূপ রাজসিক ও তামসিক খাদ্যেরও পরীক্ষা হইতে পারে।

। ১১০ । শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মোপলব্ধির পক্ষে প্রকৃতির তিন গুণই বাধা। তমের বাধা সর্বাপেক্ষা প্রবল, তার নীচে রজের, তার নীচে সত্ত্বের। পূর্বে সত্ত্বগুণকে আত্মজ্ঞানলাভের সহায়ক বলা হইয়াছে কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যদি আসক্তি জন্মায় তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞানের উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না। সত্ত্বগুণই আত্মোপলব্ধির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পথের মায়া না কাটাইলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যায় না। গীতায় আছে,

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪।২০

অর্থাৎ, দেহসমুদ্ভব এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া দেহী বা দেহধারী আত্মা জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত ভোজন করেন বা অমৃতত্ব লাভ করেন।

গীতা

মূল শ্লোক ও যথাযথ অনুবাদ

অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ॥ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ॥ দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথাঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুংগবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

প্রথম অধ্যায়। অর্জুনবিষাদযোগ

॥ ১ ॥ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন ॥ সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকামী হইয়া সমবেত মৎপক্ষীয়গণ এবং পাণ্ডবেরা কি করিয়াছিল ॥

॥ ২ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ তখন পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহাকারে সন্নিবিষ্ট দেখিয়া রাজা দুর্যোধন আচার্যের সমীপস্থ হইয়া বাক্য বলিলেন ॥

॥ ৩ ॥ আচার্য, অপনার শিষ্য ধীমান দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ব্যূহিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিশাল সৈন্য অবলোকন করুন ॥

॥ ৪ ॥ এই স্থানে বীর মহাধনুর্ধর যুদ্ধে ভীমার্জুনসম যুযুধান এবং বিরাট এবং মহারথ দ্রুপদ ॥

॥ ৫ ॥ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং বীর্যবান কাশিরাজ এবং কুন্তিভোজ পুরুজিৎ এবং নরপুংগব শৈব্য ॥

॥ ৬ ॥ এবং পরাক্রান্ত যুধামন্যু এবং বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহারথ, (অবস্থিত আছেন) ॥

॥ ৭ ॥ দ্বিজোত্তম, আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট সৈন্যনায়ক পরিচয়ার্থ আপনার সমীপে তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, তাঁহাদের অবধারণ করুন ॥

॥ ৮ ॥ আপনি এবং ভীষ্ম এবং কর্ণ এবং যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ এবং সেইরূপই সোমদত্তপুত্র ॥

॥ ৯ ॥ এবং অন্য অনেক বীর আমার জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত, সকলেই নানা শস্ত্রপ্রহরণপটু যুদ্ধবিশারদ ॥

॥ ১০ ॥ আমাদের বল ভীষ্মদ্বারা অভিরক্ষিত তাহা অপর্যাপ্ত কিন্তু ভীমের দ্বারা অভিরক্ষিত ইহাদের এই বল পর্যাপ্ত ॥

॥ ১১ ॥ সকল দ্বারেই যথানির্দিষ্ট অবস্থিত হইয়া আপনারা ভীষ্মকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥

॥ ১২ ॥ তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিয়া শক্তিমান কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সিংহনাদ নাদিত করিয়া উচ্চরবে শঙ্খ পরিপূরিত করিলেন ॥

॥ ১৩ ॥ তখন বহু শঙ্খ ও ভেরী ও পণব, আনক, গোমুখ সকল সহসা বাদিত হওয়ায় সেই শব্দ তুমুল হইয়াছিল ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
অর্জুন উবাচ॥ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩
সঞ্জয় উবাচ॥ এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥ ২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ তখন শ্বেতঅশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে অবস্থিত মাধব এবং পাণ্ডবও দিব্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন ॥

॥ ১৫ ॥ হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্মা বৃকোদর মহাশঙ্খ পৌণ্ড্র বাজাইলেন ॥

॥ ১৬ ॥ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় এবং নকুল সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক ॥

॥ ১৭ ॥ এবং মহাধনুর্ধর কাশ্য এবং মহারথ শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি ॥

॥ ১৮ ॥ পৃথিবীপতে, দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীপুত্রেরা এবং মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র সকলেই সর্বদিকে পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন ॥

॥ ১৯ ॥ সেই তুমুল শব্দ আকাশ এবং পৃথিবীকেও অনুনাদিত করিয়া ধার্তরাষ্ট্র-দিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥

॥ ২০ ॥ অনন্তর ধার্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রসম্পাত আসন্ন হওয়ায় কপিধ্বজ পাণ্ডব ধনু উত্তোলিত করিয়া ॥

॥ ২১ ॥ মহীপতে, তখন হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর ॥

॥ ২২ ॥ যতক্ষণ যুদ্ধকামনায় অবস্থিত আমি ইহাদের দেখি, এই আসন্ন রণে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ॥

॥ ২৩ ॥ যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি ধার্তরাষ্ট্রের প্রিয়কর্মসাধনকামী এই যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন সেই যুদ্ধার্থিগণকে আমি দেখি ॥

॥ ২৪ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ ভারত, গুড়াকেশ কর্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে রথশ্রেষ্ঠ স্থাপনা করিয়া ॥

॥ ২৫ ॥ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সকল রাজাদের সম্মুখীন হইয়া এইরূপ বলিলেন, পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর ॥

॥ ২৬ ॥ অনন্তর পার্থ দেখিলেন তথায় রহিয়াছেন পিতৃস্থানীয়গণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রস্থানীয়গণ তথা সখাগণ ॥

॥ ২৭ ॥ এবং শ্বশুরগণ এবং সুহৃদগণ। সেই কুন্তিপুত্র উভয় সেনাতেই সেই সকল প্রিয়জনকে অবস্থিত দেখিয়া ॥

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।
অর্জুন উবাচ॥ দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্॥ ২৮
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥ ২৯
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে॥ ৩৫
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥ ৩৬
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৭
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ॥ ৪১

॥ ২৮ ॥ পরম কৃপাবিষ্ট বিষণ্ণ হইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, এই সকল যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণকে সমুপস্থিত দেখিয়া ॥

॥ ২৯ ॥ আমার অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে এবং আমার শরীরে কম্পন ও রোমহর্ষ উৎপন্ন হইতেছে ॥

॥ ৩০ ॥ হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং গাত্রদাহ হইতেছে, অবস্থান করিতেও পারিতেছি না এবং মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে ॥

॥ ৩১ ॥ কেশব, বিপরীত লক্ষণসমূহ দেখিতেছি, যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ও দেখিতেছি না ॥

॥ ৩২ ॥ কৃষ্ণ, জয়লাভ আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য ও সুখসমূহও নহে। গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি হইবে, ভোগ বা জীবনেই বা কি প্রয়োজন ॥

॥ ৩৩ ॥ যাহাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখসমূহ কাঙ্ক্ষিত সেই তাহারাই প্রাণ ও ধন ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত ॥

॥ ৩৪ ॥ আচার্যগণ, পিতৃস্থানীয়গণ, পুত্রগণ তথা পিতামহগণও, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং সম্বন্ধিগণ ॥

॥ ৩৫ ॥ মধুসূদন, পৃথিবীর জন্য কি কথা তিন লোকের রাজত্বের জন্যও নিহত হইলে ইহাদের বধ করিতে ইচ্ছা করি না ॥

॥ ৩৬ ॥ জনার্দন, ধার্তরাষ্ট্রদিগকে হত্যা করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে, এই সকল আততায়িগণকে বধ করিয়া আমাদের পাপই আশ্রয় করিবে ॥

॥ ৩৭ ॥ সে জন্য সবান্ধব ধার্তরাষ্ট্রদিগকে হনন করিতে আমরা যোগ্য নহি, মাধব, স্বজন হত্যা করিয়া সুখীই বা কি প্রকারে হইতে পারিব ॥

॥ ৩৮ ॥ যদিও ইহারা লোভে নষ্টবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাতক দেখিতেছে না ॥

॥ ৩৯ ॥ জনার্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষদ্রষ্টা আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জ্ঞান কেন না হইবে ॥

॥ ৪০ ॥ কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্মসকল নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম সমস্ত কুলকেই অভিভূত করে ॥

॥ ৪১ ॥ কৃষ্ণ, অধর্মের অভিভবে কুলস্ত্রীরা দোষযুক্তা হয়, বার্ষ্ণেয়, স্ত্রী দুষ্টা হইলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয় ॥

সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৪
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ॥
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৭

ইতি অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

॥ ৪২ ॥ সংকর সন্তান কুলহন্তা ব্যক্তির এবং কুলের নরকপ্রাপ্তিরই কারণ হয়, ইহাদের পিণ্ডোদকক্রিয়ালুপ্ত পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয় ॥

॥ ৪৩ ॥ কুলহন্তাদের এই সকল বর্ণসংকরকারক দোষের দ্বারা শাশ্বত জাতিধর্ম ও কুলধর্মসমূহ উচ্ছিন্ন হয় ॥

॥ ৪৪ ॥ জনার্দন, কুলধর্ম হইতে উচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগের নরকে নিয়ত বাস হয় এইরূপ শুনিয়াছি ॥

॥ ৪৫ ॥ হায়, আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কারণ রাজ্যসুখ লোভের বশে স্বজন হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥

॥ ৪৬ ॥ শস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রতিকারবিমুখ অশস্ত্র আমাকে যদি রণে বিনাশ করে তাহা আমার অধিকতর কল্যাণপ্রদ হইবে ॥

॥ ৪৭ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ যুদ্ধকালে এই বলিয়া শোকাকুলহৃদয় অর্জুন সশর ধনু পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলেন ॥

অর্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ ॥ তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ ॥ কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩
অর্জুন উবাচ ॥ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮
সঞ্জয় উবাচ ॥ এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০
শ্রীভগবানুবাচ ॥ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়। সাংখ্যযোগ

॥ ১ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ সেই প্রকার কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ, আকুলনেত্র, বিষাদগ্রস্ত তাঁহাকে মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন ॥

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অর্জুন, বিষম কালে এই অনার্যোচিত স্বর্গহানিকর অকীর্তিকর চিত্তমলিনতা তোমার কোথা হইতে উপস্থিত হইল ॥

॥ ৩ ॥ পার্থ, দুর্বলতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে, পরন্তপ, ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থান কর ॥

॥ ৪ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ অরিসূদন মধুসূদন, সমরে পূজার পাত্র ভীষ্ম এবং দ্রোণের প্রতি শরসন্ধানদ্বারা আমি কি করিয়া যুদ্ধ করিব ॥

॥ ৫ ॥ মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোগ করাই শ্রেয় কিন্তু গুরুগণকে বিনাশ করিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থকামভোগসমূহ ভুঞ্জিতে হইবে ॥

॥ ৬ ॥ যদি বা জয়লাভ করি অথবা যদি আমাদের জয় করে, কোনটি আমাদের শ্রেয় ইহাও জানি না। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া জীবিত থাকিতে চাহি না সেই ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ॥

॥ ৭ ॥ দৈন্যদোষে অভিভূতস্বভাব, ধর্ম বিষয়ে মোহগ্রস্ত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা আমাকে নিশ্চিত বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও ॥

॥ ৮ ॥ ভূতলে অপ্রতিদ্বন্দ্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এমন কি সুরগণের আধিপত্য পাইলেও ইন্দ্রিয়গণের পীড়াদায়ক আমার শোক যাহাতে অপনোদন করিতে পারে দেখিতেই পাইতেছি না ॥

॥ ৯ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকার বলিবার পর যুদ্ধ করিব না এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥

॥ ১০ ॥ ভারত, উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত তাঁহাকে হৃষীকেশ যেন ঈষৎ হাস্য সহকারে এই কথা বলিলেন ॥

॥ ১১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ তুমি অশোচ্যদিগের জন্য শোক করিতেছ আবার জ্ঞানের কথা বলিতেছ, মৃত বা জীবিতগণের জন্য পণ্ডিতেরা অনুশোচনা করেন না ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫

॥ ১২ ॥ আমি ছিলাম না, তুমি না, এই সকল নরপতিগণ নয়, এরূপ কদাচ নহে, অতঃপর আমরা সকলে থাকিব না ইহাও নহে ॥

॥ ১৩ ॥ দেহধারিগণের এই দেহে যেমন কৌমার যৌবন জরা সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তি, বুদ্ধিমান তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না ॥

॥ ১৪ ॥ কৌন্তেয়, শীতলতা-উষ্ণতা-সুখ-দুঃখদায়ক মাত্রাস্পর্শসকল উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্য, ভারত, সে সকল সহ্য কর ॥

॥ ১৫ ॥ পুরুষর্ষভ, সুখদুঃখে সমভাব, বুদ্ধিমান যে পুরুষকে ইহারা ব্যথিত করে না তিনিই অমৃতের যোগ্য ॥

॥ ১৬ ॥ অসৎ পদার্থের অস্তিত্ব নাই, সৎবস্তুর অবিদ্যমানতা নাই, তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক ইহাদের উভয়েরই চরম তথ্য উপলব্ধ হইয়াছে ॥

॥ ১৭ ॥ যাহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত তাহাকে অবিনাশীরূপেই জানিও, কেহই এই অব্যয় সত্তার বিনাশে সক্ষম নহে ॥

॥ ১৮ ॥ অবিনাশী, অপ্রমেয়, নিত্য শরীরীর এই দেহসমূহ বিনাশশীল কথিত হইয়াছে, অতএব ভারত, যুদ্ধ কর ॥

॥ ১৯ ॥ যে ইহাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা উভয়ে জানে না, ইহা হনন করে না হত হয় না ॥

॥ ২০ ॥ ইহা কদাচ জন্মে না বা মরে না, পূর্বে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবে এরূপও নহে, ইহা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলে নষ্ট হয় না ॥

॥ ২১ ॥ পার্থ, যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত, অব্যয় বলিয়া জানে সেই পুরুষ কি করিয়া কাহাকে হত্যা করাইবে, কাহাকে হত্যা করিবে ॥

॥ ২২ ॥ মনুষ্য যে প্রকার জীর্ণবস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন গ্রহণ করে সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীরসকল ত্যাগ করিয়া অন্য নূতনে গমন করে ॥

॥ ২৩ ॥ শস্ত্রসমূহ ইহাকে ছিন্ন করে না, অগ্নি ইহাকে দহন করে না, জলও ইহাকে ক্লিন্ন করে না, বায়ু শুষ্ক করে না ॥

॥ ২৪ ॥ ইহা অচ্ছেদ্য, ইহা অদাহ্য, ইহা অক্লেদ্য এবং অশোষ্যও, ইহা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থাণুবৎ স্থির, অচল, সনাতন ॥

॥ ২৫ ॥ ইহা অব্যক্ত, ইহা অচিন্ত্য, ইহা অবিকার্য উক্ত হয়, সে জন্য ইহাকে এইপ্রকার জানিয়া শোক করা উচিত নহে ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

॥ ২৬ ॥ আর যদি ইহাকে নিত্য জন্মিতেছে বা নিত্য মরিতেছে মনে কর তথাপি মহাবাহো, ইহার জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে ॥

॥ ২৭ ॥ যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের জন্ম ধ্রুব অতএব অপরিহার্য ব্যাপারে তুমি শোক করিতে পার না ॥

॥ ২৮ ॥ ভারত, ভূতসমূহ আদিতে অব্যক্ত মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনের পরও অব্যক্ত, সে ক্ষেত্রে কিসের বিলাপ ॥

॥ ২৯ ॥ কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ দেখে এবং সেইরূপ অন্যে অদ্ভুত বস্তুর ন্যায় ইহার বর্ণনা করে এবং অপরে আশ্চর্যবৎ ইহার কথা শ্রবণ করে কিন্তু কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানে না ॥

॥ ৩০ ॥ ভারত, এই দেহী সকল দেহে সর্বকালে অবধ্য অতএব তুমি সমগ্র ভূতের জন্য শোক করিতে পার না ॥

॥ ৩১ ॥ আর স্বধর্মের দিকে দেখিলেও বিচলিত হওয়া উচিত নহে কারণ ধর্মপ্রদ যুদ্ধাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয় নাই ॥

॥ ৩২ ॥ এবং আপনা হইতেই স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, পার্থ, সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণ এইপ্রকার যুদ্ধ লাভ করেন ॥

॥ ৩৩ ॥ আর যদি তুমি এই ধর্মপ্রদ যুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম এবং কীর্তিও হারাইয়া পাপপ্রাপ্ত হইবে ॥

॥ ৩৪ ॥ এবং লোকেরাও তোমার চিরস্থায়ী অকীর্তি ঘোষণা করিবে, সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্তি মরণের অধিক ॥

॥ ৩৫ ॥ মহারথগণও তোমাকে ভয়ে যুদ্ধবিরাগী মনে করিবেন যাঁহাদের কাছে বহুগুণযুক্ত বিবেচিত হইয়াও তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে ॥

॥ ৩৬ ॥ অহিতকারিগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বহু অকথ্য কথা বলিবে, তাহার অপেক্ষা আর কি অধিকতর দুঃখকর ॥

॥ ৩৭ ॥ নিহত হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে আর জিতিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, সে জন্য, কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থে স্থিরসংকল্প করিয়া উত্থান কর ॥

॥ ৩৮ ॥ সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় সমান বিবেচনা করিয়া তদনন্তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এ প্রকারে পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

॥ ৩৯ ॥ পার্থ, সাংখ্যমতে এই প্রকার বুদ্ধি তোমাকে বলা হইল এইবার যোগমতে ইহা শুন যে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে কর্মবন্ধন পরিহার করিবে ॥

॥ ৪০ ॥ ইহাতে অভিক্রমনাশ নাই প্রত্যবায় নাই, এই ধর্মের স্বল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে ॥

॥ ৪১ ॥ কুরুনন্দন, ইহাতে বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, একমার্গী পরন্তু অব্যবসায়ীদের বুদ্ধিসকল বহুধা বিভক্ত এবং অশেষ প্রকারের ॥

॥ ৪২, ৪৩ ॥ পার্থ, বেদবাদে নিরত (এবং) ইহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই এই মতাবলম্বী কামনাময় স্বর্গাভিলাষী অজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার বর্ণনাবহুল জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্যপ্রাপ্তিপ্রতিপাদক এই যে পুষ্পিত বাক্য বলে ॥

॥ ৪৪ ॥ তাহাতে মোহিতচিত্ত ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে প্রযুক্ত হয় না ॥

॥ ৪৫ ॥ বেদসমূহ ত্রিগুণাধিকৃত বিষয়ের প্রতিপাদক, অর্জুন, ত্রিগুণাত্মকবিষয়-ত্যাগী, দ্বন্দ্বরহিত, নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আহরণ ও সঞ্চয়ে নিস্পৃহ, আত্মপ্রতিষ্ঠ হও ॥

॥ ৪৬ ॥ সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে জলাশয়ে যে প্রয়োজন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণের সর্ব বেদে তাহাই ॥

॥ ৪৭ ॥ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কদাচ নহে, কর্মফলের হেতু হইও না, অকর্মে তোমার আসক্তি না হউক ॥

॥ ৪৮ ॥ ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান হইয়া যোগালম্বনে কর্মসকল কর, সমত্বকে যোগ বলে ॥

॥ ৪৯ ॥ ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ হইতে দূরে থাকিলে কর্ম নিকৃষ্টই, বুদ্ধির আশ্রয় অন্বেষণ কর, (বন্ধন) ফলপ্রদ কর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ কৃপার পাত্র ॥

॥ ৫০ ॥ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত দুষ্কৃত উভয় পরিত্যাগ করে অতএব যোগালম্বনের জন্য প্রবৃত্ত হও, কর্মের কৌশল যোগ ॥

॥ ৫১ ॥ বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়াই জন্মবন্ধমুক্ত হইয়া অনাময় পদে গমন করেন ॥

॥ ৫২ ॥ তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কালুষ্য পার হইবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হইবে ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ॥ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ॥ প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

॥ ৫৩ ॥ যখন শ্রুতিবিভ্রান্ত তোমার বুদ্ধি নিশ্চলা হইয়া সমাধিতে অচলা স্থিতি লাভ করিবে তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥

॥ ৫৪ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কেশব, সমাধিযুক্ত স্থিতবুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ কি, স্থিতধী কি বলেন, কি ভাবে থাকেন, কিরূপে চলেন ॥

॥ ৫৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, যখন সর্বপ্রকার মনোগত কামনার বস্তুসমূহ বিসর্জন করেন, আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥

॥ ৫৬ ॥ দুঃখে অবিচলিতমন, সুখে বিগতস্পৃহ, অনুরাগ ভয় ক্রোধপরিত্যাগী স্থিতধী মুনি কথিত হন ॥

॥ ৫৭ ॥ যিনি সর্বত্র স্নেহশূন্য, শুভ ও অশুভ প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ব্যাপারে আনন্দিত হন না এবং দ্বেষ করেন না তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥

॥ ৫৮ ॥ যখন ইনি সকল দিকে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে কূর্মের অঙ্গসমূহের ন্যায় গুটাইয়া লন (তখন) তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥

॥ ৫৯ ॥ রস অব্যাহত রাখিয়া নিরাহার দেহধারীর বিষয়সমূহ নিবৃত্ত হয়, পরমতত্ত্ব দর্শন করিয়া ইঁহার রসও নিবৃত্ত হয় ॥

॥ ৬০ ॥ কৌন্তেয়, যত্নপর হইলেও বিদ্বান পুরুষের মন বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক হরণ করে ॥

॥ ৬১ ॥ সেই সকলকে সংযম করিয়া (বুদ্ধি) যোগযুক্ত মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥

॥ ৬২ ॥ বিষয়সমূহের ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে সঙ্গ জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥

॥ ৬৩ ॥ ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিলোপ হইতে বিনাশ হয় ॥

॥ ৬৪ ॥ কিন্তু সংযতাত্মা পুরুষ রাগদ্বেষবিরহিত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন ॥

॥ ৬৫ ॥ প্রসাদের ফলে ইঁহার সর্বদুঃখের নাশ হয়, প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র সর্বত্র স্থিতি লাভ করে ॥

॥ ৬৬ ॥ অযুক্তের বুদ্ধি নাই এবং অযুক্তের ভাবনা নাই, ভাবনাহীন ব্যক্তির শান্তিও নাই, অশান্তের সুখ কোথায় ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্‌বৎ।
তদ্‌বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

ইতি সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

॥ ৬৭ ॥ কারণ বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের যাহাকে মন অনুধাবন করে তাহা, বায়ু যেমন জলে নৌকা, ইহার প্রজ্ঞা হরণ করে ॥

॥ ৬৮ ॥ সে জন্য, মহাবাহো, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে সর্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥

॥ ৬৯ ॥ সর্বপ্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি তাহাতে সংযমী জাগ্রত থাকেন, যাহাতে প্রাণিগণ জাগ্রত থাকে দ্রষ্টা মুনির তাহা রাত্রি ॥

॥ ৭০ ॥ পরিপূরিত হইতে থাকিয়াও অচলভাবে স্থিত সমুদ্রে জলসমূহ যে ভাবে প্রবেশ করে তদ্বৎ সর্বকাম যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনি শান্তি পান, কামকামী নহে ॥

॥ ৭১ ॥ যে নিস্পৃহ, মমত্বশূন্য, নিরহংকার পুরুষ সর্বকাম বর্জন করিয়া বিচরণ করেন তিনি শান্তিলাভ করেন ॥

॥ ৭২ ॥ পার্থ, ইহা ব্রাহ্মী স্থিতি, ইহা প্রাপ্ত হইলে মোহগ্রস্ত হয় না এবং ইহাতে থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥

সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ ॥ জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২
শ্রীভগবানুবাচ ॥ লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

তৃতীয় অধ্যায়। কর্মযোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ জনার্দন, যদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠ মনে হয় তবে, কেশব, নিষ্ঠুর কর্মে আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ ॥

॥ ২ ॥ বিমিশ্রিতের ন্যায় বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি সেইরূপ এক (মার্গ) নিশ্চিত করিয়া বল ॥

॥ ৩ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অনঘ, এই লোকে দুইপ্রকার নিষ্ঠা আমার দ্বারা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যগণের কর্মযোগদ্বারা যোগিগণের ॥

॥ ৪ ॥ কর্মসকলের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিয়া মনুষ্য নৈষ্কর্ম্যফল ভোগ করে না এবং সন্ন্যাস হইতেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥

॥ ৫ ॥ যেহেতু কেহ কখনও ক্ষণকালও অকর্মকৃৎ হইয়া থাকে না কারণ প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারা অবশ হইয়া সকলে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥

॥ ৬ ॥ কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযম করিয়া যে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়বিষয় সকল স্মরণ করিতে থাকে সেই বিমূঢ়মতি মিথ্যাচারী কথিত হয় ॥

॥ ৭ ॥ কিন্তু, অর্জুন, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অসক্ত-চিত্তে কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মযোগ আরম্ভ করেন তিনি বিশেষিত হন ॥

॥ ৮ ॥ তুমি নিয়ত কর্ম কর কারণ অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং অকর্মা থাকিলে তোমার শরীরযাত্রাও সম্পন্ন হইবে না ॥

॥ ৯ ॥ অপর দিকে, যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে এই লোক কর্মবন্ধনযুক্ত, কৌন্তেয়, তদর্থ কর্ম সঙ্গরহিত হইয়া আচরণ কর ॥

॥ ১০ ॥ পুরাকালে প্রজাপতি যজ্ঞসহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা বৃদ্ধিলাভ কর, ইহা তোমাদের অভিলষিত ফলদায়ক হউক ॥

॥ ১১ ॥ ইহার দ্বারা দেবতাদের তৃপ্তিসাধন কর, সেই দেবতারা তোমাদের তৃপ্তিসাধন করুন, পরস্পর তৃপ্তিদানে পরম শ্রেয় লাভ কর ॥

॥ ১২ ॥ কারণ যজ্ঞে তৃপ্ত দেবতারা তোমাদের অভীষ্ট ভোগসমূহ দান করিবেন, তাঁহাদিগকে না দিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তুসমূহ যে ভোগ করে সে তস্করই ॥

॥ ১৩ ॥ যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন কিন্তু যাহারা নিজের জন্য পাক করে সেই পাপিগণ পাপভোগ করে ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ২০
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ অন্ন হইতে ভূতগণ জন্মে, মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে মেঘ জন্মে, যজ্ঞ কর্ম হইতে উদ্ভূত ॥

॥ ১৫ ॥ কর্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত জানিবে, ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত, সেই হেতু সর্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ॥

॥ ১৬ ॥ ইহলোকে যে এইপ্রকার প্রবর্তিত চক্রের অনুসরণ করে না, পার্থ, সেই পাপজীবন ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামী বৃথা প্রাণধারণ করে ॥

॥ ১৭ ॥ কিন্তু যে মানব আত্মরতি এবং আত্মতৃপ্ত এবং নিজেতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহার কোন করণীয় থাকে না ॥

॥ ১৮ ॥ তাঁহার ইহলোকে কর্মের কোন অর্থ নাই, অকর্মেরও নাই, ইঁহার সর্বভূতে কোন আশ্রয়ের প্রয়োজনও নাই ॥

॥ ১৯ ॥ অতএব অনাসক্ত হইয়া সতত করণীয় কর্মের আচরণ কর কারণ পুরুষ অসক্তচিত্তে কর্মাচরণ করিয়া পরমকে প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ২০ ॥ জনক প্রভৃতি কর্মের দ্বারাই সম্যক্‌সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকসংগ্রহ দেখিয়াও তোমার কর্ম কর্তব্য ॥

॥ ২১ ॥ শ্রেষ্ঠ যাহা যাহা আচরণ করেন ইতর জন তাহা তাহাই আচরণ করে, তিনি যে প্রমাণ স্থাপন করেন লোকে তাহার অনুবর্তী হয় ॥

॥ ২২ ॥ পার্থ, তিন লোকে আমার কিছুই করণীয় নাই, অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য নাই তথাপি কর্মে অবস্থিত আছি ॥

॥ ২৩ ॥ কারণ, পার্থ, যদি আমি অনলস হইয়া কর্মে বর্তমান কখনও না থাকি মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হইবে ॥

॥ ২৪ ॥ যদি আমি কর্ম না করি এই লোকসমূহ উৎসন্ন হইবে, আমিও বর্ণসংকরের কর্তা হইব, এই সকল প্রজা নষ্ট করিব ॥

॥ ২৫ ॥ ভারত, কর্মে আসক্ত হইয়া অবিদ্বান যদ্রূপ করে বিদ্বান লোকসংগ্রহে ইচ্ছুক হইয়া অনাসক্তচিত্তে তদ্রূপ করিবেন ॥

॥ ২৬ ॥ বিদ্বান কর্মে আসক্তিযুক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, (বুদ্ধি)যোগযুক্ত হইয়া আচরণ করিতে থাকিয়া সর্বরকমের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করাইবেন ॥

॥ ২৭ ॥ প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্মসকল সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ (হইলেও) অহংকারে বিমোহিত ব্যক্তি আমি কর্তা ইহা মনে করে ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ॥

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ॥

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

॥ ২৮ ॥ কিন্তু, মহাবাহো, গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ গুণসমূহ গুণেতে ক্রিয়াশীল ইহা বিবেচনা করিয়া আসক্ত হন না ॥

॥ ২৯ ॥ প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়, সেই সকল অল্পজ্ঞানী মন্দমতিদের পূর্ণজ্ঞানবান বিচলিত করিবেন না ॥

॥ ৩০ ॥ অধ্যাত্মচিত্তে সমস্ত কর্ম আমাতে সন্ন্যস্ত করিয়া ফলকামনাশূন্য মমত্বশূন্য বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর ॥

॥ ৩১ ॥ যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান অসূয়াহীন হইয়া আমার মতের নিত্য অনুবর্তন করে তাহারা কর্ম হইতে মুক্ত হয় ॥

॥ ৩২ ॥ কিন্তু যাহারা অসূয়াবশত আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না সেই সর্বজ্ঞানবিমূঢ়দের নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥

॥ ৩৩ ॥ জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী কর্মে চেষ্টিত হয়, প্রাণিগণ প্রকৃতির বশে চলে, নিগ্রহ কি করিবে ॥

॥ ৩৪ ॥ প্রতি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে, তাহাদের বশে আসিও না কারণ তাহারা ইহার পরিপন্থী ॥

॥ ৩৫ ॥ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম মঙ্গলকর, স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ ॥

॥ ৩৬ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কিন্তু, বার্ষ্ণেয়, কাহার দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া এই পুরুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ আচরণ করে ॥

॥ ৩৭ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ রজগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম এই ক্রোধ মহাগ্রাসী মহাপাপমূল, ইহলোকে ইহাকে শত্রু জানিও ॥

॥ ৩৮ ॥ ধূমের দ্বারা যেমন বহ্নি এবং মলের দ্বারা যেমন দর্পণ ঢাকা পড়ে যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে সেইরূপ তাহার দ্বারা ইহসংসার আবৃত ॥

॥ ৩৯ ॥ কৌন্তেয়, এই নিত্যশত্রু দুষ্পূরণীয় কামরূপ অনলদ্বারা জ্ঞানিগণেরও জ্ঞান আবৃত ॥

॥ ৪০ ॥ ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান কথিত হয়, ইহাদের সাহায্যে জ্ঞান আবৃত করিয়া ইহা দেহীকে মোহগ্রস্ত করে ॥

॥ ৪১ ॥ ভরতর্ষভ, সে জন্য তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশন পাপরূপী ইহাকে জয় কর ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

ইতি কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

॥ ৪২ ॥ ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ উক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই ॥

॥ ৪৩ ॥ মহাবাহো, এই ভাবে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁহাকে বুঝিয়া নিজের দ্বারা নিজেকে অবিচলিত রাখিয়া কামরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে জয় কর ॥

কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩
অর্জুন উবাচ॥ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদবিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪
শ্রীভগবানুবাচ॥ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়। জ্ঞানযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমি বিবস্বানকে এই অব্যয় যোগ বলিয়াছিলাম, বিবস্বান মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেন ॥

॥ ২ ॥ এই প্রকারে রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে ইহা অবগত হইয়াছিলেন, পরন্তপ, দীর্ঘকালপ্রভাবে সেই যোগ ইহলোকে নষ্ট হইয়া গেল ॥

॥ ৩ ॥ আমার ভক্ত এবং সখা হও বলিয়া এই সেই পুরাতন যোগ আজ আমার দ্বারা তোমাকে কথিত হইল, কারণ ইহা উত্তম রহস্য ॥

॥ ৪ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ আপনার জন্ম পরে, বিবস্বানের জন্ম পূর্বে, এ বিষয়ে তুমি আদিতে বলিয়াছিলে ইহা কি করিয়া জানিব ॥

॥ ৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমস্ত জানি, পরন্তপ, তুমি জান না ॥

॥ ৬ ॥ জন্মরহিত হইয়াও, অব্যয়াত্মা এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়ার সাহায্যে জন্মগ্রহণ করি ॥

॥ ৭ ॥ ভারত, যে যে কালে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের উদয় হয় তখন আমি নিজেকে সৃজন করি ॥

॥ ৮ ॥ সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি ॥

॥ ৯ ॥ অর্জুন, যে আমার এই দিব্য জন্ম এবং কর্মের তত্ত্ব জানে সে দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না, আমাকে পায় ॥

॥ ১০ ॥ বিষয়ের আকর্ষণ-ভয়-ক্রোধ-রহিত, মদেকচিত্ত বহু ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

॥ ১১ ॥ আমাকে যাহারা যে ভাবে আশ্রয় করে আমি তাহাদের সেই ভাবেই সন্তুষ্ট করি, পার্থ, মনুষ্যেরা সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে ॥

॥ ১২ ॥ ইহলোকে কর্মসমূহের সিদ্ধিকামিগণ দেবতাদিগের যজন করে কারণ মনুষ্যলোকে কর্মজ সিদ্ধি শীঘ্র হয় ॥

॥ ১৩ ॥ গুণকর্মবিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা চতুর্বর্ণব্যবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্তা জানিবে ॥

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ১৮
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করে না, কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এই ভাবে আমাকে যিনি জানেন তিনি কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥

॥ ১৫ ॥ এইরূপ জানিয়া পূর্ববর্তী মোক্ষাভিলাষিগণ কর্তৃক কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অতএব তুমি পূর্বজগণকর্তৃক কৃত তৎপূর্বকাল হইতে নির্দিষ্ট কর্ম কর ॥

॥ ১৬ ॥ কি কর্ম, কি অকর্ম এ বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিও মোহগ্রস্ত, তোমাকে সেই কর্ম বলিব যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥

॥ ১৭ ॥ কর্মকেও জানিতে হইবে, বিকর্মকেও জানিতে হইবে এবং অকর্ম জানিতে হইবে কারণ কর্মের গতি গহন ॥

॥ ১৮ ॥ যিনি কর্মে অকর্ম এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন মনুষ্যমধ্যে তিনি বুদ্ধিমান, তিনি সর্বকর্মকৃৎ যোগী ॥

॥ ১৯ ॥ যাঁহার সমস্ত কর্মের উদ্যোগ কামনা ও সংকল্পবর্জিত সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্মাকে বিদ্বানগণ পণ্ডিত বলেন ॥

॥ ২০ ॥ কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করায় সদাতৃপ্ত বহির্বিষয়ে অনপেক্ষী তিনি কর্মের প্রতি উদ্যোগী হইলেও কিছুই করেন না ॥

॥ ২১ ॥ ফলকামনাহীন, সংযতচিত্ত, সর্বপরিগ্রহত্যাগী ব্যক্তি কেবল শারীরকর্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হন না ॥

॥ ২২ ॥ অযাচিত যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, মাৎসর্যভাবশূন্য, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি ব্যক্তি কর্ম করিয়াও বদ্ধ হন না ॥

॥ ২৩ ॥ আসক্তিশূন্য, মুক্ত, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যজ্ঞার্থে আচরিত সমস্ত কর্ম বিলীন হয় ॥

॥ ২৪ ॥ অর্পণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মদ্বারা হুত হবি ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকর্মে সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য ॥

॥ ২৫ ॥ অপর যোগিগণ দৈব যজ্ঞই আচরণ করেন, অন্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞকে আহুতি দেন ॥

॥ ২৬ ॥ অপরে সংযমাগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেন, অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহ আহুতি দেন ॥

॥ ২৭ ॥ অপরে জ্ঞানদ্বারা প্রদীপিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে সকল ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্মসমূহ আহুতি দেন ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১

॥ ২৮ ॥ তদ্বৎ অপরে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং দৃঢ়ব্রত যতিগণ স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ (পরায়ণ হন) ॥

॥ ২৯ ॥ তথা অপরে অপানে প্রাণ, প্রাণে অপান আহুতি দেন, প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ (হন) ॥

॥ ৩০ ॥ অন্যে আহার নিয়মিত করিয়া প্রাণের দ্বারা প্রাণসমূহকে আহুতি দেন। এই যজ্ঞবিদ্‌গণ সকলেই যজ্ঞের ফলে ক্ষয়িতপাপ (হন) ॥

॥ ৩১ ॥ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজী সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন, কুরুসত্তম, যিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন না তাঁহার ইহলোক নাই, অন্য লোক কোথায় ॥

॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মার মুখে এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তারিত হইয়াছে, এ সকল কর্মজ জানিবে, এরূপ জানিলে মুক্ত হইবে ॥

॥ ৩৩ ॥ পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, পার্থ, সমস্ত অখিল কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় ॥

॥ ৩৪ ॥ তাহা প্রণিপাত, প্রশ্ন, সেবার দ্বারা জানিয়া লও, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥

॥ ৩৫ ॥ যাহা জানিলে পুনরায় এরূপ মোহগ্রস্ত হইবে না, পাণ্ডব, যাহার দ্বারা অশেষ ভূতবর্গ আপনাতে এবং আমাতে দেখিবে ॥

॥ ৩৬ ॥ যদি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপকারী হও জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সর্ব পাপ উত্তীর্ণ হইবে ॥

॥ ৩৭ ॥ অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি সর্ব কর্ম ভস্মসাৎ করে ॥

॥ ৩৮ ॥ ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই, (বুদ্ধি)যোগে সম্যক সিদ্ধ ব্যক্তি কালে তাহা স্বয়ং আপনাতে লাভ করেন ॥

॥ ৩৯ ॥ শ্রদ্ধাবান, তল্লাভে যত্নশীল, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥

॥ ৪০ ॥ এবং অজ্ঞানী এবং শ্রদ্ধাহীন সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, সংশয়াত্মার ইহলোক নাই পরলোক নাই সুখ নাই ॥

॥ ৪১ ॥ ধনঞ্জয়, (বুদ্ধি)যোগার্পিতকর্মা, জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্টসংশয়, আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষকে কর্মসকল বন্ধন করে না ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

॥ ৪২ ॥ অতএব হৃদয়স্থিত অজ্ঞানজাত এই সংশয়কে আত্মার জ্ঞান-অসির দ্বারা ছেদন করিয়া (বুদ্ধি)যোগ অবলম্বন কর, ভারত, উত্থান কর ॥

জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ॥ সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ॥ সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩

পঞ্চম অধ্যায়। সন্ন্যাস যোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, কর্মসমূহের সন্ন্যাসের আবার যোগেরও ইঙ্গিত করিতেছ, ইহাদের মধ্যে যেটি শ্রেয় সেই একটি আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল ॥

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥

॥ ৩ ॥ যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনি নিত্য সন্ন্যাসী পরিগণিত হন, কারণ, মহাবাহো, দ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥

॥ ৪ ॥ বালমতিগণ সাংখ্য ও যোগকে পৃথক বলে, পণ্ডিতেরা নয়, একটি সম্যক অনুষ্ঠিত হইলেই উভয়ের ফল লাভ হয় ॥

॥ ৫ ॥ যে স্থান সাংখ্য সাহায্যে পাওয়া যায় তাহা যোগের দ্বারাও লভ্য, যিনি সাংখ্যকে এবং যোগকে এক দেখেন তিনি দেখেন ॥

॥ ৬ ॥ কিন্তু, মহাবাহো, যোগাশ্রয় না করিয়া সন্ন্যাস লাভ দুঃখকর, যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন ॥

॥ ৭ ॥ বিশুদ্ধাত্মা, আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, নিজ আত্মাতে সর্বভূতের আত্মার উপলব্ধিসম্পন্ন, যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥

॥ ৮, ৯ ॥ ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে প্রবর্তিত হয় ইহা ধারণা করিয়া যোগযুক্ত তত্ত্ববিৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, বিসর্জন, গ্রহণ, উন্মীলন, নিমীলন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াও কিছুই করিতেছি না ইহা মনে করেন ॥

॥ ১০ ॥ যিনি কর্মসকল ব্রহ্মে ন্যস্ত করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া সম্পাদন করেন তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥

॥ ১১ ॥ যোগিগণ কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন ॥

॥ ১২ ॥ যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগের দ্বারা নিষ্ঠাজনিত শান্তি প্রাপ্ত হন, যোগবিহীন ব্যক্তি কামপ্রেরণার ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয় ॥

॥ ১৩ ॥ জিতেন্দ্রিয় দেহী সর্ব কর্ম মনের দ্বারা বর্জন করিয়া নবদ্বার পুরে না কর্ম করিয়া না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন ॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ প্রভু লোকের না কর্তৃত্ব, না কর্মসমূহ, না কর্মফলসংযোগ সৃষ্টি করেন কিন্তু স্বভাব প্রবর্তিত হয় ॥

॥ ১৫ ॥ বিভু কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না এবং পুণ্যও নহে, অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আবৃত তাহাতেই জন্তুসমূহ মোহগ্রস্ত হয় ॥

॥ ১৬ ॥ কিন্তু যাঁহাদের সেই অজ্ঞান আত্মার জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে তাঁহাদের ঐ জ্ঞান আদিত্যবৎ পরমতত্ত্ব প্রকাশিত করে ॥

॥ ১৭ ॥ তদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহার সহিত একাত্মা, তদ্‌বিষয়ে নিষ্ঠাবান, তৎপরায়ণ, জ্ঞানের দ্বারা দূরীকৃতপাপ ব্যক্তিগণ পুনর্জন্মনিবৃত্তি লাভ করেন ॥

॥ ১৮ ॥ পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী এবং কুকুর এবং চণ্ডালেও সমদর্শী হন ॥

॥ ১৯ ॥ যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত তাঁহাদের দ্বারা ইহলোকেই সৃষ্টি জিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমদৃষ্টিযুক্ত সে জন্য তাঁহারা ব্রহ্মেতে অবস্থান করেন ॥

॥ ২০ ॥ স্থিতপ্রজ্ঞ, মোহশূন্য, ব্রহ্মে স্থিত, ব্রহ্মবিৎ প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হন না ॥

॥ ২১ ॥ বাহ্য স্পর্শে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে সুখ (তাহা) প্রাপ্ত হন, সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥

॥ ২২ ॥ কারণ, কৌন্তেয়, যে সকল ভোগ সংস্পর্শজনিত তাহারা দুঃখেরই কারণ, আদি ও অন্তবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে রত হন না ॥

॥ ২৩ ॥ যিনি শরীরত্যাগের পূর্বে ইহলোকেই কাম ও ক্রোধজাত বেগ সহ্য করিতে সমর্থ তিনি যোগযুক্ত, তিনি সুখী মানব ॥

॥ ২৪ ॥ যিনি আত্মসুখী, আত্মরতি এবং যিনি অন্তর্জ্যোতিসম্পন্ন সেই ব্রহ্মভূত যোগী ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥

॥ ২৫ ॥ ক্ষয়িতপাপ, ছিন্নসংশয়, আত্মসংযমী, সর্বভূতহিতে রত ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥

॥ ২৬, ২৭ ॥ বাহ্য স্পর্শকে বাহিরে এবং দৃষ্টিকে ভ্রূযুগলের মধ্যে রাখিয়া নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানকে সম করিয়া কামক্রোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন যতিগণের (জীবিতাবস্থায় ও দেহত্যাগের পর) উভয়ত ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইতি সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

॥ ২৮ ॥ যে মুনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, মোক্ষই যাঁহার পরম আশ্রয়, যাঁহার ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিগত হইয়াছে তিনি সর্বকালেই মুক্ত ॥

॥ ২৯ ॥ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের সুহৃৎ জানিলে শান্তিলাভ হয় ॥

সন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়। অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ যিনি কর্মফল আশ্রয় না করিয়া করণীয় কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, নিরগ্নিও (যোগী) নন, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিও (যোগী) নন ॥

॥ ২ ॥ পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস এই নামে অভিহিত করা হয় তাহা যোগ বলিয়া জানিবে কারণ সংকল্প ত্যাগ হয় নাই এমন ব্যক্তি কদাচ যোগী হন না ॥

॥ ৩ ॥ (যোগ) আরোহণাভিলাষী মননশীল ব্যক্তির কর্ম কারণ বলিয়া কথিত হয়, যোগারূঢ় হইলে তাঁহার শমই কারণ কথিত হয় ॥

॥ ৪ ॥ যখন সর্বসংকল্পত্যাগী না ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে না কর্মসমূহে আসক্ত হন তখনই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥

॥ ৫ ॥ আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই আত্মার শত্রু ॥

॥ ৬ ॥ যাঁহার আত্মার দ্বারাই আত্মা জিত হইয়াছে তাঁহার আত্মা আত্মার বন্ধু কিন্তু অনাত্মার আত্মা শত্রুবৎ শত্রুত্বেই প্রবৃত্ত হয় ॥

॥ ৭ ॥ জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মা শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে এবং মান অপমানে পরম সমাহিত (থাকে) ॥

॥ ৮ ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট প্রস্তর কাঞ্চনে সমবুদ্ধি যোগী যুক্ত এই নামে অভিহিত হন ॥

॥ ৯ ॥ সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু এবং পাপীতেও সমবুদ্ধি হইয়া বিশিষ্ট বিবেচিত হন ॥

॥ ১০ ॥ যোগী নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করিয়া সংযতদেহমন, নিরাকাঙ্ক্ষ, পরিগ্রহত্যাগী হইয়া সতত নিজেকে নিয়োজিত করিবেন ॥

॥ ১১ ॥ নির্মল স্থানে স্থির অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম, বস্ত্র উপরি উপরি বিছাইয়া নিজ আসন স্থাপনা করিয়া ॥

॥ ১২, ১৩ ॥ সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ মস্তক গ্রীবা ঋজু ও নিশ্চল রাখিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া এবং চতুর্দিকে অবলোকন না করিয়া, মন একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত করিয়া আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হইবেন ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ প্রশান্তমনা, বিগতভয়, ব্রহ্মচর্যব্রতধারী মনঃসংযম করিয়া মদগতচিত্ত মৎপরায়ণ হইয়া যুক্ত হইবেন ॥

॥ ১৫ ॥ এইপ্রকার সংযতচিত্ত যোগী সর্বদা আপনাকে যুক্ত রাখিলে নির্বাণ পরমা মদাশ্রিতা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥

॥ ১৬ ॥ অর্জুন, না অতিভোজীর এবং না বা একান্ত অনাহারীর যোগ হয় এবং না অতিনিদ্রাশীলের না বা (অতি)জাগ্রতের ॥

॥ ১৭ ॥ উপযুক্ত আহারবিহারশীলের, কর্মসমূহে উপযুক্ত চেষ্টাশীলের, উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণশীলের যোগ দুঃখনাশক হয় ॥

॥ ১৮ ॥ যখন নিয়ন্ত্রিত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে, সকল কামনার বস্তু হইতে স্পৃহা নিবৃত্ত হয় তখন যুক্ত এই বলা যায় ॥

॥ ১৯ ॥ বায়ুহীন স্থানে দীপ যেমন চঞ্চল হয় না আত্মার যোগেতে যুক্ত সংযত-চিত্ত যোগীর সেই উপমা স্মৃত হইয়া থাকে ॥

॥ ২০ ॥ যে অবস্থায় যোগ সেবার দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরতি লাভ করে এবং যখন আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই তুষ্ট হয় ॥

॥ ২১ ॥ যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় যে আত্যন্তিক সুখ তাহা উপলব্ধ হয় এবং এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হয় না ॥

॥ ২২ ॥ এবং যাহা লাভ করিয়া অপর লাভ তাহা হইতে অধিক মনে হয় না, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরু দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না ॥

॥ ২৩ ॥ সেই দুঃখসংযোগবিয়োগকে যোগ নামে জানিবে, সেই যোগ নির্বেদশূন্য চিত্তে নিশ্চয় আচরণীয় ॥

॥ ২৪ ॥ সংকল্পজাত সর্ব কামনা নিঃশেষ বর্জন করিয়া এবং মনের দ্বারা সর্বদিক্ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া ॥

॥ ২৫ ॥ ধৃতির দ্বারা গৃহীত বুদ্ধির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে উপরতি অবলম্বন করিবে, মন আত্মায় স্থাপিত করিয়া কিছুমাত্রও চিন্তা করিবে না ॥

॥ ২৬ ॥ চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে সংযত করিয়া আপনারই বশে আনিবে ॥

॥ ২৭ ॥ প্রশমিতরজগুণ, প্রশান্তমনা, ব্রহ্মভূত, নিষ্পাপ এরূপ যোগীকেই উত্তম সুখ আশ্রয় করে ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অর্জুন উবাচ॥ যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ॥ অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ॥ অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ॥ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

॥ ২৮ ॥ এই প্রকারে সর্বদা আমাতে যুক্ত হইয়া বিগতপাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ আত্যন্তিক সুখ ভোগ করেন ॥

॥ ২৯ ॥ সর্বত্র সমদর্শী, যোগযুক্তাত্মা সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভূত দেখেন ॥

॥ ৩০ ॥ যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সমস্ত আমাতে দেখেন আমি তাঁহার (নিকট) নষ্ট হই না, তিনিও আমার (নিকট) নষ্ট হন না ॥

॥ ৩১ ॥ যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন সর্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে বর্তমান থাকেন ॥

॥ ৩২ ॥ অর্জুন, যিনি আত্মাকে উপমা মানিয়া সুখই হউক আর দুঃখই হউক সর্বত্র সমান দেখেন তিনি পরম যোগী বিবেচিত হন ॥

॥ ৩৩ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ মধুসূদন, এই যে সাম্যের দ্বারা যোগ তোমার দ্বারা কথিত হইল চঞ্চলতা নিবন্ধন ইহার স্থির স্থিতি দেখিতেছি না ॥

॥ ৩৪ ॥ কারণ, কৃষ্ণ, মন চঞ্চল বিক্ষোভকর প্রবল অনমনীয়, বায়ুর ন্যায় তাহার নিগ্রহ সুদুষ্কর মনে করি ॥

॥ ৩৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ মহাবাহো, মন দুর্দমনীয় চঞ্চল নিঃসন্দেহ কিন্তু, কৌন্তেয়, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আয়ত্ত হয় ॥

॥ ৩৬ ॥ অসংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা যোগ দুষ্পাপ্য ইহা আমার সিদ্ধান্ত কিন্তু যথা উপায়ে যত্নশীল আত্মজয়ী পুরুষের দ্বারা লভ্য হইতে পারে ॥

॥ ৩৭ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, যোগ হইতে বিচলিতমনা শ্রদ্ধাযুক্ত অযতি যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত হইয়া কোন গতি পায় ॥

॥ ৩৮ ॥ মহাবাহো, ব্রহ্মলাভের পথে প্রতিষ্ঠা হারাইয়া মোহাবিষ্ট উভয়বিভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন অভ্রের ন্যায় কি নষ্ট হয় না ॥

॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষ ছেদন করা তোমার উচিত কারণ তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের অন্য ছেত্তা উপস্থিত নাই ॥

॥ ৪০ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, না বা ইহলোকে না পরলোকে তাঁহার বিনাশ হয় কারণ, তাত, কল্যাণকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥

॥ ৪১ ॥ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত বৎসর বাস করিয়া শুচিস্বভাব লক্ষ্মীমন্তের গৃহে জন্মলাভ করেন ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

ইতি অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

॥ ৪২ ॥ অথবা ধীমান যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ যে জন্ম ইহাও লোকে দুর্লভতর ॥

॥ ৪৩ ॥ তথায় পূর্বজন্মার্জিত সেই বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন এবং, কুরুনন্দন, তার পর পুনরায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন ॥

॥ ৪৪ ॥ সেই পূর্বাভ্যাসের দ্বারা অবশ হইয়াই তিনি চালিত হন এবং যোগের জিজ্ঞাসু (হইয়া) শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করেন ॥

॥ ৪৫ ॥ এবং যোগী যত্নের সহিত চেষ্টা করিতে করিতে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া অনেক জন্ম পরে সিদ্ধি লাভ করিয়া তাহার পর পরাগতি প্রাপ্ত হন ॥

॥ ৪৬ ॥ যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন, যোগী কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অতএব, অর্জুন, যোগী হও ॥

॥ ৪৭ ॥ সকল যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান (হইয়া) মদ্‌গতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন আমার মতে তিনি যুক্ততম ॥

অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ ॥
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌ ॥ ১০
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্‌।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায়। জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, আমাতে মন আসক্ত রাখিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে তাহা শুন ॥

॥ ২ ॥ আমি তোমাকে সবিজ্ঞান এই জ্ঞান নিঃশেষ বলিতেছি যাহা জানিলে ইহলোকে পুনরায় অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না ॥

॥ ৩ ॥ মনুষ্যগণের মধ্যে সহস্রে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যে আবার ক্বচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বত জানিতে পারেন ॥

॥ ৪ ॥ ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ এবং মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই অষ্টপ্রকারে আমার এই প্রকৃতি বিভক্ত ॥

॥ ৫ ॥ মহাবাহো, ইহা অপরা কিন্তু জীবভূতা আমার পরা প্রকৃতিকে, যাহার দ্বারা এই জগত বিধৃত আছে, ইহা হইতে অন্য জানিও ॥

॥ ৬ ॥ ইহারা সর্বভূতের যোনি, ইহা অবধারণ কর, আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয় ॥

॥ ৭ ॥ ধনঞ্জয়, আমার অপেক্ষা পরতর অন্য কিছুই নাই, সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় এই সমস্ত আমাতে গ্রথিত ॥

॥ ৮ ॥ কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্রসূর্যে প্রভা, সর্ববেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, নরগণে পৌরুষ ॥

॥ ৯ ॥ এবং আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ এবং বিভাবসুতে তেজ, সর্বপ্রাণীতে জীবন এবং তপস্বিগণে তপ ॥

॥ ১০ ॥ পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ জানিবে, আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, আমি তেজস্বিগণের তেজ ॥

॥ ১১ ॥ এবং আমি বলবানদিগের কামরাগবিবর্জিত বল, ভরতর্ষভ, আমি প্রাণিগণে ধর্মের অবিরোধী কামনা ॥

॥ ১২ ॥ এবং যাহা কিছু সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভাবসমূহ আছে আমা হইতেই তাহারা উৎপন্ন জানিবে কিন্তু আমি সে সমূহে নাই তাহারা আমাতে (আছে) ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

॥ ১৩ ॥ এ সমস্ত জগৎ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা মোহিত (হইয়া) ইহাদের অতীত অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না ॥

॥ ১৪ ॥ কারণ আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়, যাহারা আমারই শরণাগত হয় তাহারা এই মায়া পার হয় ॥

॥ ১৫ ॥ মায়ার দ্বারা হৃতজ্ঞান আসুরভাব আশ্রয়ী দুষ্কর্মকারী মূঢ় নরাধমগণ আমার শরণাপন্ন হয় না ॥

॥ ১৬ ॥ ভরতর্ষভ অর্জুন, চতুর্বিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে ভজনা করে, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থকামী এবং জ্ঞানী ॥

॥ ১৭ ॥ তন্মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশেষণে অভিহিত হন কারণ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমার প্রিয় ॥

॥ ১৮ ॥ তাঁহারা সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই (ইহা) আমার মত কারণ সেই যুক্তাত্মা অনুত্তম আশ্রয় আমাতেই অবস্থান করেন ॥

॥ ১৯ ॥ বহু জন্মান্তে সমস্ত বাসুদেব এই জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হন, সেই মহাত্মা সুদুর্লভ ॥

॥ ২০ ॥ বিশেষ বিশেষ কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক অন্য দেবতার শরণাপন্ন হয় ॥

॥ ২১ ॥ যে যে ভক্ত যে যে মূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই প্রকারই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি ॥

॥ ২২ ॥ সে সেই শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়া আরাধনার চেষ্টা করে এবং তাহা হইতে আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনার বস্তুসমূহই লাভ করে ॥

॥ ২৩ ॥ কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির সেই ফল বিনশ্বর হয়, দেবযাজী দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয় পক্ষান্তরে আমার ভক্তেরা আমাকে পায় ॥

॥ ২৪ ॥ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ততা প্রাপ্ত মনে করে ॥

॥ ২৫ ॥ যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত নহি, মোহগ্রস্ত এই লোক অজ অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না ॥

॥ ২৬ ॥ অর্জুন, অতীত এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূতসমূহকে আমি জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানে না ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

॥ ২৭ ॥ পরন্তপ ভারত, সংসারে ইচ্ছাদ্বেষসমুৎপন্ন দ্বন্দ্বজাত মোহবশে সকল প্রাণী সম্মোহ প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ২৮ ॥ কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে সেই দ্বন্দ্বজনিতমোহমুক্ত দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করেন ॥

॥ ২৯ ॥ যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তির জন্য যত্নশীল হন তাঁহারা সেই ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম জানিতে পারেন ॥

॥ ৩০ ॥ যাঁহারা অধিভূত অধিদৈব সহিত এবং অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানেন সেই যুক্তচেতাগণ মরণকালেও আমাকে জানেন ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ॥ কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ॥ অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়। অক্ষরব্রহ্মযোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূতই বা কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাকে বলা হয় ॥

॥ ২ ॥ মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, ইহাতে কি ভাবে (অবস্থিত) এবং মরণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা কি প্রকারে জ্ঞেয় হও ॥

॥ ৩ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পরম অক্ষর ব্রহ্ম, স্বভাব অধ্যাত্ম কথিত হয়, ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কর্ম নামে অভিহিত ॥

॥ ৪ ॥ ক্ষরভাব অধিভূত এবং পুরুষ অধিদৈবত, দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ ॥

॥ ৫ ॥ এবং অন্তিমকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়া যান তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

॥ ৬ ॥ আর, কৌন্তেয়, অন্তকালে যে যে ভাবই স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করে সদা সেই ভাবে ভাবিত (থাকায়) সেই সেই প্রকারই (ভাব) প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ৭ ॥ অতএব সর্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত (হইলে) নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে ॥

॥ ৮ ॥ পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তদ্বারা অনুচিন্তন করিলে দিব্য পরম পুরুষ প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ৯, ১০ ॥ কবি, পুরাণ, অনুশাসিতা, অণু হইতে সূক্ষ্মতর, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, তমের অতীত আদিত্যবর্ণ (পুরুষ)কে মরণকালে অবিচলিত মনের দ্বারা ভক্তিযুক্ত (হইয়া) এবং যোগবলের দ্বারাই ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক স্থাপিত করিয়া যিনি অনুস্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥

॥ ১১ ॥ বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি ॥

॥ ১২ ॥ সমস্ত দ্বার সংযমিত করিয়া এবং মনকে হৃদয়দেশে নিরুদ্ধ করিয়া মূর্ধায় আপনার প্রাণ স্থাপিত করিয়া যোগধারণা অবলম্বনপূর্বক ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

॥ ১৩ ॥ ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া আমাকে অনুস্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥

॥ ১৪ ॥ যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রত্যহ সর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, পার্থ, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সহজলভ্য ॥

॥ ১৫ ॥ পরমা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জন্ম লাভ করেন না ॥

॥ ১৬ ॥ অর্জুন, ব্রহ্মভুবন অবধি লোকসমূহ পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু, কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে পুনর্জন্ম থাকে না ॥

॥ ১৭ ॥ সহস্র যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ব্রহ্মার যাহা দিন, যুগসহস্রব্যাপী রাত্রি, অহোরাত্রবিৎ সেই ব্যক্তিগণ জানেন ॥

॥ ১৮ ॥ দিন আগমনে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত উৎপন্ন হয়, রাত্রি আরম্ভে সেই অব্যক্তনামাতেই বিলীন হয় ॥

॥ ১৯ ॥ পার্থ, এই সেই ভূতগ্রামই জন্মিয়া জন্মিয়া রাত্রি আগমনে অবশ হইয়া প্রলীন হয়, দিবারম্ভে উৎপন্ন হয় ॥

॥ ২০ ॥ কিন্তু সেই অব্যক্তের অতীত অন্য যে সনাতন ভাব যাহা সমস্ত ভূত নাশ পাইলেও বিনষ্ট হয় না তাহা ॥

॥ ২১ ॥ অব্যক্ত অক্ষর এই নামে কথিত, তাহাকে পরমা গতি বলে যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরাবর্তন হয় না, তাহা আমার পরম ধাম ॥

॥ ২২ ॥ পার্থ, ভূতগণ যাঁহার অন্তঃস্থ, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত সেই পরম পুরুষ অনন্য ভক্তির দ্বারাই লভ্য ॥

॥ ২৩ ॥ ভরতর্ষভ, যোগিগণ যে কালেতে প্রয়াণ করিলে অনাবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন সেই কাল বলিতেছি ॥

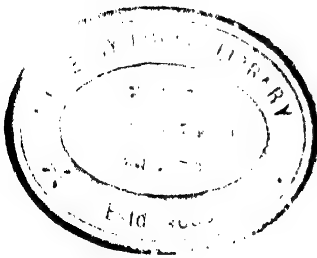
॥ ২৪ ॥ অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্ল ছয় মাস উত্তরায়ণ, তাহাতে মৃত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥

॥ ২৫ ॥ ধূম, রাত্রি এবং কৃষ্ণ ছয় মাস দক্ষিণায়ন, তাহাতে যোগী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্তন করেন ॥

॥ ২৬ ॥ জগতের শুক্ল কৃষ্ণ এই গতিদ্বয় শাশ্বত গণ্য হয়, একটির দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ হয় অপরের দ্বারা পুনরায় আবর্তন ঘটে ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

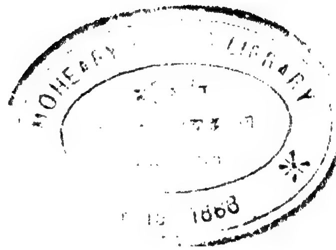
ইতি অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ



॥ ২৭ ॥ পার্থ, এই গতিদ্বয় জানিয়া কোনও যোগী মোহমান হন না৷ অতএব, অর্জুন, সর্বকালে যোগযুক্ত হও ॥

॥ ২৮ ॥ বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা জানিয়া যোগী সেই সমুদায় অতিক্রম করেন এবং আদ্য পরম স্থান প্রাপ্ত হন ॥

অক্ষরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত



রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

নবম অধ্যায়। রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অসূয়াহীন তোমাকে গুহ্যতম বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানও বলিব যাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥

॥ ২ ॥ এই রাজবিদ্যা রাজগুহ্য, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ, ধর্মপ্রদ, সুখে প্রযোজ্য, অব্যয় ॥

॥ ৩ ॥ পরন্তপ, এই ধর্মের (প্রতি) অশ্রদ্ধাবান পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারপথে নিবর্তন করে ॥

॥ ৪ ॥ অব্যক্তমূর্তি আমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, সর্বভূত আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি ॥

॥ ৫ ॥ আবার ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত নহে, আমার ঐশ্বর যোগ দেখ, আমার আত্মা ভূতগণের ধারক, ভূতগণের পালক কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে ॥

॥ ৬ ॥ যেমন সর্বদা সর্বত্র বিচরণশীল মহান বায়ু আকাশে স্থিত সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত ইহা অবধারণ কর ॥

॥ ৭ ॥ কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, কল্পের আদিতে আমি তাহাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করি ॥

॥ ৮ ॥ আমার নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি ॥

॥ ৯ ॥ এবং, ধনঞ্জয়, সেই কর্মসমূহে অনাসক্ত উদাসীনবৎ আসীন আমাকে সেই সকল কর্ম বন্ধন করে না ॥

॥ ১০ ॥ আমি অধ্যক্ষরূপে থাকায় প্রকৃতি জঙ্গম সহিত স্থাবর প্রসব করে, কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ আবর্তিত হয় ॥

॥ ১১ ॥ আমার ভূতমহেশ্বররূপ পরম ভাব না জানিয়া মূঢ়গণ মনুষ্য-শরীরাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করে ॥

॥ ১২ ॥ বৃথা আশাকারী, বৃথাকর্মী, বৃথাজ্ঞানী বিকৃতচেতাগণ মোহকরী রাক্ষসী এবং আসুরী প্রকৃতিতেই আশ্রিত ॥

॥ ১৩ ॥ কিন্তু, পার্থ, মহাত্মাগণ দৈবপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ভূতসমূহের আদি অব্যয় জানিয়া আমাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করেন ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোংকার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ২৩
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

॥ ১৪ ॥ সতত কীর্তন করিতে থাকিয়া এবং দৃঢ়ব্রত যত্নশীল হইয়া এবং নমস্কার করিতে থাকিয়া ভক্তিসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন ॥

॥ ১৫ ॥ আবার অন্যে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজনা করিয়া একত্বের দ্বারা, পৃথকৃত্বের দ্বারা বহুধা বিশ্বতোমুখ আমার উপাসনা করেন ॥

॥ ১৬ ॥ আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥

॥ ১৭ ॥ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য পবিত্র ওঁকার এবং ঋক্ সাম যজু ॥

॥ ১৮ ॥ গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি, প্রলয়, অধিষ্ঠান, নিধান, অব্যয় বীজ ॥

॥ ১৯ ॥ অর্জুন, আমি তাপ দান করি, আমি বর্ষ আকর্ষণ করি এবং মোচন করি এবং আমি অমৃত এবং মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ ॥

॥ ২০ ॥ ত্রিবেদের অনুগামী সোমপাগণ আমাকে যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পবিত্র সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ করেন ॥

॥ ২১ ॥ তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্তলোকে প্রবেশ করেন, ত্রয়ীধর্মাশ্রয়ী কামকামিগণ এইপ্রকার গতাগতি লাভ করেন ॥

॥ ২২ ॥ অনন্য চিন্তার দ্বারা যে সকল লোক আমার উপাসনা করেন সেই নিত্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি বহন করি ॥

॥ ২৩ ॥ কৌন্তেয়, আর যে ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার যজনা করে তাহারাও অবিধিপূর্বক আমাকেই যজন করে ॥

॥ ২৪ ॥ কারণ আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভুও কিন্তু তাহারা আমাকে তত্ত্বত জানে না, এ জন্য চ্যুত হয় ॥

॥ ২৫ ॥ দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়, ভূতপূজকগণ ভূতগণকে পায় আর আমার পূজকগণ আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ২৬ ॥ যে ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল অর্পণ করে, নিয়তচিত্ত ব্যক্তির ভক্তি-উপহৃত সেই দ্রব্য আমি ভোজন করি ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

ইতি রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ

॥ ২৭ ॥ কৌন্তেয়, যাহা কর যাহা খাও যাহা হোম কর যাহা দান কর যে তপস্যা কর তাহা আমাকে অর্পণ কর ॥

॥ ২৮ ॥ এই প্রকারে শুভাশুভ ফলের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, সন্ন্যাস-যোগযুক্তচিত্ত বিমুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে ॥

॥ ২৯ ॥ আমি সর্বভূতে সমদর্শী আমার দ্বেষ্য নাই প্রিয় নাই কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করে তাহারা আমাতে আর আমিও সে সকল ব্যক্তিতে (অবস্থিত) ॥

॥ ৩০ ॥ যদি অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে সে সাধুই মন্য হয় কারণ সম্যক ব্যবসিত (হওয়ায়) ॥

॥ ৩১ ॥ সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়, চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে, কৌন্তেয়, মানিও আমার ভক্ত প্রণষ্ট হয় না ॥

॥ ৩২ ॥ পার্থ, যাহারা পাপকুলোৎপন্নও হয় এবং স্ত্রীলোক বৈশ্য শূদ্রগণ আমাকে আশ্রয় করিলে তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ৩৩ ॥ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণের আবার কথা কি, এই অনিত্য সুখহীন লোকে আসিয়া আমাকে ভজনা কর ॥

॥ ৩৪ ॥ মদ্‌গতচিত্ত আমার ভক্ত আমার পূজক হও আমাকে নমস্কার কর, এই প্রকারে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া মৎপরায়ণ (হইয়া) আমাকেই পাইবে ॥

রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত

বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১
অর্জুন উবাচ॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

দশম অধ্যায়। বিভূতিযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ মহাবাহো, প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছ দেখিয়া তোমার হিতকামনায় তোমাকে আমার যে পরম বাক্য বলিতেছি তাহা আরও শ্রবণ কর ॥

॥ ২ ॥ আমার প্রভব ও শক্তির কথা না সুরগণ জানেন না মহর্ষিগণ, কারণ সর্বপ্রকারেই আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি ॥

॥ ৩ ॥ মনুষ্যমধ্যে যে মোহশূন্য ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত এবং অনাদি লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানেন তিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥

॥ ৪, ৫ ॥ আমা হইতেই ভূতবর্গের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয় এবং অভয়ও, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হয় ॥

॥ ৬ ॥ মদ্‌ভাবে ভাবিত সপ্ত মহর্ষি ও চারি জন মনু, এই সমস্ত প্রজা যাঁহাদের সৃষ্টি, পূর্বকালে মানস হইতে জন্মেন ॥

॥ ৭ ॥ যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগকে যথার্থত উপলব্ধি করেন তিনি অবিচলিত যোগের দ্বারা যুক্ত হন এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥

॥ ৮ ॥ আমি সকলের উৎপত্তির মূল, আমা হইতে সমস্ত চলিতেছে ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ ভাবযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥

॥ ৯ ॥ আমাতে মন সমর্পণ করিয়া মদ্‌গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়া ও নিত্য আমার কথা আলোচনা করিয়া তুষ্টি ও প্রীতি লাভ করেন ॥

॥ ১০ ॥ সেই সকল সততযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজনাপর ব্যক্তিদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥

॥ ১১ ॥ তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাবশেই আমি আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানজ তম নাশ করি ॥

॥ ১২ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ আপনি পরমব্রহ্ম, পরম আশ্রয়, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, অজ, বিভু ॥

॥ ১৩ ॥ সমস্ত ঋষিগণ তথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে (এই রূপ) বলেন এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে বলিতেছ ॥

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ॥

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২
রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

॥ ১৪ ॥ কেশব, তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে তাহা সমস্তই আমি সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি, ভগবন্, তোমার প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ দেবতারাও জানেন না, দানবগণও নয় ॥

॥ ১৫ ॥ পুরুষোত্তম, ভূতপালক, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে, তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারা আপনাকে জান ॥

॥ ১৬ ॥ দিব্য তোমার নিজ বিভূতিসমূহ, যে সকল বিভূতির দ্বারা তুমি এই লোক সকল ব্যাপ্ত করিয়া আছ, আমাকে নিঃশেষ করিয়া বল ॥

॥ ১৭ ॥ যোগিন্, সদা কি প্রকার চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব, ভগবন্, কোন কোন ভাবেই বা তুমি আমার চিন্তনীয় ॥

॥ ১৮ ॥ জনার্দন, বিস্তারিত করিয়া পুনরায় নিজের যোগ ও বিভূতির কথা বল কারণ অমৃত (তুল্য বাক্য) শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥

॥ ১৯ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আচ্ছা, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহ তোমাকে প্রাধান্যত বলিতেছি কারণ আমার বিস্তারের অন্ত নাই ॥

॥ ২০ ॥ গুড়াকেশ, আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা এবং আমিই ভূতগণের আদি এবং মধ্য এবং অন্ত ॥

॥ ২১ ॥ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসম্পন্ন বস্তুগণের মধ্যে কিরণযুক্ত সূর্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥

॥ ২২ ॥ বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি বাসব এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, ভূতগণের আমি চেতনা ॥

॥ ২৩ ॥ রুদ্রগণের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষরক্ষগণের মধ্যে বিত্তেশ, বসুদিগের মধ্যে আমি পাবক, শিখরীদের মধ্যে মেরু ॥

॥ ২৪ ॥ এবং, পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিও, সেনানীগণের মধ্যে আমি স্কন্দ, জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর ॥

॥ ২৫ ॥ মহর্ষিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে একাক্ষর, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয় ॥

॥ ২৬ ॥ সর্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

॥ ২৭ ॥ অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃত(সাগর) হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নরপতি (জানিবে) ॥

॥ ২৮ ॥ আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু এবং আমি প্রজনয়িতা কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি ॥

॥ ২৯ ॥ এবং নাগগণের মধ্যে অনন্ত, যাদোগণের অর্থাৎ জলচারিগণের মধ্যে বরুণ এবং পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা, সংযমকারিগণের মধ্যে আমি যম ॥

॥ ৩০ ॥ এবং দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদের মধ্যে কাল এবং আমি মৃগদিগের মধ্যে মৃগেন্দ্র এবং পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতেয় ॥

॥ ৩১ ॥ পবিত্রতাসম্পাদকগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম, ঝষদিগের মধ্যে আমি মকর, স্রোতস্বতীদের মধ্যে আমি জাহ্নবী ॥

॥ ৩২ ॥ অর্জুন, আমি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর আদি এবং অন্ত এবং মধ্যও, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদিগণের কথার মধ্যে বাদ ॥

॥ ৩৩ ॥ অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥

॥ ৩৪ ॥ এবং আমি সর্বহর মৃত্যু এবং ভবিষ্য পদার্থসমূহের উৎপত্তিহেতু, এবং নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ॥

॥ ৩৫ ॥ সেইরূপ সামসকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দসকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু ॥

॥ ৩৬ ॥ ছলনাকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূত, তেজস্বীদিগের আমি তেজ, আমি জয়, আমি ব্যবসায়, বলবানদিগের আমি বল ॥

॥ ৩৭ ॥ বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় এবং মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা কবি ॥

॥ ৩৮ ॥ আমি দমনকারীদের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপ্যগণের মধ্যে মৌনই, আমি জ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥

॥ ৩৯ ॥ অর্জুন, সমস্ত ভূতবর্গের যাহাই বীজ তাহা আমি, চরাচরে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমা বিনা থাকিতে পারে ॥

॥ ৪০ ॥ পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই, এই বিভূতির বিস্তৃতি তোমাকে সংক্ষেপে বলা গেল ॥

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ

॥ ৪১ ॥ যে যে সত্তা বিভূতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন অথবা শক্তিসম্পন্ন সেই সেই সত্তা আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥

॥ ৪২ ॥ অথবা, অর্জুন, তোমার এত বহুপ্রকারে জানিয়া কি হইবে, আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশ দ্বারা আবিষ্ট করিয়া আছি ॥

বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত

বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ ॥ মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ॥ পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ ॥ এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

একাদশ অধ্যায়। বিশ্বরূপদর্শন যোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ আমার প্রতি অনুগ্রহবশে পরমগুহ্য অধ্যাত্মসংজ্ঞিত যে কথা বলিলে তাহাতে আমার এই যে মোহ তাহা অপগত হইল ॥

॥ ২ ॥ কমলপত্রলোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্যও তোমার নিকট আমি বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥

॥ ৩ ॥ পরমেশ, পুরুষোত্তম, তুমি এই যাহা নিজ সম্বন্ধে বলিলে তোমার সেই ঐশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ॥

॥ ৪ ॥ প্রভো, যদি তুমি মনে কর আমার তাহা দেখিবার শক্তি আছে তবে, যোগেশ্বর, তুমি আমাকে তোমার অব্যয় স্বরূপ দেখাও ॥

॥ ৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, শত শত সহস্র সহস্র নানাবিধ দিব্য, নানাবর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট আমার রূপসমূহ দর্শন কর ॥

॥ ৬ ॥ ভারত, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ এবং বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য বস্তুসকল দেখ ॥

॥ ৭ ॥ গুড়াকেশ, সচরাচর সমস্ত জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর অদ্য এই স্থানেই আমার দেহে একস্থ দর্শন কর ॥

॥ ৮ ॥ কিন্তু কেবল তোমার এই নিজের চক্ষুর সাহায্যে আমাকে দেখিতে পাইবে না, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি আমার ঐশ্বর যোগ অবলোকন কর ॥

॥ ৯ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ তার পর, রাজন, এই রূপ বলিয়া মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন ॥

॥ ১০ ॥ অনেক বদন নেত্র, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণ, অনেক দিব্য উদ্যত আয়ুধ ॥

॥ ১১ ॥ দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ অনুলেপিত, সর্ব আশ্চর্যময় অনন্ত বিশ্বতোমুখ দেবতা ॥

॥ ১২ ॥ যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হয় তাহা সেই মহাত্মার প্রভার তুল্য হইতে পারে ॥

॥ ১৩ ॥ তখন পাণ্ডব অর্জুন দেবদেবের সেই শরীরে নানাপ্রকার বিভাগসম্পন্ন সমস্ত জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

॥ ১৪ ॥ তৎপরে সেই ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া নতশিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবকে বলিলেন ॥

॥ ১৫ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ দেব, তোমার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ, তথা সকল প্রকার ভূতগণের সংঘ, কমলাসনস্থিত প্রভু ব্রহ্মা এবং সমস্ত ঋষি এবং দিব্য উরগগণকে দেখিতেছি ॥

॥ ১৬ ॥ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, তোমাকে অনেক বাহু উদর মুখ ও নেত্রযুক্ত, অনন্তরূপে সর্বদিকে অবলোকন করিতেছি, না অন্ত, না মধ্য আর না তোমার আদি দেখিতেছি ॥

॥ ১৭ ॥ কিরীটধারী, গদাধারী ও চক্রধারী, সর্বদিকে দীপ্ত তেজোরাশি, দুর্নিরীক্ষ্য, উজ্জ্বল অনল ও সূর্যসমদ্যুতি অপ্রমেয় তোমাকে সর্বদিকে দেখিতেছি ॥

॥ ১৮ ॥ তুমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় তুমি অব্যয়, চিরন্তন ধর্মরক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ (ইহা) আমার ধারণা ॥

॥ ১৯ ॥ আদি মধ্য অন্তহীন, অনন্তপরাক্রম, অনন্তবাহু, শশীসূর্যনেত্র, দীপ্তানলমুখ তোমাকে স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তাপিত করিতে দেখিতেছি ॥

॥ ২০ ॥ দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে যে এই অন্তরাল এবং সর্বদিক একা তুমিই ব্যাপ্ত করিয়া আছ, মহাত্মন্, তোমার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে ॥

॥ ২১ ॥ ঐ সুরদল তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা ভয় পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, মহর্ষি ও সিদ্ধের দল স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিবিধ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন ॥

॥ ২২ ॥ রুদ্র আদিত্য বসুগণ আর যে সাধ্যগণ আছেন, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, উষ্মপাগণ এবং গন্ধর্ব যক্ষ অসুর ও সিদ্ধের দল সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন ॥

॥ ২৩ ॥ মহাবাহো, বহুমুখনেত্র, বহুবাহু-উরুপাদ, বহু-উদর বহুদ্রংষ্ট্রাকরাল তোমার মহৎ রূপ দেখিয়া লোকসমূহ এবং আমিও বিচলিত হইতেছি ॥

॥ ২৪ ॥ বিষ্ণো, আকাশস্পর্শী, দীপ্ত অনেকবর্ণ বিবৃতমুখ, দীপ্তবিশালনেত্র তোমাকে দেখিয়া অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, ধৈর্য ও মনঃস্থৈর্য আনিতে পারিতেছি না ॥

॥ ২৫ ॥ দংষ্ট্রাকরাল ও কালানলতুল্য তোমার মুখসকল দেখিয়া দিশাহারা হইয়াছি, সুখও পাইতেছি না, দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

॥ ২৬ ॥ ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলে, রাজবৃন্দের সহিত ভীষ্ম, দ্রোণ এবং ঐ সূতপুত্র আমাদেরও প্রধান যোদ্ধৃগণের সহিত ॥

॥ ২৭ ॥ তোমার ভয়ানক দংষ্ট্রাকরাল মুখসকলের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা চূর্ণমুণ্ড হইয়া দশনের অন্তরালে লাগিয়া আছে দেখা যাইতেছে ॥

॥ ২৮ ॥ নদীসকলের বহু জলস্রোত যেমন সমুদ্রের অভিমুখেই ধাবিত হয় সেইরূপ ঐ নরলোকের বীরগণ তোমার সর্বদিকে জ্বলন্ত মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥

॥ ২৯ ॥ যেমন মরিবার জন্য পতঙ্গগণ সমৃদ্ধবেগে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরূপই সমস্ত লোকও নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥

॥ ৩০ ॥ তুমি প্রজ্বলিত বদনসমূহ দ্বারা সর্বদিকে সমস্ত লোক গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, বিষ্ণো, তোমার উৎকট প্রভারাশি সমস্ত জগৎকে তেজে আবিষ্ট করিয়া সন্তাপিত করিতেছে ॥

॥ ৩১ ॥ উগ্ররূপ, আপনি কে আমাকে বলুন, তোমাকে নমস্কার, দেববর, প্রসন্ন হও, আদিস্বরূপ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি কারণ তুমি কোন কর্মে প্রবৃত্ত বুঝিতেছি না ॥

॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, লোকসমূহ সংহার করিতে এখানে প্রবৃত্ত (আছি), প্রতি সৈন্যবাহিনীতে যে সকল যোদ্ধা আছে তুমি ব্যতীতও সকলেই ভবিষ্যতে থাকিবে না ॥

॥ ৩৩ ॥ অতএব তুমি উঠ, যশ অর্জন কর, শত্রুদের পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, ইহারা পূর্বেই আমার দ্বারা হত হইয়াছে, সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও ॥

॥ ৩৪ ॥ আমার দ্বারা নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকেও তুমি মার, ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর, রণে শত্রুদের তুমি জয় করিবে ॥

॥ ৩৫ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ কেশবের এরূপ বাক্য শুনিয়া কম্পিতকলেবর কিরীটী কৃতাঞ্জলি প্রণত হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে গদ্গদকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন ॥

॥ ৩৬ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ হৃষীকেশ, তোমার মহিমা কীর্তনে জগৎ আনন্দানুভব করে ও অনুরাগযুক্ত হয়, রাক্ষসগণ দিকে দিকে পালাইয়া যায় এবং সিদ্ধদল সকলে নমস্কার করেন (তাহা) ঠিকই ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ৪৭

॥ ৩৭ ॥ মহাত্মন্, ব্রহ্মার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আদিকর্তা তোমাকে কেনই বা না নমস্কার করিবে, অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, তুমি সৎ ও অসৎ, তদতীত যে অক্ষর (তাহাও) ॥

॥ ৩৮ ॥ তুমি আদিদেব পুরাণপুরুষ তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং পরমধাম, অনন্তরূপ, তোমার দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ॥

॥ ৩৯ ॥ তুমি বায়ু যম অগ্নি বরুণ চন্দ্রমা প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ, তোমাকে সহস্র বার নমস্কার পুনশ্চ নমস্কার আবার তোমাকে নমস্কার ॥

॥ ৪০ ॥ তোমাকে সম্মুখে নমস্কার আবার পশ্চাতে নমস্কার, সর্ব, তোমাকে সর্বদিকেই নমস্কার, অনন্তবীর্য অমিতবিক্রম তুমি সর্ব বস্তু ব্যাপিয়া আছ এ জন্য তুমি সর্ব ॥

॥ ৪১ ॥ প্রমাদ বা প্রণয়বশে তোমার এই মহিমা না জানিয়া তোমাকে সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এই প্রকার যাহা হঠাৎ বলা হইয়াছে ॥

॥ ৪২ ॥ এবং, অচ্যুত, বিহারে শয়নে আসনে ভোজনে একাকী অথবা অপরের সম্মুখে পরিহাসের জন্য যে সম্মানের লাঘব প্রাপ্ত হইয়াছ অপ্রমেয় তোমার কাছে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি ॥

॥ ৪৩ ॥ অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা হও, পূজ্য, গুরু, গুরু হইতে গরীয়ান্, ত্রিলোকেও তোমার সমান কেহ নাই, অধিকতর আর কোথায় ॥

॥ ৪৪ ॥ সে জন্য নতকায়ে পূজনীয় ঈশ্বর তোমাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি, দেব, পিতা যেমন পুত্রের সখা যেমন সখার প্রিয় প্রিয়ার (তেমনি তুমি আমার অপরাধ) সহ্য কর ॥

॥ ৪৫ ॥ অদৃষ্টপূর্ব তোমার রূপ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছি এবং ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইতেছে, দেব, আমাকে সেই (পূর্বের) রূপ দেখাও, দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও ॥

॥ ৪৬ ॥ আমি তোমাকে সেই প্রকার কিরীটগদাচক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করি, সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্তে সেই চতুর্ভুজরূপই হও ॥

॥ ৪৭ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অর্জুন, আমি প্রসন্ন হওয়ায় আত্মযোগ-প্রভাবে তোমার এই পরম রূপ দর্শন হইল, আমার যে তেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন অন্যের দৃষ্টপূর্ব নহে ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ

॥ ৪৮ ॥ কুরুপ্রবীর, না বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন দ্বারা, না দানের দ্বারা, না বা ক্রিয়াসমূহের দ্বারা, না উগ্র তপস্যার দ্বারা মনুষ্যলোকে এই রূপযুক্ত আমি তুমি ভিন্ন অন্যের দর্শনসাধ্য ॥

॥ ৪৯ ॥ আমার এইপ্রকার ঘোর রূপ দেখিয়া তোমার যে ব্যথা এবং বিমূঢ় ভাব হইয়াছে তাহা অপগত হউক, পুনরায় তুমি বিগতভয় ও প্রীতমনা হইয়া এই আমার সেই রূপই দেখ ॥

॥ ৫০ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ অর্জুনকে এই কথা বলিয়া বাসুদেব পুনর্বার সেই নিজরূপ দেখাইলেন এবং মহাত্মা সৌম্যবপু ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন ॥

॥ ৫১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া এখন সুস্থির সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥

॥ ৫২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ তুমি আমার এই যে সুদুর্দর্শ রূপ দেখিলে দেবগণও এই রূপের নিত্য দর্শনকাঙ্ক্ষী ॥

॥ ৫৩ ॥ তুমি আমাকে যেরূপ দেখিয়াছ এইরূপ আমি না বেদ না তপস্যা না দান না যজ্ঞের দ্বারা দর্শনসাধ্য ॥

॥ ৫৪ ॥ কিন্তু পরন্তপ অর্জুন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমি এই প্রকারে জ্ঞাতব্য, সাক্ষাৎ দর্শনীয় এবং তত্ত্বত প্রবেশের সাধ্য হই ॥

॥ ৫৫ ॥ পাণ্ডব, যিনি আমার কর্ম করেন, মৎপরম, মদ্‌ভক্ত, সঙ্গবর্জিত, সর্বভূতে বৈরভাবশূন্য তিনি আমাকে পান ॥

বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ॥ এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ॥ ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩

দ্বাদশ অধ্যায়। ভক্তিযোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ এইপ্রকার সতত যুক্ত থাকিয়া যে ভক্তেরা তোমার উপাসনা করেন আর যাঁরা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ॥

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত থাকিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে যাঁহারা আমাকে উপাসনা করেন তাঁহারা আমার মতে যুক্ততম ॥

॥ ৩, ৪ ॥ আর যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, সর্বভূতহিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ সংযম করিয়া অনির্বচনীয় অব্যক্ত সর্বব্যাপী অচিন্ত্য এবং কূটস্থ অচল ধ্রুব অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন ॥

॥ ৫ ॥ সেই সকল অব্যক্তে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদের অধিকতর আয়াস করিতে হয় কারণ দেহধারিগণের অব্যক্তে গতি কষ্টে প্রাপ্তব্য ॥

॥ ৬ ॥ কিন্তু যাঁহারা সর্বকর্ম আমাতে সন্ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য যোগের দ্বারাই আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন ॥

॥ ৭ ॥ পার্থ, আমি অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে সেই আমাতে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণের উদ্ধারকর্তা হই ॥

॥ ৮ ॥ আমাতেই মন স্থাপিত কর আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর, এরূপ করিলে পর আমাতেই নিবাস করিবে ইহাতে সংশয় নাই ॥

॥ ৯ ॥ আর (যদি) আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পার তবে, ধনঞ্জয়, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর ॥

॥ ১০ ॥ অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে মৎকর্মপরম হও, আমার জন্য কর্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে ॥

॥ ১১ ॥ যদি আমাতে যোগ আশ্রয় করিয়া ইহাও করিতে না পার তবে যত্নসহকারে সর্বকর্মের ফলত্যাগ কর ॥

॥ ১২ ॥ কারণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান উৎকৃষ্টতর, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেয়, ত্যাগের অনন্তর শান্তি ॥

॥ ১৩ ॥ সর্বভূতে দ্বেষশূন্য মৈত্রীযুক্ত এবং করুণাশীল মমত্বহীন কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য সুখদুঃখে সমবুদ্ধি ক্ষমাশীল ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ইতি ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

॥ ১৪ ॥ সতত সন্তুষ্ট যোগাবলম্বী সংযতচিত্ত দৃঢ়নিশ্চয় আমাতে সমর্পিত-মনোবুদ্ধি যে ব্যক্তি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥

॥ ১৫ ॥ যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না যিনি আনন্দ অসহিষ্ণুতা ভয় উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমার প্রিয় ॥

॥ ১৬ ॥ পরাপেক্ষাশূন্য পবিত্রস্বভাব কর্মকুশল উদাসীন ব্যথাশূন্য সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥

॥ ১৭ ॥ যিনি আনন্দিত হন না দ্বেষ করেন না শোক করেন না আকাঙ্ক্ষা করেন না শুভাশুভপরিত্যাগী যিনি ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয় ॥

॥ ১৮ ॥ শত্রু ও মিত্রে তথা মান অপমানে সমবুদ্ধি শীত-উষ্ণ সুখদুঃখে সমবোধ আসক্তিহীন ॥

॥ ১৯ ॥ নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান সংযতবাক্ যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট বাসস্থানে অনাসক্ত স্থিরবুদ্ধি ভক্তিমান নর আমার প্রিয় ॥

॥ ২০ ॥ এবং যাঁহারা এই ধর্মামৃত শ্রদ্ধাযুক্ত মৎপরম হইয়া যথোক্ত পালন করেন সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্‌।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্‌ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪
মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌॥ ৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্‌।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্‌॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১১
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত, যিনি ইহাকে জানেন এ সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন ॥

॥ ২ ॥ এবং, ভারত, সর্বক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইয়ের যে জ্ঞান তাহা আমার মতে জ্ঞান ॥

॥ ৩ ॥ এবং সেই ক্ষেত্র যাহা এবং যে প্রকার, যেরূপ বিকারশীল এবং যে কারণ হইতে যদ্রূপ এবং তিনি (ক্ষেত্রজ্ঞ) যাহা এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥

॥ ৪ ॥ (তাহা) ঋষিগণ কর্তৃক বহুপ্রকারে বিবিধ পৃথক ছন্দে এবং যুক্তিযুক্ত অসন্দিগ্ধ ব্রহ্মসূত্রপদেও কথিত হইয়াছে ॥

॥ ৫ ॥ মহাভূতসমূহ অহংকার বুদ্ধি এবং অব্যক্ত এবং দশ ও এক ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ॥

॥ ৬ ॥ ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সংঘাত চেতনা ধৃতি সংক্ষেপে ইহাই সবিকার ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইল ॥

॥ ৭ ॥ সম্মানে অনাসক্তি অদম্ভিত্ব অহিংসা ক্ষমা সরলতা আচার্যের সঙ্গ ও সেবা শৌচ স্থৈর্য আত্মবিনিগ্রহ ॥

॥ ৮ ॥ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য এবং আমি কর্তা এই ধারণার অভাব, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিজনিত দোষের পুনঃপুন আলোচন ॥

॥ ৯ ॥ অনাসক্তি পুত্রদারগৃহাদিতে নির্লিপ্ততা এবং ইষ্টানিষ্টলাভে সর্বদা সমচিত্ততা ॥

॥ ১০ ॥ এবং অনন্যযোগে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, উপদ্রবহীন জনবিরল স্থানে থাকিবার ইচ্ছা, জনতায় মিশিতে অনিচ্ছা ॥

॥ ১১ ॥ সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানে অনুরাগ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা ইহা জ্ঞান এই নামে উক্ত হয়, যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান ॥

॥ ১২ ॥ জ্ঞেয় যাহা তাহা বলিতেছি, যাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, উৎপত্তিধর্মবর্জিত পরব্রহ্ম, তাহা না সৎ না অসৎ বলিয়া কথিত ॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১
উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬

॥ ১৩ ॥ তাহা সর্বদিকে হস্তপদযুক্ত সর্বদিকে চক্ষু মস্তক মুখবিশিষ্ট সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, জগতে সকল বস্তুকে আবৃত করিয়া বর্তমান রহিয়াছে ॥

॥ ১৪ ॥ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক সর্ব-ইন্দ্রিয়বর্জিত সংসর্গমুক্ত অথচ সর্ববস্তুর ধারক, নির্গুণ এবং গুণভোক্তা ॥

॥ ১৫ ॥ তাহা ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে, চর অথচ অচর, সূক্ষ্মহেতু অবিজ্ঞেয় এবং দূরস্থ এবং নিকটস্থিত ॥

॥ ১৬ ॥ এবং ভূতগণে অবিভক্ত এবং বিভক্তের ন্যায় স্থিত এবং সেই জ্ঞেয় ভূতপালক সংহারক এবং উৎপত্তিকারক ॥

॥ ১৭ ॥ তাহা জ্যোতিষ্কসমূহেরও জ্যোতি তমের অতীত বলিয়া উক্ত হয়, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, সকলের হৃদয়ে নিবিষ্ট ॥

॥ ১৮ ॥ এই ক্ষেত্র তথা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল, আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হন ॥

॥ ১৯ ॥ প্রকৃতি এবং পুরুষও উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে এবং বিকার-সমূহ এবং গুণসকল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন জানিবে ॥

॥ ২০ ॥ কার্য ও কারণের কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি হেতু বলিয়া কথিত, সুখদুঃখ-সমূহের ভোগকর্তৃত্ববিষয়ে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হয় ॥

॥ ২১ ॥ পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন, গুণের সহিত সঙ্গ ইহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ ॥

॥ ২২ ॥ এই দেহে পর পুরুষ সাক্ষী এবং অনুমোদনকর্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর এবং পরমাত্মা নামেও উক্ত হন ॥

॥ ২৩ ॥ যিনি পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে এই প্রকার জানেন তিনি সর্বভাবে বর্তমান থাকিয়াও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না ॥

॥ ২৪ ॥ কেহ নিজ চেষ্টায় ধ্যানের দ্বারা আত্মাতে, অন্যে সাংখ্যযোগের সাহায্যে এবং অপরে কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥

॥ ২৫ ॥ আবার অন্যে এ প্রকার জানিতে না পারিয়া অপরের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাও শ্রুত উপদেশ পালন করিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়াই যান ॥

॥ ২৬ ॥ ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের ফলে জানিও ॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৪

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

॥ ২৭ ॥ সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত বিনাশশীল বস্তুতে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনি দেখেন ॥

॥ ২৮ ॥ কারণ সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া নিজের দ্বারা আত্মার হানি করেন না, তাহাতে পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥

॥ ২৯ ॥ এবং যিনি প্রকৃতির দ্বারাই কর্মসকল সর্বভাবে কৃত হইতেছে তথা আত্মা অকর্তা রহিয়াছে দেখিতে পান তিনি দেখেন ॥

॥ ৩০ ॥ যখন ভূতসমূহের পৃথকত্ব একস্থ এবং তাহা হইতে তাহার বিস্তারও দেখেন তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥

॥ ৩১ ॥ কৌন্তেয়, এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ বলিয়া শরীরস্থ হইয়াও কিছু করেন না, লিপ্ত হন না ॥

॥ ৩২ ॥ আকাশ যেমন সূক্ষ্মত্বহেতু সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা সর্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়া লিপ্ত হন না ॥

॥ ৩৩ ॥ ভারত, যেমন এক সূর্য এই সমস্ত লোক প্রকাশ করে সেইরূপ ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশ করেন ॥

॥ ৩৪ ॥ যাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদ এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ কি তাহা জানেন তাঁহারা পরমকে প্রাপ্ত হন ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ ॥ পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২
মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

চতুর্দশ অধ্যায়। গুণত্রয়বিভাগযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম পরম জ্ঞানের কথা আবার বলিতেছি যাহা জ্ঞাত হইয়া মুনিগণ ইহলোক হইতে পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

॥ ২ ॥ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টিকালেও জন্ম হয় না এবং প্রলয়ে কষ্ট পাইতে হয় না ॥

॥ ৩ ॥ মহদ্‌ব্রহ্ম আমার যোনি, আমি তাহাতে গর্ভাধান করি তাহা হইতে, ভারত, সমস্ত ভূতবর্গের উৎপত্তি হয় ॥

॥ ৪ ॥ কৌন্তেয়, সর্বপ্রকার যোনিতে যাহা কিছু মূর্ত জীব জন্মে মহদ্‌ব্রহ্ম তাহাদের যোনি, আমি তাহাদের বীজপ্রদ পিতা ॥

॥ ৫ ॥ মহাবাহো, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব রজ তম এই গুণসকল অব্যয় দেহীকে দেহে বন্ধন করে ॥

॥ ৬ ॥ অনঘ, তাহাদের মধ্যে নির্মলত্ব হেতু প্রকাশগুণযুক্ত, বিক্ষোভরহিত সত্ত্ব সুখের আসক্তি ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে ॥

॥ ৭ ॥ রজকে রাগাত্মক ও তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন জানিবে, কৌন্তেয়, তাহা দেহীকে কর্মাসক্তির দ্বারা বন্ধন করে ॥

॥ ৮ ॥ আর তমকে অজ্ঞানজ, সর্বদেহীর মোহকারী জানিবে, ভারত, তাহা প্রমাদ আলস্য নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে ॥

॥ ৯ ॥ ভারত, সত্ত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে রজ কর্মে এবং তম জ্ঞানকে আবৃত করিয়াই প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে ॥

॥ ১০ ॥ ভারত, রজ এবং তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব এবং সত্ত্ব এবং তমকে অভিভূত করিয়া রজ, সেই রূপ সত্ত্ব রজকে অভিভূত করিয়া তম প্রবৃত্ত হয় ॥

॥ ১১ ॥ যখন এই দেহে সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞান দেখা দেয় তখন সত্ত্বই বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা জানিবে ॥

॥ ১২ ॥ ভরতর্ষভ, লোভ কর্মে প্রবৃত্তি নানা কর্মের উদ্যোগ অশান্তি বিষয়-ভোগেচ্ছা এই সকল রজ বৃদ্ধি হইলে দেখা দেয় ॥

॥ ১৩ ॥ কুরুনন্দন, অপ্রকাশ এবং কর্মে অপ্রবৃত্তি কর্তব্য কর্মে অনিচ্ছা এবং অনুচিত কর্মে আগ্রহ, তম বৃদ্ধি পাইলে এই সকল উৎপন্ন হয় ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

অর্জুন উবাচ॥
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

॥ ১৪ ॥ সত্ত্ব বৃদ্ধি হইয়া যখন দেহধারীর মৃত্যু হয় তখন তিনি উত্তম জ্ঞানিগণের অমল লোকসমূহ প্রাপ্ত হন ॥

॥ ১৫ ॥ রজে মৃত্যু হইলে কর্মাসক্তদিগের মধ্যে জন্ম হয়, সেই রূপ তমে মৃত্যু ঘটিলে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ হয় ॥

॥ ১৬ ॥ সুকৃত কর্মের ফল সাত্ত্বিক নির্মল বলিয়া কথিত আর রজের ফল দুঃখ তমের ফল অজ্ঞান ॥

॥ ১৭ ॥ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ এবং মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে ॥

॥ ১৮ ॥ সত্ত্বে স্থিতি হইলে উর্দ্ধগতি লাভ হয়, রাজসগণ মধ্যে অবস্থান করেন, জঘন্য গুণ ও প্রবৃত্তিযুক্ত তামসেরা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ১৯ ॥ যখন দ্রষ্টা গুণ ব্যতীত অপর কোন কর্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে পরকে জানেন (তখন) তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন ॥

॥ ২০ ॥ দেহী দেহসমুদ্ভব এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করেন ॥

॥ ২১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ প্রভো, কি লক্ষণসমূহের দ্বারা এই তিন গুণের অতীত হয়, (তখন) কি প্রকার আচার হয়, কিরূপ উপায়ে এই তিন গুণের অতীত হওয়া যায় ॥

॥ ২২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পাণ্ডব, প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি এবং মোহও উপস্থিত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা করেন না ॥

॥ ২৩ ॥ যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, গুণসকল থাকিবেই জানিয়া যিনি অবস্থান করেন, অস্থির হন না ॥

॥ ২৪ ॥ সুখ দুঃখে সমবোধ, নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয় অপ্রিয়ে তুল্য ভাব, ধীর, নিন্দা আত্মপ্রশংসাতে তুল্যবোধ ॥

॥ ২৫ ॥ মান অপমানে সমজ্ঞান, মিত্রশত্রুতে সমভাব, সর্বারম্ভপরিত্যাগী তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন ॥

॥ ২৬ ॥ এব যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার সেবা করেন তিনি এই তিন গুণ সম্যক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের উপযুক্ত হন ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

॥ ২৭ ॥ কারণ আমি ব্রহ্মের, অমৃতের এবং অব্যয়ের এবং শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা ॥

গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায়। পুরুষোত্তমযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ ছন্দসমূহ যার পত্ররাজি (সেই) ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ অব্যয় কথিত হয়, তাহাকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ ॥

॥ ২ ॥ গুণবর্ধিত বিষয়রূপ অঙ্কুরযুক্ত তাহার শাখাসমূহ অধ এবং ঊর্ধ্বে প্রসারিত এবং কর্মানুগামী মূলসমূহ অধোভাগে মনুষ্যলোকে অনুপ্রবিষ্ট ॥

॥ ৩ ॥ ইহলোকে না ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না অন্ত না আদি না বা প্রতিষ্ঠা, এই অতিবর্ধিতমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া ॥

॥ ৪ ॥ অনন্তর সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে যাহাতে পৌঁছিলে পুনরায় আবর্তন নাই, সেই আদিপুরুষেরই শরণ লই যাঁহা হইতে চিরন্তনী প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে ॥

॥ ৫ ॥ মানমোহশূন্য সঙ্গদোষজয়ী নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কাম্য বস্তু হইতে বিনিবৃত্ত, সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত অমূঢ়চেতা সেই অব্যয় পদ পান ॥

॥ ৬ ॥ তাহা না সূর্য প্রকাশ করিতে পারে না চন্দ্র না অগ্নি, যেখানে পৌঁছিলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা আমার পরম ধাম ॥

॥ ৭ ॥ আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতিস্থিত মন সমেত ছয় ইন্দ্রিয়কে টানিয়া লয় ॥

॥ ৮ ॥ কোন শরীরগ্রহণ এবং কোন শরীরত্যাগকালে, গন্ধাধার হইতে বায়ু যেমন গন্ধসকল, (সেই রূপ) ঈশ্বর ইহাদের লইয়া যান ॥

॥ ৯ ॥ ইনি কর্ণ চক্ষু এবং ত্বক রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মনে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সকল উপভোগ করেন ॥

॥ ১০ ॥ দেহত্যাগকালে অথবা দেহে অবস্থানকালে এবং বিষয়ভোগকালে এই গুণান্বিতকে বিমূঢ় জনেরা দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুযুক্তগণ দেখিতে পান ॥

॥ ১১ ॥ যত্নপর হইয়া যোগিগণও ইহাকে নিজের মধ্যে অবস্থিত দেখেন, অশুদ্ধান্তঃকরণ মূঢ়চেতা ব্যক্তিগণ যত্ন করিলেও ইহাকে দেখিতে পান না ॥

॥ ১২ ॥ যে তেজ আদিত্যগত হইয়া অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যাহা চন্দ্রে এবং যাহা অগ্নিতে সেই তেজ আমার জানিবে ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

॥ ১৩ ॥ আমি ওজ-শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে আবিষ্ট করিয়া ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধী পোষণ করি ॥

॥ ১৪ ॥ আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপানে যুক্ত হইয়া চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি ॥

॥ ১৫ ॥ এবং আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমা হইতে স্মৃতি জ্ঞান ও সংশয়নিরাসক সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বেদে আমিই জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তপ্রবর্তক বেদবিৎ ॥

॥ ১৬ ॥ লোকে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই পুরুষ (আছে), ভূতসকল ক্ষর, কূটস্থকে অক্ষর বলা হয় ॥

॥ ১৭ ॥ এবং অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা এই নামে অভিহিত যিনি অব্যয় ঈশ্বর লোকত্রয়কে আবিষ্ট করিয়া পালন করেন ॥

॥ ১৮ ॥ যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম সে জন্য লোকসাধারণে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ॥

॥ ১৯ ॥ ভারত, যে মোহশূন্য ব্যক্তি আমাকে এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন সেই সর্ববিৎ আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন ॥

॥ ২০ ॥ অনঘ ভারত, আমার দ্বারা এই গুহ্যতম শাস্ত্র এই প্রকারে কথিত হইল, ইহা জানিলে বুদ্ধিযুক্ত ও কৃতকৃত্য হয় ॥

পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ॥ অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

ষোড়শ অধ্যায়। দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ নির্ভয়তা শুদ্ধসত্ত্বানুভূতি, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, দান এবং বহিরিন্দ্রিয়দমন এবং যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপ সরলতা ॥

॥ ২ ॥ অহিংসা সত্য অক্রোধ ত্যাগ শান্তি, পরদোষবর্ণনে অনিচ্ছা, প্রাণিবর্গে দয়া, অলোভ মৃদুতা লজ্জা স্থৈর্য ॥

॥ ৩ ॥ তেজ ক্ষমা ধৃতি শুচিতা, পরের অনিষ্টচেষ্টার অভাব, অনতিমানিতা, ভারত, দৈবী সম্পদে অধিকারী জাত ব্যক্তির হয় ॥

॥ ৪ ॥ পার্থ, দম্ভ দর্প গর্ব ক্রোধ এবং কর্কশতা এবং অজ্ঞান আসুরী সম্পদে অধিকারী জাত ব্যক্তির হয় ॥

॥ ৫ ॥ দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভের হেতু, আসুরী বন্ধনের হেতু বলিয়া গণ্য হয়, পাণ্ডব, ভাবনা করিও না তুমি দৈবী সম্পদে অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছ ॥

॥ ৬ ॥ এই লোকে দৈব ও আসুর দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি (দেখা যায়), দৈব সবিস্তারে বলা হইয়াছে, পার্থ, আমার নিকট আসুরী শ্রবণ কর ॥

॥ ৭ ॥ আসুর জনেরা প্রবৃত্তিও জানে না নিবৃত্তিও জানে না, তাহাদের মধ্যে না শুচিতা এবং না বা আচার না সত্য আছে ॥

॥ ৮ ॥ তাহারা জগৎকে অসত্য অপ্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরসত্তাশূন্য কার্যকারণ-পরম্পরাহীন এমন কি কামমাত্রই ইহার হেতু বলে ॥

॥ ৯ ॥ এই প্রকার দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্মা অমঙ্গল-কারিগণ জগতের অনিষ্টের জন্য প্রাদুর্ভূত হয় ॥

॥ ১০ ॥ দম্ভমানমদান্বিত অশুচি কর্মীরা দুঃসাধ্য কামনার আশ্রয়ে মোহবশে অসৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয় ॥

॥ ১১ ॥ এবং তাহারা মরণকাল পর্যন্ত অন্তহীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া কামোপভোগপরম হইয়া এবং ইহাকেই ঠিক পথ ভাবিয়া ॥

॥ ১২ ॥ শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ অবস্থায় কামক্রোধপরায়ণ হইয়া কাম্য বস্তু ভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে ॥

॥ ১৩ ॥ অদ্য আমার এই লাভ হইল, এই মনোরথ পূর্ণ হইবে, এই আছে আবার এই ধনও আমার হইবে ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

॥ ১৪ ॥ এই শত্রু আমার দ্বারা হত হইয়াছে, অন্য শত্রুদেরও মারিব, আমি শক্তিসম্পন্ন আমি ভোগী আমি সফলকর্মা বলবান সুখী ॥

॥ ১৫ ॥ ধনী, আমি উচ্চবংশজাত, আমার সমান আর কে আছে, আমি যাগ করিব দান করিব আনন্দ করিব এই প্রকার অজ্ঞানবিমোহিত ॥

॥ ১৬ ॥ নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে আচ্ছন্ন, কামভোগাসক্তগণ অশুচি নরকে পতিত হয় ॥

॥ ১৭ ॥ আত্মশ্লাঘাকারী অনম্র ধনমানমদান্বিত সেই সকল ব্যক্তি যজ্ঞের নামে দম্ভের সহিত অবিধিপূর্বক যজনা করে ॥

॥ ১৮ ॥ অহংকার বল দর্প কাম এবং ক্রোধ আশ্রয় করিয়া পরছিদ্রান্বেষিগণ নিজ এবং পরদেহে অধিষ্ঠিত আমাকে দ্বেষ করে ॥

॥ ১৯ ॥ সেই দ্বেষী ক্রূর নরাধমগণকে আমি সংসারে আসুরী যোনিতেই অজস্র বার নিক্ষেপ করি ॥

॥ ২০ ॥ কৌন্তেয়, মূঢ়েরা আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতে অধমা গতিতে যায় ॥

॥ ২১ ॥ কাম ক্রোধ তথা লোভ আত্মার হানিকর এই ত্রিবিধ নরকের দ্বার, তজ্জন্য এই তিনকে ত্যাগ করিবে ॥

॥ ২২ ॥ কৌন্তেয়, এই তিন তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য নিজের শ্রেয় আচরণ করে, তাহা হইতে পরা গতি প্রাপ্ত হয় ॥

॥ ২৩ ॥ যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে চলে সে না সিদ্ধি না সুখ না পরা গতি পায় ॥

॥ ২৪ ॥ অতএব কর্তব্য অকর্তব্য ব্যবস্থা বিষয়ে তোমার শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রবিধানোক্ত বিষয় জানিয়া সংসারে তোমার কর্ম করা উচিত ॥

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ॥ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ॥ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

সপ্তদশ অধ্যায়। শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক যজনা করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার, সত্ত্ব রজ অথবা তম ॥

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ দেহীদের সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই ত্রিবিধ হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥

॥ ৩ ॥ ভারত, সকলের শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে যাহাতে শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই ॥

॥ ৪ ॥ সাত্ত্বিকগণ দেবতার যজনা করেন রাজসগণ যক্ষরক্ষদের অন্য তামস জনেরা প্রেত ও ভূতগণের যজনা করে ॥

॥ ৫, ৬ ॥ যে সকল দম্ভ-অহংকারযুক্ত কামরাগবলান্বিত মূঢ়চেতা ব্যক্তি শরীরস্থ ভূতগ্রামকে এবং অন্তঃশরীরস্থিত আমাকেও কৃশ করিয়া অশাস্ত্রীয় ঘোর তপানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে অসুরবুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥

॥ ৭ ॥ সকলের আহারও ত্রিবিধ প্রিয় হয়, যজ্ঞ তপ দানও সেইপ্রকার, তাহাদের এই প্রকারভেদ শ্রবণ কর ॥

॥ ৮ ॥ আয়ু মনোবল শারীরিক শক্তি স্বাস্থ্য সুখ তৃপ্তিবর্ধনকর, রসাল স্নেহযুক্ত সারবান রুচিকর খাদ্যদ্রব্যসমূহ সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥

॥ ৯ ॥ তিক্ত অম্ল লবণাক্ত অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ স্নেহবর্জিত জ্বালাকর পরিণামে দুঃখ শোক রোগজনক আহার্য দ্রব্যসকল রাজসগণের ঈপ্সিত ॥

॥ ১০ ॥ বাসী শুষ্করস দুর্গন্ধযুক্ত এবং যাহা বিকারপ্রাপ্ত এবং উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র এরূপ খাদ্য তামসপ্রিয় ॥

॥ ১১ ॥ যজ্ঞ কর্তব্য এই মনে স্থির করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিধি অনুসারে যে যজ্ঞ আচরিত হয় তাহা সাত্ত্বিক ॥

॥ ১২ ॥ কিন্তু ফলের আশায় এবং দম্ভের জন্যও যে যজন করা হয়, ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে ॥

॥ ১৩ ॥ শাস্ত্রবিধিহীন অন্ননিবেদনহীন মন্ত্রহীন দক্ষিণাহীন শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তামস বলিয়া কথিত ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও বিদ্বানের পূজা, শুচিতা সরলতা ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসাকে শারীর তপ বলা হয় ॥

॥ ১৫ ॥ অনুদ্বেগকর এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় হিতকর বাক্য এবং শাস্ত্রাদি পঠনের অভ্যাসকে বাঙ্ময় তপ বলে ॥

॥ ১৬ ॥ চিত্তের প্রসন্নতা সৌম্যত্ব মৌন আত্মবিনিগ্রহ বিশুদ্ধ ভাবনা এই সকলকে মানস তপ বলা যায় ॥

॥ ১৭ ॥ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে ঐ ত্রিবিধ তপ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥

॥ ১৮ ॥ সুখ্যাতি মান পূজালাভের জন্য এবং দম্ভসহকারে যাহা কৃত হয় অস্থায়ী অনিশ্চিত সেই তপ ইহলোকে রাজস কথিত হয় ॥

॥ ১৯ ॥ মোহবশে নিজেকে কষ্ট দিয়া বা পরের উৎসাদনের জন্য যাহা করা যায় তাহা তামস তপ বলিয়া কথিত হয় ॥

॥ ২০ ॥ অনুপকারীকে দেশ এবং কাল এবং পাত্রত্ব বিবেচনা করিয়া দেওয়া বিধি এই বুদ্ধিতে যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উপদিষ্ট ॥

॥ ২১ ॥ আর যাহা প্রত্যুপকারের জন্য অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং কষ্টের সহিত দেওয়া হয় সেই দান রাজস বলিয়া উপদিষ্ট ॥

॥ ২২ ॥ অবিহিত দেশে কালে অপাত্রগণকে এবং বিহিত সৎকার না করিয়া অবজ্ঞার সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥

॥ ২৩ ॥ ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা পূর্বকালে ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞসকল নিয়মিত হইয়াছিল ॥

॥ ২৪ ॥ সেই কারণে ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান তপ সকল ওঁ এই উচ্চারণ করিয়া সতত আরম্ভ করা হয় ॥

॥ ২৫ ॥ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের জন্য মোক্ষকামিগণ কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞ তপ ও দানক্রিয়া তৎ এই কথা উচ্চারণের পর অনুষ্ঠিত হয় ॥

॥ ২৬ ॥ পার্থ, সৎভাবের এবং সাধুভাবের উদ্দেশ্যে সৎ এই শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং উত্তম কর্মের সহিত সৎ শব্দ যুক্ত হয় ॥

॥ ২৭ ॥ এবং যজ্ঞ তপ ও দানের স্থিতি সৎ এই নামে কথিত এবং তাহার উদ্দেশ্যে কর্মও সৎ এই নামে অভিহিত ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

॥ ২৮ ॥ অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত দান তপ ও যাহা কিছু কর্ম তাহা অসৎ এই নামে কথিত, পার্থ, তাহা না পরলোকের না ইহলোকের (জন্য) করণীয় ॥

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত



মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ ॥ সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ॥ কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩

অষ্টাদশ অধ্যায়। মোক্ষযোগ

॥ ১ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥

॥ ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ জ্ঞানিগণ কাম্য কর্মের ন্যাসকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, বিচক্ষণগণ সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন ॥

॥ ৩ ॥ এক শ্রেণীর (মনীষীরা) এই বলেন যে কর্ম দোষবৎ পরিত্যাজ্য, অপরে যজ্ঞ দান তপ-রূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে ইহাই বলেন ॥

॥ ৪ ॥ ভরতসত্তম, সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থির সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর, পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে ॥

॥ ৫ ॥ যজ্ঞ দান তপ-রূপ কর্ম বর্জনীয় নহে, তাহা কর্তব্যই, যজ্ঞ দান এবং তপ মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিরই হেতু ॥

॥ ৬ ॥ কিন্তু, পার্থ, এই সকল কর্মও আসক্তি ও ফলসমূহ ত্যাগ করিয়া আচরণীয় এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত ॥

॥ ৭ ॥ নিয়ত কর্মেরও সন্ন্যাস যুক্তিযুক্ত নহে, মোহবশে তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হয় ॥

॥ ৮ ॥ শরীরের ক্লেশের ভয়ে ইহা দুঃখ এই মনে করিয়া কোন কর্ম যে বর্জন করে সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফলই লাভ করে না ॥

॥ ৯ ॥ অর্জুন, আচরণ কর্তব্য ইহা মনে করিয়াই যে নিয়ত কর্ম সঙ্গ এবং ফলত্যাগপূর্বক করা হয় সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বিবেচিত হয় ॥

॥ ১০ ॥ সত্ত্বগুণযুক্ত বুদ্ধিমান সংশয়হীন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্মে আসক্ত হন না ॥

॥ ১১ ॥ কারণ দেহযুক্ত জীবের দ্বারা সমস্ত কর্ম নিঃশেষ বর্জন করা সাধ্য নহে কিন্তু যিনি কর্মফলত্যাগী তিনি ত্যাগী এই নামে অভিহিত হন ॥

॥ ১২ ॥ অত্যাগীদের কর্মের পরলোকে ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্র তিন প্রকার ফললাভ হয় কিন্তু সন্ন্যাসীর কখনও না ॥

॥ ১৩ ॥ মহাবাহো, সাংখ্যে কৃতান্তে সকলপ্রকার কর্মের সফলতার হেতু বলিয়া কথিত এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট বুঝ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্‌সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যত্তু কামেপ্‌সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্‌সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭

॥ ১৪ ॥ অধিষ্ঠান এবং কর্তা এবং পৃথগ্‌বিধ করণ, বিবিধ পৃথক চেষ্টা এবং এই বিষয়ে পঞ্চম দৈব ॥

॥ ১৫ ॥ শরীর বাক্য মন দ্বারা মানুষ যে কাজ আরম্ভ করে তাহা ন্যায্য হউক বা তাহার বিপরীত হউক এই পাঁচটি তাহার হেতু ॥

॥ ১৬ ॥ এই প্রকার হওয়াতে সেই ক্ষেত্রে যে কেবল আত্মাকেই কর্তা বলিয়া দেখে সেই দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু দেখে না ॥

॥ ১৭ ॥ যাঁহার অহংকৃত ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না তিনি এই সমস্ত লোক হত্যা করিলেও হত্যা করেন না, বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ॥

॥ ১৮ ॥ জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধ কর্মচোদনা, করণ কর্ম কর্তা এই ত্রিবিধ কর্মসংগ্রহ ॥

॥ ১৯ ॥ গুণসংখ্যানে জ্ঞান এবং কর্ম এবং কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধই কথিত হইয়াছে, তাহাও যথাযথ শ্রবণ কর ॥

॥ ২০ ॥ যাহার দ্বারা পরস্পর ভিন্ন সর্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যয় ভাব দেখা যায় সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে ॥

॥ ২১ ॥ কিন্তু যে জ্ঞান সর্বভূতের পৃথগ্‌বিধ নানাভাব পৃথক ভাবে জানে সেই জ্ঞান রাজসিক জানিবে ॥

॥ ২২ ॥ এবং যাহা একই কার্যে সর্বস্বের মত আসক্ত, অহৈতুক, তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ এবং অল্প তাহা তামস কথিত হয় ॥

॥ ২৩ ॥ ফলকামনাহীন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, আসক্তিরহিত যে কর্ম রাগ-দ্বেষবিবর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥

॥ ২৪ ॥ কিন্তু ফলকামী কর্তৃক অথবা আমি করিতেছি এই ভাবের সহিত বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত ॥

॥ ২৫ ॥ পরিণাম, ক্ষতি, পরের কষ্ট ও নিজের ক্ষমতার হিসাব না করিয়া মোহবশে যে কর্ম আরব্ধ হয় তাহা তামস উক্ত হয় ॥

॥ ২৬ ॥ আসক্তিরহিত, আমি কর্তা এই ভাবশূন্য, ধৃতি উৎসাহযুক্ত সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্তা সাত্ত্বিক উক্ত হয় ॥

॥ ২৭ ॥ অনুরাগযুক্ত, ফললাভে আগ্রহান্বিত, লোভী পরপীড়াকারী অপবিত্র স্বভাব হর্ষ শোকযুক্ত কর্তা রাজস কথিত হয় ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

॥ ২৮॥ অস্থিরমতি অসংস্কৃতস্বভাব অনম্র শঠ পরদ্বেষী অলস উৎসাহহীন এবং দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস উক্ত হয় ॥

॥ ২৯ ॥ ধনঞ্জয়, বুদ্ধির এবং ধৃতিরও গুণানুসারে ত্রিবিধ ভেদ সম্যকভাবে পৃথক পৃথক কথিত হইতেছে শ্রবণ কর ॥

॥ ৩০ ॥ পার্থ, কর্তব্যে অকর্তব্যে, ভয়ে অভয়ে যে বুদ্ধি প্রবৃত্তিও জানে নিবৃত্তিও জানে, বন্ধ এবং মোক্ষ জানে তাহা সাত্ত্বিকী ॥

॥ ৩১ ॥ পার্থ, যাহার দ্বারা ধর্ম এবং অধর্মও, কর্তব্য এবং অকর্তব্য অনিশ্চিত ভাবে জানা যায় সেই বুদ্ধি রাজসী ॥

॥ ৩২ ॥ পার্থ, যাহা তমের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ইহাই ধর্ম এবং সর্ববিষয়কে বিপরীত মনে করে সেই বুদ্ধি তামসী ॥

॥ ৩৩ ॥ পার্থ, যে অবিচলিত ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ক্রিয়া যোগযুক্ত হইয়া ধারণ করা যায় সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥

॥ ৩৪ ॥ কিন্তু, অর্জুন, যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম কাম অর্থ ধারণ করা হয়, আসক্তি-যুক্ত হইয়া পুরুষ ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, পার্থ, সেই ধৃতি রাজসী ॥

॥ ৩৫ ॥ দুর্মতিগণ যাহার বশে নিদ্রা ভয় শোক অবসাদ এবং মদভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, পার্থ, সেই ধৃতি তামসী ॥

॥ ৩৬ ॥ ভরতর্ষভ, এখন আমার নিকট ত্রিবিধ সুখও শ্রবণ কর, যাহাতে অভ্যাসবশে আনন্দ হয় এবং দুঃখনিবৃত্তি হয় ॥

॥ ৩৭ ॥ যাহা আরম্ভে বিষবৎ পরিণামে অমৃততুল্য সেই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখ সাত্ত্বিক কথিত হয় ॥

॥ ৩৮ ॥ যাহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন তাহা প্রথমে অমৃততুল্য পরিণামে বিষবৎ সেই সুখ রাজস বলিয়া উপদিষ্ট ॥

॥ ৩৯ ॥ যাহা আরম্ভে এবং পরিণামেও নিজের মোহজনক, নিদ্রা আলস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস বলিয়া কথিত ॥

॥ ৪০ ॥ পৃথিবীতে এবং স্বর্গে আর দেবগণের মধ্যেও এমন কোন সত্ত্ব নাই যাহা এই তিন প্রকৃতিজ গুণ হইতে মুক্ত হইয়া বর্তমান থাকিতে পারে ॥

॥ ৪১ ॥ পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের এবং শূদ্রদের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

॥ ৪২ ॥ শম দম তপ শৌচ ক্ষমা এবং সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য স্বভাবজ ব্রাহ্মণকর্ম ॥

॥ ৪৩ ॥ শৌর্য তেজ ধৃতি দক্ষতা এবং যুদ্ধে পলায়ন না করাও, দান এবং প্রভুত্বের ইচ্ছা স্বভাবজ ক্ষাত্র কর্ম ॥

॥ ৪৪ ॥ কৃষি, পশুপালন ও রক্ষা, বাণিজ্য স্বভাবজ বৈশ্যকর্ম এবং শূদ্রের পরিচর্যাত্মক কর্ম স্বভাবজ ॥

॥ ৪৫ ॥ মনুষ্য নিজ নিজ কর্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করে, স্বধর্মনিরত ব্যক্তি যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শ্রবণ কর ॥

॥ ৪৬ ॥ যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে, স্বকর্মের দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে ॥

॥ ৪৭ ॥ বিগুণ স্বধর্ম সুসম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়, আর স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করিয়া পাপ অর্জন হয় না ॥

॥ ৪৮ ॥ কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, কারণ ধূমের দ্বারা অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত ॥

॥ ৪৯ ॥ সর্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি জিতাত্মা কামনাহীন ব্যক্তি সন্ন্যাসের দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন ॥

॥ ৫০ ॥ কৌন্তেয়, সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের যাহা পরা নিষ্ঠা সেই ব্রহ্মকে যে প্রকারে লাভ করেন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট বুঝিয়া লও ॥

॥ ৫১ ॥ শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধৃতির দ্বারা নিজেকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি বহির্বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এবং রাগ দ্বেষ বর্জন করিয়া ॥

॥ ৫২ ॥ নির্জন দেশে অবস্থিত হইয়া, লঘু আহারসেবী সংযতবাক্‌কায়মানস নিত্যধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ॥

॥ ৫৩ ॥ অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া, মমত্ব-ভাবশূন্য শান্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভের উপযুক্ত হন ॥

॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করেন ॥

॥ ৫৫ ॥ ভক্তিদ্বারা আমি যে সমস্ত এবং আমি যাহা যথার্থভাবে জানিতে পারেন, যথার্থভাবে জানিয়া তাহা হইতে তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন ॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮
যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

॥ ৫৬ ॥ সর্বদা সকলপ্রকার কর্ম করিয়াও আমার আশ্রয় লইলে আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

॥ ৫৭ ॥ চিত্তদ্বারা সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত মৎ-চিত্ত হও ॥

॥ ৫৮ ॥ মৎ-চিত্ত হইলে মৎপ্রসাদে সর্বপ্রকার দুর্গতি উত্তীর্ণ হইবে আর যদি তুমি অহংকার বশে না শুন বিনষ্ট হইবে ॥

॥ ৫৯ ॥ অহংকার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না এই যদি ভাব তোমার কর্তব্য-বুদ্ধি মিথ্যাই হইবে, প্রকৃতি তোমাকে প্রবৃত্ত করাইবে ॥

॥ ৬০ ॥ কৌন্তেয়, মোহ বশে যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না নিজ স্বভাবজ কর্মের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া অবশ হইয়াই তাহা করিবে ॥

॥ ৬১ ॥ অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীকে মায়ার দ্বারা যন্ত্রার্পিতের ন্যায় ঘুরাইতে থাকিয়া সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করেন ॥

॥ ৬২ ॥ ভারত, সর্বভাবে তাঁহারই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি, শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥

॥ ৬৩ ॥ এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান আমার দ্বারা তোমাকে কথিত হইল তাহা নিঃশেষ বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥

॥ ৬৪ ॥ পুনর্বার আমার সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বাক্য শ্রবণ কর, তুমি আমার অতিশয় প্রিয় জানিবে সে জন্য তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি ॥

॥ ৬৫ ॥ আমাতে নিবদ্ধমন আমার ভক্ত আমার যজনাকারী হও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার প্রিয় তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমাকেই পাইবে ॥

॥ ৬৬ ॥ সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ॥

॥ ৬৭ ॥ ইহা কদাচ তোমার দ্বারা তপস্যাহীন ব্যক্তিকে বক্তব্য নহে, না অভক্তকে না অশ্রবণেচ্ছুকে না বা যে আমাকে অসূয়া করে (তাহাকে) ॥

॥ ৬৮ ॥ যিনি আমার প্রতি পরা ভক্তি করিয়া এই পরম গুহ্য কথা আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন (তিনি) নিশ্চয় আমাকেই পাইবেন ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২
অর্জুন উবাচ॥ নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩
সঞ্জয় উবাচ॥ ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮

ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

॥ ৬৯ ॥ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার প্রিয়কার্যপরায়ণ কেহই নাই, পৃথিবীতে তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তর অন্য কেহ হইবেনও না ॥

॥ ৭০ ॥ এবং যিনি আমাদের এই ধর্মপ্রদ সংবাদ অধ্যয়ন করেন তাঁহার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে তৃপ্ত হই ইহা আমার মত ॥

॥ ৭১ ॥ এবং যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত অসূয়াহীন হইয়া শ্রবণ করেন তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মীদের শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন ॥

॥ ৭২ ॥ পার্থ, তোমার দ্বারা একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রুত হইল কি, ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত সম্মোহ সম্যক নষ্ট হইল কি ॥

॥ ৭৩ ॥ অর্জুন বলিলেন ॥ অচ্যুত, মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতিলাভ হইয়াছে, স্থির ও সন্দেহমুক্ত হইয়াছি, তোমার কথামত কাজ করিব ॥

॥ ৭৪ ॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ আমি এই প্রকারে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শুনিলাম ॥

॥ ৭৫ ॥ ব্যাসপ্রসাদে আমি এই পরমগুহ্য যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণকর্তৃক সাক্ষাৎ কথিত হইতে শুনিলাম ॥

॥ ৭৬ ॥ এবং, রাজন্, কেশব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্যসংবাদ পুনঃপুন স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥

॥ ৭৭ ॥ রাজন্, হরির সেই অতি অদ্ভুত রূপও বার বার স্মরণ করিয়া আমার মহা বিস্ময় হইতেছে এবং পুনঃপুন পুলকিত হইতেছি ॥

॥ ৭৮ ॥ যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ যেখানে ধনুর্ধর পার্থ সেখানে শ্রী বিজয় ঐশ্বর্য ধ্রুবনীতি (এই) আমার মত ॥

মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

গীতা

পারিভাষিক ও বিশিষ্ট শব্দের নির্ঘণ্ট

পারিভাষিক ও বিশিষ্ট শব্দের নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্টে সংস্কৃত শব্দের বাংলা রূপ দেওয়া হইল। একাধিক নির্দেশ থাকিলে শব্দের অর্থের জন্য তারকা-চিহ্নিত সংখ্যা নির্দিষ্ট শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্টেও কোন কোন শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদসংখ্যার দ্বারা তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। উদাহরণ: ৫।৩ — পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৬।৪* = ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শব্দটির অর্থ পাওয়া যাইবে। প।২৩* = পরিশিষ্টের ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদে শব্দের অর্থ বিচার আছে। আচার্য, ১।২*-৩, ২৬, ১৩।৭ = গীতার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ষড়বিংশ শ্লোক এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক, এই কয় স্থলে 'আচার্য' শব্দের উল্লেখ আছে; ইহাদের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'আচার্য' শব্দের অর্থ পাওয়া যাইবে। অহোরাত্রবিৎ, ৮।১৭, ৯।৭*, প।৩৯* = গীতার অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে 'অহোরাত্রবিৎ' শব্দ আছে এবং এই শব্দের অর্থের জন্য নবম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং পরিশিষ্টের ৩৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।